এহ্ইয়াউস সুনান

সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স

إحياء السنن

এহ্ইয়াউস সুনান

সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

:
:

এহ্ইয়াউস সুনান
সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রপ্তিস্থানঃ

১. **দারুশ শরীয়াহ্ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা**
২. **ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬**
৩. **আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০**

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণঃ ২০০৭ ঈসায়ী

হাদিয়া
২৬০ (দুইশত ষাট) টাকা মাত্র।

Ehyaus Sunan (Revival of Sunnah) by Dr. Kh. Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. 5th edition 2007. Price TK 260.00 only.

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের দিশারী

মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা'দ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণই সকল বেলায়াত, কামালাত ও নাজাতের একমাত্র পথ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে মুসলিম সমাজের অনেক ধার্মিক মুসলিম বর্তমানে বিশ্বাসে ও কর্মে সুন্নাতের বাইরে অগণিত কর্মে লিপ্ত রয়েছেন। বিদ'আতের সর্বগ্রাসী প্রসারতায় সুন্নাত আজ মৃতপ্রায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত জীবনধারা ও রীতিনীতি আজ সমাজে অপরিচিত। অপরদিকে বিদ'আতই সুন্নাত ও দ্বীন বলে প্রচলিত।

সমাজের এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের পরিচয়, গুরুত্ব, বিভিন্ন কর্মে প্রকৃত সুন্নাত নিয়ম ও সমাজে প্রচলিত সুন্নাত-বিরোধী বিভিন্ন কর্ম, রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ দিয়ে এই বইটি লিখেছে আমার স্নেহাস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। আমি বইটি পড়ে খুবই খুশি হয়েছি।

কুরআন কারীম, সহীহ হাদীস ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতির আলোকে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে প্রকৃত সুন্নাত পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সমাজের খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতির প্রভাবে এগুলি অবজ্ঞা বা অবহেলা করে ঈমান হারা হবেন না। এগুলির উপর আমল করুন এবং সর্বান্ত করণে গ্রহণ করুন। সহীহ সুন্নাত জানার পরে মুমিনের উপর তা মেনে নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। পালন করতে না পারলেও সুন্নাতের মহব্বত ও ইজ্জত করতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে, বিশেষ কারণে আমি সুন্নাত পালন করতে পারছি না। কিন্তু সুন্নাত জানার পরেও তাকে সমাজের প্রচলন বা কোনো মানুষের অজুহাত দিয়ে অবজ্ঞা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে ; সাবধান থাকবেন।

বইটির বহুল প্রচার ও প্রসারের জন্য দোয়া করছি। আশা করি, আমার সকল মুহিব্বীন এবং সর্বস্তরের সকল আলেম ও দ্বীনদার মুসলিম বইটি পাঠ করবেন এবং উপকৃত হবেন। দোয়া করি, আল্লাহ লেখকের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এই বইকে তাঁর ও আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আহ্কারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দীকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর ও তাঁর মহান রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম। সুন্নাতের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রকার, উৎস, খেলাফে-সুন্নাত কর্মের পর্যায়, বিদ'আতের পরিচয়, প্রকার, সুন্নাত থেকে বিদ'আতে উত্তরণের কারণাদি এবং ওযু, নামায, যিকির, কুলখানী ইত্যাদি থেকে শুরু করে হরতাল-ধর্মঘটসহ মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত জানার প্রচেষ্টা এ গ্রন্থটি। সুন্নাতের আলোচনা করতে যেয়ে স্বভাবতই সমাজে প্রচলিত অগণিত ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম, রীতি ও আচার- অনুষ্ঠানের সুন্নাত বহির্ভুত বিষয়গুলি আলোচনা করতে হয়েছে।

২০০২ সালে বইটি প্রথম প্রকাশ করার সময় ধারণা করেছিলাম যে, সমাজের আলেম-উলামা ও ধার্মিক মানুষেরা হয়ত বইটি গ্রহণ করবেন না এবং যুগ যুগ ধরে আচরিত ও প্রচারিত কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করাও তাঁদের জন্য কঠিন হবে। শুধুমাত্র সুন্নাতে নববীকে জানিয়ে দেওয়ার আবেগ নিয়েই বইটি লিখেছিলাম। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। বড় কলেবরের কষ্ট-পাঠ্য এ বইটি পড়তে পাঠকদের বিপুল সাড়া থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সমাজের অগণিত ধার্মিক মানুষ কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ করতে এবং সে অনুযায়ী জীবনকে পরিবর্তিত ও পরিচালিত করতে আগ্রহী। সমাজের শত প্রচলন এমনকি নিজের দীর্ঘদিনের আচরিত রীতি, অভ্যাস বা কর্মও সুন্নাতের অনুসরণের জন্য অকাতরে পরিত্যাগ করতে পারেন এমন মানুষ সমাজে অগণিত।

জায়েয না-জায়েযের অন্তহীন বিতর্ক, যুক্তির ঘোরপ্যাচ বা অগণিত সম্ভাবনার কথা তাঁরা শুনতে চান না। পরবর্তী যুগের অগণিত বুজুর্গ কে কিভাবে কি করেছেন তা নিয়েও তাঁরা বিতর্কে যেতে চান না। তাঁরা জানতে চান রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর মহান সাহাবীগণের সুন্নাত। তাঁরা জানতে চান রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনের কোন্ কাজটি কিভাবে পালন করেছেন এবং যথাসাধ্য তাঁর হুবহু অনুকরণ অনুসরণ তাঁরা করতে চান। বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মনগড়া কথা, গল্প, কাহিনী, জাল হাদীস বা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর তাঁরা নির্ভর করতে চান না। তাঁরা সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জানতে চান। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কেউ সেগুলি সংগ্রহ করে তাঁদের সামনে উপস্থাপন করলে তাঁর আনন্দিত হন এবং সাদরে গ্রহণ করেন।

এ বইটির নামকরণ, প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্‌হার সিদ্দীকী (রাহ)। জীবনের সবকিছুর উর্ধ্বে সুন্নাতে নববীকে ভালবেসেছেন তিনি এবং আমাদেরকেও এভাবে সুন্নাতকে ভালবাসতে ও গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর মহান রব্বের ডাকে সাড়া দিয়ে গত বছর তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, সুন্নাতে নববীর পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা তিনি দয়া করে কবুল করে নেন, তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন এবং তাঁর সন্তানগণসহ আমাদের সকলকে সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহান রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম জানিয়ে শুরু করছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের কর্তব্য দ্বিমুখী : প্রথমত, তাঁকে সর্বাধিক ভালবাসা ও সম্মান করা ; দ্বিতীয়ত, তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা। এ দুটি বিষয় পরস্পর সম্পূরক। ভালবাসা ও ভক্তি মানুষকে অনুসরণ, অনুকরণ ও দ্বিধাহীন আনুগত্যের পথে ধাবিত করে। আবার ক্রমাগত ও সার্বিক অনুসরণ ও আনুগত্য অনুসারীর মনে তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা ও ভক্তি সৃষ্টি করে। সাহাবীগণের জীবনে আমরা এটাই দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি তাঁদের ভক্তি ও ভালবাসা যেমন ছিল সীমাহীন, অতুলনীয়, তেমনি তাঁকে জীবনের সকলক্ষেত্রে, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁদের ঐকান্তিকতাও ছিল অতুলনীয়।

ইসলাম ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এখানে মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একজন খ্রিষ্টান ঈসা (আ) বা 'যীশু খ্রিষ্টকে' গভীরভাবে ভালবাসেন ভক্তি করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তিনিই তার মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা। কিন্তু তাকে যদি যীশুর ইবাদত বন্দেগি, আচার আচরণ, অভ্যাস বা কর্ম বা শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় , তাহলে তিনি বিশেষ কিছুই বলতে পারবেন না। কারণ, তার বিশ্বাস হলো, যীশু খ্রিষ্টের অনুসরণ, অনুকরণ বা আনুগত্য নয়, বরং তাঁর প্রতি ভালবাসা, ভক্তি ও বিশ্বাসই তাকে মুক্তি দেবে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিমের বিশ্বাস হলো যে, রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর প্রতি কর্মহীন বা অনুসরণহীন ভালবাসা নয়, বরং তাঁর ভক্তিময় প্রেমময় অনুসরণ অনুকরণ ও আনুগত্যই তাকে চিরকল্যাণ ও মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। তাই একজন মুসলিম সকল ক্ষেত্রে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ বা তাঁর সুন্নাত জানতে আগ্রহী।

ইসলামের সকল কর্মকাণ্ডের সূত্র ও উৎসই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তাঁর অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্যের উপরেরই সকল ইসলামী কর্ম ও জ্ঞানের ভিত্তি। ইসলামী আকীদার উদ্দেশ্য, আমাদের বিশ্বাস ও আকীদা যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের মতো হয়। ইসলামী ফিকহের উদ্দেশ্য, আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল কর্মকাণ্ড যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো হয়। ইসলামী তাসাউফের উদ্দেশ্য, আমাদের ক্বলব, আমাদের আত্মিক ও হার্দিক অবস্থা যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের মতো হয়। এক কথায় – রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের 'সুন্নাত' মতো চলা বা তাঁদের মতো হওয়াই মুসলিম জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগের মানুষেরা ছিলেন তাঁর আনুগত্যে ও অনুসরণে আপোষহীন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম তাঁরা পছন্দ করেননি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন মুসলিম উম্মাহর সকল ধর্মীয় ও জাগতিক কাজকর্ম অবিকল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগের মতোই হোক। তাঁদের পরবর্তী দুই যুগে তাবেয়ীগণ ও তাবে- তাবেয়ীগণ সেভাবে সমাজকে পরিপূর্ণ সুন্নাতের উপর রাখতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাহাবীদের যুগের শেষ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল যুগেই বিভিন্ন মুসলিম সমাজে বিভিন্ন খেলাফে-সুন্নাত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম রীতিনীতি, বিশ্বাস, কর্ম বা কর্মপদ্ধতি প্রবেশ করেছে ও প্রসার লাভ করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ, ইসলামের প্রসার, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণ এবং যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান রীতি পদ্ধতি প্রচলিত হতে থাকে। কখনো আবেগের ফলে, কখনো ধর্মপালনে অতি- আগ্রহের ফলে, কখনো অজ্ঞতার ফলে, কখনো পূর্ববর্তী ধর্মের বা সমাজের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাবে এ সকল নতুন ধর্মীয় ও জাগতিক রীতিনীতি সমাজে উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

আমাদের সমাজও এ ধারার বাইরে নয়। যে কোনো গবেষক যদি হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের আলোকে ইবাদত বন্দেগি, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান রীতি পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লহ (ﷺ) –এর যুগের চিত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তার সাথে আমাদের সমকালীন মুসলিম উম্মাহর চিত্র তুলনা করেন তাহলে তিনি খুব সহজেই দুটি চিত্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধান পাবেন।

সকল যুগেই আলেমগণ চেষ্টা করেছেন সকল ব্যতিক্রম রোধ করে মুসলিম উম্মাহর সকল কর্মকাণ্ড অবিকল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের মতোই বা তাঁদের 'সুন্নাত' বা রীতির মতোই রাখা। একদিকে নূতনত্বের আগ্রহ ও আনন্দ, অপরদিকে পুরাতনের প্রতি ভালবাসা ও তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকার আকুতি ও ব্যাকুলতা। – এ হলো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের নিয়মিত অধ্যায়।

এ দিক থেকে মুসলিম উম্মাহর উলামায়ে কেরামকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি। এক শ্রেণির উলামায়ে কেরাম যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে উপরোল্লেখিত বিভিন্ন কারণে সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন নতুন নতুন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল-না বা থাকলেও অন্য পদ্ধতিতে পালন করা হতো, পরবর্তী যুগে সমাজে যা প্রচলিত হয়েছে, সেসবের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণাদি সন্ধান করেছেন এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন এসবের পক্ষে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কোনো দলিল পাওয়া গেলে তাকে শরীয়ত-সঙ্গত বলে বহাল রাখতে।

অপর শ্রেণির আলেম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছেন, তাঁরা সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, কর্ম ও উৎসব, যা সে যুগে ছিল-না তার বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা চেষ্টা করেছেন, – যতটুকু সম্ভব মুসলিম সমাজের সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ড রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ থাকুক এবং তাঁদেরই পদ্ধতিতে পালিত হোক।

উভয় পক্ষেই রয়েছেন বরেণ্য আলেমগণ এবং তাঁদের সকলের প্রতিই রয়েছে আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তবে আমি একথা

গোপন করার মোটেও চেষ্টা করছি-না যে, আমার মনটা দ্বিতীয় শ্রেণির আলেমদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে, প্রথম শ্রেণির উলামায়ে কেরাম সমাজকে সমাজের স্থানে রেখে সুন্নাতকে সমাজের কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করেছেন, আর দ্বিতীয় শ্রেণির আলেমগণ সুন্নাতকে অবিচলিত ও অপরিবর্তিত রেখে সমাজকে সুন্নাতের কাছে টেনে নিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সবাই সুন্নাতের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় শ্রেণির আলেমদের কাজ আমাদের সমাজগুলোকে যথাসম্ভব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের সমাজের মতো থাকতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ আমাদেরকে অবিকল তাঁদের সুন্নাত মতো চলতে সাহায্য করবে।

দু'একটি উদাহরণ হয়ত বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। ইমাম গাযালী (রাহ.) (৫০৫ হি.) মুসলিম উম্মার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি বিভিন্ন দলিলের আলোকে আল্লাহর পথের পথিক সাধকদের জন্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহকারে গান বাজনা করা, শ্রবণ করা ও এ সকল অনুষ্ঠানে সম্মিলিতভাবে নর্তন করাকে শরীয়ত-সঙ্গত ও ভালো কাজ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ সকল অনুষ্ঠানের উদ্ভব তিনি ঘটাননি। এ সকল কর্ম তাঁর যুগের সূফী সাধকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ ছিল। ইমাম গাযালী স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে এ সকল অনুষ্ঠান ছিল না। কিন্তু এ সকল কর্মের পক্ষে তিনি বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। এসকল কর্মকে তিনি বিদ'আতে হাসানা হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং পালন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

অপর পক্ষে সে যুগের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অনেক আলেম এ সকল কর্ম ও অনুষ্ঠানকে নিষেধ করেছেন, তাঁরাও তাঁদের মতের পক্ষে যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করেছেন। আমার কাছে দ্বিতীয় পক্ষের মতটাই ভালো লেগেছে। যুক্তি প্রমাণের দিকে তাকালে আমরা উভয় পক্ষের কাছেই তা পাই। মানবীয় ভালোলাগা ও বাসনার দিকে লক্ষ্য করলে প্রথম মতই গ্রহণ করতে মন টানে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের দিকে তাকালে দ্বিতীয় মতটাই গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমরা ইমাম গাযালী সমর্থিত সূফী সাধকদেরকে দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা প্রতিদিন নিয়মিত ধর্মীয় ভক্তিমূলক গানবাজনা করছেন। এ সকল অনুষ্ঠান তাদের সাধক জীবনের নিয়মিত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। গানের আসরে অনেকে ভক্তির আতিশয্যে পাগলের মতো নর্তন করছেন, কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলছেন, কেউ বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। যে যত বেহাল হচ্ছেন আমরা বুঝতে পারছি যে তিনিই ভক্তির মার্গে তত বেশি অগ্রসর, আল্লাহ প্রাপ্তির পথে ও আল্লার নৈকট্যে তিনি তত অগ্রসর। আর যিনি এ সকল কর্ম করছেন না বা যার হৃদয়ে এগুলি প্রভাব ফেলছে না, তিনি আল্লাহ প্রেমের পথে অনগ্রসর বলেই আমরা বুঝতে পারছি।

এখন এ অবস্থাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের অবস্থার সাথে তুলনা করুন। তাঁরা কেউ গানের মাহফিল করেননি, গান শুনে নাচেননি, অজ্ঞান হয়ে পড়েননি। তাহলে কি তাঁরা আল্লাহর প্রেমে অনগ্রসর ছিলেন? এখানেই সুন্নী হৃদয়ের সমস্যা। যখনই কোনো বরেণ্য সাধক বা আলেম সম্পর্কে বলা হয় তিনি ভক্তিমূলক গান গজল শুনে বেহাল হয়েছেন, বা জ্ঞান হারিয়েছেন তখনই সুন্নী হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীরা কী করতেন? উক্ত আলেম বা সাধকের কর্মের প্রতি আমাদের কোনো অবজ্ঞা আসে না। তবে আমাদের কাছে সর্বদাই মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণই অনুসরণের যোগ্য। তাঁদের সুন্নাতের বাইরে আর কারো কর্ম পদ্ধতিই নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়া আমরা যদি ইমাম গাযালীর মত গ্রহণ করি এবং সকল মুসলিম উম্মাহ এ মত অনুযায়ী চলতে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এ সকল অনুষ্ঠানাদি মুসলিম সমাজের বহুল প্রচলিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পরিণত হবে। প্রতিদিন, বিভিন্ন খানকায়, বৈঠকখানায় কোনো না কোনো প্রকারে এ সকল অনুষ্ঠান ধর্মীয় উদ্দীপনার সাথে পালিত হবে।

এখন এ অবস্থাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের অবস্থার সাথে তুলনা করি। আমরা এ সকল আচার অনুষ্ঠান বা কর্মের কোনো সামান্যতম নিদর্শনও তাঁদের সমাজে পাই না। এভাবে আমাদের সমাজটি তাঁদের সমাজ থেকে ভিন্ন হয়ে যাবে। অথচ আমাদের উচিত আমাদের সমাজের ধর্মীয় আচার আচরণ তাঁদের সমাজের মতো রাখা। আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত যে, আমাদের সমাজের ছবিটি যেন তাঁদের সমাজের অনুরূপ হয়। যুগের বিবর্তনে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তন আসলেও আমাদের চেষ্টা করা দরকার যতদূর সম্ভব পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিশেষ করে এ সকল পরিবর্তন যেন আমাদের সমাজের ধর্মীয় অবস্থাকে পরিবর্তিত করতে না পারে। দেড় হাজার বছর আগের মদীনা সমাজের যে ছবি ঐতিহাসিকরা এঁকেছেন, আমাদের সমাজের ছবি যখন আঁকা হবে তখন যেন দু'টো ছবির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলের পরিমাণই বেশি হয় সেজন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন, আচরণ, ধর্মপালন, ধর্মীয় কাজকর্ম, কর্মধারা, রীতি ও পদ্ধতির সাথে আমাদের যথাসম্ভব মিল তৈরি করার জন্য একটি অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ গ্রন্থটি। আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছেন যাঁদের কর্মস্পৃহা ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশি। অনেক নেক কাজ তাঁরা করতে পারেন। কিন্তু আমার মতো দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি চিন্তা করে কী-ভাবে অল্প কর্মে বেশি পুরস্কারের আশা করা যায়। সুন্নাতের উপর কর্ম করলে এবং কোনো মৃত সুন্নাত জীবিত করলে খুবই বেশি সাওয়াবের কথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। তাই ভাবলাম যে, সুন্নাতের খেদমতের সামান্য চেষ্টা করি।

আমার কাছে মনে হয়েছে, আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান সরলপ্রাণ ও ধর্মপ্রাণ। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত কর্ম করি সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞান না-থাকার কারণে। আমার ক্ষুদ্র সাধ্য ও সাধকে সম্বল করে কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত বা তাঁর কর্মধারা ও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কোন্ কাজ তিনি কখন, কী-ভাবে, কতটুকু করেছেন, কী-ভাবে কতটুকু বর্জন করেছেন তা আলোচনার চেষ্টা করেছি। যদি কোনো মুসলমান এ লেখার মাধ্যমে একটি সুন্নাতের সাথে পরিচিত হন এবং কোনো পরিত্যাক্ত বা অজানা সুন্নাতের উপর আমল করতে শুরু করেন তাহলে সেটাই হবে আমার বড় পাওয়া। তার চেয়েও বড় চাওয়া ও পাওয়া হলো যে – মহিমাময় আল্লাহ দয়া করে তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের প্রতি ক্ষুদ্র হৃদয়ের অপূর্ণ ভালবাসা প্রসূত এ সামান্য কর্মটুকু কবুল করে নিয়ে তাকে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-পরিজন, উস্তাদগণ ও সকল পাঠকের নাজাতের ওসীলা করে দেবেন। মহান আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি।

সুন্নাতকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে সমাজের অনেক কিছুই 'খেলাফে-সুন্নাত' বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম হিসাবে দেখতে পেয়েছি। এ সকল আলোচনায় হয়তো অনেকের মতের বিরোধিতা করে ফেলেছি। অনেক বরেণ্য আলেমের মতের সাথে একমত হতে পারিনি। অনেক বিষয় আমি 'খেলাফে-সুন্নাত' বলে বুঝতে পেরেছি এবং এ বইয়ে লিখেছি, যেগুলি এড়িয়ে যেতেই আমার মন চেয়েছে। কারণ আমার সবচেয়ে আপন জনেরা,

সম্মানিত ও ভালবাসার মানুষেরা, যাঁদের ভালবাসা আমি নাজাতের ওসীলা মনে করি এমন অনেক বুজুর্গ এসকল 'খেলাফে- সুন্নাত' কর্ম বা রীতি অবলম্বন করে চলেছেন। এ সকল কাজকে 'খেলাফে-সুন্নাত' বলতে কষ্ট লেগেছে। ভেবেছি চুপ করে যাই। অন্য বিষয়ে বলি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হলো, কথা বলা দরকার। সুন্নাতের কথা বললেই তাঁদের সঠিক অর্থে ভালবাসা হবে। তাঁরা আজীবন যে কাজ করেছেন, করতে আমাদের শিখিয়েছেন সেই কাজেই আঞ্জাম দেওয়া হবে।

কোনো কাজ বা রীতিকে খেলাফে-সুন্নাত বলার অর্থ যারা এ কাজ বা রীতি পালন করেছেন তাদের সমালোচনা করা বা অবমূল্যায়ন করা নয়, কখনোই নয়। ইসলামের আলোকজ্জ্বল ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, সাহাবীগণ থেকে শুরু করে সকল যুগের সকল আলেম, মাশায়েখ, বুজুর্গ, সমাজ সংস্কারক, সূফী, দার্শনিক, এক কথায় সকল ইসলামী ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্য ছিল সুন্নাতের অনুসরণ ও সুন্নাতের প্রসার। সবাই একমত যে, একমাত্র সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সকল বেলায়াত ও সকল কামালাত।

সাথে সাথে আমরা দেখতে পাব যে, সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে সকল যুগেই বিভিন্নভাবে বুজুর্গগণের মধ্যে কিছু খেলাফে-সুন্নাত কাজ দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজ তাঁদের বুজুর্গী একটুও কমায় না। কারণ তাঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কারণে তাঁরা খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেছেন, যে কারণগুলির আলোকে তাঁরা খেলাফে-সুন্নাত কর্ম পালন করা সত্ত্বেও সাওয়াব পাবেন অথবা তাঁদের ভুল ক্ষমা করা হবে। একটি কারণ – উক্ত বিষয়ে সুন্নাত না জানা, ফলে তিনি প্রচলনের অনুকরণে অথবা ঐ বিষয়ে অন্য কোনো হাদীস বা আয়াতের উপর নির্ভর করে ইজতিহাদ করেছেন এবং তাঁর ইজতিহাদের ফলে একটি মতামত ব্যক্ত করেছেন বা কর্ম করেছেন। হাদীসের আলোকে ইজতিহাদকারী আলেম সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে তিনি ২টি সাওয়াব পাবেন। আর তিনি ভুল করলে একটি সাওয়াব পাবেন। অন্য একটি কারণ হলো, কখনো কখনো মহান বুজুর্গগণ বৃহত্তর সংস্কার ও তাজদীদের জন্য অনেক খেলাফে-সুন্নাত আমল সম্পর্কে বিতর্ক থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা উম্মাতের অপেক্ষাকৃত কঠিন সমস্যাগুলি আগে নিরসণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রতর খেলাফে-সুন্নাত সম্পর্কে কথা বলেন না। তাঁরা বৃহৎ সমস্যাগুলির সমাধান করে যান। পরবর্তীদের উপর বাকি দায়িত্ব রেখে যান। অনেক সময় তাঁরা বিভিন্ন ওজরের কারণে বা জায়েয উপকরণ হিসাবে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেন। পরবর্তী ভক্তগণ তাকে না-জায়েয পর্যায়ে নিয়ে যান।

কিন্তু আমরা কী করব? তাঁরা শত সহস্র সুন্নাত পালনের মাঝে দু'একটি খেলাফে-সুন্নাত কোনো ওজরের বা ইজতিহাদের কারণে, অথবা না জেনে করেছেন বলে কি আমরা সেগুলিকে রীতিতে পরিণত করব এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রীতিকে মেরে ফেলব? আমার জানা দু'একটি বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী, ফরিদুদ্দিন গঞ্জে শকর, নিযামুদ্দীন আউলিয়া প্রমুখ উলামা ও মাশায়িখ রাহিমাহুমুল্লাহ আল্লাহর দ্বীন পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীনের পালন ও প্রতিষ্ঠায় কোনো লোভ বা ভয় তাঁদেরকে সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারেনি। ইলম, আমল, জিহাদ, দাওয়াত, তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, রোযা, নামায ইত্যাদি সকল কর্ম তাঁরা সুন্নাত-পদ্ধতিতে পালন করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন। তবে তাঁরা বাজনা ছাড়া কাওয়ালীর মাজলিস করতেন, কাওয়ালী শুনে তাঁরা অনেক সময় বেহুঁশ হয়ে যেতেন, নাচানাচি করতেন বা কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলতেন। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, এগুলি কখনোই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাগণের রীতি ছিল না। এখন আমরা করণীয় কী? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লালহর নৈকট্যলাভের জন্য এসব করেননি জেনেও বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের দোহাই দিয়ে তাঁদের এ ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকব? তাঁদের মতো রোযা, তাহাজ্জুদ, যিকর, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদি না করতে পারলেও অন্তত তাঁদের মতো কাওয়ালী, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি করব ? না-কি তাঁদের শিক্ষা ও সামগ্রিক কর্ম অনুসরণে নিজেদেরকে আল্লাহর দ্বীনের পরিপূর্ণ পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিলিয়ে দেব ?

আল্লাহর দ্বীনের পরিপূর্ণ পালন ও প্রতিষ্ঠার আরেক সিপাহ সালার মুজাদ্দিদ-ই- আলফ-ই-সানী। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা ও বিদ'আতের বিনাশের জন্য। তাঁর যুগে মুসলমানেরা পীর, বুজুর্গ ও রাজাবাদশাহদেরকে সাজদা করত। অনেকে তাঁদের সামনে গড় হয়ে বা শুয়ে পড়ে মাটিতে চুমু খেত, যা জমিনবুছি বলে পরিচিত। মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর সমাজে প্রচলিত মানুষকে সাজদা করার রীতির প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। কিন্তু তিনি জমিনবুসীর বিরোধিতা করেননি। বরং জায়েয বলে মেনে নিয়েছেন। অথচ জমিন বুছিও খেলাফে-সুন্নাত কর্ম। এখন আমরা কী করব ? তিনি জমিনবুছির বিরোধিতা করেননি বলে আমরা এর প্রচলন করব ? না-কি আমরা মনে করব যে, বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তিনি ক্ষুদ্রতর বিষয় নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি বড় অন্যায় দূর করে গিয়েছেন, এখন আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁদের ফেলে রেখে যাওয়া ছোটখাট ভুলগুলো দূর করা ?

এ ধরনের অগণিত উদাহরণ দেওয়া যায়। এসব কিছু দেখে ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে জীবিত করার জন্য বুজুর্গগণের জোর তাগিদে প্রভাবিত হয়ে আমি সামান্য কিছু লেখার চেষ্টা করেছি। কারো সমালোচনা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। সকল মুসলিম আলেম আমাদের মাথার মণি। আমরা তাঁদের পায়ের ধূলিতুল্যও নই। তবে আমার মনে হয় রাসূলে আকরাম (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হৃদয়ের সর্বোচ্চ মণিকোঠায় বসালে আর কারো সমালোচনা হয় না, কোনো বুজুর্গই এতে বিন্দুমাত্র নাখোশ হবেন না।

আমার মনে হয়, আমাদের হৃদয়ের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, আমাদের হৃদয় জুড়ে আছেন শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। সবচেয়ে বড় আদর্শ তিনিই। সবচেয়ে বড় সহচর ও অনুসারী তাঁর সাহাবীগণ। তাঁদের কথা, তাঁদের কাজ, তাঁদের আচার, তাদের জীবন আমাদের এত ভালো লাগে যে, আর কাউকেই হৃদয়ের সেই স্থানে স্থান দিতে পারি না। যখনই কোনো বরেণ্য আলেম, সূফী, ইমাম বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের থেকে কোনো নেক কাজের কথা আমরা জানতে পাই, তখনই মনের অজান্তেই আমাদের মনে প্রশ্ন এসে পড়ে – রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ কি এ কাজটি করেছেন ? করলে কী-ভাবে করেছেন ? আমরা কি অবিকল তাঁদের মতো করে বা না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব না ? যখনই কোনো বরেণ্য আলেম থেকে কোনো মতামত, কোনো ব্যাখ্যা বা কোনো চিন্তাধারা জানতে পারি, তখনই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ এ বিষয়ে কী বলেছেন, কী মতামত পোষণ করেছেন বা কী ব্যাখ্যা দান করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? আমাদের হৃদয়ের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে কি তা নিন্দনীয় হবে ?

স্বভাবতই আমি আমার নিজস্ব মতামত, কোনো মুরব্বী বা দলের মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য এ বই লিখছি না। কোনো মতামতের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেও নয়। শুধু সুন্নাতকে জানার জন্যই আমার চেষ্টা। আমি চেষ্টা করেছি শুধু সহীহ ও হাসান বা নির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর

করতে। যে সকল হাদীসকে হাদীসের ইমামগণ বা গবেষকগণ সহীহ বলেছেন বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন আমি সেগুলির উপরেই নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। কোনো হাদীসের দুর্বলতার বিষয়ে কোনো কথা থাকলে তা উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবিতে হাদীসের পরেই তা উল্লেখ করেছি। এ সকল হাদীসের আলোকে যা বুঝতে পেরেছি তা আমি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। কোনো সহীহ হাদীসকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা কারণ দেখিয়ে তাঁর স্পষ্ট অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। অনুরূপভাবে আমার পছন্দসই বলে কোনো দুর্বল সনদের হাদীসকে জোরদার করার বা সহীহ হাদীসকে বাতিল করার কোনো চেষ্টা জ্ঞানত করিনি। আমার কাছে মনে হয়েছে, সুন্নাতকে স্বাভাবিক ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে তার বিপরীতে নিজের জ্ঞান ও মর্জিকে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

আমার এ চেষ্টায় ভুল থাকবেই। আমার যে কোনো ভুল আপনার চোখে পড়লে তা আমাকে জানানো ও আমাকে সংশোধন করা আপনার ধর্মীয় দায়িত্ব, একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের দায়িত্বের অংশ ও সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের প্রতি আপনার দায়িত্বের অংশ। আমার ভুল দেখে যদি আপনি চুপ করে থাকেন তাহলে আপনি আপনার এ দায়িত্বে অবহেলা করলেন।

সম্মানিত পাঠক, আমার যে কোনো ভুল আপনার চোখে ধরা পড়লে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আমি আমার মতামত এবং লেখা সবই সংশোধন করব এবং আজীবন সকল ক্ষেত্রে আপনার অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে, দোয়ার সাথে স্মরণ করব। সর্বোপরি, আপনি আমাকে সংশোধন করার জন্য আল্লাহর কাছে অবশ্যই সাওয়াব পাবেন। এটি কোনো চ্যালেঞ্জ নয়, শিক্ষা গ্রহণের আবেদন। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও বুদ্ধিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাতের আলোকে সুন্নাত বোঝার চেষ্টা করেছি। সুন্নাতের আলোকে আমার ভুল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে ও সকল মুসলিমগণকে সুন্নাতকে ভালবাসার ও সুন্নাতের অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন ; আমীন।

মুহতারাম পাঠক, আমার উদাহরণ ঐ ছাত্রের মতো, যে তার পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে সাধ্যমতো নোট তৈরি করেছে এবং নোট মুখস্থ করে তাঁর পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় তার এক সহপাঠি এসে তাকে বলল : এ নতুন তথ্যটি তোমার নোটে সংযুক্ত কর, এতে তোমার নাম্বার বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ছাত্রটি নিশ্চয় তার সহপাঠির এ সহযোগিতায় অত্যন্ত খুশি ও কৃতজ্ঞ হবে। আপনার সহযোগিতায়ও আমি অনুরূপ কৃতজ্ঞ হব।

সুন্নাতই আমাদের পক্ষ, সুন্নাতই আমাদের দল। মনে করুন একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী তার দলের নির্দেশনা মনে করে একটি কাজ করছেন বা একটি দল বা কর্মকে সমর্থন করছেন। হঠাৎ তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে দলীয় কমাণ্ড থেকে তাঁর কর্মের বা সমর্থনের বিপরীত নির্দেশ পেলেন। নিঃসন্দেহে তিনি দলের নির্দেশ মতো তাঁর কর্মকাণ্ড ও সমর্থন সংশোধন করে নেবেন। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া উচিত। একটি কাজ সুন্নাত হিসাবে করতাম অথবা বর্জন করতাম। সহীহ সনদে তার বিপরীত জানতে পারলাম। তৎক্ষণাৎ আমরা সুন্নাতের অনুসরণে আমাদের মতামত সংশোধন করে নেব।

সুন্নাতকে যতটুকু জেনেছি তা আলোচনার চেষ্টা করেছি। আপনি যদি দয়া করে আমাকে বলেন যে, অমুক বিষয়ে কোনো সুন্নাত নেই বলে আপনি উল্লেখ করেছেন, অথচ এ বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস রয়েছে। অথবা বলেন যে, অমুক বিষয়টি সুন্নাত বলে আপনি দাবি করেছেন, অথচ এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয় তাহলে এ ধরনের যে কোনো সংযোজনে আমার চেয়ে আর কে বেশি খুশি হবে ? আগে জানিনি তাই আমল করতে পারিনি। আল্লাহর রহমতে এখন জানলাম এখন থেকে পালন করব। যিনি জানালেন বা জানতে সাহায্য করলেন তিনি আমার উস্তাদ। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের ও নতুন আমলের আনন্দের সাথে আর কিসের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ দয়া করে আমাদের ভাললাগা ভালবাসা, প্রবৃত্তি ও চাহিদাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুগত ও অনুসারী করে দেন; আমীন।

এ গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে অনেক গ্রন্থ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি, অনেক গ্রন্থ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দিয়েছি। যে সকল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি সে সকল গ্রন্থের তালিকা ও তথ্যাদি বইয়ের শেষে উল্লেখ করলাম, যাতে গবেষক পাঠক প্রয়োজনে তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থগুলির প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। পাদটীকায় শুধু সংক্ষেপে লেখক, গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছি।

বর্তমানে সমাজের অনেক আলেম ও বুজুর্গ সমাজের প্রচলিত রীতিকে আঁকড়ে ধরতে আগ্রহী। সুন্নাতে নববীর চেয়ে বিদ'আতে-হাসানা বা সুন্নাতে-মুরব্বী তাঁদের কাছে বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে খুঁজে বের করার প্রবণতাটাই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য অনেকে সুন্নাত বুঝতে পারলেও সে বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহ অথবা সাহস পান না। এ পরিস্থিতিতে আমার মতো ক্ষুদ্র ও ক্ষমতাহীন ব্যক্তির পক্ষে হয়ত সুন্নাতের কথা বলা সম্ভবই হতো না, যদি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, ফুরফুরার পীর, আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল কুরাইশীর দ্বিধাহীন অনুপ্রেরণা ও বলিষ্ট সমর্থন না পেতাম। অনেক সময় আমরা সমাজের প্রচলনকে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে জায়েয করতে চাই, যদিও জানি যে, এ রীতিটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে ছিল না। কিন্তু তিনি আমাদেরকে প্রেরণা যুগিয়েছেন সুন্নাতে নববীর বিপরীতে সব কিছুকে অবলীলায় ত্যাগ করতে। আল্লাহ তাঁকে সুন্নাতের মহব্বতের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। তাঁকে নেক আমলে পূর্ণ দীর্ঘ জীবন দান করে তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নসীহত দ্বারা আমাদেরকে দীর্ঘদিন উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে, তাঁকে, তাঁর সকল অনুসারী ও মুহিব্বীনকে এবং সকল মুসলমানকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের উপরে, শুধু সুন্নাতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক প্রদান করুন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আকুতি, দয়া করে এ ক্ষুদ্র কর্মকে কবুল করে একে আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিবেন। এ গ্রন্থ রচনা করতে যত লেখক ও উলামায়ে কেরামের কথা বা লিখনীর দ্বারা উপকৃত হয়েছি এবং এ বইয়ের মধ্যে যত আলেম ও বুজুর্গের নাম উল্লেখ করেছি আল্লাহ তাঁদের সকলকে অফুরন্ত রহমত দান করুন।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। তাঁর হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর, তাঁর পরিবার পরিজন ও অনুসারীগণের উপর আল্লাহর অগণিত দরুদ ও সালাম।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায় : সুন্নাতের উৎস /১৭৫-২২৮

তৃতীয় পদ্ধতি, সুন্নাতের জ্ঞানের অভাবে খেলাফে-সুন্নাতের প্রতি ভক্তি /৩৭৫

চতুর্থ পদ্ধতি, জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা না-করা /৩৭৯

প্রথম অধ্যায়
সুন্নাতের পরিচিতি ও গুরুত্ব

প্রথমত, সুন্নাতে নববীর পরিচিতি

'সুন্নাত' শব্দের অর্থ

সুন্নাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনার পূর্বে আমরা তার অর্থ ও ইসলামী শরীয়তে তার ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করব। সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো : মুখ, ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি।[১] ইসলামী শরীয়তে ব্যবহারের দিক থেকে 'সুন্নাত' শব্দের দুই ধরনের প্রয়োগ রয়েছে : (১). সুন্নাতের প্রথম ও পুরাতন প্রয়োগ হলো রাসূলে আকরাম (ﷺ) -এর সকল প্রকারের নির্দেশ, কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। মূলত হাদীস শরীফে ও সাহাবী-তাবেয়ীদের যুগে 'সুন্নাত' বলতে এই অর্থই বোঝান হতো। এছাড়া পরবর্তী যুগেও হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও 'সুন্নাত' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (২). সুন্নাতের দ্বিতীয় ও প্রচলিত অর্থ ইসলামী শরীয়তে অত্যাবশ্যকীয় নয় – এরূপ নেক কর্ম। অর্থাৎ, ফরয ও ওয়াজিব-এর পরবর্তী, আবশ্যকীয় নয় এরূপ কর্ম, যা করা প্রয়োজন, বা করা উত্তম। সাধারণত এই অর্থটিই আমাদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত। সাধারণত আমরা 'সুন্নাত' শব্দটি শুনলে এই অর্থই বুঝে থাকি।

উপরোল্লেখিত দ্বিতীয় পরিভাষাটি দ্বিতীয় শতাব্দী ও তৎপরবর্তী ফিকহ শাস্ত্রবিদদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা কুরআন ও হাদীস বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর শিক্ষার আলোকে ইসলামের কর্মগুলির গুরুত্ব বর্ণনা করেন এবং এসকল পরিভাষার মাধ্যমে গুরুত্বের শ্রেণিবিভাগ করেন। এই দুই অর্থের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরিত্য নেই, প্রথম অর্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামগ্রিক সুন্নাত বোঝান হয়েছে, দ্বিতীয় অর্থে তাঁর সামগ্রিক সুন্নাতকে তাঁর সুন্নাতের আলোকে শ্রেণিভাগ করে গুরুত্বের পর্যায় নির্ধারণ করে একটি পর্যায়কে 'সুন্নাত' নাম দেওয়া হয়েছে।[২]

কুরআন-হাদীসে 'সুন্নাত' শব্দের প্রয়োগ

(ক). কুরআন কারীমে 'সুন্নাত' : রীতি, পদ্ধতি, প্রকৃতি বা কর্মপন্থা

কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে 'সুন্নাত' শব্দটি সাধারণত কর্ম, কর্মপন্থা, পদ্ধতি বা প্রকৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমে 'সুন্নাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে – 'প্রকৃতি', 'রীতি' বা 'নিয়ম' অর্থে। কুরআনে 'সুন্নাত' শব্দটি ১৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। "সুন্নাতুল্লাহ" বা "আল্লাহর সুন্নাত" বলতে – আল্লাহর বিধান বা তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মকে বোঝান হয়েছে। এছাড়া "সুন্নাতুল আওয়ালীন" বা "পূর্ববতী জামানর মানুষদের সুন্নাত" বলতে বুঝানো হয়েছে নবী-রাসূলদেরকে অস্বীকার করায় তাদের অভ্যাস, কর্ম ও স্বভাব এবং আল্লাহর অমোঘ শাস্তির বিধান যা তাদেরকে ধ্বংস করেছে। ইরশাদ করা হয়েছে :

"যখন তারা আমার শাস্তি দেখল, এরপর আর তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে লাগল না। এটাই হলো আল্লাহর সুন্নাত (রীতি), যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে (শাস্তি আসার পরে ঈমান আনলে কোনো লাভ হবে না)।[৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হদে ছ :

"তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের সুন্নাতের অপেক্ষা করছে? তুমি কখনই আল্লাহর সুন্নাতের কোনো পরিবর্তন পাবে না, তুমি কখনই আল্লাহ সুন্নাতের স্থানান্তর পাবে না।"[৪]

(খ). হাদীস শরীফে 'সুন্নাত' : ভালো বা মন্দ রীতি বা পদ্ধতি অর্থে

হাদীস শরীফে সাধারণত সুন্নাত শব্দটি রীতি, পদ্ধতি বা নিয়ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের আলোকে বুঝা যায় কোনো কাজ নিয়মিত রীতিতে পরিণত হলেই তাকে সুন্নত বলা হয়। ভালো বা মন্দ কোনো কর্ম সমাজে প্রচলিত নিয়মে পরিণত হলে তাকে সুন্নাত বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন:

.

"এক সময় আসবে, যখন ফিতনা-ফাসাদ তোমাদের ঘিরে ফেলবে, ফিতনার মধ্যেই শিশুরা বড় হবে, বড়রা বৃদ্ধ হবে, মানুষেরা

ফিতনাগুলিকেই সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করবে। যখন কোনো ফিতনা সংশোধন করা হবে বা পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষেরা (আফসোস করে) বলবে : সুন্নাত পরিবর্তিত হয়ে গেল! সেই পরিস্থিতিতে তোমরা কি করবে? তাঁর সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করেন : কখন এরূপ অবস্থা হবে? তিনি বলেন : যখন তোমাদের মধ্যে আবেদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, অভিজ্ঞ ফকীহ্ আলেমদের সংখ্যা কমে যাবে, তোমাদের নেতা ও আমীরদের সংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু বিশ্বস্ত ও সৎ মানুষদের সংখ্যা কমে যাবে, যখন মানুষ দুনিয়া (দুনিয়াবী সুবিধা ও ফায়দা) লাভের উদ্দেশ্যে আখেরাতের কর্ম সম্পাদন করবে।"[১]

আভিধানিক অর্থে 'সুন্নাত' ভালো বা মন্দ হতে পারে। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন :

ﷺ

" : ﷺ

."

একদল বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিহ হয়। তাদের পরনে ছিল পশমী পোশাক। তিনি তাদের করুণ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখতে পান এবং তাদের অভাব বুঝতে পারেন। তিনি সমবেত সকলকে (এদের জন্য) দান করতে উৎসাহ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতাগণ বেশ দেরি করেন (তাঁর ওয়াজ শোনার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো দান করেন না), এতে রাসূলুল্লহ (ﷺ) বিচলিত হন এবং তাঁর চেহারা মোবারকে তা বোঝা যায়। এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী রৌপ্যের একটি পোটলা নিয়ে আসেন। এরপর আরেক ব্যক্তি আসেন, এরপর ক্রমাগত মানুষেরা তাদের দানের দ্রব্য নিয়ে আসতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেহারা মুবারাকে আনন্দের ছাপ ফুটে ওঠে। তিনি বলেন : "যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো ভালো সুন্নাত চালু করে অতঃপর অন্য মানুষেরা এই 'ভালো সুন্নাত' অনুযায়ী কর্ম করে তাহলে ঐ প্রবর্তক ব্যক্তি পরবর্তী সকল কর্মকারীর কর্মের সমান সাওয়াব ও পুরস্কার পাবে, তবে এতে পরবতী কর্মকারীদের সাওয়াব কমবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো খারাপ সুন্নাত চালু করে এবং পরে অন্য মানুষেরা এই খারপ সুন্নাত মতো কর্ম করে তাহলে পরবর্তী সকল কর্মকারীর কর্মের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ লাভ করবে প্রথম প্রবর্তক ব্যক্তি, কিন্তু এতে পরবর্তী কর্মকারীদের গোনাহ কমবে না।"[২]

এখানে আমরা দেখছি যে, ক্ষুদ্র রীতিকেও 'সুন্নাত' বলা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে দান করতে উৎসাহ প্রদান করলেন। এতে প্রথম যে ব্যক্তি সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসল তাকে তিনি 'সুন্নাতে হাসানা'র বা সুন্দর রীতির প্রচলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু তার দেখাদেখি আরো অনেকে দান করতে এগিয়ে এসেছেন কাজেই এই দান কর্মটি একটি সুন্নাত বা রীতি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। আমরা আরো দেখছি যে, 'সুন্নাত' ভালো বা মন্দ হতে পারে।

'সুন্নাত' সামাজিক বা ব্যক্তি প্রচলিত হতে পারে। আয়েশা (রা.) বলেছেন:

. ...

"ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসারগণ এবং গাসসান গোত্রের মানুষেরা 'মানাত' দেবীর জন্য হজ্বের ইহরাম বাঁধত।... এটি তাদের পিতা-পিতামহদের মধ্যে 'সুন্নাত' (প্রচলিত রীতি) ছিল।"[৩]

জাহিলী যুগের রীতিনীতিকেও হাদীসে 'সুন্নাত' বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

...

"তিন প্রকারের মানুষ আল্লাহ কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত, এক প্রকার হলো : যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যেও জাহেলিয়াতের সুন্নাত অনুসরণ করে।"[৪]

ইহুদী-নাসারা ইত্যাদি পূর্ববর্তী জাতির বিভ্রান্তির পথকেও হাদীসে 'সুন্নাত' বলা হয়েছে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এ সকল বিভ্রান্তির সুন্নাত প্রকাশিত হবে বলে ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে। আবু ওয়াকিদ লাইসি (রা:) বলেছেন:

ﷺ

ﷺ

."

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুনাইনের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন, পথে 'যাতু আনওয়াত' নামক একটি গছের পাশ দিয়ে যান, যে গাছে মুশরিকগণ তাদের অস্ত্রাদি বরকতের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। তখন কোনো কোনো সঙ্গী বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুশরিকদের যেমন 'যাতু আনওয়াত' আছে আমাদেরও অনুরূপ একটি 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : সুবহানাল্লাহ! মূসার কওম যেরূপ বলেছিল : মুশরিকদের মূর্তির মতো আমাদেরও মূর্তির দেবতা দাও, তোমরাও সেইরূপ বললে। যাঁর হাতে আমার

জীবন তাঁর কসম, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাত অনুসরণ করবে।”[১]

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) বলেন: রাসূলুল্লহ ﷺ বলেন:

(:)

“তোমরা (উম্মতে মুহাম্মাদীর কোনো কোনো মানুষ) অবশ্যই (বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে) পূর্ববর্তী জাতিদের সুন্নাত পদে পদে অনুসরণ করবে।”[২]

(গ). হাদীসে ‘সুন্নাতে রাসূল’: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি:

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন হাদীসে ‘সুন্নাত’ শব্দ ভালো বা মন্দ রীতি, পদ্ধতি ও নিয়ম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সুন্নাতে নববী বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত বলতে হাদীস শরীফে প্রধানত দু'টি অর্থ দেখতে পাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্নাত বলতে শরীয়তে মুহাম্মাদী বোঝান হয়েছে। কখনো বা ‘সুন্নাত’ বলতে ফরজের অতিরিক্ত অন্যন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয় বুঝানো হয়েছে।

প্রথম অর্থ: ‘শরীয়তে মুহাম্মাদী’ অর্থে ‘সুন্নাতে মুহাম্মাদী’ (ﷺ)

হাদীস শরীফে সাধারণত “সুন্নাত” বলতে রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর রীতি বা তাঁর প্রবর্তিত নিয়ম বা বিধান বোঝান হয়েছে। এজন্য ‘সুন্নাতের’ মধ্যে ফরয, ওয়াজিব বা নফল সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অর্থে ‘সন্নাত’ অনেকটা ‘শরীয়ত’-এর সমার্থক। ‘সুন্নাতে মুহাম্মাদী’ ও ‘শরীয়তে মুহাম্মাদী’ প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে, যে পদ্ধতিতে, যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে করেছেন তাকে সেভাবে সেই পদ্ধতিতে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে করাই সুন্নাত। আবার তিনি যে কাজ যেভাবে বর্জন করেছেন তা ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করাই সুন্নাত। ফরযকে ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা যেমন সুন্নাত, তেমনি নফলকে নফলের গুরুত্ব দিয়ে পালন করাই সুন্নাত, মুবাহকে মুবাহের গুরুত্ব দিয়ে করা বা বর্জন করাই সুন্নাত। অপরদিকে হারামকে হারামের গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত।

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন :

ﷺ

.

যখন উসমান ইবনু মাযঊন (রা) দাম্পত্য জীবন বা স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগের চিন্তা করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন: উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? তিনি বলেন: না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপছন্দ করছি না। রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন : আমার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো নফল রোযা রাখি, কখনো রাখিনা, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।”[৩]

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সামগ্রীক জীবন পদ্ধতিকে তাঁর সুন্নাত বলেছেন, যার মধ্যে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ সবই রয়েছে। তিনি যা পরিত্যাগ করেছেন তা পরিত্যাগ করা সুন্নাত। যা যেভাবে করেছেন সেভাবে করাই সুন্নাত। এখানে লক্ষণীয় যে, দ্বীনের পূর্ণতার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের জন্য সুন্নাতের চেয়ে বেশি কাজ করাকে তিনি ‘তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা’ বলেছেন।

এ অর্থে অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, আমার আব্বা আমাকে বিবাহ দেন, কিন্তু ইবাদতের আগ্রহের কারণে আমি রাতদিন নামায রোযায় ব্যস্ত থাকতাম এবং আমার স্ত্রীর কাছে যেতাম না। তখন আমার আব্বা আমর (রা) আমাকে অনেক রাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। ইবনু উমার (রা) বলেন,

ﷺ

... ﷺ

.

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন : তুমি কি প্রতিদিন রোযা রাখ? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বলেন : তুমি কি সারা রাত জেগে নামায পড়? আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে নামায পড়ি আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন : প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।”[৪]

এই হাদীসেও রাত্রে কিছু সময় তাহাজ্জুদের নামায পড়া, কিছু সময় তাহাজ্জুদ ত্যাগ করে ঘুমান, নফল রোযা রাখা, মাঝে মাঝে রোযা রাখা আবার বাদ দেওয়া সবকিছুকেই একত্রে 'সুন্নাত' বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনোটি ফিকহের পরিভাষায় ওয়াজিব, কোনোটি নফল, কোনোটি সুন্নাত। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, হাদীসের পরিভাষায় সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত। করণীয় ও বর্জনীয় সকল কাজ তাঁরই পদ্ধতিতে করাই সুন্নাত।

আনাস ইবনু মালেক (রা.) বলেন :

"তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর স্ত্রীগণের নিকট যেয়ে তাঁর ইবাদত বন্দেগি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাঁরা তাঁর ইবাদত বন্দেগি সম্পর্কে জানালেন। মনে হলো এই প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর ইবাদত বন্দেগি কিছুটা কম ভাবলেন। তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পবরর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উম্মত, আমাদের উচিৎ তাঁর চেয়েও বেশি ইবাদত বন্দেগি করা)। তখন তাদের একজন বললেন : আমি সর্বদা সারা রাত জেগে নামায পড়ব। অন্যজন বললেন : আমি সর্বদা রোযা রাখব, কখনই রোযা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে : প্রশ্নকারীদের একজন বলেন : আমি কখনো বিবাহ করব না, আরেকজন বলেন : আমি কখনো গোশত খাব না, তৃতীয়জন বলেন : আমি কখনো বিছানার উপর ঘুমাব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বলেন : তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"[1]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম যেমন সুন্নাত, তাঁর বর্জনও তেমনি সুন্নাত

উপরের হাদীসগুলির আলোকে কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন, সঠিকভাবে সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাতের গণ্ডি বোঝার জন্য। প্রথম প্রশ্ন হলো : এখানে 'আমার সুন্নাত' বলতে তিনি কী বোঝাচ্ছেন? তিনি কি নফল রোযা থাকা, তাহাজ্জুদ পড়া, বিবাহ করা, গোশত খাওয়া? স্ত্রীকে তালাক দেওয়া? এগুলিকে পৃথক পৃথক-ভাবে সুন্নাত বলছেন? অথবা মাঝে মাঝে রোযা রাখা বর্জন করা, রাতে কিছুসময় তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করাকে সুন্নাত বলে বোঝাচ্ছেন? সুযোগমতো হালাল খাদ্য খাওয়া, বিবাহ করা ও প্রয়োজনে স্ত্রী তালাক দেওয়া ইত্যাদি সার্বিক কর্ম ও বর্জনকে বোঝাচ্ছেন?

এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, সুন্নাত বলতে এখানে শুধু কর্ম নয় বর্জনও বুঝান হচ্ছে। অর্থাৎ, যে কাজ তিনি যেভাবে, যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যে পরিমাণে করেছেন এবং যে কাজ যতটুকু বর্জন করেছেন, তা অবিকল সেভাবে, সেই পরিমাণে করা ও বর্জন করাই সুন্নাত।

অন্য একটি প্রশ্ন এখানে থেকে যায়। রাসূলুল্লহ ﷺ প্রশ্নকারী সাহাবাগণের কাজগুলিকে 'তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁরা কী করতে চেয়েছিলেন? তাঁরা কয়েকটি কাজ করতে ও কয়েকটি কাজ বর্জন করতে চেয়েছিলেন – তারা সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করতে এবং সারা বৎসর রোযা রাখতে এরাদা করেছিলেন। তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা দু'টিই সুন্নাত-সম্মত কর্ম। তারা তা একটু বেশি করতে চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে 'সুন্নাত অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করলেন কেন?

অপরদিকে তাঁরা কয়েকটি কাজ বর্জন করতে চেয়েছিলেন – গোশত খাওয়া, বিছানায় শোয়া, রাতে ঘুমান, বিবাহ করা। একর্মগুলি মূলত মুবাহ (বিবাহের ক্ষেত্রে ইমামদের মতপার্থক্য আছে), এগুলি বর্জন করা শরীয়ত অসম্মত নয়। তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই বর্জনকে 'তাঁর সুন্নাত থেকে বিমুখ হওয়া' বলে আখ্যায়িত করলেন কেন? তাহলে সুন্নাত কাজ বেশি করা কি না-জায়েয? মুবাহ কাজ পরিত্যাগ করা কি না-জায়েয?

প্রশ্নকারী সাহাবীগণ যে কাজগুলি করতে চেয়েছিলেন তা সবই শরীয়ত-সম্মত ও 'সাওয়াবের কাজ' এবং যে সকল বিষয় বর্জন করতে চেয়েছিলেন তা শরীয়তে মুবাহ বা বর্জন করা জায়েয। অথচ রাসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের করা ও বর্জন করাকে শুধু 'সুন্নাতের খেলাফ' বলেই থামছেন না, তাদের করা ও বর্জন করাকে "তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা" বলে আখ্যায়িত করছেন এবং এমন একটি কঠিন শাস্তির কথা বলছেন যা শুধু কঠিনতম পাপের ক্ষেত্রেই বলা হয়ে থাকে। এর কারণ কী?

তিনি বললেন: 'আমি মাঝেমাঝে নফল রোযা রাখি, আবার মাঝেমাঝে রোযা রাখা পরিত্যাগ করি', এটা তাঁর সুন্নাত। যদি

কোনো উম্মত মাঝেমাঝে নফল রোযা না রাখে, বা কখনই নফল রোযা না রাখে অথবা যদি কেহ সর্বদা রোযা রাখে (হারাম দিনগুলি বাদে) তাহলে কি সে গোনাহগার হবে এবং এই কঠিন শাস্তি তার পাওনা হবে?

তিনি বললেন: 'রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই'। এটি তাঁর সুন্নাত। যদি কোনো উম্মত মোটেও তাহাজ্জুদ না পড়ে বা সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ে তাহলে কি সে গোনাহগার হবে এবং উক্ত কঠিন শাস্তি তার পাওনা হবে?

তিনি বললেন: 'আমি বিবাহ করেছি'। এটি তার সুন্নাত। যদি কোনো উম্মত বিবাহ না করতে পারে তাহলে কি সে গোনাহগার হবে? অনুরূপভাবে যদি কেহ গোশত না খান, বিছানায় না ঘুমান তাহলে কি তিনি গোনাহগার হবেন?

'সুন্নাত' বুঝতে হলে বিষয়টি ভালোকরে বোঝা দরকার। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যেভাবে যতটুকু যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে করেছেন বা বর্জন করেছেন, তাকে সেভাবে করা বা বর্জন করা সুন্নাত। সুন্নাতের কম বা বেশি করা সুন্নাতের খেলাফ। সুন্নাতের খেলাপ যদি ব্যক্তিগত সুবিধা, অসুবিধা বা আনুসঙ্গিক কোনো কারণে হয় তাহলে তা জায়েয বা মুবাহ হতে পারে, বা শরীয়তের অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে গোনাহও হতে পারে। আর যদি 'সুন্নাতের খেলাফ'-কে 'সাওয়াবের মাধ্যম' হিসাবে, আল্লাহর নৈকট্যের জন্য করা হয় তাহলে তা 'রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাত অপছন্দ করা' –এর পর্যায়ে পড়বে।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সুন্নাতকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ও মেনে নেওয়ার পরে, কেউ যদি ব্যক্তিগত আগ্রহ উদ্দীপনা, আলস্য বা শারীরিক সুবিধা অসুবিধার জন্য নফল রোযা মোটেও না রাখে, তাহাজ্জুদ মোটেও না পড়ে, অথবা হারাম দিনগুলি বাদে সবসময় রোযা রাখে ও সারারাত নামাজ আদায় করে, বা বিবাহ না করতে পারে, বা গোশত খেতে না পারে, তাহলে সে 'খেলাফে সুন্নাত' কাজ করল, কিন্তু তার কাজ হয়ত না-জায়েয নয়, বা তার কাজ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ' করার পর্যায়ে পড়বে না।

আর যদি কেহ এসকল খেলাফে সুন্নাত কাজ করা বা বর্জন করাকে 'আল্লাহর নৈকট্য' বা 'সাওয়াবের' কারণ মনে করে বা অতিরিক্ত সাওয়াব অর্জনের আশায় এসকল কাজ করে বা বর্জন করে তাহলে সে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ' করার পর্যায়ে পড়বে। কারণ সে মূলত মনে করছে, – রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যতটুকু, যেভাবে করেছেন তার চেয়ে কিছু বেশি বা কম করে, বা পদ্ধতিগত পরিবর্তন করে সে বেশি সাওয়াব পাবে, এভাবে সে 'সুন্নাতে রাসূলের' অবমূল্যায়ন করছে এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়েও বেশি মুত্তাকী বানাতে যাচ্ছে।

তৃতীয় হাদীসে তিনি আমাদেরকে আরেকটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক আবেদ বা আগ্রহী আল্লাহর পথের পথিকের ইবাদত বন্দেগির মধ্যে কখনো উদ্দীপনা আসে, কখন স্থিতি আসে। এই উদ্দীপনা ও স্থিতি কখনো তাকে বিদ'আতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, অতি উদ্দীপনার কারণে যদি কোনো আবেদ ভালো ও শরীয়ত-সম্মত ইবাদত সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে করে তাহলে তা আর ভালো থাকে না, বরং বিদ'আতে পরিণত হয় এবং তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, উদ্দীপনার মুহূর্তে কেউ সুন্নাতের অতিরিক্ত নেক কাজ করলে তিনি হয়তো মা'যূর বলে গণ্য হবেন। কিন্তু যদি তার কর্মের স্থিতি ও স্থায়ী রীতি সুন্নাতের অতিরিক্ত হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

তাহাজ্জুদ অত্যন্ত বড় নেক কাজ হলেও তিনি তা সারারাত জেগে আদায় করেননি। বরং কিছু সময় তা বর্জন করেছেন। কেউ উদ্দীপনার মুহূর্তগুলিতে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করতে হয়ত অপরাধ হবে না। কিন্তু তার স্থিতি ও রীতি অবশ্যই সুন্নাতের মধ্যে থাকতে হবে। সুন্নাতের অতিরিক্ত নিয়মিত বা রীতিবদ্ধ ইবাদত বা নেক কর্মও বিদ'আত ও ধ্বংসের কারণ।

তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, পূর্বের হাদীসগুলিতে যে কাজকে তিনি 'আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করা' –বলে আখ্যায়িত করেছেন সেটিই হলো বিদ'আতের অবস্থা। যদি কেহ খেলাফে সুন্নাত কর্ম আল্লাহর অধিক নৈকট্য বা অধিক সাওয়াবের জন্য করে বা পদ্ধতিগত বৃদ্ধিকে বেশি সাওয়াবের কাজ বলে মনে করে তাহলে তা বিদ'আতের পর্যায়ে চলে যাবে। অর্থাৎ, কেউ যদি সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়াকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন অথবা মনে করেন যে, তা কিছু রাত তাহাজ্জুদ পড়া ও কিছু রাত ঘুমানোর চেয়ে বেশি ভালো ও বেশি সাওয়াবের তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। তেমনিভাবে যদি কেহ মনে করেন যে, সুন্নাত মতো মাঝেমাঝে রোযা রাখার চেয়ে সারা বৎসর রোযা রাখা বেশি সাওয়াবের, বা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা খেয়েছেন বা হালাল করেছেন তা না খেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি বা সাওয়াব বেশি অর্জন করা যাবে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিদ'আত আবেদকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

সাহাবীগণের ভাষায় সুন্নাত: ফরয, ওয়াজিব, নফল, মুবাহ সবই সুন্নাত

(ক). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখান ফরয-ওয়াজিব, নফল সবই সুন্নাত

(১). রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবর্তিত ফরয রীতিও সুন্নাত

সাহাবীগণও সুন্নাত শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আলী (রা.) বলেন:

.

"রজম করা (বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা) সুন্নাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা প্রচলন করেছেন।"[১]

আমরা জানি যে, রজম করা শরীয়তের একটি ফরয শাস্তি, তাই এখানে সুন্নাত বলতে বুঝান হয়েছে যে, তা রাসূলে আকরাম ﷺ

কর্তৃক প্রচলিত নিয়ম।

অন্য হাদীসে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পুনরায় প্রথম স্বামীর নিকট ফেরার বিষয়ে আয়েশা (রা.) বলেন : রিফাআহ কুরাযীর স্ত্রী এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে : আমি রিফাআহ কুরাযীর ঘরে ছিলাম। সে আমাকে তালাকে বায়েন প্রদান করে। পরে আব্দুর রাহমান ইবনু যুবাইর আমাকে বিবাহ করে, কিন্তু সে অক্ষম।... রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হেসে বলেন : "তুমি কি আবার রিফাআহর নিকট ফিরে যেতে চাও? যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবেন এবং তুমি তাঁর স্বাদ গ্রহণ করবে, ততক্ষণ তুমি প্রথম স্বামীর নিকট ফিরে যেতে পারবে না। আয়েশা (রা.) বলেন :

"পরবর্তীতে এটাই সুন্নাতে পরিণত হলো।"[১]

অর্থাৎ, মুসলিম বিধানের অত্যাবশ্যকীয় রীতিতে পরিণত হলো যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে পরিপূর্ণ মিলনের পরে তালাক হলেই শুধু প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহ হতে পারবে।

অন্য একটি হাদীসে "লেয়ান" বা ব্যভিচারের অভিযোগের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর অভিশাপ প্রদানের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিরস্থায়ী বিচ্ছেদকে 'সুন্নাত' বলা হয়েছে, যদিও এই বিচ্ছেদ পরিভাষাগতভাবে ফরয বা অলঙ্ঘনীয়। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রা.) বলেন :

"এভাবে সুন্নাত প্রচলিত হয়ে গেল যে, লেয়ানকারী স্বামী স্ত্রী দুইজনের মধ্যে বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়া হবে এবং কখনই তারা আর একত্রিত হবে না।"[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন :

ﷺ

"সা'দ ইবনু উবাদা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তার আম্মার একটি মানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যে মানত পূর্ণ না করেই তার আম্মা ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার আম্মার পক্ষ থেকে উক্ত মানত আদায় করে দিতে বলেন। পরবর্তীতে এটাই সুন্নাত হয়ে গেল।[৩]

অর্থাৎ, ওয়ারিসের জন্য মৃতের পক্ষ থেকে ওয়াজিব মানত আদায় করাটাই শরীয়তের বিধান হয়ে গেল।

(২) ফরয, ওয়াজিব ও নফল সবই সুন্নাত

এক হাদীসে আবু মুসা আশআরী (রা.) নামাযের ফরয, নফল সকল কর্মকে সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর পিছনে নামায আদায় কালে একব্যক্তি তাশাহহুদের বৈঠকে বলেন: "যাকাত ও কল্যাণের সাথে সালাত সংযুক্ত ও স্থিত হয়েছে।" সালাত শেষে তিনি বলেন :

ﷺ

... (...)

." ...

"তোমরা কি জান না কী-ভাবে সালাতের (নামাযের) মধ্যে (দোয়া বা যিক্র) বলবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের ওয়াজ করলেন এবং আমাদের জন্য আমাদের সুন্নাত বর্ণনা করলেন এবং আমাদেরকে আমাদের সালাত (নামায) শেখালেন। তিনি বললেন : যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তখন কাতার সোজা করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন ইমাম হবে। সে যখন তাকবীর বলবে তখন তোমরা তাকবীর বলবে। যখন সে (...ওয়ালাদ দোয়াল্লীন) বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে... বৈঠকের সময় প্রথমে তোমরা 'আত-তাহিয়্যাতু... " পাঠ করবে।... "[৪]

তাবেয়ী ইকরিমা বলেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)-কে বললাম: আমি একজন নির্বোধ আহমক ব্যক্তির পিছনে যোহরের সালাত আদায় করেছি, যে সালাতের মধ্যে ২২ বার তাকবীর বলে, সাজদায় যেতে ও সাজদা থেকে উঠতে সে তাকবীর বলেছে। তখন ইবনু আব্বাস (রা.) বললেন :

ﷺ.

"হতভাগা পোড়া কপালে! এতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত।"[৫]

এখানে আমরা দেখছি যে, তাকবীরে তাহরীমাসহ সকল তাকবীরকেই ইবনু আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত নামে আখ্যায়িত করছেন।

একজন তাবেয়ী ইবনু আব্বাসকে (রা.) প্রশ্ন করেন : যদি মুসাফির অবস্থায় মক্কায় অবস্থানকালে ইমামের সাথে জামাতে সালাত আদায় না করি তাহলে কয় রাকাত সালাত আদায় করব? তিনি জবাবে বলেন :

ﷺ.

দুই রাকাত (কসর) পড়বে, এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত।"[১]

এখানে সফরে কসর করাকে সুন্নাত বলা হয়েছে, যদিও কসর আদায় করা অনেকের মতে ওয়াজিব। মূলত সাহাবীর কথার অর্থ হলো : সফরে কসর করাই তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি কখনো সফরে পুরো নামায পড়েননি, তাই তুমি সফরে কসর করবে।

(৩) সুন্নাতের খেলাফ করা কুফরী

উপরের ব্যাপক অর্থেই আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন :

"সফরের নামায দুই রাক'আত (কসর), যে ব্যক্তি সুন্নাতের খেলাফ করল সে কুফরী করল।"[২]

এখানে তিনি সফরের নামায দুই রাক'আত না পড়ে পুরা পড়াকে কুফরী বলেছেন। সফরের সময়ে নামায পুরো চার রাক'আত আদায় করা কুফরী নয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের সময় চার রাক'আত নামায আদায় বর্জন করেছেন। যে ব্যক্তি মনে করবে যে, সফরের নামায পুরো পড়াই তাকওয়া, বেশি সাওয়াব, বরকত বা নৈকট্যের কারণ, সে মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের খেলাফ করাকে উত্তম মনে করছে। সাওয়াব অর্জন বা তাকওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানদণ্ড রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি যা করেননি তা করাকে নৈকট্যের কারণ মনে করলে তাঁকে ও তাঁর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয় ও অপছন্দ করা হয়, যা কুফরীর নামান্তর।

(খ). সুন্নাত-সম্মত 'মুবাহ' রীতিও সুন্নাত

(১). একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদায় সুন্নাত

সাধারণভাবে সালাত বা নামায আদায়ের জন্য তিন প্রস্থ কাপড় পরিধান করা হয় : শরীরের নিম্নাঙ্গের জন্য একটি, ঊর্ধ্বাঙ্গের জন্য একটি ও মাথা আবৃত করার জন্য একটি। সকলেই একমত যে, এইরূপ পোশাকই উত্তম। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী একপ্রস্থ কাপড় পরিধান করে সালাত আদায়কে সুন্নাত বলেছেন। উবাই ইবনু কা'ব (রা.) বলেন :

ﷺ .

.

শুধু এক কাপড়ে সালাত আদায় করা সুন্নাত, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এভাবে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতাম, এজন্য আমাদেরকে কোনো দোষ দেওয়া হতো না। তখন ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন : সে সময়ে কাপড় চোপড়ের কমতির কারণে এভাবে সালাত আদায় করা হতো। এখন যেহেতু আল্লাহ প্রাচুর্য প্রদান করেছেন সেহেতু দুটি কাপড়ে সালাত আদায় করা উত্তম।"[৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, এক কাপড়ে নামায আদায় করা, অর্থাৎ শুধু একটি বড় চাদর দ্বারা যথাসাধ্য শরীরের উপরের ও নিচের অংশ ঢেকে বা শুধু লুঙ্গির মতো পরে নিচের অংশ ঢেকে উপরের অংশ খোলা রেখে নামায আদায় করাকে উবাই (রা.) সুন্নাত বলছেন। পরিভাষার দিক থেকে এটি জায়েয বা মোবাহ ভিন্ন কিছুই নয়। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু করেছেন বা অনুমোদন করেছেন সবই সুন্নাত। সে কর্ম যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে ও যেভাবে করেছেন সেভাবেই সুন্নাত। মোবাহ বা জায়েযকে মোবাহ বা জায়েয হিসাবে করাই সুন্নাত। তাকে মোবাহ না মনে করা, না-জায়েয মনে করা, বা মুস্তাহাব মনে করা সুন্নাতের খেলাফ।

(২) মোজার উপর মোসেহ করা সুন্নাত ও ওয়াজিব: ইমাম আবু হানীফা

এ অর্থেই প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) (১৫০ হি) বলেন:

"খুফ্ফ বা চামড়ার মেজার উপর মোসেহ করা সুন্নাত।"[৪]

এই অর্থে তিনি একে ওয়াজিবও বলেছেন :

"নিজ গৃহে অবস্থানকারী বা মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত ও মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি মোজার উপর মোসেহ করা ওয়াজিব বলে আমরা স্বীকার করি।"[৫]

অর্থাৎ, মোজার উপর মোসেহ করা একটি সুন্নাত সম্মত জায়েয কাজ। একে জায়েয বলে গ্রহণ করা ওয়াজিব। মোসেহ না

করে মোজা খুলে পা ধোয়াকে বেশি তাকওয়া মনে করা বা মোসেহ করাকে না-জায়েয মনে করা খেলাফে সুন্নাত।

(৩). হজ্বের সময় কুরবানির উটের পিঠে সাওয়ার হওয়া সুন্নাত

হজ্বের জন্য হাজীগণ যে সকল জানোয়ার জবাই করেন বা কুরবানি দেন সেগুলিকে "হাদঈ" বলা হয়। অনেক হাজী এগুলি সাথে নিয়ে হজ্বে রওয়ানা হন। কুরআন কারীমে এ সকল জানোয়ারকে "আল্লাহর নামাঙ্কিত" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এগুলির তা'যীম করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অনেকের মনেই খটকা লাগত যে, মহান আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার নিয়্যাত করে যে পশু আল্লাহর ঘরের দিকে নেওয়া হচ্ছে তার পিঠে আরোহণ করা জায়েয হবে কি-না বা এতে "আল্লাহর নামাঙ্কিত" দ্রব্যের তা'যীমের ঘাটতি হবে কি-না। অনেকে তাকওয়া হিসাবে এগুলির পিঠে আরোহণ করার চেয়ে হেঁটে যাওয়াকে উত্তম মনে করতেন।

এজন্য আলী (রা.)-কে প্রশ্ন করা হয় : একজন হজ্বযাত্রী কি তার "হাদঈ" বা হজ্বের পশুর পিঠে চড়ে পথ চলতে পারেন ? তিনি উত্তরে বলেন : কোনো বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের সময় পথে কাউকে হেঁটে যেতে দেখলে তাদেরকে তাদের "হাদঈ"-র পিঠে ও (প্রয়োজনে) তাঁর নিজের "হাদঈ"-র পিঠে সাওয়ার হতে নির্দেশ দিতেন। আলী (রা.) বলেন :

ﷺ

"অনুসরণ করার জন্য তোমরা তোমাদের নবীর (ﷺ) সুন্নাতের চেয়ে ভালো কিছুই পাবে না।"[১]

এখানে আলী (রা.) জানাচ্ছেন যে, এধরণের জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করা জায়েয, এতে কোনো বাধা নেই, তা সত্ত্বেও তিনি তাকে 'সুন্নাত' বলছেন। কারণ একে জায়েয বলে গ্রহণ করা সুন্নাত, আর না-জায়েয মনে করা অথবা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাকওয়া মনে করে এ ধরনের উটের পিঠে সাওয়ার না হওয়া সুন্নাতের খেলাফ।

(৪). ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ করা সুন্নাত

একব্যক্তি ইবনু উমর (রা.). -কে প্রশ্ন করে : হজ্বের ইহরাম করা অবস্থায় কি আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারি? ইবনু উমর বলেন : কেন পারবে না? লোকটি একজনের নাম উল্লেখ করে বলে : তিনি হজ্বের ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ করাকে অপছন্দ করেন বা মাকরুহ মনে করেন।... ইবনু উমর (রা.) বলেন :

ﷺ ﷺ

.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হজ্বের ইহরাম করা অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করতে দেখেছি। অতএব তোমার কথা যদি ঠিকও হয় (যে, অমুক সাহাবী ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ মাকরুহ মনে করেন) তাহলেও অমুক তমুকের সুন্নাতের চেয়ে আল্লাহর সুন্নাত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত।"[২]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ করা জায়েয বা মুবাহ। অর্থাৎ, ইহরাম ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন তাওয়াফ করা জায়েয, অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফও জায়েয, কোনো অবস্থাতেই তা না-জায়েয নয়। উভয় অবস্থাতেই তাওয়াফকারী তাওয়াফের সাওয়াব পাবেন, পোশাকের জন্য সাওয়াবের কোনো বৃদ্ধি বা ঘাটতি নেই। তাওয়াফের ক্ষেত্রে ইহরাম অবস্থা ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য বর্জন করাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত। তিনি এ ধরনের পার্থক্য করেননি, এজন্য এ ধরনের কোনো পার্থক্য করলে তা তাঁর সুন্নাতের বিরোধী হবে।

প্রথম অর্থের দু'টি বিশেষ ব্যবহার

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিকেই সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর নির্দেশিত, আচরিত বা তাঁর দ্বারা প্রচলিত সকল ধরনের কাজকেই সুন্নাত বলা হয়েছে। যদিও ফিকহের পরিভাষায় তা ফরয, ওয়াজিব বা নফল নামে পরিচিত। তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেও সুন্নাত বলা হয়েছে। এই ব্যপক অর্থে সুন্নাত শব্দটি দুটি বিশেষ পদ্ধতিতে হাদীস শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে : (১). কুরআনের অতিরিক্ত সকল শিক্ষা ও (২). বিদ'আতের মুকাবিলায়।

(১). কুরআনের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল শিক্ষাই সুন্নাত

সুন্নাত বলতে হাদীস শরীফে অনেক সময় কুরআন কারীমের অতিরিক্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বর্ণনায়, কুরআনের ব্যাখ্যায় বা আল্লাহর নির্দেশাবলীর বর্ণনায় তাঁর সকল কথা, কাজ ও অনুমোদনকে সুন্নাত বলা হয়, ফিকহের পরিভাষায় তা ফরয বা নফল হতে পারে। মুয়ায ইবনু জাবাল (রা.)-এর কতিপয় ছাত্র বলেন :

ﷺ

ﷺ ﷺ

. ﷺ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুয়াযকে ইয়ামানের শাসক নিযুক্ত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন : যদি তোমার কাছে কোনো বিচারের দায়িত্ব আসে তাহলে কী-ভাবে বিচার করবে? মুয়ায বলেন : আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করব। তিনি প্রশ্ন করেন : যদি আল্লাহর কিতাবে (তোমার কেসের কোনো বিধান) না পাও? মুয়ায বলেন : তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত দ্বারা (বিচার করব)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি আল্লাহর কিতাবে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের মধ্যে (তোমার নির্দিষ্ট কেসের কোনো বিধান) না পাও? মুয়ায বলেন : তাহলে আমি সর্বাত্মকভাবে আমার বুদ্ধিমত্তা ও মেধা প্রয়োগ করে ফয়সালা প্রদানের চেষ্টা করব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বুকে থাবা দিয়ে বলেন : "আল-হামদু লিল্লাহ, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতিনিধিকে তৌফিক প্রদান করেছেন এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করেন।"[১]

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) "সুন্নাত" বলতে এই অর্থ বুঝিয়েছেন। এক মৃতব্যক্তির দাদী এসে আবু বকর (রা.)-এর কাছে মীরাস দাবী করে। তিনি বলেন:

ﷺ

"আল্লাহর কিতাবে তোমার কোনো অংশ বর্ণিত নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতেও আমার জানা মতে তোমার জন্য কোনো বিধান নেই। তুমি পরে এস, আমি সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

তিনি সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলে মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) বলেন : আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাদীকে ছয় ভাগের এক ভাগ মীরাস দিয়েছেন। আবু বকর (রা) বলেন : আপনার সাথে আর কেউ আছেন কি যিনি এই হাদীস জানেন? তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রা.) উঠে মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) যা বলেছেন তাই বললেন। তখন আবু বকর (রা.) দাদীকে উক্ত মীরাস প্রদান করেন।"[২]

অন্য হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, উমর (রা.) তার নিযুক্ত কুফার বিচারক কাযী শুরাইহকে বিচারের নীতি-পদ্ধতি জানিয়ে লিখেন:

ﷺ

ﷺ

"আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার করবে, আল্লাহর কিতাবে না থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অনুসারে। যদি আল্লাহর কিতাবে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের মধ্যে (তোমার নির্দিষ্ট কেসের কোনো বিধান) না থাকে তাহলে (তোমার পূর্ববর্তী) সৎ ন্যায়পরায়ণ বিচারকগণের বিচারের আলোকে বিচার করবে।..."[৩]

এখানে উমর (রা.) কুরআনের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল প্রকারের কর্মকাণ্ডকে 'সুন্নাত' বলেছেন।

(২) বিদ'আতের মুকাবিলায় সুন্নাত

সুন্নাতের ব্যাপক অর্থে প্রয়োগের আরেকটি বিশেষ দিক হলো বিদ'আতের মুকাবিলায় সুন্নাত শব্দের ব্যবহার। এখানে সুন্নাত বলতে ফিকহের পরিভাষার সুন্নাত বুঝানো হয়নি। তিনি যা করেছেন তা করা এবং তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা সুন্নাত। তাঁর শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতির আলোকে ফরযকে ফরয, নফলকে নফল, মুবাহকে মুবাহ, মাকরুহকে মাকরুহ ও হারামকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করা সুন্নাত। এর বাইরে কোনো রীতি প্রচলন করাই বিদ'আত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ক কিছু হাদীস আলোচনা করব। এখানে দুটি হাদীস উল্লেখ করছি। একটি হাদীসে ইরবায ইবনু সারিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

.

"আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে তাঁরা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। কাজেই তোমার দৃঢ়ভাবে আমার সুন্নাত (কর্মপদ্ধতি ও জীবনধারা) এবং আমার পরের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত (কর্মপদ্ধতি ও জীবনধারা) আঁকড়ে ধরে থাকবে, অনুসরণ করবে। আর খবরদার! নব উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" এবং সকল "বিদ'আত"-ই পথভ্রষ্ঠতা বা গোমরাহী।"[৪]

এ হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তাঁর ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের 'সুন্নাত' বা রীতি আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং তাঁদের রীতির বাইরে উদ্ভাবিত সকল কর্ম বা রীতিকে বিদ'আত ও পথভ্রষ্ঠতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অন্য হাদীসে ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

.

"ভবিষ্যতে তোমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এমন কিছু মানুষ গ্রহণ করবে যারা সুন্নাতকে নির্বাপিত করবে এবং বিদ'আতের উদ্ভাবন

করবে, তাঁরা সময়ের পরে নামায আদায় করবে।" ইবনু মাসঊদ বলেন : আমি যদি তাদের যুগে পড়ে যাই তাহলে কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বার বলেন : "...যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তার কোনো আনুগত্য করা যাবে না।"[১]

এখানে লক্ষণীয় যে, মুস্তাহাব সময়ে রাসূলুল্লহ ﷺ -এর রীতি অনুযায়ী নামায আদায় করাকে 'সুন্নাত' বলা হয়েছে। অপরদিকে দেরি করে নামায আদায় করাকে বিদ'আত বলা হয়েছে। এখানে দেরি করা বলতে মুস্তাহাব সময়ের পরে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা যে সময়ে সালাত আদায় করতেন সে সময়ের পরে আদায় করা বোঝান হয়েছে।[২] এভাবে মুস্তাহাব ওয়াক্তের পরে নামায আদায় করা সাধারণ বিচারে 'জায়েয', কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতি নয়। তাঁর রীতি হলো মুস্তাহাব সময়ে নামায আদায় করা। তিনি এই জায়েযকে বর্জন করতেন। এজন্য এই জায়েযকে বর্জন করাই তাঁর রীতি ও সুন্নাত। মুস্তাহাবের বিপরীতে জায়েযকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিদ'আত বলেছেন এবং আল্লাহর অবাধ্যতা বলে কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। এ থেকে আমরা দুটি বিষয় বুঝতে পারি। প্রথমত, মুস্তাহাবকে মুস্তাহাব হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর রীতিতে পালন করাই সুন্নাত। দ্বিতীয়ত, তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত। তিনি যা বর্জন করেছেন তা জায়েয হলেও তাকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে তা বিদ'আত, গোনাহ ও আল্লাহর অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অর্থ: ফরযের অতিরিক্ত নিয়মিত প্রয়োজনীয় কাজ অর্থে সুন্নাত

উপরের হাদীসগুলিতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সমগ্র শরীয়ত অর্থেই সুন্নাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সাহাবীগণ কখনো কখনো ফরয বা আবশ্যকীয় বিষয়ের অতিরিক্ত যে সকল নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন তাকে সুন্নাত বলতেন, যা পরবর্তী ফকীহগণের পরিভাষায় ওয়াজিব বা সুন্নাত বলে পরিচিত। আলী (রা)-কে বিতর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন :

) ( )

ﷺ(

"বিতির ফরয নামাযের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় নয়, কিন্তু তা সুন্নাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা প্রচলন করেছেন, কাজেই বিতর কখনো পরিত্যাগ করবে না।"[৩]

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ মাকহুল (রাহ) (১১২হি.) বলেন:

. :

"সুন্নাত দুই প্রকার : এক প্রকার সুন্নাত পালন করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য যা পরিত্যাগ করা কুফরী। দ্বিতীয় প্রকার সুন্নাত পালন করা ভালো, তবে পরিত্যাগ করলে কোনো দোষ নেই।"[৪]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীস শরীফে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সুন্নাত' ব্যাপক অর্থে 'শরীয়তে মুহাম্মাদী' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল আচরণ, কর্ম, কথা, অনুমোদন বা বর্জন সুন্নাত। আমি এই গ্রন্থে 'সুন্নাত' শব্দকে এই ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যে রীতিতে করেছেন বা বর্জন করেছেন তাই তাঁর সুন্নাত। তাঁর কর্মপদ্ধতির আলোকে গুরুত্ব অনুসারে, ফিকহের পরিভাষায়, তা 'ফরয', 'ওয়াজিব' বা 'নফল' হতে পারে। কর্ম হতে পারে বা বর্জনও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সুন্নাতে নববীর গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বা তাঁর জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার গুরুত্ব প্রকাশ করে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অসংখ্য হাদীস। আমরা এখানে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করব।

(ক). কুরআন কারীমে সুন্নাতের গুরুত্ব

কুরআন কারীমের অনেক আয়াতে রাসূলে আকরাম ﷺ -এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত রাসূলে আকরাম ﷺ -এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্যের কোনো পথ নেই। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্য, অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর 'সুন্নাতের' অনুসরণই মুক্তি, সফলতা ও হেদায়েতের একমাত্র মাধ্যম। বিভিন্নভাবে এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(১). তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণই নাজাতের ওসীলা

অনেক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যই নাজাতের, রহমতের ও ক্ষমার একমাত্র ওসীলা। ইরশাদ করা হয়েছে :

.

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং

তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।"[১]

"আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদেরকে রহমত করা হয়।"[২]

"যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমতো চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য।"[৩]

"হে ঈমানদারগণ! মান্য করা নির্দেশ আল্লাহর, মান্য করা নির্দেশ রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী বা হুকুমদাতা তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট উপস্থাপিত কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।"[৪]

"অতএব, তোমার প্রভুর কসম, কখনই তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।"[৫]

"আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।"[৬]

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না।"[৭]

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।"[৮]

"বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তিনি দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সঠিক পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।"[৯]

(২). তাঁর আনুগত্যেই আল্লাহর আনুগত্য করা হয়

অন্যত্র স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য তাঁর আনুগত্য ছাড়া কোনো পথ নেই। তাঁর আনুগত্য করলেই আল্লাহর আনুগত্য করা হয়:

"যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে, তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।"[১০]

---

(৩). তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করাই ঈমানের আলামত

অন্যত্র জানানো হয়েছে যে, মুমিনের পরিচিতিই হলো তাঁর আনুগত্য:

"আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর - যদি ঈমানদার হয়ে থাক।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদর্শই মুমিনের একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ :

"নিশ্চয় তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য।"[২]

এ থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, শুধু যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে না, অর্থাৎ শুধু কাফিররাই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে না বা পূর্ণাঙ্গ মনে করে না। শুধু কাফেরদের জন্যই অন্য কারো আদর্শের প্রয়োজন হয়। মুমিনদের জন্য তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ আদর্শ। আর হুবহু তাঁর আদর্শে জীবন চালানই ঈমানের আলামত।

(৪). তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ না-করা ধ্বংস ও শাস্তির কারণ

অপরদিকে রাসূলুল্লাহর ﷺ আনুগত্য ও তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ না করা মু'মিনের চরমতম ক্ষতি ও সকল আমল বরবাদ হওয়ার কারণ। ইরশাদ হচ্ছে :

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য কর এবং (তাঁদের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না।"[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মের সামান্যতম ব্যতিক্রম, বা তাঁর চেয়ে বেশি কিছু করাও ধ্বংসের কারণ। এক আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে :

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে এগিয়ে যেও না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সককিছু শোনেন এবং সবকিছু জানেন।"[৪]

সকল দ্বিধা, যুক্তি, তর্ক বা নুন্যতম বিরোধিতার ঊর্দ্ধে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল শিক্ষা, বিধিনিষেধ বা এককথায় তাঁর "সুন্নাত" গ্রহণ করাই হলো মু'মিনের দায়িত্ব:

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[৫]

অন্য আয়াতে মুমিনদেরকে এই শাস্তি ও ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে :

"তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়।"[৬]

"যারা তাঁর আদেশের বা কর্মের খেলাফ (ব্যতিক্রম) করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর আপতিত হবে বিপর্যয় অথবা তাদের উপর আপতিত হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৭]

(৫). রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের ঈমান ও তাঁদের অনুসরণের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন তাঁর সঙ্গী বা সাহাবীগণ। কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে সাহাবীগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁদের অতুলনীয় আদর্শস্থানীয় ঈমান, আমল, তাকওয়া, জিহাদ, স্বার্থ ত্যাগ, তাঁদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] এ সকল আয়াতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমান, তাকওয়া,

তাকওয়া, বেলায়াত ও কামালাতে তাঁরাই শীর্ষে। তারা মুসলিম উম্মাহর আদর্শ। আল্লাহর অফুরন্ত রহমত তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদেরককে ভালবাসা ও তাঁদের অনুকরণ- অনুসরণ পরবর্তী মুসলমানদের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহবীদের জীবন-পদ্ধতি বা কর্মপন্থার (সুন্নাতের) বিরেধিতাকারীর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে :

"যদি কেউ তার কাছে হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ছেড়ে অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে তার বেছে নেওয়া পথেই ছেড়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা নিকৃষ্টতম গন্ত ব্যস্থল।"[১]

এখানে 'বিশ্বাসীদের পথ' বলতে স্বভাবতই সাহাবীদের পথ বোঝান হয়েছে, কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সময়ের বিশ্বাসীগণ তাঁরাই।

(খ) হাদীস শরীফে 'সুন্নাত' -এর গুরুত্ব

(১) সুন্নাতের পরিপূর্ণ ও হুবহু অনুসরণই নাজাতের ওসীলা

কুরআনের ন্যায় হাদীসেও 'সুন্নাতে রাসূলের' অনুসরণ ও অনুকরণ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুন্নাতের অনুসরণ করাই যে মুক্তির মাধ্যম ও সুন্নাতের বাইরে যাওয়া যে ধ্বংসের কারণ তা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে আমরা সুন্নাতের অর্থ আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে অনেক হাদীস দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে সকল কর্মে ও বর্জনে তাঁর চুলচেরা অনুসরণ করতে বলেছেন। তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত নেককাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত ইবাদত বন্দেগিকে তিনি 'তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা' – বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আনাস ইবনু মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন:

"বেটা, যদি সম্ভব হয় তাহলে এভাবে জীবনযাপন করবে যে, সকালে সন্ধ্যায় (কখনো) তোমার অন্তরে কারো জন্য কোনো ধোঁকা বা অমঙ্গল কামনা থাকবে না। অতঃপর তিনি বলেন : বেটা, এটা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে (পালন ও প্রচারের মাধ্যমে আমার সুন্নাতকে জীবিত, প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত রাখবে), সে আমাকেই ভালবাসবে। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"[২]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে:

"যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তার দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।" একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ ধরনের মানুষ তো আজকাল অনেক। তিনি বললেন : আমার অনেক যুগ পরেও আমার উম্মতের মধ্যে এরূপ মানুষ থাকবে।[৩]

(২). কুরআন ও সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার উপায়

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন :

"আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো – আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।"[৪]

(৩). সুন্নাত অনুযায়ী অল্প নেক কর্মেও বেশি সাওয়াব

তাবেয়ী হাসান বসরী (রাহ.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার পদ্ধতির অনুসরণ করবে সে আমার উম্মত, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার পদ্ধতি (সুন্নাত) অপছন্দ করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"[৫]

স্বভাবতই এখানে আমল বলতে নেক আমল বা সাওয়াবের কাজ বুঝানো হয়েছে। পাপকর্ম বা খারাপ কাজের চেয়ে সুন্নাত পালন যে

উত্তম তা সকলেই জানেন। তবে অনেক সময় আগ্রহী মুসলিম সুন্নাতের অতিরিক্ত বা সুন্নাত-পদ্ধতির বাইরে বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগি ও নেক কর্ম করতে চান। তাই হাদীসে ইরশাদ করা হলো যে, সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে বেশি বেশি নেক কাজ করার চেয়ে সুন্নাত অনুসারে অল্প আমল করলেই বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে।

সাহাবী উতবা ইবনু গাযওয়ান বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

: : .

.

"তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি অবিকল তোমাদের পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?" তিনি বলেন, "না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।"[১]

অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

"আমার উম্মতের (ধর্মীয় ও জাগতিক) অধঃপতন ও বিপর্যয়ের সময়ে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (পরিপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি ও রীতিনীতি)[২] আঁকড়ে ধরে থাকবে তাঁর জন্য একজন শহীদের পুরস্কার রয়েছে।"[৩]

হাফিজ আব্দুল আযীম মুনযিরী (৬৫৬ হি.) বলেছেন: হাদীসটির সনদ একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়।[৪] হাফিজ নুরুদ্দীন হাইসামী (৮০২ হি.) বলেছেন: এই হাদীসের সনদে একজন রাবী অজ্ঞাত পরিচয় আছেন, যার ফলে হাদীসটি দুর্বল।[৫] অন্য একটি দুর্বলতর সনদে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে:

"আমার উম্মতের অধঃপতন ও বিপর্যয়ের সময়ে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকবে তাঁর জন্য একশত শহীদের পুরস্কার রয়েছে।" এই বর্ণনাটি খুবই দুর্বল।[৬]

(৪). মৃত সুন্নাত পালন করা ও পুনর্জীবিত করার পুরস্কার

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

"ইসলামের শুরু হয়েছে অনাত্মীয় বান্ধবহীন প্রবাসীর মতো এবং তেমনি আত্মীয়হীন বান্ধবহীন রূপেই ইসলাম ফিরে আসবে। এই বান্ধবহীন স্বজনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ"।[৭]

অন্য বর্ণনায় বান্ধবহীন খাঁটি মুসলিমগণের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন:

"বান্ধবহীন স্বজনহীন ইসলামের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদ যাঁরা আমার পরে মানুষেরা আমার যেসকল সুন্নাত নষ্ট করবে তা ঠিক করবে।"[৮]

অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বলা হয়েছে:

.

"যদি কেউ আমার একটি সুন্নাতকে জীবিত করে এবং এই পুনর্জীবিত সুন্নাতের উপর মানুষ আমল করে, তাহলে যত মানুষ ঐ সুন্নাতের উপর আমল করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ পুণ্য ঐ ব্যক্তি পাবেন, এতে ঐ সুন্নাতটির উপর আমলকারীগণের পুণ্যের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো মানুষ কোনো বিদ'আত (ধর্মের মধ্যে নতুন বিষয়) উদ্ভাবন করে এবং মানুষ ঐ বিদ'আতটির উপর আমল করে, তাহলে যত মানুষ ঐ বিদ'আত কাজ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ ঐ ব্যক্তি (যে বিদ'আতটির উদ্ভাবন করে) পাবে, এতে বিদ'আত কাজটি যারা করেছে তাদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না।"[৯]

(৫). সুন্নাতের বাইরে কোনো আমলই গ্রহণ করা হবে না

হাদীস শরীফে একদিকে যেমন সুন্নাতের অনুসরণকে নাজাতের একমাত্র ওসীলা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অপরদিকে সুন্নাতের অতিরিক্ত বা সুন্নাতের বাইরে কোনো কর্ম করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কোনো নেক আমলও সুন্নাতের অতিরিক্ত করলে তা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপছন্দ করা' বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি সুন্নাতের অতিরিক্ত নেক আমল করবে সে ব্যক্তির সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পর্ক থাকবে না। 'সুন্নাতকে অপছন্দ করার' এই অবস্থাকে অন্যান্য হাদীসে বিদ'আত বলা হয়েছে।

স্বভাবতই সুন্নাতের অতিরিক্ত নেক কর্মকেই বিদ'আত বলা হয়েছে, কারণ পাপকর্ম যে আল্লাহর নিকট সাওয়াবের জন্য গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে অতি মূর্খ মুসলিমও সচেতন। কিন্তু সমস্য হয় নেক আমলকে নিয়ে। অনেক সময় আগ্রহভরে কোনো মুসলিম কোনো নেক কর্ম হয়ত সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে করেন। তিনি একে নেক আমল বলেই মনে করেন এবং এই আমল আল্লাহর নিকট তাঁর মুক্তি ও সাওয়াবের জন্য গ্রহণ করা হবে বলেই তার আশা থাকে। এধরনের আশা যাতে মুসলমানদেরকে সুন্নাতের বাইরে নিয়ে না যায় এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য হাদীসে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, সুন্নাতের বাইরে কোনো নেক কর্ম পালন করে আমরা যতই সাওয়াবের আশা করি না কেন, আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না, বরং তা জাহান্নামে যাবে। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় এই মর্মে কতিপয় হাদীস আলোচিত হয়েছে। আরো কয়েকটি সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

১ম হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

.

"সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কেতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহম্মদের (ﷺ) আদর্শ, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" আর প্রতিটি "বিদ'আত"-ই পথভ্রষ্ঠতা এবং সকল পথভ্রষ্ঠতা জাহান্নামে যাবে।"[১]

২য় হাদীসে ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"বিষয় শুধু দুটি : বাণী ও আদর্শ। সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ ও পথ হলো মুহম্মদ ﷺ -এর আদর্শ ও পথ। সাবধান! তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে; কারণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নবউদ্ভাবিত বিষয়। আর সকল নবউদ্ভাবিত বিষয়ই "বিদ'আত" এবং সকল "বিদ'আত"ই বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা।"[২]

৩য় হাদীসে আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

"আমাদের (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর যুগের মুসলমানদেরঃ সাহাবীদের) এ কাজের (ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের) মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবিত করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।"

সহীহ মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

"আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহর নিকট কবুল হবে না)।"[৩]

৪র্থ হাদীসে আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতীর জন্য তওবার দরজা বন্দ করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত ত্যাগ করে।"[৪]

৫ম হাদীসে আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"যে ব্যক্তি তার পিতাকে অভিশাপ দেয় তাকে আল্লাহ লা'নত করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য জবাই করে তাকে আল্লাহ লা'নত করেন, যে ব্যক্তি কোনো নব-উদ্ভাবন বিদ'আত প্রচলনকারীকে আশ্রয় প্রদান করে তাকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং যে ব্যক্তি জমিনের চিহ্ন (আইল) পরিবর্তন করে তাকে আল্লাহ লা'নত করেন।"[৫]

৬ষ্ঠ হাদীসটি অধিকাংশ সনদে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তবে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস

হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এ হাদীসে তাবেয়ী ইবরাহীম ইবনু মাইসারা বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"যে ব্যক্তি কোনো (সুন্নাতের বিপরীতে কর্মকারী) বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধর্মের ধ্বংস সাধনে সাহায্য করল।"[১]

(৬). খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করতে হবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাকে সর্বোত্তমভাবে বুঝেছেন, মেনেছেন ও শিখিয়েছেন তাঁর সাহাবীগণ। তাঁরা পেয়েছেন তাঁর মুবারক সাহাচার্য। নবুয়তের নূরে সরাসরি নূরানী হয়েছেন তাঁরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত সঠিকভাবে বুঝতে হলে তাঁদের কর্ম, শিক্ষা ও মতামতের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন গতি নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁর সাহাবীদেরকে অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সামান্যতম ব্যতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন। অন্য হাদীসে বিশেষ করে প্রথম দুই খলীফার কথা তিনি বলেছেন। হুযাইফা (রা.) বলেন:

ﷺ .

:

.

আমরা একদিন নবীজী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। তিনি বললেন : আমি জানি না আর কতদিন তোমাদের মধ্যে থাকব। আমার পরে যে দুইজন তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করবে, একথা বলে তিনি আবু বকর ও উমরের দিকে ইশারা করেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: "তোমরা আমার পরের দুইজন – আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করবে, আম্মারের পদ্ধতি মেনে চলবে এবং ইবনু মাসঊদ তোমাদেরকে যা বলে তা সত্য বলে মানবে।"[২]

(৭). সাহাবীগণের সুন্নাত ও পরবর্তী দুই প্রজন্মের মর্যাদা

খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়াও সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণ মুসলিম উম্মাহর অনুকরণীয় আদর্শ। ইতঃপূর্বে কুরআনের আলোকে তাঁদের মর্যাদা ও আদর্শস্থানীয়তা আমরা দেখেছি। সাহাবীদের আদর্শস্থানীয়তা সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

"ইসরাঈল সন্তানগণ ৭২টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, একটি দল ব্যতীত সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" তাঁরা (সাহাবীগণ) প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল, এই একটিমাত্র দল কারা? তিনি উত্তরে বলেন: "আমি এবং আমার সাহাবীগণ যার উপরে আছি (সেই কর্মের উপর যারা থাকবে তারাই একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল)।"[৩]

এ ছাড়া সুন্নাত বোঝর ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে সাহাবীদের পরবর্তী প্রজন্ম ও তাঁদেরই সাহচার্যে আলোকিত তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী প্রজন্ম তাবে-তাবেয়ীগণের। কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

( )

"মানুষের মধ্যে (আমার উম্মতের মধ্যে) সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছেন আমার যুগের মানুষেরা, যাঁদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি, এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা, এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা।"[৪]

(গ). সাহাবায়ে কেরামের জীবনে সুন্নাতের গুরুত্ব

প্রথমত, সকল ইবাদত ও জাগতিক কর্মে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ

সাহবায়ে কেরামের জীবন ছিল 'সুন্নাত' কেন্দ্রিক। আগেই বলেছি, এই গ্রন্থে আমরা 'সুন্নাত'-কে মূল ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। আমরা 'সুন্নাত' বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতি ও কর্মরীতি বোঝাচ্ছি। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এই অর্থই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই ছিল একমাত্র আদর্শ ও সফলতার একমাত্র পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি ও তাঁর অনুসরণে তাঁরা ছিলেন আপোষহীন ও অতুলনীয়। সুন্নাতের প্রতি তাঁদের এই অতুলনীয় আপোষহীনতা আমরা দুই দিক থেকে পর্যালোচনা করতে পারি। প্রথম দিক হলো, জীবনের সকল দিকে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের আপোষহীনতা। জীবনের ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও তাঁরা তাঁর অনুসরণ করতেন। ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে তাদের আপোষহীন অনুসরণের উদাহরণ লিখতে হলে বহু খণ্ডের একটি বই লিখতে হবে। আমি এখানে অতি সাধারণ জাগতিক বিষয়ে তাঁদের অনুসরণের দু'একটি নমুনা পেশ করছি :

(১). কোনো যুক্তি বা অজুহাতে তাঁর শিক্ষার বাইরে না যাওয়া

ﷺ :

.[ ] : ﷺ :

: . ﷺ : : .!

.

তাবেয়ী মুজাহিদ বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মেয়েদেরকে রাতে (জামাতে সালাত আদায়ের জন্য) মসজিদে যেতে বাধা দেবে না।" তখন ইবনু উমরের এক ছেলে বলল: আমরা মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে দিব না; কারণ তারা মসজিদে যাওয়র নামে বের হওয়াকে তাদের নষ্টামির সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করবে। তখন ইবনু উমর রাগান্বিত হন ও ছেলেকে গালাগালি করে তার বুকে আঘাত করে বলেন: আমি বলছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আর তুমি বলছ আমরা তাদের যেতে দেব না!"[১]

সুবহানাল্লাহ, কোনো যুক্তি বা অজুহাতেই তাঁর সুন্নাত বর্জন করতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। নিজের তবীয়তে বা প্রকৃতিতে ভালো না-লাগলেও অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে যাওয়া যাবে না।

ঠিক একই কারণে তাঁর পিতা খলীফা উমর ইবনু খাত্তাব (রা.) নিজ স্ত্রীকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি মেয়েদের ঘরে নামায আদায় করাকেই বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিষেধ করতে নিষেধ করেছেন, তাই তিনি কখনো নিষেধ করতেন না। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন :

ﷺ : . :

: ( )

.

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর স্ত্রী আতিকা বিনত যাইদ নিয়মিত মসজিদে জামাতে নামায (এক বর্ণনায়: ফজর ও ইশার নামায) আদায় করতেন। উমর (রা.) তাঁকে বলতেন, তুমিতো জানো যে, আমি এ কাজ (মেয়েদের নিয়মিত মসজিদে নামায আদায়) ভালবাসি না। তখন তাঁর স্ত্রী বলতেন: আপনি আমাকে নিষেধ না-করা পর্যন্ত আমি এ থেকে বিরত হব না। যতদিন আপনি আমাকে নিষেধ না করবেন ততদিন আমি যাব। উমর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে নিষেধ করছি না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমরা মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না, সেহেতু তিনি নিষেধ করতেন না। এজন্য তাঁর স্ত্রীও নিয়মিত জামাতে গমন বন্ধ করেননি। (উমার (রা)-এর শেষ জামাত) যেদিন তিনি (আবু লুলু কর্তৃক) ছুরিকাহত হলেন সেদিনের সে জামাতেও আতিকা (রা.) উপস্থিত ছিলেন।"[২]

(২). সকল যুক্তির উর্ধ্বে শুধু রাসূলুল্লাহর (ﷺ) অনুসরণে ইবাদত পালন

:

ﷺ :

ﷺ.

ইবনু উমর (রা.) বলেন : উমর ফারুক (রা.) কাবা শরীফ তাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদকে সম্বোধন করে বলেন : আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, কোনোরকম কল্যাণ-অকল্যাণের, উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই। যদি নবীজী ﷺ তোমাকে চুম্বন না করতেন তাহলে কখনই আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। এরপর তিনি হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করেন। এরপর তিনি বলেন : তাওয়াফের সময় দৌড়ানোর আর কী প্রয়োজন? আমরা তো মুশরিকদের ভয় দেখানোর জন্য এভাবে তাওয়াফ করেছিলাম। আল্লাহ তো মুশরিকদেরকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন : একটি কাজ, রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন (কোনো যুক্তি বা প্রয়োজন না থাকলেও) আমরা তা পরিত্যাগ করতে চাই না। (আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতিতে দৌড়ে দৌড়ে তাওয়াফ কবর)।"[৩]

ﷺ

.

যাইদ ইবনু আসলাম বলেন : আমি ইবনু উমর (রা.)-কে দেখলাম যা'ফরান মিশ্রিত সুগন্ধ 'খালূক' খেযাব দ্বারা তাঁর দাড়ি হলুদ রঙে

খেযাব করেছেন। তাকে প্রশ্ন করলে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এভাবে খেজাব দিয়ে হলুদ করতে দেখেছি। তাঁর কাছে এর চেয়ে প্রিয় রঙ আর কিছুই ছিল না। তিনি এই রঙ দিয়ে তার সকল পোশাক এমনকি পাগড়ি পর্যন্ত রঙ করে নিতেন।"[১]

এভাবে তাঁরা তাঁর অনুসরণ করেছেন। কোনো যুক্তি নয়, কারণ নয়, কেন করেছেন, কী প্রয়োজন ইত্যাদি প্রশ্ন নয়। যেহেতু তিনি করেছেন তাই তাঁরই মতো করতে হবে। আর যা তিনি বর্জন করেছেন তা বর্জন করতে হবে, কেন বর্জন করেছেন বা কী যুক্তিতে তা জানার কোনো প্রয়োজন নেই।

(৩). কর্মে, বর্জনে, ইবাদতে ও মুআমালাতে অবিকল তাঁরই অনুসরণ

তাবেয়ী নাফে' (রাহ.) বলেন :

ﷺ

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.)-কে দেখলাম তিনি তাঁর উটকে কিবলার দিকে রেখে উটের দিকে মুখ করে (উটকে সুতরা বানিয়ে) নামায পড়ছেন। (কারণ হিসাবে) তিনি বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।"[২]

উবাইদুল্লাহ ইবনু জুরাইজ আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.)-কে বলেন,

আমি আপনাকে ৪টি কাজ করতে দেখেছি যা আপনার অন্যান্য সঙ্গী করেছেন বলে আমি দেখিনি। তিনি বলেন: সেগুলি কী? আমি বললাম: (১) আমি দেখি আপনি তাওয়াফের সময় শুধু কাবাঘরের দক্ষিণদিকের দুই কোণা – হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করেন, অন্য কোনো স্থান স্পর্শ করেন না, (২) আপনি পশমহীন চামড়ার জুতা পরেন, (৩) আপনি হলুদ খেজাব বা রঙ ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মক্কায় থাকেন মক্কার মানুষেরা জিলহাজ্ব মাসের চাঁদ দেখলেই হজ্বের এহরাম করে নেয়, অথচ আপনি ৮ তারিখের আগে এহরাম করেন না। ইবনু উমর (রা.) বলেন : কাবাঘরের তাওয়াফের সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দক্ষিণ দিকের দুই রুকন (কোণ) ছাড়া অন্য কোনো স্থান স্পর্শ করতে দেখিনি এজন্য আমিও শুধু এই দুই কোণই স্পর্শ করি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পশমহীন চামড়ার জুতা পরতে এবং এই জুতা পায়ে ওযু করতে দেখেছি, এজন্য আমিও এই ধরনের জুতা পরিধান করতে পছন্দ করি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হলুদ খেজাব বা রঙ ব্যবহার করতে দেখেছি, এজন্য আমিও তা ব্যবহার করতে ভালবাসি। হজ্বের এহরামের বিষয় হচ্ছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি ৮ ই জিলহজ্জ উটের পিঠে আরোহণ করে মিনা অভিমুখে যাত্রা শুরুর আগে হজ্বের এহরাম করেননি, এজন্য আমিও এর আগে এহরাম করি না।"[৩]

এখানে লক্ষ্য করুন, জায়েয না-জায়েযের বিষয় নয়, ফরয বা নফল চিন্তা নয়, একমাত্র চিন্তা কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ করা। তিনি যা যেভাবে করেছেন তা ঠিক সেভাবেই করা। তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা। অন্য যে যাই করুক না কেন। তিনি যেহেতু আগে এহরাম করেননি সেহেতু আগে এহরাম শত জায়েয হলেও তা করার কথা তিনি চিন্তা করতেন না। কা'বা শরীফের অন্যান্য রুকন বা স্তম্ভ স্পর্শ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্জন করেছেন, তাই তা জায়েয হলেও তিনি বর্জন করবেন।

(৪). রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেছেন তা বিনা যুক্তিতে বর্জন করা

যাইদ ইবনু আসলাম বলেন :

: ﷺ.

আমি ইবনু উমর (রা.)-কে দেখলাম জামার বোতাম খুলে নামায আদায় করছেন। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : "আমি নবীজী ﷺ -কে এভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি।"[৪]

: ﷺ : .

.

তাবেয়ী উরওয়া আরেক তাবেয়ী মু'য়াবিয়া ইবনু কুররা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর আব্বা সাহাবী কুররা ইবনু ইয়াস বলেছেন : "যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বাইয়াত করলাম, তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল।" উরওয়া বলেন : আমি শীত হোক বা গ্রীষ্ম হোক কখনই এই সাহাবী কুররা বা তাঁর পুত্র মুয়াবিয়াকে জামার বোতাম লাগান অবস্থায় পায়নি। সর্বদাই

তাঁরা জামার বোতাম খুলে রাখতেন।”[১]

সুবহানাল্লাহ! অতি সাধারণ জাগতিক বিষয় ! এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কারণে বা ইচ্ছেকরে বোতাম খুলে রেখেছিলেন না অজান্তে বোতম খোলা ছিল কি-না তাও বুঝা যায় না। কিন্তু ভালবাসা ও ভক্তি সাহাবীগণকে কিভাবে সর্বাত্মক অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করত তা আমরা এ সব ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি। তিনি বোতাম লাগান বর্জন করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা সাহাবীর প্রশ্ন নয়। তা বর্জন করা জায়েয অথবা না-জায়েয তা বিবেচ্য নয়। কোনো যুক্তি দিয়ে তা করার চেষ্টা নয়। শুধু তাঁর অনুসরণ করার আগ্রহ। তিনি করেননি আমিও করব না।

(৫). রাসূলুল্লাহ ﷺ যা খেতে পছন্দ করতেন সাহাবীগণও তা পছন্দ করতেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাদেম আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন :

ﷺ : ﷺ

ﷺ ﷺ :

.

একদিন একজন দর্জি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে খানা প্রস্তুত করে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। আনাস (রা) বলেন : আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে গেলাম। দাওয়াতকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে রুটি এবং লাউ ও শুকানো নোনা গোশত দিয়ে রান্না করা ঝোল তরকারি পেশ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখলাম খাঞ্চার ভিতর থেকে লাউয়ের টুকরোগুলি বেছে বেছে নিচ্ছেন। আনাস বলেন : ঐদিন থেকে আমি নিজে সর্বদা লাউ পছন্দ করতে থাকি।”[২]

এখানে লক্ষণীয় যে, পানাহারের রুচি সাধারণত একান্তই ব্যক্তিগত হয়। একজন অপরজনকে ভালবাসলেও পানাহারের রুচিতে ভিন্নতা থেকে যায়। অন্যের রুচি অনুসারে পানাহার করলেও মনের অভিরুচি নিজের থেকেই যায়। আনাস ইবনু মালিক (রা.) এর কথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও ভক্তির প্রচণ্ডতা এতই বেশি ছিল যে, তাঁর ব্যক্তিগত আহারের রুচিও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি একথা বলছেন না যে, সেইদিন থেকে তিনি বেশি করে লাউ খেতেন, বরং তিনি বলছেন যে, সেই দিন থেকে তিনি লাউ খাওয়াকে বেশি পছন্দ করতে ও ভালবাসতে শুরু করলেন। এই ছিল সাহাবীদের ভালবাসা, ভক্তি ও অনুসরণের নমুনা।

(৬). ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাগতিক কাজেও তাঁরই অনুসরণের আপ্রাণ চেষ্টা করা

“ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত,

ﷺ.

তিনি (হজ্জ-উমরার সফরের সময়) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের কাছে যেতেন এবং তার নিচে দুপুরের বিশ্রাম (কাইলুলা) করতেন। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে এভাবে বিশ্রাম করতেন।”[৩]

ﷺ

.

মুজাহিদ বলেন, আমরা এক সফরে ইবনু উমরের (রা.) সঙ্গী ছিলাম। তিনি এক স্থানে পথ থেকে একটু সরে ঘুরে গেলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো : আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেন : “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছি তাই আমি এরূপ করলাম।”[৪]

সুবহানাল্লাহ! দেখুন অনুকরণের নমুনা। নিতান্ত জাগতিক কাজ, পথ চলতে হয়তো কোনো কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু ঘুরে গিয়েছিলেন। কোনোরূপ ইবাদত বা সফরের আহকাম হিসাবে নয়, কোনো সাওয়াবের কারণ হিসাবেও নয়। একান্তই ব্যক্তিগত জাগতিক বিষয়। তা সত্ত্বেও প্রেমিক ভক্তের অনুসরণের ঐকান্তিকতা দেখুন।

অন্য ঘটনায় তাবেয়ী আনাস ইবনু সিরীন বলেন :

ﷺ

.

আমি একবার হজ্বের সময় আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা.) সাথে ছিলাম। দুপুরে তিনি আমাদেরকে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে গমন করেন এবং ইমামের সাথে যোহর ও আসরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি ইমামের সাথে আরাফাতে অবস্থান করেন। আমি ও আমার কিছু সঙ্গীও সাথে ছিলাম। সন্ধ্যায় ইমাম আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিলে তিনিও

আমাদেরকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন মুযদালিফার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানে পৌছালাম তখন তিনি উট থামিয়ে অবতরণ করলেন। তাঁকে দেখে আমরাও আমাদের উট থামিয়ে নেমে পড়লাম। আমরা ভাবলাম তিনি এখানে (মাগরিব ও এশার) নামায আদায় করবেন। তখন তাঁর উটের চালক খাদেম আমাদেরকে বলল : তিনি এখানে নামায আদায় করবেন না। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ স্থানে পৌঁছান, তখন প্রাকৃতিক হাজত পূরণ করে ইস্তিঞ্জা করেন, তাই তিনিও এখানে হাজত সারতে বা ইস্তিঞ্জা করতে পছন্দ করেন।"[১]

সাহাবীদের জীবনের এ ধরনের ঘটনা লিখতে গেলে বড় বই হয়ে যাবে। হাফিজ আব্দুল আযীম মুনযিরী (৬৫৬ হি.) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন: "সাহাবীদের থেকে সুন্নাতের এরূপ অনুসরণের ঘটনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই বেশি।"[২]

(৭) ইবাদত ও জাগতিক সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্ণ অনুসরণ

বর্তমান সময়ে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জাগতিক অভ্যাস বা পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ইত্যাদি সুন্নাতকে অবজ্ঞা করেন বা এসব বিষয়ে কোনো 'সুন্নাত' নেই বলে মনে করেন তাদের এ সকল ঘটনাগুলি চিন্তা করা দরকার। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জাগতিক ও মানবীয় কর্মও 'সুন্নাত'-এর মর্যাদায় সমাসীন। তাঁর ইবাদতকে ইবাদত হিসাবে, জাগতিক অভ্যাসকে জাগতিক অভ্যাস হিসাবে অনুকরণ করাই 'সুন্নাত'। সার্বিক অনুকরণ আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভক্তি সৃষ্টি করবে। তেমনি তাঁর প্রতি আমাদের সত্যিকার ভালবাসা ও ভক্তি থাকলে তা আমাদের এইরূপ দ্বিধাহীন পরিপূর্ণ অনুসরণের দিকে ধাবিত করবে।

সমাজে যারা এ ধরণের জাগতিক বা প্রাকৃতিক সুন্নাতের অনুসরণ করতে দ্বিধা করেন, নিজের রুচি অভিরুচিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রুচি অভিরুচির উপরে স্থান দিয়ে একেক ধরনের অজুহাত দেখিয়ে একেক ধরনের 'সুন্নাত' পরিত্যাগ করেন, অথচ তাঁর প্রেমিক ও ভক্ত অনুসারী বলে দাবি করেন তাদেরও এখানে একটু থমকে দাঁড়ান দরকার।

অপরদিকে আমাদের সমাজে অনেক ভক্ত প্রেমিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জাগতিক অভ্যাসমূলক সুন্নাতগুলিকেই গুরুত্বসহকারে পালন করেন। অথচ যে সকল কাজ তিনি নিজে 'সুন্নাত' হিসাবে শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবে পালন করেছেন, হয়তবা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সে সকল সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ত্রুটি ও অবহেলা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যেভাবে, যতটুকু গুরুত্বসহকারে, যে পদ্ধতিতে করেছেন বা বর্জন করেছেন, সেই কাজ সেভাবে, ততটুকু গুরুত্বসহকারে, সেই পদ্ধতিতে করা বা বর্জন করাই সুন্নাত। প্রকার, পদ্ধতি বা গুরুত্বের ক্ষেত্রে বেশি-কম করা সুন্নাতের খেলাফ। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে তাঁর খলীল ও হাবীব নাবীয়ে উম্মীর (ﷺ) পূর্ণ অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করেন। আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মতো ভক্তি, ভালবাসা ও অনুসরণের তৌফিক দান করেন। দয়া করে আমাদেরকে তাঁদেরই দলভুক্ত করে হাশরে উঠান এবং জান্নাতের নেয়ামত দান করেন ; আমীন।

দ্বিতীয়ত, তাঁর পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম বর্জন ও প্রতিরোধ করা

সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের আপোষহীনতার দ্বিতীয় দিক হলো, কোনো অজুহাতেই সুন্নাতের বাইরে, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা সুন্নাতের বিপরীত কোনো পদ্ধতিতে কোনো কাজ করতে তাঁরা সম্মত ছিলেন না। সুন্নাতের সামান্য ব্যতিক্রমকেও তাঁরা ঘৃণা করেছেন। কোনো যুক্তিতে, কোনো অজুহাতে বা কোনো প্রয়োজনেই তাঁর পদ্ধতির বাইরে যেতে তাঁরা ইচ্ছুক ছিলেন না।

উম্মে দারদা (রা.) বলেন: একদিন আবু দারদা (রা.) রাগন্বিত অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এত রাগন্বিত কেন? তিনি বললেন : "আমি এদের মধ্যে (তাঁর সমসাময়িক মানুষদের মধ্যে) মুহাম্মাদ ﷺ -এর কোনো কাজকর্ম নিয়মরীতিই দেখতে পাচ্ছি না। শুধু এতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে, এরা জামাতে নামায আদায় করছে।"[৩]

সুবহানাল্লাহ! সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগ। সবাই সুন্নাত অনুসরণ করছেন। হয়ত সামান্য কিছু বিষয়ে সামান্য ব্যতিক্রম হয়েছে। কিন্তু তাও তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

আনাস ইবনু মালেক (রা.) একদিন তাঁর ছাত্রদেরকে বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে যা কিছু দেখেছি জেনেছি তা কিছুই তোমাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু তোমরা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলছ তাই দেখছি।" ছাত্ররা বললেন : কেন? আমরা তো সুন্নাতের উপরেই রয়েছি? তিনি বললেন : "তোমরা (আসরের) নামায আদায় করলে সূর্য প্রায় ডুবতে বসেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এভাবে নামায আদায় করতেন?"[৪]

সময়ের ব্যতিক্রমকেও তাঁরা মেনে নেননি। তাঁরা জায়েয না-জায়েয মাসআলা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁদের একমাত্র কথা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে, কোন্ সময়ে, কতটুক কাজটি করেছেন, অবিকল সেভাবে, সেই সময়ে, ততটুকু করাই তাঁদের লক্ষ্য। সামান্যতম পদ্ধতিগত বা সময়গত ব্যতিক্রমও তাঁরা মানতে রাজি ছিলেন না।

যে সকল সাহাবী ৮০/ ৯০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেছেন, এবং তাঁদের পরবর্তী অনেক তাবেয়ী সর্বদা আফসোস করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের বা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের কোনো মানুষ যদি আবার আমাদের সময়ে পৃথিবীতে আসেন তাহলে দু'একটি কাজ – আযান, নামায ইত্যাদি ছাড়া ইসলামের কিছুই দেখতে পাবেন না!"[৫] একথা তাঁরা বলতেন সেই মুবারক যুগে! খুঁটিনাটি কাজেকর্মে সামান্যতম ব্যতিক্রম দেখে ! তাঁরা যদি দেড় হাজার বছর পরে আমাদের যুগের ইসলামের রূপ দেখতেন জানি

না তাঁরা কী বলতেন !

(১). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতির অতিরিক্ত দরুদ সালাম পাঠে অসম্মতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যেভাবে করেছেন বা বর্জন করেছেন সে কাজ ঠিক সেভাবেই করতে বা বর্জন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন সাহাবীগণ। সুন্নাতের সামান্য পদ্ধতিগত ব্যতিক্রমও তাঁরা করতে রাজি ছিলেন না। সুন্নাতের ন্যুনতম ব্যতিক্রমও তাঁদের দৃষ্টিতে বিদ'আত ও বর্জনীয় ছিল। তাঁরা সুন্নাতের সকল প্রকার ব্যতিক্রমকে বিদ'আত বলে মনে করেছেন এবং কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি :

তাবেয়ী নাফেয় (রাহ.) বলেন :

( ) ﷺ ( )

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা.) পাশে বসে হাঁচি দেয় এবং বলে: "আল-হামদু লিল্লাহ, ও আস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ (প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাম)।" তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমর বলেন: আমিও বলি: "আল-হামদু লিল্লাহ, ও আস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ", তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (হাঁচি প্রদান করলে) এভাবে দোয়া পড়তে শেখাননি, তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, আমরা হাঁচি দিলে বলব: "আলহামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল (সকল অবস্থায় প্রশংসা আল্লাহর)।"[১]

এখানে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠ করা ইসলামের অন্যতম ইবাদত। ইহলৌকিত বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি ও মর্যাদার জন্য তা অন্যতম মাধ্যম। এ বিষয়ে অনেক হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম সদা সর্বদা সালাত ও সালাম পাঠ করতে ভালবাসতেন। তাঁরা একান্তে, সমাবেশে সর্বদা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের মতো সালাত ও সালাম পড়তেন। সালাত ও সালাম পাঠের এত বেশি মর্যাদা ও সাওয়াব এবং এত বেশি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সাহাবী ইবনু উমর কেন হাঁচির পরে সালাম পাঠ অনুমোদন করছেন না? তাহলে কি কোনো কোনো সময়ে সালাত ও সালাম পাঠ নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ? তাহলে কি হাঁচির পরে দরুদ বা সালাম পাঠ নিষিদ্ধ ? তা কখনোই নয়।

বিষয়টি অন্য রকম। সাহাবীদের দৃষ্টিতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যেভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন তা সেভাবে করাই সুন্নাত। সর্বাবস্থায় যিক্র করা বা সালাত ও সালাম পাঠ করা জায়েয বা শরীয়ত-সঙ্গত এবং আমরা তা করতে পারি। কিন্তু কোনো একটি বিশেষ অবস্থায় কোনো বিশেষ যিক্র বা সালাত সালাম নিয়মিত করতে হলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের প্রয়োজন। হাঁচির পরে সুন্নাত দোয়া হলো "আল-হামদুলিল্লাহ" বলা। এখানে যদি কেউ দরুদ ও সালাম পাঠ নিয়মিত করে নেন তাহলে তা সুন্নাতের বাইরে চলে যায় বলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) আপত্তি করেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁচি প্রদান করেছেন, তিনি দোয়া পাঠ করেছেন, তাঁর মহান সাহাবীগণ তাঁর শেখান দোয়া পাঠ করেছেন, তারা শুধু "আল হামদু লিল্লাহ" বলেছেন। এখন যদি কেউ এর সাথে দরুদ সালাম যোগ করে নেন এবং তা নিয়মিত করতে থাকেন তাহলে মনে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের দোয়া হয়ত অসম্পূর্ণ ছিল, অথবা তাদের দোয়ার চেয়ে এই বর্ধিত দোয়া একটু ভালো। নিঃসন্দেহে এই ধারণা ধ্বংস ও অধঃপতনের কারণ এবং এভাবেই বিদ'আত ও বিভ্রান্তির শুরু হয়।

(২). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতির অতিরিক্ত দোয়া বা ওয়াজে অসম্মতি

গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী (রা.) বলেন:

.

. ﷺ

"উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান (রাজত্ব: ৬৫-৮৬ হি./ ৬৮৪-৭০৩ খ্রি) আমার কাছে দূত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে আবু আসমা, আমরা দুটি বিষয়ের উপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি)। গুদাইফ বললেন: বিষয় দুটি কী কী? খলীফা বললেন: বিষয় দুটি হলো : (১). শুক্রবারের দিন (জুমআর খুত্বার মধ্যে) মিম্বরে ইমামের খুৎবা প্রদানের সময় (সমবেতভাবে) হাত তুলে দোওয়া করা, এবং (২). ফজর এবং আসরের নামাযের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজ করা। তখন গুদাইফ (রা) বললেন : নিঃসন্দেহে এই দুটি বিষয় আমার মতে তোমাদের বিদ'আতগুলির মধ্য থেকে সবথেকে ভালো বিদ'আত, তবে আমি এই দুই বিদ'আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করব না। খলীফা বললেন : কেন আপনি আমার কথা রাখবেন না? গুদাইফ (রা) বলেন : কারণ নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন : "যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয় ; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকা

একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম।"[১]

এখানে লক্ষণীয় যে, যে দুটি বিষয় গুদাইফ (রা) বিদ'আত বলেছেন দু'টি বিষয়ই শরীয়ত-সম্মত। জুমআর নামাযের খুৎবা প্রদানের সময় নবীয়ে আকরাম ﷺ দোয়া করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দোয়ার সময় দুই হাত তুলে দোয়া করার কথাও বিভিন্ন হাদীসে এসেছে। খুত্‌বা চলাকালীন সময়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে তিনি দুই হাত উঠিয়েছেন বলেও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই, যে কোনো যুক্তি তর্কে আমরা বলতে পারি খুৎবার সময় দোওয়া করা জায়েয, দোয়ার সময় দু'হাত তোলাও জায়েয এবং খুৎবা চলাকালীন সময়ে সমবেতভাবে দু'হাত তুলে দোয়া করাও জায়েয। কিন্তু সাহাবী একে বিদ'আত বললেন কেন? কারণ বৃষ্টির জন্য দোয়া ছাড়া খুৎবার মধ্যে অন্য কোনো দোয়াতে তিনি দুই হাত উঠাতেন না, বরং শাহাদত আঙ্গুলের ইশারা করে দোয়া করতেন। আর তিনি শুধু একাই হাত তুলতেন বা শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা করতেন, সমবেতভাবে তা করতেন এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সুন্নাতের উপরেই থাকতে চাচ্ছেন। তিনি যতটুকু করেছেন তাঁর একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না।

এ অর্থেই আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) বলতেন :

ﷺ

"তোমরা দোয়ার জন্য যেভাবে হাত উঠাও তা বিদ'আত, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো হাত বুকের উপরে উঠাতেন না।"[২]

লক্ষণীয় যে, জায়েয বা মাসনূন (সুন্নাত-সম্মত) কাজ পালনের পদ্ধতিও চুলচেরা সুন্নাত মতো করতে চাইতেন তাঁরা। পদ্ধতিগত সামান্যতম পরিবর্তনকেও তাঁরা বিদ'আত বলে আপত্তি করতেন।

দ্বিতীয় বিষয় হলো ওয়াজ বা গল্প-কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে উপদেশ প্রদান। ওয়াজ বা উপদেশ প্রদান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ছিল। তাঁর সাহাবীগণও মাঝে মাঝে ওয়াজ বা নসীহত করতেন।[৩] কাজেই, ফজর ও আসরের পরে নিয়মিত ওয়াজ-নসিহত বা কাহিনী আলোচনা না জায়েয হওয়ার কথা নয়। তাহলে কেন সাহাবী তাকে বিদ'আত বললেন এবং তা করতে অস্বীকার করলেন? কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে তা নিয়মিত বা প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সময়ে করা হতো না, বরং প্রয়োজন মতো মাঝে মাঝে করা হতো।[৪] সাহাবী ঠিক সেইভাবে চলাকেই পছন্দ করছেন। তাঁর মতে অনিয়মিতভাবে, অনির্ধারিতভাবে মাঝে মাঝে প্রয়োজন মতো কুরআন ও হাদীস-ভিত্তিক ওয়াজ নসিহতই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরীকা বা সুন্নাত। এই কাজকে নিয়মিত বা দৈনিক হিসাবে চালু করলে নবীজীর পদ্ধতিটা বিদায় নেবে, তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো অনিয়মিত প্রয়োজন অনুসারে ওয়াজ-নসীহতের পক্ষে।

আল্লামা ইবনু হাজার এই হাদীসের টীকায় বলছেন: "যে কাজের মূল হাদীসে ও সুন্নাতে রয়েছে সেই বিষয়ে যদি একজন সাহাবীর উত্তর এই হয়, তাহলে যে কর্মের কোনো অস্তিত্বই হাদীসে নেই, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত কী হবে তা একবার ভেবে দেখুন। আর যে কাজ হাদীসের বিপরীত সে বিষয়ে তাঁরা কী মতামত পোষণ করতেন তাও একবার ভাবুন।"[৫]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর পদ্ধতির বাইরে নামাযে ডাকাও বিদ'আত

মুজাহিদ বলেন: আমি ইবনু উমরের (রা) সঙ্গে ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি যোহর বা আসরের নামাযের জন্য ডাকাডাকি করল। তখন তিনি বললেন :

"এখান থেকে বেরিয়ে চল, কারণ এটি একটি বিদ'আত।"[৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে নামাযের জন্য শুধু আযান দেওয়া হতো। এতেই সকল মুসলমান মসজিদে এসে উপস্থিত হতেন। কিছু বছর পরে দেখা গেল অনেক এলাকায় মানুষেরা নামাযে আসতে অবহেলা করছে। তখন অনেক আগ্রহী মুয়াজ্জিন আজানের কিছুক্ষণ পরে আবার ডাকাডাকি করতেন বা জামাতের সময় হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করতেন। যেহেতু এই রীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় ছিল না, তাই ইবনু উমার (রা) একে খুবই অপছন্দ করেছেন এবং সে মসজিদে নামাযই পড়েননি, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কর্ম বর্জন করেছেন মাত্র, নিষেধ করেন নি এবং এরূপ কাজকে সমর্থন করে অনেক কথা বলা যায়। সাহাবীদের কাছে বড় হলো রাসূলে আকরাম ﷺ -এর রীতি। তাঁর বাইরে তাঁরা একটুও যেতে রাজি ছিলেন না।

(৪). সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে এতেকাফ করাও বিদ'আত

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন :

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো বিদ'আত। আর এ সকল বিদ'আতের মধ্যে একটি হলো বাড়ির মধ্যে যে নামাযের স্থান বা ঘরোয়া মসজিদ থাকে সেখানে এতেকাফ করা।"[৭]

(৫).সুন্নাত-পদ্ধতি বহির্ভূত যিক্‌রে তাঁরা ঘোরতরভাবে বাধা প্রদান করেছেন

উমরের (রা) সময় মুসলমানগণ পার্শ্ববর্তী অনেক এলাকা জয় করেন। এসকল এলাকার অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সকল নও-মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে ইবাদত বন্দেগি করতে ইচ্ছা করতেন, কিন্তু 'সুন্নাত' সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান না থাকায় তাদের চিন্তা বা কর্ম অনেক সময় 'সুন্নাতের খেলাফ বা বিদ'আতময় হয়ে পড়ত। মক্কা মদীনার বাইরে মিশর, কুফা, বসরা ইত্যাদি নতুন ইসলামী শহরগুলিতে এদের বেশি দেখা যেত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বেশ কিছুদিন কুফার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁকে অনেক সময় এধরনের আগ্রহী মুসলমানদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি তাঁদেরকে তাঁদের সকল ইবাদত বন্দেগি পরিপূর্ণ সুন্নাত মোতাবেক করার জন্য বারবার তাকিদ প্রদান করেছেন। সুন্নাতের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন ও সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার নিন্দা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অনেক হাদীস রয়েছে। এ ধরনের একটি ঘটনা :

ﷺ

ﷺ

▪

আমর ইবনু সালামা বলেন : আমরা (হাদীস ও ইলম শিক্ষা জন্য তালেবে ইলেমগণ) ফজর নামাযের পূর্বেই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের (রা.) বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে থাকতাম। যখন তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বাহির হতেন, তখন আমরা তাঁর সাথে সাথে যেতাম। একদিন আবু মুসা আশআরী (রা.) এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ কি বেরিয়েছেন ? আমরা বললাম না, এখনো বের হননি। তখন তিনিও আমাদের সাথে বসে পড়লেন। যখন তিনি বের হলেন তখন আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে গেলাম। আবু মুসা আশয়ারী (রা.) তাঁকে বললেন : আমি একটু আগে মসজিদের মধ্যে একটি বিষয় দেখেছি এবং দেখে খারাপ মনে করেছি, যদিও যা দেখেছি তা ভালো ছাড়া খারাপ নয়, আলহামদু লিল্লাহ। ইবনু মাসঊদ বললেন: বিষয়টি কি? আবু মূসা বললেন : আপনি, ইন্‌শা আল্লাহ, একটু পরেই দেখবেন। আমি দেখলাম কিছু মানুষ কয়েকটি দলে হালকায় (বৃত্তাকারে) বসে নামাযের অপেক্ষা করছে। প্রত্যেক হালকায় (গ্রুপে) একজন (নেতা গোছের) ব্যক্তি রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে (তাসবীহের মতো) কাঁকর। নেতাগোছের ব্যক্তি বলছে : সবাই একশতবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ুন, তখন সবাই ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলছে। তখন সে বলছে : সবাই ১০০ বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ুন। এতে সবাই ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলছেন। তখন সে বলছে : সবাই ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলুন। সবাই তখন ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলছে। ইবনু মাসঊদ বললেন : আপনি তাদেরকে কি বলেছেন? তিনি বললেন : আমি আপনার মতামতের ও নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে কিছু বলিনি। ইবনু মাসঊদ বললেন : আপনি তাদেরকে বললেন না কেন : তোমরা তোমাদের পাপগুলি গুণে গুণে রাখ, আর আপনি দায়িত্ব নিতেন যে তাদের কোনো নেককর্ম নষ্ট হবে না। এরপর আমরা সবাই তাঁর সাথে মসজিদে গেলাম। তিনি ঐ হালকাগুলির (গ্রুপগুলির) একটি হালকার কাছে যেয়ে তাদেরকে বললেন : এ তোমরা কী করছ? তারা বলল : জনাব, আমরা কাঁকর দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর গণনা করছি। তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পাপগুলি গণনা কর, আমি দয়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের কোনো নেক কর্ম বিনষ্ট হবে না। হতভাগা উম্মতে মুহাম্মাদী ! কত দ্রুত তোমরা ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছ ! এখনো তোমাদের মাঝে তোমাদের নবীর (ﷺ) সাহাবীগণ বিপুল সংখ্যায় জীবিত রয়েছেন। দেখ! তাঁর পোশাকগুলি এখনো পুরাতন হয়নি, তাঁর আসবাবপত্র এখনো ভেঙ্গে নষ্ট হয়নি! (অথচ তার আগেই তোমরা ধ্বংসের পথে চলে গেলে) আল্লাহর কসম করে বলছি : তোমরা কি মুহাম্মাদের (ﷺ) ধর্মের চেয়েও ভালো কোনো ধর্ম আবিষ্কার করলে? নাকি তোমরা বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর দরজা খুলে নিলে? সমবেত যিক্‌রকারীরা বলল : জনাব, আমরা তো একান্তই ভালো নিয়্যাতে এ কাজ করেছি। তিনি জবাবে বললেন : অনেক মানুষেরই উদ্দেশ্য ভালো থাকে তবে সে ভালো পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না (কারণ, উদ্দেশ্য ভালো হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য অর্জনের পন্থা ভালো হয় না)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন যে, কিছু মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তাদের তিলাওয়াত কণ্ঠনালির নিচে নামবে না। (বিদ'আতে লিপ্ত থাকার ফলে তাদের আমল কবুল হবে না)। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, হয়ত তোমাদের অনেকেই এই শ্রেণির অন্ত র্গত। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে চলে যান। আমর ইবনু সালামা বলেন : এ সকল হালকায় যারা উপস্থিত ছিল তাদের

অধিকাংশকেই দেখেছি নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের পক্ষে আমাদের (আলীর (রা.) বাহিনীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।"[১]

এখানে দেখুন, তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর সুন্নাত নির্দেশিত অত্যন্ত মূল্যবান ইবাদত। বিভিন্ন হাদীসে বেশি বেশি যিক্‌র, তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীরের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। একা একা এবং অন্যান্যদের মধ্যে অবস্থানরত উভয় অবস্থায় যিক্‌র করতে উৎসাহ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যিক্‌রের মাজলিসের প্রশংসাও হাদীসে করা হয়েছে। কিন্তু শুধু পদ্ধতির কারণে ইবনু মাসঊদ তাদেরকে কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন। তারা যে পদ্ধতিতে যিক্‌রের হালকা করেছে সেভাবে কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ যিক্‌র করেননি। তাঁরা প্রত্যেকে, ব্যক্তিগতভাবে যার যার মতো, যত পেরেছেন তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও অন্যান্য মাসনূন যিক্‌র করেছেন। একা একা করেছেন, মাজলিসে বসা অবস্থায় করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশব্দে যিক্‌র করেছেন, কখনো কখনো সশব্দেও করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো একত্রে সমস্বরে বা সমবেতভাবে বা সবাই মিলে একজনের নেতৃত্বে গণনা করে যিক্‌র করেননি। তাঁদের পদ্ধতির অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতিতে ইবাদত করার অর্থ হলো তাঁদের পদ্ধতিকে অপূর্ণ মনে করা, এজন্যই তিনি বলেছেন: 'তোমরা কি মুহাম্মাদের (ﷺ) ধর্মের চেয়েও ভাল কোন ধর্ম আবিষ্কার করলে?' যেহেতু কখনই তা সম্ভব নয় সেহেতু তাদের পদ্ধতি পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

(৬). খেলাফে-সুন্নাতের বিরোধিতা ও সুন্নাত-পদ্ধতিতে সার্বক্ষণিক যিক্‌র

এখানে লক্ষণীয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) শুধু অতিরিক্ত পদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন, কারণ এই অতিরিক্ত বিষয়টি মুসলিমকে সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে নিয়ে যায়। তিনি কখনো যিক্‌র করার বা সুন্নাত পদ্ধতিতে সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে যিক্‌র করার বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি ও অন্যান্য সাহাবী এ বিষয়ে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলেন। তাঁরা সুন্নাত মোতাবেক সকাল-সন্ধ্যায় যিক্‌র ছাড়াও সর্বদা একাকী থাকা অবস্থায় ও জনসমক্ষে নিজের মনে দরুদ সালাম ও যিক্‌রে লিপ্ত থাকতেন।

অনেকে না বুঝে মনে করতো যে, ইবনু মাসঊদ বুঝি যিক্‌র করতেই নিষেধ করছেন। অথবা অনেকে তাঁর নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করত। এজন্য তাবেয়ী আবু ওয়াইল বলেন : অনেকে না বুঝে মনে করে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) যিক্‌র করতে নিষেধ করেন! আমি তাঁর সাথে যখনই বসেছি তাঁকে যিক্‌র করতে দেখেছি।[২]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) সর্বদা যখনই কোনো দাওয়াতে গিয়েছেন, বা কোনো জানাযায় গিয়েছেন, বা কোনো ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন তখন সেই স্থান বা মাজলিস পরিত্যাগ করার আগে আল্লাহর প্রশংসা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ করতেন এবং বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। তিনি অনেক সময় বাজারে যেয়ে বাজারের সবচেয়ে পরিত্যক্ত ও নির্জন স্থানে বসে আল্লাহর প্রশংসা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ পাঠ করতেন এবং বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন।[৩]

এই ছিল সাহাবীগণের পদ্ধতি, তাঁদের সুন্নাত। একদিকে যিক্‌রের বা দরুদ-সালামের ক্ষেত্রে সুন্নাতের অতিরিক্ত সকল কাজ বর্জন করা ও নিষেধ করা ; অপরদিকে সুন্নাত মোতাবেক সর্বাবস্থায় যিক্‌র, সালাত, সালাম ও দোয়ায় নিমগ্ন থাকা। বর্তমানে আমরা একেবারেই উল্টোপথে চলছি। কেউ যিক্‌রের নামে সুন্নাতের বাইরে বিভিন্ন নতুন নতুন শব্দ বা পদ্ধতিতে যিক্‌র করছি। আর কেউ পদ্ধতিগত খেলাফে-সুন্নাতের প্রতিবাদ করছেন, কিন্তু সুন্নাত মোতাবেক কোনো যিক্‌র তাঁদের জীবনে নেই। প্রথম শ্রেণির পদ্ধতি খেলাফে-সুন্নাত। এজন্য পদ্ধতির জন্য ব্যয়িত শ্রম ও সময় পণ্ড হলেও, পদ্ধতিগত খেলাফে-সুন্নাতের কারণে পদ্ধতির সাওয়াব না পেলেও মাসনূন যিক্‌র, দোয়া ও মহব্বতের সাওয়াব পাচ্ছেন বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণি অন্যের বিদ'আতের বিরোধিতাকেই নিজের একমাত্র দায়িত্ব বলে মনে করছেন। নিজের জীবনে মাসনূন যিক্‌র, সালাত, সালাম ও দোয়ার কল্যাণ থেকে একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছেন। আল্লাহ আমাদিগকে এবং আমাদের সকল মুসলিম ভাইকে সুন্নাত মোতাবেক জীবন গঠনের তাওফীক প্রদান করুন ; আমীন।

(৭). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়মের বাইরে সুন্নাত নামায আদায়ে অনাগ্রহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে থাকাকালীন সময়ে ৪ রাকআত ফরয নামায কসর করে ২ রাকআত আদায় করতেন। এছাড়া তিনি সফর অবস্থায় ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায আদায় করতেন না, তবে তিনি সফর অবস্থায় তাহাজ্জুদের নামায জানোয়ারের পিঠে কেবলামুখী হয়ে অথবা কেবলা ছাড়া যেদিকে তাঁর গন্তব্য সেদিকে মুখ করেই আদায় করতেন। এ জন্য সাহাবীগণও সফরে সুন্নাত নামায আদায় করতেন না। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতোই তাহাজ্জুদ উটের পিঠে সাওয়ারী অবস্থায় বা মাটিতে দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের কেউ কেউ সফর অবস্থায় সুন্নাত আদায় করতে দেখলে আপত্তি করতেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত। সফরের সময়ে সুন্নাত নামায বর্জন করাই সুন্নাত।

তাবেয়ী হাফস ইবনু আসিম বলেন: আমি একবার অসুস্থ হলে আমার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাকে সফর অবস্থায় সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায আদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন :

ﷺ)

(

“আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সফর করেছি। আমি তাঁকে কখনো সুন্নাত আদায় করতে দেখিনি। আমি যদি সুন্নাতই আদায় করব তাহলে তো ফরয নামাযই পুরো চার রাকআত আদায় করতাম। আর আল্লাহ বলেছেন: “নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে”।[১]

এখানেও দেখুন, তাঁরা সুন্নাতে রাসূল ﷺ কী-ভাবে বুঝেছেন। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, সাধারণ ফযীলত বা বিধানের আলোকে সুন্নাতের উপর আমাদের মর্জি মতো যা খুশি আমরা বাড়িয়ে নেব, তাতে সুন্নাতের কোনো ক্ষতি হবে না। আর সাহাবীগণের বিশ্বাস ছিল যে, সুন্নাতের উপরে সামান্যতম বৃদ্ধি বা ব্যতিক্রম অর্থই হলো সুন্নাতের খেলাফ।

কেউই বলবেন না যে, সফরে সুন্নাত নামায না-জায়েয। সফরে সুন্নাত ও নফল নামায আদায়ের বৈধতার পক্ষে ও একে নেক কর্ম বা সুন্নাত মুস্তাহাব প্রমাণের পক্ষে আমরা কুরআন ও হাদীসের সাধারণ আয়াত, হাদীস বা সাধারণ বিধানাবলী দিয়ে অনেক অকাট্য (!) প্রমাণ পেশ করতে পারব। নফল নামাযের ফযীলত, সুন্নাত নামাযের ফযীলত ইত্যাদি অনেক কথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু সাহাবীগণের কাছে এসকল অকাট্য (!) দলিলের কোনো মুল্য নেই। তাঁরা জানতেন যে, এ সকল ফযীলতের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন। তিনি কী-ভাবে তা পালন করেছেন তা-ই দেখার বিষয়। বেশি বেশি নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আগ্রহ তাঁরই ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন উটের পিঠে বসেই। তিনি চাইলে এ সকল সুন্নাত নামাযও আদায় করতে পারতেন। প্রয়োজন ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করেছেন। কাজেই বর্জন করাই সুন্নাত, পালন করা সুন্নাত নয়। এজন্যই তিনি সফরে সুন্নাত আদায়ে আপত্তির জন্য একটি মাত্র দলিল পেশ করেছেন, তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্জন এবং একেই তিনি তাঁর 'আদর্শ' বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু আমাদের অনেকের কাছেই এই একটিমাত্র দলিল যথেষ্ট নয়। আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবীগণের মতোই সুন্নাতের অনুসরণের তাওফীক প্রদান করেন।[২]

(৮). সুন্নাতের বাইরে কোনো নেককর্ম না-করার জন্য তাঁদের শিক্ষা

উসমান ইবনু হাদির বলেন: আমি ইবনু আব্বাস (রা.)-এর নিকট গমন করি এবং তাঁকে বলি: আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বলেন:

“হাঁ, তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে, ইসলামের বিধিবিধান সুদৃঢ়ভাবে পালন করবে। তুমি অনুসরণ করে চলবে, নব উদ্ভাবন করবেন না।”[৩]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

“প্রতি বৎসরই মানুষ কিছু বিদ'আত উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং সুন্নাত মেরে ফেলবে, এক পর্যায়ে শুধু বিদ'আতই বেঁচে থাকবে আর সুন্নাতসমূহ বিলীন হয়ে যাবে।”[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

“তোমরা অবশ্যই ইল্ম শিক্ষা করবে। আর খবরদার! তোমর কখনো বিদ'আতের মধ্যে লিপ্ত হবে না, খবরদার! তোমরা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হবে না। খবরদার! তোমরা অতি গভীরতার চেষ্টা করবে না। বরং তোমরা প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে।”[৫]

তিনি আরো বলেন :

“তোমরা অনুসরণ কর, উদ্ভাবন করো না, কারণ দীনের মধ্যে যা আছে তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ।”[৬]

অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল বিষয় বর্ণনা করা ও পালন করে উম্মতকে শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন রাসূলুল্লহ ﷺ, কাজেই তোমাদের দায়িত্ব হলো তাঁর সার্বিক অনুসরণ করে যাওয়া, নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার বা প্রচলনের কোনো প্রয়োজন তোমাদের নেই।

অন্য হাদীসে তিনি বলেন :

“বিদ'আত পদ্ধতিতে বেশি আমল করার চেয়ে সুন্নাতের উপর অল্প আমল করা উত্তম।”[৭]

জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন, হুযাইফা (রা.) বলেন :

ﷺ

"সাহাবায়ে কেরাম যে ইবাদত করেননি, তোমরা কখনো সে ইবাদত করবে না। কারণ পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের জন্য কথা বলার (কোনো নতুন কথা বলার বা নতুন কর্ম উদ্ভাবন করার) কোনো সুযোগ রেখে যাননি। হে আল্লাহর পথের পথিক দরবেশগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পথ অবলম্বন করে চল।"[১]

(৯). বিদ'আত যতই প্রসার লাভ করুক বা জনপ্রিয় হোক তা বর্জনীয়

মুয়ায ইবনু জাবাল (রা.) একদিন বলেন :

:

. !

তোমাদের সামনে অনেক ফিতনা ফাসাদ আসছে। যখন মানুষের মাল-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। তখন কুরআন শিক্ষার পথ খুলে যাবে। মুমিন-মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, মনিব-চাকর সবাই কুরআন শিখবে। তখন হয়ত কোনো ব্যক্তি বলবে : মানুষের কী হলো, আমি কুরআন শিক্ষা করলাম অথচ তারা আমার অনুসরণ করছে না ? কুরআন ছাড়া কোনো নতুন মত বা কাজ উদ্ভাবন না করলে মানুষেরা আমার অনুসরণ করবে না। (আমি এত আলেম হলাম কিন্তু আমার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না, আমার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা বাড়ছে না। কাজেই, মানুষের মধ্যে আমার সঠিক মূল্যায়নের উপায় হলো নতুন কোনো মতামত বা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা) খবরদার! তোমরা বিদ'আতের কাছেও যাবে না। নিঃসন্দেহে যা কিছু বিদ'আত তাই পথভ্রষ্ঠতা।"[২]

হুযাইফাহ (রা.) দুটি পাথর নিয়ে একটিকে অপরটির উপরে রাখেন এবং সহচর তাবেয়ীগণকে প্রশ্ন করেন : তোমরা কি দুটি পাথরের মাঝখানে কোনো আলো দেখতে পাচ্ছ? তাঁরা বলেন : খুব সামান্য আলোই পাথর দুটির মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি বলেন :

. :

"যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর (আল্লাহর) কসম করে বলছি : বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মত এই দুটি পাথরের মধ্য থেকে আসা আলোর মতো ক্ষীণ হয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, বিদ'আত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, যদি কোনো বিদ'আত বর্জন করা হয়, তাহলে সবাই বলবে : সুন্নাত বর্জন করা হয়েছে (বিদ'আতকেই সুন্নাত মনে করা হবে বা বিদ'আত পালনই সুন্নী হওয়ার আলামত বলে গণ্য হবে)।[৩]

(১০). বিদ'আতের বিরোধিতা করাই আল্লাহর ওলীদের কর্ম ও পরিচয়

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আন জমিয়িস সাহাবাহ) বলেন:

"যখনই কোনো বিদ'আত প্রচলন করে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়, তখনই আল্লাহ কিছু আওলিয়ায়ে কেরাম ঐ বিদ'আতের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ান এবং তার আলামতগুলো ব্যাখ্যা করতে থাকেন। তাই তোমরা এসকল স্থানে উপস্থিত থাকার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে চলবে।"[৪]

(১১). সকল বিদ'আতই খারাপ, মানুষ যতই তাকে ভালো মনে করুক

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলতেন :

"সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্ঠতা, যদিও মানুষ তাকে 'হাসানা' বা ভালো মনে করে।"[৫]

(১২). বিদ'আতীর সাথে সম্পর্ক না- রাখা

তাবেয়ী নাফে' বলেন : এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) কাছে এসে বলে : অমুক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বলেন :

"আমি শুনেছি সে নাকি নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছে। যদি সে বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তাকে আমার সালাম জানাবে না।"[১]

(ঘ). সাহাবীগণের দৃষ্টিতে সুন্নাতে খুলাফা ও সুন্নাতে সাহাবা

প্রথমত, সাহাবীগণের দৃষ্টিতে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত

আমরা ইতোপূর্বে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সাহাবগণের সুন্নাত বা জীবন পদ্ধতি ও রীতি এবং বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি ও রীতির গুরুত্ব আলোচনা করেছি। সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা সুন্নাতকে বুঝা ও পালনের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মকাণ্ডকে মাপকাঠি হিসাবে সামনে রাখতেন। আমরা বিভিন্ন হাদীসে সাহাবীদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের গুরুত্ব দিতে দেখি। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) যখন উসমান ইবনু আফফান (রা.)-কে মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে প্রথম বাই'য়াত করেন তখন বলেন :

"আমি আল্লাহর সুন্নাত, তাঁর রাসূলের (ﷺ) সুন্নাত ও তাঁর পরে তাঁর দুই খলীফার সুন্নাতের উপরে আপনার হাতে বাই'য়াত করছি।"[২]

ওসমান (রা.) মদপানের শাস্তিতে বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে বলেন :

ﷺ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘা বেত মেরেছেন, আবু বকর ৪০ ঘা বেত মেরেছেন এবং উমর ৮০ ঘা বেত মেরেছেন। সবই সুন্নাত, তবে আমার কাছে এটিই (৪০ টি বেত্রঘাত করার উপর আমল করাই) বেশি প্রিয়।"[৩]

আবু মালিক আশআরী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন:

ﷺ

.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছে সালাত আদায় করেছি, তিনি (ফজর নামাযের শেষে নিয়মিত) কুনূত পড়েননি, আবু বকরের (রা.) পিছে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়েননি, উমরের (রা.) পিছে সালাত আদায় করেছে, তিনিও কুনূত পড়েননি, উসমানের (রা.) পিছে সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়তেন না, আলীর (রা.) পিছনেও সালাত আদায় করেছি, তিনিও কুনূত পড়তেন না। এরপর তিনি বলেন : বাবা, এই (ফজরের সালাতের শেষে নিয়মিত কুনূত পাঠ) একটি বিদ'আত।"[৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো কখনো জাতীয় বিপদাপদে ফজরের সালাতের শেষে কুনূত পড়েছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত, কিন্তু তিনি নিয়মিত পড়েননি, তাই এই সাহাবী নিয়মিত কুনূত পাঠকে বিদ'আত বলছেন। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মও তাঁদের নিকট সুন্নাত বলে বিবেচিত ছিল এবং তা বিদ'আত নির্ধারণের মাপকাঠি ছিল।

অন্য হাদীসে সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফালের (রা.) পুত্র বলেন :

...

ﷺ...

আমার পিতা আমাকে সালাতের মধ্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানিররাহীম' (সশব্দে) বলতে শোনেন। তিনি আমাকে বলেন : বেটা, (নামাযের মধ্যে জোরে বিসমিল্লাহ পাঠ) একটি নব উদ্ভাবিত (বিদ'আত) কর্ম, খবরদার! কখনো কোনো নব উদ্ভাবিত কর্ম করবে না।... আমি নবীয়ে আকরাম ﷺ -এর সাথে সালাত আদায় করেছি, আবু বকরের সাথে, উমরের সাথে ও উসমানের সাথে সালাত আদায় করেছি, তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ বলতে শুনিনি। অতএব, তুমিও তা বলবে না।"[৫]

দ্বিতীয়ত, সাহাবীগণের দৃষ্টিতে সাহাবীগণের সুন্নাত

(১). সাহাবীগণের মতামত ও ইজমা ইসলামের প্রামাণ্য দলিল

সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগে তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ সর্বদা সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণকে সুন্নাতে মুহাম্মাদী ও শরীয়তে মুহাম্মদীর পালন ও বুঝার ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে সামনে রাখতেন। ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন :

ﷺ

▪

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ক্বলব বা হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর হৃদয়কে সমস্ত সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয় হিসাবে পেয়েছেন। এজন্য তিনি তাঁকে নিজের জন্য বেঁছে নেন এবং তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি মুহাম্মাদ ﷺ -এর হৃদয়ের পরে অন্যান্য বান্দাদের হৃদয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের হৃদয়গুলিকে সর্বোত্তম হৃদয় হিসাবে পেছেয়েন। এজন্য তিনি তাঁদেরকে তাঁর নবীর সহচর ও পরামর্শদাতা বানিয়ে দেন, তাঁরা তাঁর দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করেন। অতএব, মুসলমানগণ (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহচর পরামর্শদাতা পবিত্র হৃদয় সাহাবীগণ) যা ভালো মনে করবেন তা আল্লাহর নিকটেও ভালো। আর তাঁরা যাকে খারাপ মনে করবেন তা আল্লাহর নিকেটেও খারাপ।"[১]

এখানে স্বভাবতই ইবনু মাসঊদ (রা) 'মুসলমানগণ' বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র হৃদয় সাহাবাগণের কথা বোঝাচ্ছেন, কারণ তিনি তাঁদের গুরুত্বের কথাই এখানে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁর কথায় আমরা বুঝতে পারছি যে, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো সুন্নাত নেই বা কুরআন-সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট বিধান নেই, সেখানে সাহাবাগণের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত বা ইজমা পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্য প্রামাণ্য দলিল ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণীয় হবে।

(২). নেক কর্মে তাঁরাই পরিপূর্ণ আদর্শ, তাঁদের পদ্ধতির ব্যতিক্রম বিভ্রান্তি

সকল নেককর্ম, ইবাদত, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণই মাপকাঠি এবং তাঁরাই পরিপূর্ণ আদর্শ। তাদের চেয়ে বেশি কিছু করার অধিকার কারো নেই। তাবেয়ী আবু আব্দুর রহমান আস সুলামী বলেন : আমর ইবনু উতবা আস সুলামী ও মি'যাদ তাদের কিছু সঙ্গী নিয়ে মসজিদে বসে যিক্র করত ; মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সবাই মিলে বসে বসে নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'সুবহানাল্লাহ' বলত, নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'আলহামদুল্লিাহ' পড়ত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.)-কে এ কথা জানানো হলে তিনি বললেন: তাঁরা যখন এভাবে যিক্রে বসে তখন আমাকে সংবাদ দেবে। তারা এসে যিক্রে বসলে ঐ ব্যক্তি এসে তাঁকে সংবাদ দেয়। তিনি তাদের কাছে যেয়ে বললেন :

ﷺ

"আমি ইবনু মাসঊদ বলছি: তোমরা কি যুলুম করে বিদ'আত চালু করলে? না তোমরা জ্ঞানে বিদ্যায় মুহাম্মাদের সাহাবাগণের উপরে উঠে গেলে?"

তাদের মধ্যে মিযাদ নামক লোকটি খুব বাকপটু ছিল। সে বলল : "আল্লাহর কসম, আমরা যুলুম করে বিদ'আত চালু করিনি বা জ্ঞানে বিদ্যায় মুহাম্মাদের (ﷺ) সাহাবাগণের উপরে উঠে যায়নি। (আমরা তো শুধু তাসবীহ তাহলীল করছি)। ইবনু মাসঊদ বলেন :

"তোমর যদি সাহাবীগণের অনুসরণ কর তাহলেই সফলতা পাবে, কারণ তাঁরা ইবাদত বন্দেগিতে তোমাদের চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন ও অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন। আর যদি তোমরা (তাদের পদ্ধতির অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতি চালু করে) তাদের পথ থেকে সামান্য ডানে বা বামে সরে যাও তাহলে তোমরা কঠিন গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হবে।"[২]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইবনু মাসঊদ (রা.) নেক কর্ম পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণকে পূর্ণতার মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করছেন এবং তাঁদের হুবহু অনুকরণ করাকেই নাজাতের একমাত্র ওসীলা হিসাবে বর্ণনা করছেন। যদি কেউ আবেগে আগ্রহে তাঁদের চেয়ে বেশি আমল করে বা নতুন কোনো পদ্ধতিতে নেক আমল করে তাহলে তা পথভ্রষ্ঠতার নামান্তর হবে বলে তিনি ঘোষণা করছেন। অনুরূপ আরেক ঘটনায় তিনি যিক্রকারীদেরকে বলেন :

ﷺ.

"তোমরা কি মুহাম্মাদের (ﷺ) সাহাবীগণের চেয়েও বেশি হেদায়েতপ্রাপ্ত ? নাকি তোমরা গোমরাহ ? বরং নিঃসন্দেহে তোমরা পথভ্রষ্ট, গোমরাহ, তোমরা পথভ্রষ্ট গোমরাহ।"[৩]

আমর ইবনু যুরারাহ বলেন: আমি একদিন কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে ওয়াজ করছিলাম। এমন সময় ইবনু মাসঊদ (রা.) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন :

ﷺ

"হে আমর, তুমি কি একটি পথভ্রষ্টতার বিদ'আত উদ্ভাবন করলে, না তুমি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের চেয়েও বেশি সুপথপ্রাপ্ত আল্লাহওয়ালা হয়ে গেলে? তাঁর এই কথা শুনে আমার শ্রোতারা সবাই একে একে চলে গেল, শেষে দেখলাম শুধু আমিই বসে আছি।"[৪]

(৩). বেলায়াতে তাঁদের হালতই সর্বোত্তম, ব্যতিক্রম প্রশংসনীয় নয়

আমির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর বলেন : আমি একবার আমার আব্বার কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় ছিলে? আমি বললাম : আমি কিছু অতুলনীয় ভালো মানুষ পেয়েছি, আল্লাহর যিক্‌র করে যাদের একেক জন কাপতে থাকে এবং আল্লাহর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আমার আব্বা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) বললেন : এদের সঙ্গে আর বসবে না। এ কথা বলার পরে তিনি অনুভব করলেন যে তার কথা আমার মনে ধরল না। তিনি তখন বললেন :

ﷺ

"আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি, আবু বকর ও উমরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি, তাদের কখনো এরূপ হাল হতো না। তুমি কি মনে কর যে, এরা আবু বকর ও উমরের চেয়েও বেশি মুত্তাক্বী- খোদাভীরু ?" তখন আমি বিষয়টি বুঝতে পারলাম এবং তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করলাম।[১]

(৬). সুন্নাতের গুরুত্ব সম্পর্কে পরবর্তী যুগের কতিপয় বুজুর্গের বাণী

পবরর্তী যুগের সকল আলেম, ইমাম, সূফী ও নেককার মানুষ সর্বদা সুন্নাতের অনুসরণকেই সকল কল্যাণের একমাত্র পথ বলে জেনেছেন। সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমকে তাঁরা বিদ'আত বলে ঘৃণা করেছেন। সকল প্রকার বিদ'আতকে বর্জন করতে বলেছেন। তাঁরা সর্বদা সমাজের খেলাফে-সুন্নাত কর্মসমূহ উচ্ছেদ করে অবিকল সুন্নাত মোতাবেক চলতে সকল মুসলিমকে আহ্বান করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের অগণিত বাণী ও নির্দেশনা রয়েছে, যা সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। কুরআন কারীম, হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের বাণীর পরে আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারি যে, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মার উলামায়ে কেরাম কী বলবেন। তবে বর্তমান যুগে অনেক সময় হাদীসের বাণী ও সাহাবীগণের মতামত জানার পরেও আমাদের তৃপ্তি আসে না, কিছু ক্ষুধা থেকে যায়। আমরা বড় বড় ইমাম, আলেম বা সূফীগণের কিছু কথা শুনতে চাই। এখানে আমি কয়েকজনের বাণী উল্লেখ করছি :

প্রথমত, কয়েকজন তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর বাণী

(১). প্রথম শতাব্দীর সংস্কারক মুজাদ্দিদ, পঞ্চম খালীফায়ে রাশেদ, উমর ইবনু আব্দুল আযীয রহিমাহুল্লাহ (১০১ হি.) বলেন :

.

"আল্লাহর কসম, যদি মেরে ফেলা সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং যে সকল বিদ'আত চালু করা হয়েছে তা মেরে ফেলার দায়িত্ব ও কর্ম না থাকত, তাহলে আমি তোমাদের মাঝে একমুহূর্ত বেঁচে থাকতে ঘৃণা করতাম।"[২]

(২). এক ব্যক্তি উমর ইবনু আব্দুল আযীযের (রাহ.) নিকট 'তকদীর' সম্পর্কে প্রশ্ন করে চিঠি লিখে। তিনি উত্তরে লিখেন :

"আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আর তাঁর নবীর ﷺ সুন্নাত অনুসরণ করে চলবে। তাঁর সুন্নাত প্রচলিত হওয়ার পরে মানুষেরা যেসকল নতুন কথা বা কাজ উদ্ভাবন করেছে তা পরিহার করে চলবে। এ সকল কথা বা কাজের উদ্ভাবনের কোনো প্রয়োজন তাদের ছিল না। তাই তুমি সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে। ইন্‌শা আল্লাহ, সুন্নাতই তোমার রক্ষাকবজ হবে।"[৩]

(৩). প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ (১০৯ হি.) বলেছেন:

"আল্লাহ তা'লা কোনো বিদ'আতকারীর নামায, রোযা, হজ্ব, উমরা কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে বিদ'আত পরিত্যাগ না করে।"[৪]

(৪). প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবনু সিরীন রাহিমহুল্লাহ (১১৫ হি.) বলেন :

"কেউ একবার একটি বিদ'আতে লিপ্ত হলে সে আর কখনো সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে পারে না।"[৫]

(৫). প্রসিদ্ধ তাবে-তাবেয়ী সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.) বলেন:

"কাজ ছাড়া কথার মূল্য নেই। বিশুদ্ধ নিয়্যাত ছাড়া কথা ও কাজের কোনো মূল্য নেই। আর সুন্নাতের অনুসরণে না হলে কথা, কাজ ও নিয়্যাত কিছুরই মূল্য নেই।"

তিনি আরো বলেন :

"ইবলিসের কাছে গোনাহ ও পাপাচারের চেয়ে বিদ'আত বেশি প্রিয়। কারণ, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির তাওবা করার সম্ভাবনা থাকে না।"[১]

অর্থাৎ, সাধারণ সুপরিচিত গোনাহ যেমন মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়, বিদ'আতও তেমনি মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়। তবে ইবলিসের কাছে বিদ'আতের গুরুত্ব বেশি, কারণ সাধারণ গোনাহে লিপ্ত মানুষ জানেন যে, তিনি অন্যায় করছেন। তার মনে পাপবোধ থাকে। হয়ত তিনি এক সময় তাওবা করবেন। কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তি কখনই মনে করেন না যে, তিনি অন্যায় করছেন। বরং তিনি তার বিদ'আতকে ভালো কাজ ও সাওয়াবের কাজ মনে করেই করেন। কাজেই তিনি কখনোই তাওবা করার কথা চিন্তা করেন না। এ জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার অন্যায়ে লিপ্ত থাকবেন বলেই আশা করা যায়। পাপীর ক্ষেত্রে শয়তান যেমন সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে যে, কখন সে তাওবা করে ফেলল, বিদ'আতীর ক্ষেত্রে সেধরনের দুশ্চিন্তা তার থাকে না। তাই বিদ'আত তার কাছে অন্যান্য পাপের চেয়ে প্রিয়। এই অর্থে আরো অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী অনেক কথা বলেছেন।

(৬). তাবে-তাবেয়ী হাস্সান ইবনু আতিয়্যা (২১২ হি.) বলেছেন :

"যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করে তখনই আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে অনুরূপ সুন্নাত তুলে নেন, পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে সে সুন্নাত ফিরিয়ে দেন না।"[২]

দ্বিতীয়ত, ৩য় হিজরী শতকের কয়েকজন সূফী ও বুজুর্গের বাণী

সাহাবীগণের পরে মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে বেশি সম্মান প্রদর্শন করে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের প্রতি; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এই তিন যুগের প্রশংসা করেছেন। এই তিন মুবারক যুগের পরে আমাদের সমাজের মুসলিমগণ সাধারণত পবিত্রহৃদয় সূফী বুজুর্গগণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সুন্নাত অনুসরণে তাঁদের দৃঢ়তা ও সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রম বা বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁদের বাণী দেখলে ও তাঁদের বিশুদ্ধ জীবনী প্রাচীন গ্রন্থসমূহে পাঠ করলে অবাক হতে হয় যে, কিভাবে এসকল সুন্নাত প্রেমিক মানুষের নামে পরবর্তী যুগে শত শত খেলাফে সুন্নাত বা বিদ'আত কাজ করা হচ্ছে। আমরা তাসাউফের গুরুত্ব বুঝাতে এদের কথা বালি। এরপর তাসাউফের নামে এদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে থাকি।

প্রথম যুগের সূফীগণ সুন্নাতের বাইরে বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল ইবাদত, রিয়াযাত, যিক্র, ওযীফা ইত্যাদিকে নফসের অনুসরণ বলে মনে করতেন। তাঁদের দৃষ্টিতে শুধু সুন্নাতের অনুসরণেই আল্লাহ পাওয়া যায়। সুন্নাতের অনুসরণই একমাত্র তরীকত, তাতেই মানুষ শরীয়ত পালন করতে পারে, শরীয়তের হাকীকত জানতে পারে এবং সত্যিকারের মা'রিফাত অর্জন করে।

(১). এ শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও সূফী বিশর আল-হাফী (২২৭ হি.) বলেন : "কেবলমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ ও সাহাবী এবং আহলে বাইতের মহব্বতের কারণেই আল্লাহ আমার মর্যাদা প্রদান করেছেন।"[৩]

(২). এ শতকের অন্যতম সূফী আলেম ও তাসাউফের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতা হারেস মুহাসেবী (২৪৩ হি.) বলেন : "সূফী ঐ ব্যক্তি যে এখলাস ও সার্বক্ষণিক আল্লাহর দিকে লক্ষ্য রাখার মাধমে তার ভিতরকে বিশুদ্ধ করেছে এবং মুজাহাদা ও সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর বাহিরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।"[৪]

(৩). যুন্নুন মিসরী (২৪৫ হি.) বলেন : "আল্লাহ প্রেমিকের আলামত হলো যে, সে সকল কর্মে, সুন্নাতে, নির্দেশে, চলনে, বলনে ও চরিত্রে আল্লাহর হাবীবের (ﷺ) অনুসরণ করবে।"[৫]

(৪). সাহল তাসতুরী (২৮৩ হি.) বলেন : "সুন্নাতের অনুসরণের বাইরে বান্দা যত নেক আমলই করুক আর গোনাহই করুক সবই নফসের আনন্দ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর সুন্নাত অনুসরণে যা কিছুই বান্দা করুক তাতেই নফস দমন ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ।"[৬]

(৫). ৩য় হিজরী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী, সূফীগণের সরদার, কাদেরীয়া, নকশাবন্দীয়া ও অন্যান্য অধিকাংশ তরীকার মূল পূরুষ জুনাইদ বাগদাদী (২৯৮ হি.) সর্বদা বলতেন :

ﷺ

"আল্লাহ পাওয়ার বা আল্লাহর কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ হলো মুসতাফা (ﷺ) -এর অনুসরণ করা"[৭] তিনি আরো বলেন :

ﷺ.

"শুধুমাত্র যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুবহু অনুসরণ করবে সে ব্যক্তি ছাড়া বাকি সকল সৃষ্টির জন্য সকল তরীকত বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ বন্ধ।"[১]

তিনি বলেন : "আমাদের এই তাসাউফের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে ব্যক্তি কুরআন হিফজ করেনি, হাদীস শিক্ষা করেনি এবং ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেনি তাকে অনুসরণ করা যাবে না।"

তিনি আরো বলতেন : "আমাদের তাসাউফ হাদীসে রাসূলের (ﷺ) সাথে গ্রথিত।... আমরা অনিয়ন্ত্রিত কথাবার্তার মাধ্যমে তাসাউফ অর্জন করিনি। বরং ক্ষুধা (বেশি বেশি রোযা পালন, অতি অল্প আহার করা), দুনিয়া ত্যগ, ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আমরা তা অর্জন করেছি।"[২]

তৃতীয়ত, সুন্নাতের পরিচিতি ও গুরুত্ব : উপসংহার

প্রথম, সুন্নাতে নববীর পরিচিতি ও সীমারেখা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয হিসাবে করেছেন তা ফরয হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা নফল হিসাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি কখনো করেননি, অর্থাৎ সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত।

যে কাজ তিনি করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দিয়েছেন তা পালনের ক্ষেত্রে তাঁর পালনপদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ তিনি করতে নিরুৎসাহিত করেছেন বা বর্জন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা তাঁর কর্মপদ্ধতির আলোকে বর্জন করাই সুন্নাত।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্তসাপেক্ষ বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে ঐসব শর্তসাপেক্ষ বা নির্দেশনা সাপেক্ষ পালন করাই সুন্নাত। যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তাকে কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ ব্যতিরেকে উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত।

কোন কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি বা কম হলে বা সুন্নাতের বাইরে গেলে তা 'খেলাফে সুন্নাত' হবে। অর্থাৎ, যা তিনি ফরয হিসাবে করেছেন তা নফল মনে করে পালন করা, যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা, যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা মাঝেমধ্যে করা, যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করা, যা তিনি কখনই করেননি তা কখনো করা, যা তিনি শর্তসাপেক্ষ বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে শর্তহীন উন্মুক্তভাবে পালন করা, যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তা পালনের জন্য কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ করা বা যা তিনি বর্জন করেছেন তা পালন করা সবই খেলাফে সুন্নাত। 'খেলাফে সুন্নাত' সুন্নাতের নির্দেশনার আলোকে মুবাহ, জায়েয, হারাম, মাকরুহ বা বিদ'আত হতে পারে।

দ্বিতীয়, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের সুন্নাত

(১). সাহাবীগণের অনুসরণ : ইমামগণের মতভেদ

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে মক্কা বিজয়ের আগের ও পরের সকল সাহাবীর জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।[৩] তিনি পরবর্তী পরবর্তী উম্মতদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবীকে নির্ভেজাল হৃদয়ে ভালবাসে এবং তাঁদের জন্য দোয়া করে।[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে তাঁদেরকে নিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা সবাই উম্মতের সম্মান ও ভালবাসার পাত্র।[৫] মুসলিম মুসলিম উম্মাহর সকল অনুসরণীয় ইমাম ও আলেম, তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল ইমাম একমত যে, সকল সাহাবীকে ভালবাসতে হবে, কাউকে সামান্যতম ঘৃণা করা বা কারো নিন্দা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাঁদেরকে ভালবাসা ও সম্মান করা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মানের অংশ। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম আকীদা গ্রন্থ 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (১৫০হি.) লিখেছেন :

) ﷺ (

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কোনো কথা বলি না।"[৬]

পরবর্তী সকল ইমাম ও আলেম একই কথা বলেছেন যে, কোনো সাহাবীকে মন্দ বলা, সামন্যতম খারাপ ভাবা বা সমালোচনা করা

কুরআন ও সুন্নাহ অমান্য করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে ঘৃণা করার সমতুল্য।[১]

তবে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সহাবীগণের কথা বা কর্ম শরীয়তের দলিল বা অনুকরণীয় আদর্শ কি-না সে বিষয়ে ফকীহ ও ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সকলেই একমত যে, যেক্ষেত্রে কুরআন বা সুন্নাহতে নির্দেশনা রয়েছে, বা যেখানে স্পষ্ট সুন্নাতে নববী রয়েছে, সেখানে আর সাহাবীগণের সুন্নাত বা তাঁদের মতামত ও কর্ম বিবেচ্য নয়। কিন্তু যেখানে সুন্নাতে নববীর কোনো নির্দেশনা নেই সেখানে তাঁদেরকে অনুসরণ করা যাবে কি-না তা নিয়ে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (২০৪ হি.) ও অন্যান্য কোনো কোনো ইমাম ও ফকীহ সাহাবীগণের কোনো কর্ম বা মতামতকে শরীয়তের দলিল হিসাবে গ্রহণ করতে ঘোর আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে শুধুমাত্র কুরআন কারীম ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ শরীয়তের দলিল। যেক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো বিধান নেই সেক্ষেত্রে এজমা বা প্রয়োজনে কিয়াস শরীয়তের দলিল হিসাবে বিবেচ্য হবে। সাহাবীগণের এজমা সর্বোত্তম এজমা হিসাবে গণ্য হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো এক বা একাধিক সাহাবীর কর্ম বা মতামত কোনো অবস্থাতেই অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হবে না। অনেক সাহাবীর মত তো আমরা গ্রহণ করি না। যেমন, কোনো কোনো সাহাবী রোযা অবস্থা বৃষ্টির সাথে পড়া বরফ বা 'শিল' খাওয়া জায়েয বলেছেন। কেউ নগদ লেনদেনে কম-বেশির সুদ জায়েয বলেছেন। কেউ বা অস্থায়ী বিবাহ জায়েয বলেছেন। কাজেই, তাদের কর্ম সুন্নাত হবে কী-ভাবে?

যারা সাহাবীগণের কথা বা কর্মকে অনুকরণীয় আদর্শ মনে করেন ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) কঠোর ভাষায় তাঁদের সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন। তাঁর ও অন্যান্য শাফেয়ী আলেমের দাবি হলো যে, সাহাবীগণ অন্যান্য মানুষের মতোই, তাঁদের ভুল হতে পারে, অজ্ঞতা থাকতে পারে। কাজেই, তাঁদেরকে অনুসরণীয় বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। তাঁদের মতে যেখানে সুন্নাতে-নববী নেই সেখানে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হি.), ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি.), তাঁদের অনুসারীগণ ও অন্যান্য অনেক আলেমের মতে যে ক্ষেত্রে সুন্নাতে-নববীর কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে সাহাবীগণ যদি ঐকমত্য পোষণ করেন, অথবা কোনো কোনো সাহাবী কোনো মত গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সাহাবী সে মতের কোনো প্রতিবাদ না করেন তাহলে সাহাবীর মতামত বা কর্ম অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা বলেন যে, সাহাবীগণ ভুলের উর্ধে না হলেও কুরআন ও হাদীসে বারবার তাঁদের পরিপূর্ণ মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এই অনুসরণ শুধু সুন্নাতে নববীর অনুসরণের ক্ষেত্রেই নয়, সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও। তাঁরা বলেন, যে ক্ষেত্রে সুন্নাতে-নববীর কোনো নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে সাহাবীর মত বা কর্ম হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো হাদীসের আলোকে হবে অথবা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত হবে। যদি তাঁর ব্যক্তিগত মতামতও হয় তাহলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্য, আরবি ভাষার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কুরআন-হাদীসের পটভূমি সার্বিকভাবে জানা থাকার ফলে তাঁর মতামত বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা পরবর্তী ইমামগণের মতামতের বিশুদ্ধতার সম্ভাবনা থেকে অনেক বেশি। কাজেই তাঁদের অনুসরণ করাই কর্তব্য।[২]

কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা ও যুক্তির আলোকে আমরা এ মতকেই সঠিক বলে মনে করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবগণের সুন্নাত ও বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত সুন্নাতে-নববীর অংশ ও ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য। আমরা এ গ্রন্থে সুন্নাতে নববীর অংশ হিসাবেই তাঁদের সুন্নাত আলোচনা করব।

(২). খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত : পরিচিতি ও পরিধি

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত বা রীতি প্রচলনের অধিকার প্রদান করেছেন। তাঁরা কি ইচ্ছামতো কোনো রীতি প্রচলন করতেন? কখনই নয়। আসলে তাঁরা কখনই তাঁর সুন্নাতের বাইরে চলেননি। আবু বকর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরে প্রথম ভাষণ প্রদান কালে বলেন : "আমাকে আপনারা রাষ্ট্রের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। তবে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাত প্রচলিত করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা তা শিখে নিয়েছি।... আপনারা জেনে রাখুন ( ) আমি শুধুমাত্র (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর) অনুসরণ করব, কোনো নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আত রীতি প্রচলন করব না। আমি যদি ভালো করি তাহলে আমাকে সহযোগিতা করবেন। আর যদি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমাকে সোজা করবেন।"[৩]

এভাবে দেখছি যে, তাঁরা ছিলেন সুন্নাতের অনুসরণে আপোষহীন। তাহলে তাঁদের সুন্নাত অনুসরণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃথকভাবে নির্দেশ দিলেন কেন? উলামায়ে কেরাম এর কারণকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত, তাঁরা ছিলেন সুন্নাত বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কাজ কেন করেছেন বা কেন বর্জন করেছেন তা তাঁরাই সবচেয়ে ভালো জানতেন। যেহেতু তাঁরা আজীবন তাঁর সাথে ছিলেন, ইসলামের দাওয়াতের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত সদা সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকেছেন, একান্ত কাছে থেকে তাঁর সকল আদেশ নিষেধ জেনেছেন, তাঁরই নূরে তাঁরা আলোকিত হয়েছেন, তাই তিনি যে কাজ বর্জন করেছেন তা প্রয়োজনে করার সুযোগ আছে কি-না, অথবা তিনি যা করেছেন তা প্রয়োজনে বর্জন করা যাবে কি-না তা তাঁরা সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের বিবেচনাই ছিল সর্বোত্তম। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ করে তাঁদের সুন্নাত অনুসরণের কথা বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম উম্মাহর আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সকল পথ, পদ্ধতি ও রীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়ে গিয়েছেন। তবে স্বভাবতই যুগে যুগে জাগতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেবে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

যুগে ছিল না। এ সকল সমস্যার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষার আলোকে কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে তা আমরা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত বা পদ্ধতি থেকে জানতে পারি। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজের শান্তি নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধান, নতুন নতুন অপরাধ প্রবণতা ও অপরাধ পদ্ধতি দমন করে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন, ইবাদত বন্দেগি পালনের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হলে তা অপসারিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অনুসারে ইবাদত বন্দেগি পালন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাতই উম্মতের আদর্শ।

(ক). সুন্নাতু আবী বকরঃ ধর্মদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ, কুরআন সংকলন

আবু বকরের (রা.) সময়ে কিছু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করে। এটি একটি নতুন সমস্যা। তিনি সুন্নাতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমাদের জন্য এটি সুন্নাত বা ইসলামের নির্দেশ। এভাবে কোনো সমাজে কেউ যাকাত বা অনুরূপ কোনো অত্যাবশ্যকীয় বিধান অস্বীকার করলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

তাঁর সময়ে অসংখ্য হাফেজ সাহাবী শহীদ হতে থাকেন। এতে কুরআনের কোনো অংশ ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এটি একটি নতুন সমস্যা। তিনি কুরআনকে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেখে যাওয়া অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য তাঁর রেখে যাওয়া লিখিত পৃষ্ঠা ও সূরাগুলিকে একত্রিত করে বাইন্ডিং করতে নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসকে অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণের জন্য তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাক্ষী গ্রহণের নিয়ম প্রচলন করে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ির রীতি প্রচলন করেন। এগুলি আমাদের জন্য সুন্নাত বা শরীয়তের অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

(খ). রাষ্ট্র পরিচালনায় উমর (রা.)-এর বিভিন্ন সুন্নাত

এভাবে উমরের সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র আকারে আয়তনে বিস্তৃতি লাভ করে। মুসলিম রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি অনেক নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি হিজরী সাল গণনার পদ্ধতি চালু করেন, বিভিন্ন শহরের নিয়মিত কাজী ও বিচারক নিয়োগ করেন। প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দফতর সৃষ্টি করেন। ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। অপরাধ দমনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা নিয়মিত রাত্রের নফল নামায আদায় করতেন এবং বিশেষভাবে রমযান মাসে তা আদায়ে উৎসাহ দিয়েছেন। কয়েকদিন জামাতেও আদায় করেছেন। কিন্তু ফরয হওয়ার ভয়ে তা জামাতে আদায় নিয়মিত করেননি। সুন্নাতের শিক্ষার আলোকে উমর (রা) তা নিয়মিত জামাতে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এগুলি সবই আমাদের জন্য সুন্নাত ও শরীয়ত হিসাবে গণ্য হবে।

(গ). উসমান ও আলীর (রা) সুন্নাতঃ কুরআন প্রচার, স্বরচিহ্ন, আরবি ব্যাকরণ

উসমান (রা) আবু বকরের (রা) সংকলিত কুরআনের কপি করে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত করেন, যেন কুরআন সকলে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত মতো তিলাওয়াত করতে পারে, কোনো ভুল না হয়। আলী (রা) এ উদ্দেশ্যে কুরআন কারীমে স্বরচিহ্ন প্রদানের রীতি প্রচলন করেন এবং আরবি ভাষার নিয়মাবলী লেখার ও শেখানোর ব্যবস্থা করেন, যেন মুসলমানগণ অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতিতে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন। এগুলি সবই তাঁদের সুন্নাত এবং উম্মতকে এ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত অনুযায়ী চলতে হবে। নতুন নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাতের আলোকে ইজতিহাদ করতে হবে।[1]

(ঘ). জুমআর নামাযের প্রথম আযান

আমরা দেখেছি যে, সাহাবায়ে কেরাম খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের কোনো রীতি বাহ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতির সামান্য ব্যতিক্রম হলে তাঁরা তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন। খুলাফায়ে রাশেদীন কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতির বাইরে চলেননি। ইবাদত বন্দেগি, রীতিনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা চুলচেরাভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ করেছেন। তবে তাঁরই সুন্নাতের আলোকে তাঁরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইবাদত বন্দেগির উপকরণ বা মাধ্যমের ক্ষেত্রে সামান্য দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছেন। তার একটি ঘটনা হলো জুম'আর নামাযের আযান।

সায়েব ইবনু ইয়াযিদ (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর (রা.) ও উমরের (রা.) যুগে জুমআর দিনের আযান ছিল একটিই। যখন ইমাম মিম্বারের উপর বসতেন তখন মুয়াজ্জিন আজান দিতেন। (একটি দুর্বল সনদের বর্ণনায় বলা হয়েছে: যখন ইমাম মিম্বারের উপর বসতেন তখন তাঁর সামনে মসজিদের দরজার উপর আযান দেওয়া হতো।) উসমান (রা.) -এর যুগে যখন মদীনার লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেল তখন তিনি প্রথমে অতিরিক্ত আরেকটি আযানের ব্যবস্থা করলেন। এই আযানটি মদীনার যাওরা নামক বাজারে প্রদান করা হতো। পরবর্তী যুগে এভাবেই জুমআর আযন উসমান (রা)-এর নিয়মেই চালু থাকল। ইবনু মাজাহর বর্ণনায় বলা হয়েছে : উসমান (রা) যে আযানটি চালু করেন তা মদীনার যাওরা বাজারের একটি ঘরের ছাদের উপর থেকে প্রদান

করা হতো।[1]

এভাবে আমরা দেখছি যে, উসমান (রা) একটি আযান বৃদ্ধি করলেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না। কেন? কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজীবন সাহচর্য ও তাঁর সুন্নাতকে নিকট থেকে জেনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আযান হচ্ছে নামাযের আহ্বানের মাধ্যম ও উপকরণ। জুম'আর খুতবা শোনা সকল মুসলানের জন্য জরুরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মদীনা শহর ছিল খুবই ছোট। মসজিদের আশেপাশেই সবার কুটির। ওয়াক্তের আগেই সবাই মসজিদে চলে আসতেন। যারা না আসতেন তাঁরা আযানের সাথে সাথে এসে পুরো খুতবা শুনতে পেতেন। কিন্তু তাঁর যুগে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের মতো একটি আযান দিলে অনেক মুসলমান খুতবা শোনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন। তিনি জুম'আর দিনের উদ্ভুত নতুন পরিস্থিতিতে খুতবা শোনার 'সুন্নাত' পরিপূর্ণ আদায় করার সুযোগ প্রদানের জন্য তাঁর মসজিদে প্রবেশের পূর্বে আরেকটি আযান বাজারের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

সুন্নাতের ব্যাখ্যার এই অধিকার শুধুমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনেরই ছিল। তাঁর কর্মের আলোকে অন্য কেউ কোনো নামাযে আরেকটি আযান বাড়ালে কোনো মুসলমান তা মানবেন না। কিন্তু উসমানের (রা) সিদ্ধান্ত তাঁর যুগে বিদ্যমান সাহাবায়ে কেরামসহ সকলেই মেনে নেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী এবং কোনো কোনো তাবেয়ী এই প্রথম আযানের বিষয়ে কিছুটা আপত্তি মনে রাখতেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় মনে হতো। খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত উত্তম হলেও তাঁরা তা মানতে দ্বিধা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) বলতেন : এই অতিরিক্ত আযান বিদ'আত এবং সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তি, মানুষ যতই তাকে ভালো বলে মনে করুক।[2]

নিঃসন্দেহে এটি ইবনু উমরের (রা) ব্যক্তিগত মত। তিনি সাহাবী হিসাবে অন্য সাহাবীর কাজের সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু আমরা পরবর্তী যুগের মানুষেরা খুলাফায়ে রাশেদীনের কোনো কাজকে বিদ'আত বলতে পারি না, কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাজকে সুন্নাত বলেছেন এবং অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয়, সুন্নাতে সাহাবা : পরিচিতি ও পরিধি

খুলাফায়ে রাশেদীন ছাড়াও সামগ্রিকভাবে সাহাবীগণের সুন্নাত আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ, যা আমি ইতঃপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতে বলেছেন, বা করলে কোনো ফযীলত আছে বলে জানিয়েছেন, কিন্তু নিজে করেননি, সে ক্ষেত্রে তাঁর বর্জনের কারণ জানতে হবে এবং সাহাবীদের কর্মপদ্ধতির আলোকে তা পালন করাই সুন্নাত। যে কাজ তিনি করতে নিষেধ করেছেন বা বর্জন করতে বলেছেন, অথচ নিজে তা করেছেন বা নিজের জন্য তা করা উচিত বলেছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর কর্মের কারণ জানতে হবে, কর্মটি বিশেষভাবে তাঁর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল কিনা তা জানতে হবে এবং সাহাবীদের কর্মপদ্ধতির আলোকে তা বর্জন করাই সুন্নাত বলে গণ্য হবে।

সাহাবীগণের মতামত, কর্ম বা অনুমোদনও সুন্নত বলে বিবেচিত। সুন্নাত বোঝার ও সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শ। এ ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন কারীম, সুন্নাতে নববী ও উম্মতের সকল অনুসরণীয় ইমাম ও আলেমের মত অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামগণ সামষ্টিকভাবে সুন্নাত পালনের আদর্শ। তবে তাঁদের কেউ কেউ হয়ত কোনো কোনো সুন্নাত জানতেন না। সময় ও স্থানের দূরত্বের কারণে অনেকে সবসময় তাঁর কাছে অবস্থান করতে পারেননি। এমনি তাঁর ঘনিষ্ঠতম সাহাবীদের মধ্য থেকে অনেকে অনেক সুন্নাত জানতে পারেননি। পরে অন্যদের নিকট থেকে জেনেছেন বা জানেননি। কোনো বিষয়ে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো সুন্নাত থাকে তাহলে সেখানে আর সাহাবীদের সুন্নাতের প্রয়োজন হয় না, গৃহীত হয় না। কারণ তাঁর সুন্নাতের মোকাবিলায় কারো মতামতই থাকে না। যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতে স্পষ্ট নির্দেশনা নেই, অথবা সুন্নাত বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়েছে সে ক্ষেত্রে সাহাবাগণের সুন্নাত বা রীতি পদ্ধতি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বুঝতে সাহায্য করবে। কোনো বিষয়ে একাধিক প্রকারের সুন্নাত বর্ণিত হলে তন্মধ্যে কোনো সুন্নাত মানসূখ হয়েছে কিনা এ বিষয়ে জানতে সাহায্য করবে সুন্নাতে সাহাবা।[3]

(১). সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যায় সুন্নাতে সাহাবা

(ক). দাড়ির পরিমাপ নির্ধারণ

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি বড় করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন, ছেড়ে দিতে বলেছেন এবং কাটতে নিষেধ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনোরূপ সীমারেখা নির্ধারণ করেননি। তাঁর থেকে এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁর ও তাঁর সকল সাহাবীর দাড়ি বড় ছিল। তাঁর এই নির্দেশ ও কর্মের সুন্নাত থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, দাড়ি বড় রাখতে হবে। দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, যত বড়ই হোক তা কাটা যাবে না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) ও অন্যান্য দুই একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের দাড়ি মুষ্টি করে ধরে মুষ্টির বাইরে কেটে ফেলতেন। অনেক ইমাম ও আলেম এই কর্মকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য ইমাম ও আলেম তাঁদের এই কাজকে ব্যক্তিগত ইজতিহাদ মনে করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাধারণ নির্দেশকে উন্মুক্ত রেখেছেন। তাঁদের মতে দাড়ি যত বড়ই হোক তা কখনোই ছাটা যাবে না।

(খ). রাত্রের নামাযের রাক'আত ও কিরা'আত

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণভাবে রাত্রে বেশি বেশি নফল নামায পড়তে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অপরদিকে রাত্রে কিছু সময় ঘুমাতে ও

কিছু সময় নামায আদায় করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন : দুই রাক'আত করে রাতের নামায আদায় করতে থাকবে, যখন ভোর হওয়ার ভয় পাবে তখন এক রাক'আত বিতির আদায় করে নেবে। কত রাক'আত নামায পড়তে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা প্রদান করেননি। তবে তিনি নিজে নিয়মিত বিতির সহ ১১ বা ১৩ রাকা'আত তাহাজ্জুদের নামায সুদীর্ঘ কিরা'আত সহ আদায় করতেন। এখন তাঁর নির্দেশনা ও কর্মের সুন্নাত থেকে দুই প্রকার অর্থ হতে পারে :

প্রথম অর্থ, তাঁর সাধারণ নির্দেশের ও ফযীলতের হাদীসের ব্যাখ্যা হলো তাঁর কর্ম, কাজেই রাতের নফল নামায বা তাহাজ্জুদ নামায তাঁর পদ্ধতিতে ৮ বা ১০ রাক'আতের কম বা বেশি পড়া যাবে না। এই পরিমাণ নামাযই দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘ কিরা'আত ও দীর্ঘ রুকু সাজাদার মাধ্যমে পড়তে হবে। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কারণে কম করলে খেলাফে সুন্নাত হবে, তবে নফল ত্যাগের জন্য কোনো গোনাহ হবে না। বেশি সাওয়াব বা বেশি তাকওয়ার জন্য বেশি-কম করলে তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা হবে।

দ্বিতীয় অর্থ, তাঁর সাধারণ নির্দেশের আলোকে ইচ্ছামতো কম বা বেশি রাক'আত নফল নামায রাত্রে আদায় করা যাবে। তবে রাত্রের কিছু অংশ অবশ্যই ঘুমিয়ে নিতে হবে। বাকি অংশে সাধ ও সাধ্যমতো নামায আদায় করা যাবে। তবে অবিকল তাঁর পদ্ধতিতে সুদীর্ঘ কিরা'আত ও রুকু-সাজদা সহ ১১ বা ১৩ রাক'আত আদায় করলে তা নিঃসন্দেহে উত্তম হবে।

সাহাবীদের থেকে কোনো ব্যাখ্যা না থাকলে প্রথম অর্থই গ্রহণ করতে হতো, কারণ প্রথম অর্থটিই সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের উপযোগী। তবে সাহাবীগণের কর্ম থেকে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা রাত্রের প্রথমভাগে বা শেষভাগে কম বা বেশি রাকা'আত নামায আদায় করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারছি যে, এ বিষয়ের সুন্নাতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই গহণযোগ্য।

(গ). পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তেকালের আগে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান বা খলীফা হিসাবে কাউকে নিয়োগ প্রদান করেননি। মুসলিম জনগণের নির্বাচন ও মতামতের উপর বিষয়টি ন্যস্ত থাকে। এতে সাধারণত বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুর সময় বা প্রয়োজনে অবসরের সময় কাউকে নিয়োগ না দেওয়াই সুন্নাত। কিন্তু আবু বকর (রা) ওফাতের পূর্বে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে উমরকে (রা) নিয়োগ দিয়ে যান। উমর (রা) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ৬ সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করে দেন, যে কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে জনগণ মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের এই কর্মকে আমরা সুন্নাতে নববীর ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। আমরা বুঝতে পারি প্রয়োজন হলে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ দেওয়াও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রয়োজন মনে করেননি বলেই নিয়োগ দেননি। যদি খলীফাগণও কাউকে নিয়োগ না দিতেন তাহলে আমরা সুন্নাতে নববীর স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করতাম এবং কোনোরূপ নিয়োগপ্রদানকে খেলাফে সুন্নাত মনে করতাম।

(ঘ). সুন্নাত নামায ঘরে বা মসজিদে আদায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে ও পরে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায সর্বদা ঘরে আদায় করতেন। তিনি আগের সুন্নাত আদায় করে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করতেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করলে বেলাল (রা) নামাযের ইকামত দিতে শুরু করতেন। অথবা তাঁর অনুমতিক্রমে বেলাল ইকামত দিতে শুরু করলে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। কখনো ইকামতের কিছু পরে মসজিদে প্রবেশ করতেন। সর্বাবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করে সমবেত মুসল্লীগণকে কাতার সোজা করতে ও কাতারের মাঝের ফাঁক পূরণ করতে নির্দেশ দিতেন। এরপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করতেন। ফরয নামায আদায়ের পরে তিনি কখনো প্রয়োজনে উঠে আলোচনা ও ওয়াজ করতেন। সাধারণত সামান্য সময় বসে থাকার পরে উঠে ঘরে যেয়ে ফরয-পরবর্তী সুন্নাত আদায় করতেন।

ফরয নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে (তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ) দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন। যেমন, সফর থেকে ফেরার সময় মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত ছিল দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করে এরপর নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতেন। এছাড়া ফরয ব্যতিরেকে সকল সুন্নাত ও নফল নামায তিনি সাধারণত ঘরে আদায় করতেন। তিনি সাহাবীগণকে ফরয ছাড়া অন্য সকল নামায ঘরে আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুন্নাত-নফল নামায ঘরে আদায় করলে সাওয়াব বেশি হবে ও বাড়িতে আল্লাহ বরকত দান করবেন বলে জানিয়েছেন।

তাঁর এ কর্ম ও নির্দেশনার আলোকে আমরা মনে করতে পারি যে, যেহেতু তিনি সর্বদা 'সুন্নাত' নামায মসজিদে আদায় বর্জন করেছেন সেহেতু সুন্নাত নামায মসজিদে আদায় 'খেলাফে সুন্নাত' হবে। কিন্তু সাহাবীগণের সুন্নাতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাত নামায মসজিদে আদায়ও জায়েয। কারণ তাঁরা কখনো কখনো মসজিদে সুন্নাত আদায় করতেন। সাহাবীগণের সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, ঘরে সুন্নাত নামায আদায় করাই উত্তম ও বেশি সাওয়াবের। তবে মসজিদে আদায় করলে তা খেলাফে সুন্নাত বা মাকরুহ হবে না। এ জন্য ইমাম আবু হানীফা ও অন্যন্য সকল ইমাম সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফল নামায ঘরে আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন, তবে মসজিদে আদায় করতে নিষেধ করেননি।

(২). সুন্নাতে নববীর বিপরীতে কোনো সাহাবীর ব্যক্তিগত কর্ম

যে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও বিধি নিষেধ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ২/১ জন সাহাবীর ব্যক্তিগত কর্ম সুন্নাতের মোকাবিলায় গ্রহণ করা হবে না। এ বিষয়ে অগণিত উদাহরণ রয়েছে। এখানে দু'একটি উল্লেখ করছি :

(ক) মোজার উপর মোসেহ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযুর সময় কখনো কখনো খুফফাইন বা চামড়ার মোজার উপর মোসেহ করেছেন। এছাড়া তিনি কখনো মোজাবিহীন খালি পা মোসেহ করেননি। ওযু অবস্থায় মোজা পরা না থাকলে তিনি সর্বদা মুখমণ্ডল, দুই হাতের সাথে দুই পা ধৌত করতেন। কোনো কোনো সাহাবী চামড়ার মোজা পরিহিত অবস্থায় মোজার উপর মোসেহ করাকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁদের মতে মোজা খুলে পদযুগল পুরোপুরি ধৌত করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই মোজার উপর মোসেহ জায়েয নয়। যেহেতু

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মোজার উপর মোসেহ করেছেন, সেহেতু তাঁর সুন্নাতের মোকাবিলায় এদের মতামতকে কেউ গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতামাত বর্জন করাতে তাঁদের কোনো অসম্মান হয়েছে বলে কোনো ইমাম ও আলেম মনে করেননি। অপরদিকে তাকওয়া হিসাবে এটাকে গ্রহণ করার চেষ্টাও কেউ করেননি। কেউ বলেননি – রাসূলুল্লাহ ﷺ তো বলেননি যে, মোজার উপর মোসেহ করতেই হবে। মোজার উপর মোসেহ করা জায়েয, তবে মোজা খুলে পা ধুয়ে ফেলা উত্তম ও বেশি তাকওয়া হবে। কাজেই সেই অর্থে আমরা এ সকল সাহাবীগণের মত গ্রহণ করি। কখনই কোনো মুসলমান মনে করতে পারে না যে, কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী হতে পারে। তিনি যা করেছেন তা বর্জন করে কোনো তাকওয়া হয়, অথবা তিনি যা বর্জন করেছেন তা করলে তাকওয়া হয় এ কথা কোনো মুমিনের মনে ঘুণাক্ষরেও আসতে পারে না।[১]

(খ). ওযুর সময় খালি পা না-ধুয়ে মোসেহ করা

অপরদিকে কোনো কোনো প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ী মোজা-বিহীন খালি পা মোসেহ করা জায়েয বলেছেন। তাদের মতে ওযুতে দুটি অঙ্গ (মুখ ও হাত) ধৌত করা এবং দুটি অঙ্গ (মাথা ও পা) মোসেহ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের সুন্নাতের বিপরীতে তাঁদের এই মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।[২]

(গ). একবার বা তিনবার মাথা মোসেহ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা ওযুর সময় মাথা একবার মোসেহ করতেন। কিন্তু কোনো কোনো তাবেয়ী তিনবার মাথা মোসেহ করতেন। তাদের এই কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের মোকাবিলায় গ্রহণ যোগ্য নয়। একথা কেউ বলবেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার মোসেহ করতে তো নিষেধ করেননি, তিনবার করলে তাঁর সুন্নাত পালন হবে, উপরন্তু এঁদের সুন্নাতও পালন করা হবে, কাজেই এটাই উত্তম বা এটাই তাকওয়া। কারণ তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাপকাঠি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল যে, তিনি তিনবার মোসেহ করবেন। তা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করেছেন। তিনি যা বর্জন করেছেন তাতে কখনো কোনো তাকওয়া, সাওয়াব বা দ্বীন থাকতে পারে না।[৩]

(ঘ). রুকুর মধ্যে হাঁটু ধরা

রুকুর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটু শক্ত করে ধরতেন। পরবর্তীকালে কোনো কোনো সাহাবী রুকুর সময় দুই হাত উরুর উপর বিছিয়ে বা দুই হাঁটুর মধ্যে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো এভাবে রুকু করতেন। তবে পরে তিনি তা বর্জন করেন। এজন্য উলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়মিত সুন্নাতের বিপরীতে এই সাহাবীর মত গ্রহণ করেননি।[৪]

(ঙ). নামায রত অবস্থায় মুসাফাহা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে কারো সাথে মুসাফাহা করেননি। পরবর্তী কালে কোনো কোনো সাহাবী নামায রত অবস্থায় তাঁকে কেউ সালাম দিলে হাতের ইশারায় তার উত্তর প্রদান করতেন এবং হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করতেন।[৫]

এরূপ অগণিত বিষয় আমরা হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থে দেখতে পাই। এবিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমি পাঠককে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক আস-সান'আনী (মৃ: ২১১ হি.) সংকলিত "আল-মুসান্নাফ" ও ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী শাইবা আল-কূফী (মৃ: ২৩৫ হি.) সংকলিত "আল-কিতাবুল মুসান্নাফ", ইমাম আবু জাফর আমদ ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাহাবী (মৃ: ৩২১ হি.) লিখিত "শারহু মা'আনীল আসার", "শারহু মুশকিলিল আসার", "ইখতিলাফুল উলামা" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(চ). সুন্নাতে সাহাবীর পর্যায় নির্ধারণে ইমাম আবু হানীফার মতামত

সাহাবীগণের অনুসরণ ও তাদের মতামতের পর্যায় নির্ধারণের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হি.) বলেন : "আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী চলব। আল্লাহর কিতাবে যা নেই সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অনুযায়ী চলব। আল্লাহর কিতাবে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতে যদি কোনো বিষয় না পাওয়া যায় তাহলে আমি সেক্ষেত্রে তাঁর সাহাবীগণের মতামত গ্রহণ করব।"[৬]

(ছ). সুন্নাতে নববীর বিপরীতে সাহাবীর কর্ম সম্পর্কে ইমাম সারাখসী

হানাফী মাযহাবের অন্যতম আলেম, ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ আস সারাখসী (মৃত্যু ৪৯০ হি.) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহাবীগণের হাদীসের খেলাফ মতামত, কর্ম ও ফাতওয়ার বিষয় আলোচনা করে বলেন যে, এ সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতই মানতে হবে এবং সাহাবীগণের মতামতকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তিনি বিস্তারিত আলোচনার শেষে হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবীগণের মতামত বর্জনের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন : "কারণ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস সহীহ সূত্রে পাওয়া যায় তাহলে তার উপরে আমল করতে হবে, তাকে পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মর্যাদার নিচে কেউ যদি তাঁর হাদীসের বাইরে বা বিপরীত কর্ম করেন সে জন্য তাঁর হাদীস পালন ত্যাগ করা যাবে না। বরং বিপরীত কর্মকারীর হাদীস বিরোধী কর্ম বা ফাতওয়ার জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ওজরখাহী করতে হবে এবং সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বলতে হবে যে,– তিনি হাদীসটি জানতেন না, এ জন্য নিজের মতামত অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করেছেন। যদি তিনি হাদীসটি জানতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর মত ত্যাগ করে হাদীসটিই গ্রহণ করতেন। কাজেই, অন্য যে কোনো মানুষ যদি সহীহ সনদে

হাদীসটি জানতে পারে তাকে অবশ্যই হাদীসটি গ্রহণ করতে হবে, পালন করতে হবে ।"[১]

চতুর্থ: সুন্নাতের অনুসরণ, উদ্ভাবন ও সুন্নাতের নামে প্রতারণা

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা সুন্নাতের পরিচয় ও সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের বা "জীবনদানের" গুরুত্ব জানতে পেরেছি। অনুরূপভাবে সুন্নাতের বাইরে কোনো নতুন উদ্ভাবনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও কিছু জানতে পেরেছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা "উদ্ভাবন" বা বিদ'আতের পরিচিতি, প্রকরণ, কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করব। তার আগে আমরা অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের চেষ্টা করব। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগ্রহী ও আবেগী মুসলিম সুন্নাতের উপর নির্ভর করেই সুন্নাত থেকে বিচ্যুতি ও নব-উদ্ভাবনের মধ্যে নিপতিত হন। কখনো ইবাদতের আগ্রহ মুসলিমকে সুন্নাতের আলোকে উদ্ভাবনার জন্য উদ্দীপনা জোগায়। কখনো সমাজের চাপে, পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে বা অন্যান্য জাতির কর্মের প্রভাবে মুসলিম বিদ'আত বা উদ্ভাবনার মধ্যে নিপতিত হন। এরপর তিনি "সুন্নাতের" আলোকে সে উদ্ভাবনা "সুন্নাত-সম্মত" বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুন্নাতের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হন। সর্বোপরি তিনি বিচ্যুতি ও পদস্খলন অনুভব বা স্বীকার করতে চান না। এজন্য সুন্নাতের অনুসরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বুঝতে না পারলে আমরা অনুসরণের ইচ্ছা থাক সত্ত্বেও উদ্ভাবনের মধ্যে নিপতিত হব।

পূর্বে আলোচিত হাদীসগুলি চিন্তা করুন। যে সকল সাহাবী স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ, সারারাত তাহাজ্জুদ, প্রতিদিন সিয়াম, গোশত পরিত্যাগ, আরাম আয়েশ পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা মূলত সুন্নাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সুন্নাতের আলোকেই তাঁরা এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব ও সাওয়াবের কথা জেনেছেন। তাঁরা ভালো কাজগুলি বেশি করে করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁদের আগ্রহ যে তাঁদেরকে বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা তাঁরা অনুভব করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে তা বুঝিয়ে দেন। অনুরূপভাবে দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিক্র পালনকারীগণ, হাঁচির পরে সালাম পাঠকারী, খুত্‌বার মধ্যে হাত তুলে দোয়া-কারী ও অন্য সকল বিচ্যুতির মধ্যে নিপতিত ব্যক্তিগণ সকলেই সুন্নাত জানেন, সুন্নাতের আলোকেই কিছু "ভালো" কাজ করতে চেয়েছেন। কিন্তু হুবহু অনুকরণ না হওয়ার কারণে তা "সুন্নাতের অনুসরণ" বা "জীবনদান" বলে গণ্য হয়নি, বরং উদ্ভাবন বা বিচ্যুতি বলে গণ্য হয়েছে। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, অধিকংশ ক্ষেত্রে উদ্ভাবন অর্থ কোনো আনকোরা নতুন বিষয় প্রচলন নয়। সুন্নাত-সম্মত বিভিন্ন নেক কর্মের সুন্নাত বহির্ভূত পালনই বিচ্যুতি ও উদ্ভাবন।

অপরদিকে অনুসরণকারীগণের কথা চিন্তা করুন। তাঁরা হুবহু তাঁর অনুসরণ করেছেন। নিজের মনের আবেগ, আগ্রহ ও প্রজ্ঞা মিশিয়ে কিছু অনুসরণ, কিছু বর্জন বা কিছু উদ্ভাবন করেননি। তাওয়াফ, রমল, খেযাব, জুতা, তালবিয়া, কা'বা ঘর স্পর্শ, উটের দিকে মুখ করে সালাত আদায়, জামার বোতাম খুলে সালাত আদায় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অবিকল ও হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে সুন্নাতের।

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কা'বা ঘরের দুটি রুকন স্পর্শ করার উপর 'কিয়াস' করে বাকি সকল রুকন বা দেওয়াল স্পর্শ করি, হজরে আসওয়াদ চুম্বনের উপর 'কিয়াস' করে সকল দেওয়াল ও পাথর চুম্বন করি, তাওয়াফের সময় ৪ বার রমল করার উপর 'কিয়াস' করে ৭ বারই রমল করি বা এভাবে সুন্নাতের উপর কিয়াস করে বা ভিত্তি করে সুন্নাতের অতিরিক্ত কিছু কাজ করি তবে তা উদ্ভাবন ও বিচ্যুতি বলে গণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযানের পর ফজরের দু রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করতেন। এরপর সাধারণত ডান কাতে একটু শুয়ে থাকতেন। বেলাল এসে সাড়া দিলে বা ইকামত দিলে তিনি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে জামাতে নামায পড়াতেন। অন্য কোনো সময়ে সুন্নাত ও ফরয নামাযের মাঝে তিনি শুতেন না। এখন কেউ যদি অবিকল তাঁরই মতো ফজরের আযানের পরে দু রাক'আত সুন্নাত আদায় করে ডান কাতে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন তবে তাকে অবিকল অনুসারী বলা হবে। কিন্তু তিনি যদি ঘরের পরিবর্তে মসজিদে এসে শুয়ে থাকেন অথবা দলবদ্ধভাবে শুয়ে থাকেন তাহলে তাকে অবিকল অনুসারী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ যোহরের সুন্নাতের পরেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার রীতি চালু করেন তাহলে তাকেও আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবিকল অনুসারী বলতে পারব না। তিনি হয়ত বলবেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে শয়ন করে শিখিয়েছেন যে, যে কোনো ওয়াক্তে সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে একটু শয়ন করা সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব.... ইত্যাতি অনেক অকাট্য (!) যুক্তি ও দলিল হয়ত তিনি পেশ করতে পারবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তাঁর কাজকে সুন্নাতের অনুসরণ বলে প্রমাণিত করতে পারবেন না। তাঁকে মানতে হবে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাতের পরে শুয়ে থাকার অনুকরণে যোহরের সুন্নাতের পরে শুয়ে থাকার উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর উদ্ভাবন যত মহানই হোক, সুন্নাতের অনুসরণ প্রেমিক উম্মতের কাছে মনে হবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের সুন্নাতের পরে কখনো শুতেন না, সাহাবীগণ শুতেন না। কাজেই যত দলিলই দেখান হোক আমি এ নতুন উদ্ভাবিত রীতির অনুসারী না হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করতে চাই।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ কখনো কখনো সম্মানিত আগন্তককে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম-মুসাফাহা করে বসাতেন এবং নিজেরা বসতেন। কিন্তু অনুপস্থিত কারো স্মরণ বা উল্লেখ করার সময় বা তাঁর জন্য সালাম প্রেরণের সময় তাঁরা কখনো উঠে দাঁড়াতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে সাহাবীগণ দরুদ ও সালাম পাঠ করেছেন। কখনোই তাঁরা এজন্য বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ান নি। এখন আমরা যদি আগন্তককে দেঁখে দাঁড়ানোর 'দলিল' দিয়ে সালামের জন্য বসা থেকে উঠে দাঁড়ানোর রীতি প্রচলন করি তাহলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের আজীবনের সুন্নাত পরিত্যাগ করে নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করা

হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় বিশেষ নেয়ামত লাভ করলে বা সুসংবাদ পেলে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শুকরানা সাজদা করতেন। এখন যদি কেউ এসকল হাদীসের আলোকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে নিয়মিত একটি করে শুকরানা সাজদা দেওয়ার প্রচলন করেন তাহলে তাকে কখনোই অনুসারী বলা যাবে না। তাকে উদ্ভাবক বলতে হবে। তিনি হয়ত অনেক অকাট্য (!) দলিল পেশ করবেন। তিনি বলবেন, যে কোনো নেয়ামত লাভের পরেই শুকরিয়া সাজদা করা যায়। মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো নামায আদায় করতে পারা। কাজেই, এ নেয়ামত লাভের পরে যে শুকরানা সাজদা করে না সে অকৃতজ্ঞ বান্দা। তিনি হয়ত বলবেন, এ সাজদা যে নিষেধ করে সে বেওকুফ, তাকে আবু জাহল বলা উচিত। কারণ সে, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে বান্দাকে নিষেধ করছে। কোথাও কি আছে যে, বিশেষ কোনো নেয়ামতের জন্য সাজদায়ে শুকর আদায় করা যাবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনো নামাযের পরে শুকরানা সাজদা করতে নিষেধ করেছেন ? নেয়ামতের জন্য সাজদা হাদীসে প্রমাণিত। নামায মুমিনের জীবনের অন্যতম নিয়ামত। এছাড়া সাজাদার সময়ে দোয়া কবুল হয় তাও প্রমাণিত। নামাযের পরে দোয়া কবুল হয় তাও প্রমাণিত। কাজেই, প্রত্যেক নামাযের পরে সাজদা করা ও সাজদার মধ্যে দোয়া করা 'সুন্নাত' (!)।

এরূপ অনেক কথাই তিনি বলতে পারবেন। অগণিত অকাট্য (!) প্রমাণ তিনি প্রদান করবেন। কিন্তু কখনই আমরা তাঁকে সুন্নাতে নববীর অনুসারী বলতে পারব না। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন আদায় করেছেন, তাঁর সাহাবীগণও করেছেন, কিন্তু কেউ কখনোই নামায আদায়ের নেয়ামত লাভের পর শুকরিয়ার সাজদা করেননি। কাজেই, নামাযের পরে শুকরানা সাজদা না করাই তাঁদের সুন্নাত। আর এরূপ সাজদার প্রথা এ সুন্নাতকে মেরে ফেলবে। অনুকরণপ্রিয় সুন্নাত প্রেমিকের প্রশ্ন হলো : আমরা কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাই? এ সকল অকাট্য (!!) দলিলের মাধ্যমে আমরা কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণকেই অকৃতজ্ঞ ও হেয় বলে প্রমাণিত করছি না?

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুসংবাদ শুনে কখনো শুকরানা সাজদার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করতেন বলে যদি আমরা বাজি ফুটিয়ে, তোপধ্বনি করে, মিছিল করে বা রং ছিটিয়ে আনন্দ প্রকাশকে দ্বীনের অংশ হিসাবে পালন করি তাহলেও আমরা সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হব। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুসংবাদ পেলে শুকরানা সাজদা করতেন বলে প্রতিবৎসর সুসংবাদ পাওয়ার দিনে শুকরানা সাজদা করা, তিনি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আকীকা করতেন বলে প্রতি বৎসর সন্তানের জন্মদিন পালন করা, তিনি বিবাহের সময় ওলীমা করতেন বলে প্রতি বৎসর বিবাহ বার্ষিকী পালন করা ... সবই উদ্ভাবন বা বিদ'আত ও বিচ্যুতি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সুন্নাতের 'আলোকে' উদ্ভাবিত এরূপ 'ভাল কাজ'-কে অনেক আলিম 'বিদ'আতে হাসানা' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এগুলির বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে অনেক প্রকার দলিল তাঁরা পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলিমগণ মতভেদ করলেও জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নেন নি। তাঁরা সুন্নাতকে 'সুন্নাত' ও বিদ'আতকে 'বিদ'আত' বলে স্বীকার করতেন, শুধু বিদ'আতটি হাসানা অথবা সাইয়িয়াহ সে বিষয়ে মতভেদ করতেন। বর্তমান যুগে অনেকে এরূপ 'উদ্ভাবিত ভাল কর্মকে' প্রতারণামূলকভাবে 'সুন্নাত' বলে আখ্যায়িত করেন। যে সকল কর্ম 'বিদ'আত' বলে পূর্ববর্তী সকল আলিম একমত হয়েছেন, শুধু 'হাসানা' বা 'সাইয়িয়াহ' বিষয়ে মতভেদ করেছেন সেগুলিকেও বর্তমান যুগে অনেকে প্রতারণামূলকভাবে 'সুন্নাত' বলে দাবি করছেন। কারণ 'সুন্নাত' শব্দের প্রতি মুমিনের মনে বিশেষ দুর্বলতা আছে। বিদ'আত যতই হাসানা হোক না কেন, তা সুন্নাত নয় জানার পরে অনেক মুমিনই উক্ত বিদ'আতের বিকল্প সুন্নাত কর্ম অনুসন্ধান করেন এবং বিদ'আতে হাসানা বাদ দিয়ে সুন্নাত মোতাবেক কর্ম করতে চেষ্টা করেন। এছাড়া বিদ'আতকে যতই হাসানা প্রমাণ করা হোক তা বর্জন করলে দোষ হবে তা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সুন্নাত বর্জন করা দোষণীয় বলে প্রমাণ করা যায়। এজন্য এ সকল 'উদ্ভাবিত ভাল কর্মগুলি' প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য সচেষ্ট কেউ কেউ এগুলিকে 'বিদ'আতে হাসানা' না বলে সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করেন।

তাঁদের দাবি মত যোহরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে শয়ন করা 'সুন্নাত', পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে শুকরানা সাজদা করা সুন্নাত, নেয়ামত লাভের দিনে মিছিল করে বা রঙ ছিটিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সুন্নাত, প্রতি বৎসর নেয়ামত লাভের দিনে শুকরানা সাজদা করা, জন্ম বার্ষিকী, বিবাহ বাষিকী ইত্যাদি পালন করা সবই সুন্নাত !!! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!!!

পঞ্চম: ইত্তিবায়ে সুন্নাত বনাম ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, সুন্নাতই কি সব? তাহলে ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ ইত্যাদির অবস্থান কোথায়? বস্তুত সুন্নাতের ক্ষেত্র ও ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে সুন্নাত নেই সেখানেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ প্রয়োজন। যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বিধান দেওয়া হয় নি কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে সেগুলির বিধান নির্ধারণ করতে হয়। যেমন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সালাতের কোন কাজটি ফরয, কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বিস্তারিত বলেন নি। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে মুজতাহিদ তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। কোনো কোনো বিষয়ে সুন্নাতে একাধিক পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে, সেগুলির সমন্বয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুন্নাতের মধ্যে নেই। যেমন সালাতের রুকুর সময় হাত উঠানো অথবা না উঠানো, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অথবা না করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও মুজতাহিদ প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি ও কিয়াসের ভিত্তিতে এগুলির সমন্বয় দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনুরূপভাবে মাইক, টেলিফোন, প্লেন ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কিছু বলা হয় নি। কুরআন ও হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলির আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলির বিধান অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন মুজতাহিদ। কোনো ইজতিহাদী বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত হলে তাকে 'ইজমা' বা ঐকমত্য বলা হয়।

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন বা সুন্নাতে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে সে বিষয়ে কোনো কিয়াস বা ইজতিহাদের

সুযোগ নেই। আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সে বিষয়ে আবার ইজতিহাদ, কিয়াস বা ইজমার কোনো প্রয়োজনের কথা কোনো মুমিন চিন্তাও করতে পারেন না।

আর এজন্যই কিয়াস, ইজমা বা ইজতিহাদ দ্বারা কোনো ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি তৈরি, উদ্ভাবন, পরিবর্তন বা সংযোজন করা যায় না। যেমন ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে জোরে বা আস্তে 'আমীন' বলার বিষয়ে বিধান, গমের উপর কিয়াস করে চাউলের বিধান, প্লেন, মাইক ইত্যাদির বিধান প্রদান করা যায়। কিন্তু সালাতের মধ্যে আস্তে আমীন বলার উপর কিয়াস করে ঈদুল আযহার দিনগুলিতে সালাতের পরের তাকবীর 'আস্তে' বলার বিধান দেওয়া যায় না, সালাতের মধ্যে জোরে আমীন বলার উপর কিয়াস করে সালাতের পরে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি জোরে পড়ার বিধান দেওয়া যায় না, সফরে সালাত কসর করার উপর কিয়াস করে সিয়াম কসর বা অর্ধেক করার বিধান দেওয়া যায় না, হজ্জের সময় ইহরাম পরিধানের উপর কিয়াস করে সালাতের মধ্যে ইহরাম পরিধানের বিধান দেওয়া যায় না...। প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হুবহু অনুকরণ করতে হবে। এমনকি রামাদান মাসে জামাতে সালাতুল বিতর আদায়ের উপর কিয়াস করে কেউ অন্য সময়ে জামাতে সালাতুল বিত্‌র আদায়ের বিধান দিতে পারেন না। বিতরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'আ করার উপর কিয়াস করে সালাতের পরে দু'আ করার সময় দাঁড়ানোর বিধান দিতে পারেন না। দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের উপর কিয়াস করে দাঁড়িয়ে যিক্‌র করা বা কুরআন তিলাওয়াত করাকে উত্তম বলতে পারেন না।

অনুরূপভাবে ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানানো যায় না। যেমন ইজহিতাদের মাধ্যমে প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন, মাইকে আযান দেওয়া ইত্যাদির বিষয়ে জায়েয বা না-জায়েয বিধান দেওয়া যায়, কিন্তু প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন বা মাইকে আযান দেওয়াকে দীনের অংশ বানানো যায় না। কেউ বলতে পারেন না যে, প্লেন ছাড়া অন্য বাহনে হজ্জে গমন করলে সাওয়াব বা বরকত কম হবে বা বাইতুল্লাহর সাথে আদবের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা থাকবে। অনুরূপভাবে কেউ বলতে পারেন না যে, মাইকে আযান না দিলে আযানের সাওয়াব কম হবে। সকল ইজতিহাদী বিষয়ই এরূপ।

সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ইজমা-কিয়াস এবং উদ্ভাবন-বিদআতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রক্ষা করেছেন। সালাতুল বিতরের রাক'আত, সালাতের মধ্যে হাত উঠানো, আমীন বলা, সূরা ফাতিহা পাঠ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পদ্ধতির বিধান ইত্যাদি অগণিত বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ কিয়াস ও ইজতিহাদ করেছেন এবং মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ক মতভেদের কারণে তাঁরা কাউকে নিন্দা করেন নি বা বিদ'আতী বলেন নি। পক্ষান্তরে আমরা দেখলাম যে, ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম করলে তাঁরা আপত্তি করেছেন এবং বিদ'আত বলেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, জ্ঞান যেরূপ সুন্নাতের অনুসরণের দিকে ধাবিত করে, অনুরূপভাবে সুন্নাতের জ্ঞান অনেক সময় সুন্নাত পরিত্যাগ করে নতুন উদ্ভাবনার দিকেও ধাবিত করে। মুসলিম বিশ্বে সকল সুন্নাত-বিরোধী বা সুন্নাত-অতিরিক্ত উদ্ভাবনার পিছনে সমর্থন যুগিয়েছেন কিছু প্রাজ্ঞ আলেম ও পণ্ডিত। যে সকল উদ্ভাবন বিভিন্ন মুসলিম সমাজ থেকে অগণিত সুন্নাতকে বিদায় করে দিয়েছে। সুন্নাত হয়ে গিয়েছে অপরিচিত। নব উদ্ভাবিত নিয়মরীতি হয়েছে প্রচলিত ও পরিচিত।

উদ্ভাবনমুখী জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞানের উপর আস্থাশীল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুন্নাতকে এত বেশি গভীরভাবে বুঝেছেন যে, এখন এর উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করার ক্ষমতা তাঁর অর্জিত হয়েছে। অপর দিকে অনুসরণকারী সরল প্রেমিক। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সমগ্র হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন। ভালবাসেন তাঁর সুন্নাতকে। তাঁর সুন্নাতকেই একমাত্র নাজাতের, বেলায়াতের ও সকল নেয়ামতের উৎস মনে করেন। তাই হুবহু তাঁর অনুসরণ করতে চান। তিনি তাঁর জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নন। তাই তিনি উদ্ভাবনের চেয়ে অনুসরণকে নিরাপদ মনে করেন।

মুহতারাম পাঠক, আমিও আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নই, যেরূপ আস্থাশীল আমি রাসূলে আকরাম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সুন্নাতের কর্ম ও বর্জনের অবিকল ও হুবহু অনুসরণকেই নিরাপদ পথ বলে মনে করি। একেই আমি নাজাত, কামালাত ও সকল নেয়ামতের একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করি। আমাদের এই গ্রন্থ মূলত এই ধরনের সরল অনুসারীদের জন্য লেখা, যারা উদ্ভাবনের চেয়ে হুবহু অনুসরণ করাকেই নিরাপদ মনে করেন। আপনি যদি এরূপ সরল ও বোকা অনুসারী হতে চান তাহলে এই গ্রন্থের বাকি অংশ পাঠ করতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা বাকি অংশে নামায, রোযা, যিক্‌র, দরুদ, সালাম, তরীকত, তাসাউফ, তাবলীগ, রাজনীতি, হরতাল, ধর্মঘট, জিহাদ-সহ আমাদের ধর্মীয় জীবনের সকল দিকে ও সকল কর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বা রীতি ও আমাদের রীতির তুলনামূলক আলোচনা করে কী-ভাবে আমরা সকল উদ্ভাবিত রীতি পদ্ধতি বর্জন করে অবিকল তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করতে পারি তা আলোচনা করব। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সুন্নাত বনাম বিদ‘আত

সুন্নাতের মুকাবিলায় বিদ‘আত

সুন্নাতের গুরুত্ব নির্দেশক হাদীস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ হাদীসে সুন্নাতের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে পাশাপাশি বিদ‘আতের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সুন্নাতের অনুসরণের নির্দেশনা দিতে গিয়ে বিদ‘আত বর্জনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসকল হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিদ‘আতের অপকারিতা বর্ণনা ব্যতিরেকে সুন্নাতের গুরুত্ব বর্ণনা পূর্ণ হচ্ছে না। এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, সুন্নাতকে বুঝতে হলে বিদ‘আতও বুঝতে হবে এবং সুন্নাত পালন করতে হলে বিদ‘আত পরিত্যাগ করতে হবে। এ জন্য আমরা এখানে বিদ‘আত সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিদ’আত শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘নব-উদ্ভাবন’। প্রখ্যাত আরবি অভিধান প্রণেতা আল্লামা ইবনু মানযুর (৭১১ হি.) বলেন : “বিদ’আত অর্থ : নবসৃষ্টি এবং ধর্মের পূর্ণতার পরে যা উদ্ভাবন করা হয়েছে।”[১] বিদ‘আত শব্দটি এসেছে ‘বাদা’আ’ ক্রিয়া থেকে, যার অর্থ : কোনো পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, শুরু করা বা প্রচলন করা।”[২]

আমরা দেখেছি যে, বিদ‘আত-কে বিভিন্ন হাদীসে ‘মুহদাসাত’ও বলা হয়েছে, যার অর্থও ‘নব-উদ্ভাবিত’। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “আর খবরদার! নব-উদ্ভাবিত কর্মাদি থেকে সাবধান থাকবে; কারণ সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদ’আত এবং সকল বিদ’আত-ই পথভ্রষ্ঠতা বা গোমরাহী।” তিনি আরো বলেছেন : “আমাদের এই কাজের মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবিত করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।” অনুরূপভাবে আরো অনেক হাদীসে আমরা দেখেছি যে, সুন্নাতের মুকাবিলায় নব-উদ্ভাবনকে বিদ‘আত বলা হয়েছে।

এ থেকে কি বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের যুগের পরে উদ্ভাবিত সকল প্রকার পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া, বাড়িঘর তৈরির পদ্ধতি, লেখাপড়ার পদ্ধতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সকল প্রকার কর্মই বিদ‘আত? তাহলে সবই কি পথভ্রষ্টতা ও নিষিদ্ধ? তাহলে কি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের তাঁবু বা খেজুর পাতার বাড়িতেই থাকতে হবে? আমাদের কি তাহলে তাদের মতো খেজুরের পাতা বা কাদার তৈরি পাত্রে লিখতে হবে? স্বভাবতই উত্তর হলো : না। তাহলে উপরের হাদীসের অর্থ কি? উলামায়ে কেরাম মূলত দুইভাবে উপরের হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন, তবে তাঁদের কথার সারবস্তু একই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও পরবর্তী কালে তাঁর অনুসারীগণ এবং আরো পরে অন্যান্য মাযহাবের কোনো কোনো অনুসারী বিদ‘আতকে ভালো ও মন্দ (হাসানা ও সাইয়্যেআহ) দুই ভাগ করেছেন। অন্যান্য ইমামগণ ও পরবর্তীকালে অনেক আলেম বিদ‘আতের শ্রেণিবিভাগ করেননি, তাঁরা সকল বিদ‘আতকেই নিন্দনীয় মনে করেন।

বিদ‘আতের ১ম ব্যাখ্যা :

সকল নতুনই বিদ‘আত, কিন্তু সকল বিদ‘আত খারাপ নয়

এক শ্রেণির আলেম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের পরবর্তী সকল প্রকার কর্মকে এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরে উদ্ভাবিত সকল ইবাদত বন্দেগি এবং ধর্মীয় বা সামাজিক, পার্থিব ও জাগতিক কর্ম সবই বিদ‘আত। তবে সকল বিদ‘আতই খারাপ নয় কিছু বিদ‘আত ভালো বা “বিদ‘আতে হাসানা” এবং কিছু বিদ‘আত খারাপ বা “বিদ‘আতে সাইয়্যেআহ”।

(ক). ইমাম শাফেয়ী সর্বপ্রথম বিদ‘আতের ভালো ও মন্দ ভাগ করেন

আলেমদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বিদ‘আতের ভালো ও মন্দ এই শ্রেণিবিভাগ করেন সর্বপ্রথম ইমাম শাফেয়ী (২০৪ হি.)। চারজন অনুসরণীয় ইমামের মধ্যে শুধুমাত্র তিনিই বিদ‘আতকে এভাবে দুইভাগ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। তাঁর নিজের লেখা কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখেছেন বলে জানতে পারিনি। তবে পরবর্তী যুগের কোনো কোনো শাফেয়ী আলেম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদ‘আতের এই শ্রেণিবিভাগ করেছেন। আবু নুয়াইম (আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ) আল-ইসফাহানীর (৪৩০ হি./১০৩৮ খ্রি.) বর্ণনায় তিনি বলেন :

:

“বিদ‘আত দুই প্রকার : প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয়। যে বিদ‘আত বা নবউদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের সাথে মিলসম্পন্ন হবে বা সুন্নাতের অনুসরণে হবে তা প্রশংসনীয়, আর যে বিদ‘আত বা নব- উদ্ভাবিত বিষয় সুন্নাতের বিপরীত বা বাইরে হবে তা নিন্দনীয়।” অপর দিকে ইমাম বাইহাকী, আবু বকর আহমদ ইবনু হুসাইন (৪৫৮ হি.)-এর বর্ণনায় তিনি বলেছেন :

:

"নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলি দু প্রকার : যা কুরআন অথবা সুন্নাত অথবা সাহাবীদের বর্ণনা, অথবা (মুসলমানদের) সর্বসম্মত ঐক্যবদ্ধ কোনো মতের বিপরীতে উদ্ভাবিত তা পথভ্রষ্টতার বিদ'আত। আর যা এগুলোর কোনো কিছুর বিপরীত বা বিরোধী নয় তা নিন্দনীয় নয়।"[১]

(খ). বিদ'আতের ভালো বা মন্দ হওয়ার মাপকাঠি সুন্নাত

তাহলে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীগণ যারা বিদ'আতকে ভালো ও মন্দ নিন্দিত ও অনিন্দিত দুই ভাগ করেছেন তাদের মতে বিদ'আতের ভালো বা মন্দ হওয়ার মাপকাটি হলো "সুন্নাত"। এই মতানুসারে মুসলিম জীবনের কর্ম তিন প্রকারের : (১) সুন্নাত, (২) ভালো বা অনিন্দনীয় বিদ'আত ও (৩) নিন্দনীয় বা খারাপ বিদ'আত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ (বা সাহাবীগণ) যা করেছেন বা যেসকল বিষয় অনুমোদন করেছেন সেগুলি "সুন্নাত" বলে গণ্য হবে। তাঁর যুগের পরে মুসলিম উম্মাহ প্রয়োজনে নতুন কোনো কাজ বা নিয়ম প্রচলিত করতে পারবেন, যা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। এই নতুন কাজ যদি "সুন্নাত"-এর অনুসরণে বা প্রয়োজনে করা হয় এবং কোনো সুন্নাতকে দুর্বল, ক্ষতিগ্রস্ত বা অপসারিত করে-না তাহলে তা "ভালো বিদ'আত" বা অনিন্দনীয় বিদ'আত বলে গণ্য হবে। অপরদিকে যদি নতুন উদ্ভাবিত কাজ "সুন্নাতের" পরিপন্থী হয় বা এ কাজের দ্বারা কোনো সুন্নাত ব্যহত, বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগস্ত, দুর্বল বা অপসারিত হয় তবে তা খারাপ বা নিন্দনীয় বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের অন্য আলেম ইমাম আবু হামিদ গাযালী (৫০৫ হি.) বলেনঃ

"যে বিদ'আত কোনো প্রবর্তিত সুন্নাতকে বাধাগ্রস্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই বিদ'আতই শুধু নিষিদ্ধ।"[২]

তিনি আরো বলেন :

"সকল নতুন কর্ম বা বিষয়ই নিষিদ্ধ নয় ; বরং যে বিদ'আত কোনো প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত সুন্নাতের বিপরীতে উদ্ভাবিত এবং শরীয়তের কোনো কর্মকে তার কারণ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ব্যহত করে বা নষ্ট করে শুধুমাত্র সেই বিদ'আতই নিষিদ্ধ।"[৩]

এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পার্থিব, জাগতিক ও সামাজিক বিবর্তনের কারণে যে সকল কর্ম নব-উদ্ভাবিত হয়েছে তা "বিদ'আতে হাসানা" বলে বিবেচিত হবে, যেমন – বসবাস, যাতায়াত, পানাহার, চাষাবাদ, ব্যবসা, চিকিৎসা ইত্যাদির বিষয় বা পদ্ধতি, যতক্ষণ না ইসলামের কোনো নির্দেশের বিরোধী হবে ততক্ষণ তা এই মতে নিন্দনীয় হবে না।

অনুরূপভাবে 'সুন্নাত' বা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত বা নির্দেশিত কোনো কর্ম সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যম হিসাবে কোনো কর্ম উদ্ভাবিত হলে তাও "বিদ'আতে হাসানা" বলে গণ্য হবে। যেমন, সুন্নাত-মতো কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য হরকত বা স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে হরকত ছাড়াই বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন আরব সাহাবীগণ। সাহাবীদের যুগে অনারব নও মুসলিমগণ এবং অনেক আরব কুরআন তিলাওয়াতে ভুল করতে লাগল, তখন আলীর (রা) নির্দেশে আবুল আসওয়াদ দুয়ালী স্বরচিহ্ন ব্যবহার শুরু করেন, যেন সকলে সঠিকভাবে, যেভাবে রাসূলে আকরাম ﷺ ও সাহাবাগণ তিলাওয়াত করতেন অবিকল সেভাবে যেন তিলাওয়াত করতে পারেন। যেহেতু সুন্নাতকে জীবিত ও অনুসরণ করার জন্যই এ সকল কর্ম উদ্ভাবন করা হয়েছে তাই সেগুলি ভালো বিদ'আত বা "বিদ'আতে হাসানা" বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে সুন্নাত সম্মতভাবে ইলম শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা, পাঠ্যক্রম তৈরী করা, সুন্নাত সম্মত নিরাপত্তা ও অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ বাহিনী ও বিভিন্ন আইন পদ্ধতি চালু করা ইত্যাদি।

(গ). কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলার স্বপক্ষে প্রমাণাদি

তাঁরা বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করেন:-

(১). সকল নতুন কর্ম খারাপ হওয়া অযৌক্তিক ও অসম্ভব

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের পরে স্বভাবতই অগণিত কাজ নতুন উদ্ভাবিত হবে। ইসলাম বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বে। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম, আচার আচরণ, খাওয়া দাওয়া, আবাস, পোশাক থাকবে যা সে যুগে ছিল না। সকল নব-উদ্ভাবিত কর্ম নিন্দনীয় হলে মানব জীবন অচল হয়ে পড়বে। কাজেই সকল উদ্ভাবন নিন্দনীয় হতে পারে না।

(২). রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নতুন উদ্ভাবনের অনুমতি দিয়েছেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে 'সুন্নাতে হাসানা' বা 'সুন্দর রীতি' প্রচলনের প্রশংসা করেছেন। এতে জানা যায় যে, নতুন রীতিনীতি প্রচলনের সুযোগ ইসলামে রয়েছে এবং সকল নতুন রীতি নিন্দনীয় নয়। এছাড়া যেসকল ক্ষেত্রে কুরআন বা সুন্নাহতে কোনো বিধান নেই সে সকল ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইজতেহাদ করলে স্বভাবতই নতুন নতুন বিধানাবলী বা বিচার প্রচলিত হবে। এতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে সকল নব-উদ্ভাবন খারপ বা গোমরাহী হতে পারে না, বরং কিছু কিছু

উদ্ভাবন ভালো অথবা জরুরি।

(৩). সাহাবায়ে কেরাম অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছেন

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে অনেক বিষয় উদ্ভাবন করেছেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে ছিল না। তাঁরা কুরআন কারীম বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে একত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন, কুরআন লিখন পদ্ধতিতে নুকতা ও হারাকাতের প্রচলন করেছেন। এ ছাড়া তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন নিয়ম পদ্ধতি চালু করেছিলেন। সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগে মুসলিম উম্মাহ আরো অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ভাবন করেছেন। যেমন, আরবি ভাষা শিক্ষার বিভিন্ন শাখা, ফিকহ, হাদীস, কুরআন, কিরাআত ইত্যাদী বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রের মূলনীতি উদ্ভাবন করা, মাদ্রাসা মক্তব চালু করা ইত্যাদি। এগুলি সব নিন্দনীয় হতে পারে না।

(৪) সাহাবায়ে কেরাম কোনো কোনো বিদ'আতের প্রশংসা করেছেন

সাহাবীগণ নিজেরাই কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলেছেন। আব্দুর রাহমান ইবনু আবদ আলকারী বলেন :

.

একদিন আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সাথে রমযান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম মানুষেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত। কোথাও একব্যক্তি একা (তারাবীহ বা রাতের) নামায আদায় করছে। কোথাও কয়েকজনে মিলে ছোট্ট একটি জামাতে নামায আদায় করছে। এ দেখে উমর বললেন : আমার মনে হয় এ সকল মানুষের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করে দেওয়া ভালো হবে। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তিনি উবাই ইবনু কা'বকে ইমাম নিযুক্ত করে যারা ইশা'র পরেই রাতের নামায বা তারাবীহ আদায় করত তাদের একত্রে (তারবীহের) নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর অন্য এক রাতে যখন আমি তাঁর সাথে বাহির হয়েছি তখন আমরা দেখলাম সকল মানুষ একত্রে ইমামের পিছে জামাতে (তারাবীহ) আদায় করছে। এই দৃশ্য দেখে উমর বললেন : এটি একটি ভালো বিদ'আত, তবে যা থেকে এরা ঘুমিয়ে থাকে তা বেশি উত্তম (অর্থাৎ, এ সকল মানুষের প্রথম রাতে তারাবীহ আদায় করছে, শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু শেষ রাতে তারাবীহ পড়লে তা বেশি ভালো। বাহ্যত উমর (রা.) নিজেও শেষ রাত্রে তা আদায় করতেন, এজন্য তিনি জামাতে শরীক ছিলেন না, বাইরে থেকে তা দেখেছেন)।[১]

এ হাদীসে আমরা দেখছি উমর (রা.) একটি বিদ'আতকে 'ভালো' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে স্পষ্ট হলো যে সকল বিদ'আত খারাপ নয়।

(৫). মুসলমানদের কোনো কাজ ভালো বা মন্দ বলার অধিকার আছে

এসকল আলেম দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ যা করেছেন তাই শুধু ভালো, আর তাঁরা যা করেননি তা সবই খারাপ একথা ঠিক নয়। বরং পরবর্তী সকল যুগের মুসলিমগণের অধিকার ও সুযোগ আছে কোনো নতুন কাজকে ভালো বা মন্দ বলার। কোনো কাজকে ভালো বা মুস্তাহাব বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কোনো মুসলমান তাকে ভালো মনে করবে। তবে কোনো কাজকে খারাপ, মাকরুহ বা হারাম বলতে হলে অবশ্যই শরীয়তের দলিলের প্রয়োজন হবে, কোনো কোনো বা অনেক মুসলমান তাকে খারাপ বললেই তা খারাপ হয়ে যাবে না। তাদের এই দাবির পক্ষে তাঁরা ইতঃপূর্বে উল্লেখিত ইবনু মাসউদের বাণী পেশ করেন। আমরা দেখেছি যে, তিনি বলেছেন : "মুসলিমগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছে ভালো, আর মুসলিমগণ যা খারাপ মনে করে তা আল্লাহর কাছে খারাপ।" তাঁর এ কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুসলিম উম্মার নতুন কোনো বিষয়কে ভালো বা মন্দ বলার অধিকার আছে। সকল নতুন বিষয় মন্দ বা নিন্দনীয় হলে এই অধিকার থাকে না।

(৬). বিদ'আত অর্থ 'নতুন', বিদ'আত অর্থই খারাপ নয়

এদের মতে বিদ'আতের নিজস্ব কোনো হুকুম নেই। সুন্নাতের আলোকে তার বিধান নির্ধারতি হবে। যে সকল বিদ'আত সুন্নাতের প্রতিকূল, কোনো সুন্নাতকে বিনষ্ট করে তা বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ। আর যে বিদ'আত কোনো সুন্নাতকে বিনষ্ট করে না, বরং সুন্নাতের অনুকূলে হয় তা বিদ'আতে হাসানা বলে গণ্য হবে।

শাফেয়ী মযহাবের আলেমগণের কেউ কেউ বিদ'আতকে শরীয়তের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে ভাগ করেছেন : ওয়াজিব বিদ'আত, মুসতাহাব বিদ'আত, মুবাহ বিদ'আত, মাকরুহ বিদ'আত ও হারাম বিদ'আত। এদের মতেও বিদ'আত শব্দের নিজস্ব কোনো হুকুম নেই। কোনো কাজ বিদ'আত হওয়ার অর্থ তার মন্দ হওয়া বা ভালো হওয়া নয়। তার ভালো বা মন্দ হওয়া নির্ভর করে শরীয়তের অন্যান্য দলিলের উপর। দলিলের ভিত্তিতে তার ভালোমন্দ নির্ধারিত হবে। তবে সাধারণভাবে যে সকল বিদ'আত কোনো সুন্নাত নষ্ট করে তা মাকরুহ বলে গণ্য হবে।

(৭). সুন্নাতই ভালো ও মন্দ বিদ'আতের মাপকাঠি

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এ সকল আলেমের মতে বিদ'আত শব্দটি কখনই নিন্দাবাচক শব্দ নয়। বিদ'আত শুধু ভালোই নয়, ওয়াজিবও হতে পারে। ভালো ও মন্দ বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড হলো 'সুন্নাত'। এজন্য বিদ'আতের শ্রেণিভাগকারীদের

নেতা, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন :

"কিন্তু আমরা কর্ম ও বর্জন উভয় দিক দিয়েই সুন্নাতের অনুসরণ করি। (রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা করি, তিনি যা বর্জন করেছেন বা করেননি আমরাও তা করি না।)"[১]

বিদ'আতের ২য় ব্যাখ্যা :

ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব বিদ'আত, সকল বিদ'আতই খারাপ

(ক). অন্যান্য ইমাম বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করেননি

প্রথম যুগের অধিকাংশ ইমাম ও মুজতাহিদ বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করেননি। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ (১৫০হি.) ও তাঁর প্রথম যুগের অনুসারীগণ বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করেননি, বরং সকল বিদ'আতই গোমরাহী বলে বারবার উল্লেখ করেছেন।[২] ইমাম মালিক (১৭৯ হি.), ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.) রাহিমাহুমাল্লাহ ও তাঁদের প্রথম যুগের অনুসারীগণও অনুরূপভাবে বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগের বিরোধিতা করেছেন।[৩]

ইমাম মালিক (রাহ) বলেন : "যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো বিদ'আত উদ্ভাবন করে এবং মনে করে যে, এই বিদ'আতটি হাসানা বা ভালো; তাহলে বুঝতে হবে যে, সে মনে করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ খিয়ানত করেছেন, তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি। কারণ আল্লাহ বলেছেন: (আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম[৪]), কাজেই সেই দিন যে বিষয় দ্বীনের অংশ ছিল না পরে আর কখনো তা দ্বীনের অংশ হতে পারে না।"[৫] পরবর্তীকালে অনেক আলেম, ইমাম ও সংস্কারক বুজুর্গ এই মত অনুসরণ করেছেন।

(খ). বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ নয়, কর্মের শ্রেণিবিভাগ

তাঁরা বলেন, আমরা বিদ'আতের নিন্দায় বর্ণিত সকল হাদীসে দেখতে পাই যে, সাওয়াব কবুলিয়্যত, আল্লাহর নৈকট্য বা তাকওয়ার জন্য উদ্ভাবনকে নিন্দা করা হয়েছে। কোনো উদ্ভাবন কবুল হবে না বা তার দ্বারা কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিদ'আতের ক্ষেত্র হলো "দ্বীন" বা ইবাদত বন্দেগি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাদের এই কাজের মধ্যে যে নতুন কোনো বিষয় উদ্ভাবিত করবে তার নতুন উদ্ভাবিত কাজটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।" এর অর্থ তাঁর দ্বীনের মধ্যে যে কোনো নব উদ্ভাবন প্রত্যাখ্যাত হবে। সাধারণ জাগতিক কাজ যা দ্বীনের জন্য করা হয় না, বরং সকল ধর্মের মানুষই করেন, তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। "সকল নব উদ্ভাবিত কর্মই বিদ'আত" – অর্থ হলো : "সকল নব উদ্ভাবিত ইবাদতমূলক কর্মই বিদ'আত"। এদের মতানুসারে বিদ'আত হলো এমন কোনো বিশ্বাস বা কর্মরীতি যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পালন করা হয় বা যা পালন করলে বিশেষ সাওয়াব আসে এবং পালন না করলে সাওয়াবের কমতি বা ঘাটতি হবে বলে মনে করা হয়, অথচ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীদের যুগে ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পরে সাওয়াব, তাকওয়া বা দ্বীনের জন্য কোন বিশ্বাস, কর্ম, কর্মপদ্ধতি বা রীতি উদ্ভাবন করা হলে তা "বিদ'আত" বলে গণ্য হবে এবং সকল বিদ'আতই নিন্দনীয় ও গোমরাহী বলে গণ্য হবে। জাগতিক বিষয়ে কোন উদ্ভাবন, যেখানে উদ্ভাবিত বিশ্বাস, কর্ম, বা রীতির মধ্যে কোন ইবাদত, তাকওয়া বা দ্বীন কল্পনা করা হয় না, সে সকল বিষয়ে উদ্ভাবন বিদ'আত বলে গণ্য হবে না। সেগুলির ভাল বা মন্দ নির্ধারণ করতে শরীয়তের অন্যান্য বিধানাবলীর উপর নির্ভর করতে হবে।

(গ). ইবাদতের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন বিদ'আত ও সকল বিদ'আতই গোমরাহী

তাঁরা বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের পরে নব-উদ্ভাবিত কর্ম দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এক ধরনের হলো 'ইবাদত' জাতীয় কর্ম, যা ধর্মীয় আচরণ বা অনুষ্ঠান হিসাবে আল্লাহর নিকট সাওয়াব অর্জনের জন্য করা হয়। এ ধরনের কর্ম সাধারণত এক এক ধর্মে এক এক রূপে পালন করা হয়। যেমন,– নামায, রোযা, যিক্‌র, ধ্যান, মানত, নজর, সাজ্দা ইত্যাদি। বিদ'আত মূলত এ ধরনের কাজের মধ্যেই। এই শ্রেণির কর্মের মধ্যে নব উদ্ভাবন বিদ'আত ও নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে।

তাদের মতে বিদ'আতের সংজ্ঞা : "বিদ'আত হচ্ছে ধর্মের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত রীতি বা পদ্ধতি, যা শরীয়তের রীতির মতো পালন করা হয় এবং পালনের মাধ্যমে বেশিমাত্রায় আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি বা সাওয়াব আশা করা হয়।" অন্য কথায় : "যে কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি সেই কর্ম আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবে বা সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হিসাবে করলে তা বিদ'আত হবে।"[৬]

(ঘ). জাগতিক বিষয়ে নব উদ্ভাবন বিদ'আত নয়

আরেক ধরনের কাজ হলো মু'আমালাত ও 'আদাত বা জাগতিক, পার্থিব ও স্বাভাবিক মানবীয় কর্ম, যা মূলত মানবীয় প্রয়োজনে সকল ধর্মের বা ধর্মহীন মানুষেরা করেন। ধার্মিক মানুষ হয়ত এ সকল কর্মের মধ্যেও আল্লাহর সন্তুষ্টি সন্ধান করেন।

অধার্মিক মানুষেরা শুধুমাত্র জাগতিক কারণেই এ সকল কাজ করেন। সর্বাবস্থায় কর্মগুলি জাগতিক ও পার্থিব প্রয়োজনেই মূলত করা হয়। এ ধরনের জাগতিক, পার্থিব, সামাজিক কাজে বা মুআমালাত ও আদাতের মধ্যে কোনো বিদ'আত নেই। এ ধরনের কাজ শরীয়তের সাধারণ বিধান অনুযায়ী জায়েয বা না-জায়েয হবে, কিন্তু এই শ্রেণির কোনো কাজকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করা বাতুলতা।

(ঙ). উপকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন 'সুন্নাতে হাসানা' বা বিদ'আত হতে পারে

তৃতীয় এক প্রকার কর্ম যা জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। তা হলো ইবাদত পালনের জাগতিক উপকরণ ও মাধ্যম। যেমন, নামায আদায়ের জন্য পোশাক বা স্থান, রোযার ইফতারী বা সেহেরীর জন্য খাদ্য, যাকাত আদায়ের জন্য মুদ্রা, হজ্ব আদায়ের জন্য পরিবহণ, ইলম শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান, উপকরণ, পদ্ধতি ইত্যাদি।

ইসলামের অন্যতম ইবাদত নামায বা সালাতকে আমরা বিবেচনা করি। সালাতের ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্যমূলক কর্মের মধ্যে সামান্যতম ব্যতিক্রম করার অধিকার মুসলিমের নেই। সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি প্রচলন করলে তা বিদ'আত হবে। সালাতের পদ্ধতি, দোয়া, সাজদা, রুকু, কিরা'আত ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে নতুন রীতি প্রচলন করার অধিকার কারো নেই। এমনকি যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে যেভাবে যে সময়ে করেছেন সে সময়ে বা সেভাবে না করে অন্য সময়ে আদায় করার রীতি তৈরি করলেও তা বিদ'আত হবে। যেমন, রুকুর দোয়া অন্য সময় পড়লে ভুল, মাকরুহ বা অন্যায় হবে, কিন্তু তা রীতিতে পরিণত করলে বিদ'আত হবে।

পক্ষান্তরে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু আহকাম আছে যা জাগতিক বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত, যেমন সতর ঢাকা, পোশাক পরা, মসজিদ তৈরি করা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের দু'টি দিক আছে। একদিকে এগুলি সালাতের অংশ ও আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম। অন্যদিকে জাগতিক বিষয়াবলীর সাথে সম্পৃক্ত। জাগতিক দিক থেকে পোশাকের ধরন, রঙ, মসজিদের ধরন, উপকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রশস্ততা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে যে প্রশস্ততা আছে সে বিধানের ভিতরে থেকে বিভিন্ন রঙের পোশাক নামাযে পরিধান করা যায়। শরীয়তের সীমার মধ্যে যে কোনো উপাদানের, রঙের বা ধরনের পোশাক মুসল্লী পরিধান করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাঁর জাগতিক বিষয়ের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্টতা শুধু সতর ঢাকার ক্ষেত্রেই। সতর ঢাকাটুকুই ইবাদত, সকল উপাদান, রঙ ও ধরনের সাওয়াব একই হবে, অর্থাৎ শুধু সতর ঢাকার সাওয়াব হবে। কোনো বিশেষ উপাদান, রঙ বা ধরনকে বিশেষ সাওয়াব বা ইবাদত মনে করলে তা সুন্নাতের অনুসরণে হতে হবে, সুন্নাতের বাইরে হলে বিদ'আত বলে গণ্য হবে। যদি কেউ সুন্নাতের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট রঙ বা নির্দিষ্ট প্রকারকে বিশেষভাবে নামাযের রীতি করে নেন এবং তাকে 'সাওয়াবের কারণ' মনে করেন বা তা ত্যাগ করাকে 'সাওয়াব কম হওয়ার কারণ' মনে করেন তাহলে বিদ'আত হবে।

যেমন, সাদা, কাল, সবুজ, ইত্যাদি রঙের পোশাক নামাযের মধ্যে পরিধান করা যায়। কিন্তু কেউ যদি শুধু একটি বিশেষ রঙের পোশাককে নামাযের জন্য রীতি করে ফেলেন এবং মনে করেন সর্বদা এই রঙের পোশাক পরিধান করেই নামায আদায় করতে হবে, এবং তাতে সাওয়াব বেশি হবে বা অন্য রঙ ব্যবহার করলে সাওয়াব কম হবে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে হজ্বের ক্ষেত্রে যাতায়াতের মাধ্যম একটি জাগতিক উপকরণ। এ ক্ষেত্রে যে কোনো উপকরণ বা পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগ মুসলিমের রয়েছে। কিন্তু 'সুন্নাত'-এর নির্ধারণ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট উপকরণকে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বা সাওয়াব কম-বেশি হওয়ার কারণ মনে করলে তা বিদ'আত হবে।

ইবাদত পালনের উপাদান, উপকরণ বা মাধ্যমের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দিক হলো, যদি যুগের পরিবর্তনে কোনো ইবাদত পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে আদায়ের জন্য কোনো উপাদান বা উপকরণ উদ্ভাবন করা হয় তা হলে তা 'সুন্নাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। যেমন, সুন্নাত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠের জন্য বাগদাদী, নুরানী বা নাদিয়া কায়েদা উদ্ভাবন করা।

অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ রক্ষা ও সামাজিক কল্যাণ লাভের জন্য শরীয়ত-সম্মত জাগতিক উপকরণ ও উপাদান উদ্ভাবন করলেও তা 'সুন্নাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য শরীয়ত সম্মত শর্তাবলী ও পদ্ধতিতে বিবাহের কাবিন রেজিস্ট্রি করার নিয়ম প্রচলন করা। সমাজসেবামূলক কাজ, নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের কর্মে রত মানুষদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য শরীয়ত সম্মত বিভিন্ন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এগুলি কিছুই বিদ'আত নয়। কারণ এগুলি ইবাদত নয়, ইবাদতকে সুন্নাত পদ্ধতিতে পালনের উপকরণ ও উপাদান মাত্র।

তবে এগুলিকে ইবাদতের অংশ হিসাবে বা সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ তখন তা দ্বীনের (ধর্মের) মধ্যে উদ্ভাবন হবে। যেমন, যদি কেউ বিবাহের কাবিন রেজিস্ট্রি করাকে ইবাদতের অংশ মনে করেন বা মনে করেন যে শুধুমাত্র কাবিনের কারণে বিবাহের সাওয়াবের কম-বেশি হবে বা কাবিন ছাড়া বিবাহের চেয়ে কাবিনসহ বিবাহে সাওয়াব বেশি হবে, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

(চ). সকল বিদ'আতকে পথভ্রষ্ঠতা বলার প্রমাণাদি

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীগণ ছাড়া অধিকাংশ ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উলামায়ে কেরাম বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করেন নি। তাঁরা বলেন যে, দ্বীন হিসাবে কোনো কিছুর উদ্ভাবনই বিদ'আত ও সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা ও অন্যায়। তাঁরা এ মতের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণাদি পেশ করেছেন :

(১). কোনো বিদ'আতকে ভালো বললে এ বিষয়ের হাদীস অর্থহীন হয়ে যায়

হাদীস শরীফে বিদ'আত শব্দটিকে নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হাদীসে বিদ'আতের নিন্দা করার জন্য 'সাইয়্যেআহ', 'খারাপ', 'বর্জনীয়' বা অন্য কোনো নিন্দাবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, বরং বিদ'আত শব্দটিই নিন্দা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল।

বিদ'আতকে শ্রেণিবিভাগ করলে এবং কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বললে বিদ'আতের নিন্দার আর কোনো অর্থই থাকে না। বিদ'আতকে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ ইত্যাদি শ্রেণিতে ভাগ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অসংখ্য হাদীস একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ তখন প্রশংসা ও নিন্দা অন্য কোনো মানদণ্ডের উপর নির্ভর করবে; বিদ'আত হওয়ার কারণে কোনো কাজকে নিন্দনীয় বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে এ সকল হাদীসের ভাব ও মর্ম অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ হাদীসের স্পষ্ট অর্থ এই যে, বিদ'আত হওয়াটাই নিন্দনীয় হওয়ার কারণ, অন্য কোনো মানদণ্ডের প্রয়োজন নেই। সাহাবীগণের অসংখ্য হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা যখন কোনো কাজকে বিদ'আত বলেছেন তখনই শ্রোতা বুঝেছেন যে কাজটি নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। কিন্তু বিদ'আতের শ্রেণি ভাগ করার পরে কোনো কাজকে বিদ'আত বললে তার নিন্দা বুঝা যায় না; কাজটি নতুন এইটুকুই শুধু বোঝা যায়। শ্রোতা স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন: বুঝলাম কাজটি বিদ'আত, কিন্তু ভালো বিদ'আত না খারাপ বিদ'আত? কাজেই বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে এসকল হাদীসকে অর্থহীন না করে এমন অর্থ গ্রহণ করা উচিৎ যাতে হাদীসগুলির আবেদন ও মর্ম ব্যাহত না হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনই কোনো বিদ'আতকে ভালো বলেননি। তাঁর সুন্নাতের শিক্ষা অনুযায়ী কোনো কোনো বিদ'আত ভালো বা পথভ্রষ্টতা নয়, –একথা বলার অবকাশ নেই। সাহাবীগণ সর্বদা বিদ'আত শব্দকে নিন্দা ও ঘৃণার অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তাঁরা বিদ'আতকে নিন্দা করার জন্য কোনো অতিরিক্ত 'সাইয়্যেআহ' বা খারাপ শব্দ ব্যবহার করেননি। আমরা আগেই দেখেছি, উমর (রা) কিয়ামুল লাইলের জামাআতকে বিদ'আত বলেছেন একান্তই আভিধানিক অর্থে, কারণ কিয়ামুল লাইলের জামাত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত। অসুবিধার কারণে তিনি নিয়মিত চালু করতে পারেননি। সেই সুন্নাতকে চালু করলেন উমর। শুধুমাত্র নতুন চালু করার জন্য তিনি তাকে শাব্দিক অর্থে বিদ'আত বলেন। যেহেতু, বিদ'আত শব্দটি নিন্দাবাচক তাই তিনি তাকে 'ভাল বিদ'আত' বলেন। কাজেই, এই ব্যতিক্রম ব্যবহারকে উপলক্ষ্য করে কোনো অবস্থাতেই রাসূলে আকরাম ﷺ -এর দ্ব্যর্থহীন এতগুলি হাদীসকে আমরা অর্থহীন করে দিতে পারি না। শরীয়তের ও উসূলুল ফিকহের মূলনীতি অনুসারে এক্ষেত্রে 'সাধারণ নিষেধাজ্ঞা' অনুসারে সকল বিদ'আত নিষিদ্ধ হবে, শুধু যে 'বিদ'আতটি' খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ অনুমোদন করেছেন তা 'সুন্নাতে সাহাবা' হিসেবে অনুমোদিত হবে।

(২). হাদীসের আলোকে বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদতের সাথে

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদতের সাথে বা দ্বীনের সাথে, সাধারণ জাগতিক কাজের সাথে নয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবাদতের উদ্দীপনা হয় সুন্নাতের দিকে নয় বিদ'আতের দিকে ধাবিত হবে। এসকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দীপনায় যে কাজ করা হয় তাতে সুন্নাতের বাইরে গেলে বিদ'আত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে তাঁর 'সুন্নাতের' বা তাঁর আদর্শের, কুরআন ও সুন্নাহর বা তাঁর ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের মুকাবিলায় সকল নব-উদ্ভাবনকেই বিদ'আত বলেছেন। সুন্নাত তো আল্লাহর নৈকট্যের পথ। এ পথের বিপরীতে তিনি নব উদ্ভাবন নিষেধ করেছেন। তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে আল্লাহর নৈকট্যের জন্য আর কোনো নব উদ্ভাবনের সুযোগ নেই।

এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবীদের তাঁর সুন্নাতের বাইরে যেতে দেখলেন তখন বললেন যে, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ও আল্লাহ ভীরু। কাজেই, তাকওয়ার জন্য বা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য তাঁর সুন্নাতের বাইরে যাওয়া অর্থই হলো তাঁর সুন্নাতকে অবমূল্যায়ন করা ও অপছন্দ করা। জাগতিক কাজ-তো তা নয়। এ জন্যই সাহাবায়ে কেরাম বিদ'আতকারীদেরকে নিন্দা করে বলেছেন, "তোমরা কি সাহাবীগণের চেয়েও বেশি হেদায়েতপ্রাপ্ত, আল্লাহ ওয়ালা ?" কারণ যে কাজ হেদায়েত পাওয়ার জন্য বা আল্লাহ পাওয়ার জন্য তা অবশ্যই তাঁদের 'সুন্নাতের' মধ্যে হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুন্নাতের বাইরে সকল নতুন কাজ ও নতুন পদ্ধতিই বিদ'আত।

(৩). সাওয়াবের সকল কর্ম তিনি শিখিয়ে গিয়েছেন, নতুনত্বের অবকাশ নেই

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, উম্মতকে আল্লাহর নৈকট্যের সকল পথ বলে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব এবং তিনি তা পালন করেছেন। কাজেই তাঁর সুন্নাতের বাইরে আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের কোনো পথ থাকতে পারে না। তিনি বলেছেন:

"আমার পূর্বের প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যত ভালো বিষয় জানেন সে বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দান করবেন, এবং তিনি তাদের জন্য যত খারাপ বিষয়ের কথা জানেন সেগুলি থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন।"[১]

তিনি আরো বলেন :

" "

"জান্নাতের নিকটে নেওয়ার ও জাহান্নাম থেকে দূরে নেওয়ার সকল বিষয়ই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হলো।"[২]

এ সকল হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে নতুন কোনো রীতি পদ্ধতি চালু করার কোনো অবকাশ নেই।

(৪). ইসলামী শরীয়তে ইবাদত ও জাগতিক কাজের মধ্যে পার্থক্য

ইসলাম মানব জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা ও বিধান প্রদান করেছে। জীবনের সকল দিকের জন্য এতে সুস্পষ্ট বিধান ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিধান ও নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে ইবাদত ও জাগতিক বিষয়ের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান রাখা হয়েছে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ধর্মের বিস্তারিত নির্দেশনার প্রয়োজন। কোন্ কর্ম কিভাবে কতটুকু করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন তা একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং তিনি তা তাঁর রাসূলদেরকে জানিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ ইবাদতের কর্মসমূহ কখন, কিভাবে কতটুকু করবে তা বিস্তারিত শিক্ষা দান করেছেন রাসূলে আকরাম ﷺ। তিনি নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ তা সঠিকভাবে পালন করেছেন। কাজেই তাঁদের ইবাদতমূলক কর্মের মধ্যে কোনোপ্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন, বৃদ্ধি, সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকার পরবর্তী যুগের কোনো মুসলিমের নেই। যদি কেউ করেন তাহলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে এবং কঠোরভাবে নিন্দনীয় হবে।

পক্ষান্তরে 'মুআমালাত', 'আদাত' বা সামাজিক, পার্থিব বা জাগতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অত খুঁটিনাটি বিধান দেওয়া হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে শরীয়তে সাধারণ মূলনীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যতক্ষণ এ সকল কর্ম মূলনীতিসমূহের আওতায় থাকবে ততক্ষণ জায়েয বলে বিবেচিত হবে। মূলনীতির বিরুদ্ধে গেলে না-জায়েয বলে বিবেচিত হবে। এ জন্য মূলনীতির মধ্যে থেকে এ সকল কর্মে প্রয়োজন অনুসারে নতুন রীতির প্রচলন করার সুযোগ মুসলমানদের রয়েছে। নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের আহকামের সাথে ব্যাবসা-বাণিজ্য, খাওয়া-দাওয়া, বাড়িঘর তৈরি, লেখাপড়া শিক্ষা, বিবাহ ও সংসার প্রতিপালন, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা, চিকিৎসা ইত্যাদির আহকামের তুলনা করলেই আমর সহজেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি।

(৫). ইবাদতের জাগতিক উপকরণের উদ্ভাবনও বিদ'আত হতে পারে

মুসলিম জীবনের সকল কর্ম, ইবাদত ও মুআমালাত পরস্পর সম্পৃক্ত। মুআমালাত বা জাগতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে ইসলামের কিছু নির্দেশনা ও সুন্নাত, যেগুলি ইবাদত হিসাবে গণ্য ও অপরিবর্তনীয়। মুআমালাতের এই অংশটুকুতেই মুসলিম মূলত সাওয়াব আশা করেন। এক্ষেত্রে কোনো উদ্ভাবন বা সুন্নাত থেকে ব্যতিক্রম বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

অপরদিকে ইবাদত পালনের জন্য কিছু জাগতিক উপকরণ ব্যবহার করা হয়, যেগুলির মধ্যে অনেকটা মুআমালাতের অনুরূপ প্রশস্ততা রয়েছে। এই অংশে মূলত মুমিন কোনো বিশেষ সাওয়াব আশা করেন না। এসকল বিষয়ে উদ্ভাবন কখনো জায়েয, কখনো সুন্নাতে হাসানা এবং কখনো বিদ'আত বলে গণ্য হতে পারে, যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

(৬). আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণই সর্বোচ্চ আদর্শ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ধর্ম পালনে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ও বেলায়াতে সকল যুগের সকল মুসলিমের পরিপূর্ণ আদর্শ। মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস করে যে, যুগের পরিবর্তনে মানুষের জাগতিক উন্নতি হতে পারে, কিন্তু ধার্মিকতায়, আধ্যাত্মিকতায়, তাকওয়ায় বা সাওয়াব অর্জনে কোনো উন্নতি সম্ভব নয়। কখনোই পরবর্তী কোনো মুসলিম কোনোভাবেই তাঁদের চেয়ে বেশি ধার্মিক, বেশি ওলী বা আল্লাহর বেশি নৈকট্য অর্জনকারী হতে পারবে না। একজন মুসলিম হয়ত কল্পনা করতে পারে আমি এমন একটি জাগতিক নেয়ামত ভোগ করলাম যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ভোগ করেননি, যেমন বিমানে আরোহণ করলাম, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করলাম ইত্যাদি। কিন্তু কখনো কোনো মুসলিম ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে না যে, সে দ্বীনি বিষয়ে এমন কোনো নেয়ামত ভোগ করল, এমন একটি মর্যাদা পেল, এমন একটি স্তরে পৌছাল যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ পাননি। এ সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণতম নেয়ামত তাঁরা পেয়েছেন এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করেই শুধু এ সকল বিষয় অর্জন করা যাবে। যেহেতু, তাঁরাই এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের 'পরিপূর্ণ আদর্শ' , সেহেতু যে কর্ম তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য করেননি সে কর্ম পরবর্তী যুগের কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে পারেন না। তাঁরা যে কর্ম যতটুকু যেভাবে করেছেন,ততটুকু সেই পদ্ধতিকে করাই 'সুন্নাত' ও 'পরিপূর্ণ আদর্শ'। এর বাইরে কোনো রীতি তৈরি করলে বা তাকে আল্লাহর নৈকট্যের কারণ মনে করলে তা বিদ'আত হবে।

(৭). উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অধিকার

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত সর্বোত্তমভাবে বুঝেছেন ও পালন করেছেন সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীন। এ জন্য তাঁদের কর্মও 'সুন্নাত' হিসাবে গণ্য। তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন্ কাজ কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে করেছেন, কোন্ কাজ কী-জন্য বর্জন করেছেন। কোনো কাজে অতিরিক্ত সংযোজনের সুযোগ রাসূলে আকরাম ﷺ রেখে গিয়েছেন কি-না তাও তাঁরা জানতেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের ব্যাখ্যায় তাঁদের মত, পথ ও উদ্ভাবনও 'সুন্নাত' বলে বিবেচিত। কিন্তু পরবর্তী কোনো যুগের মানুষের খুলাফায়ে রাশেদীনের বা সাহাবীদের মর্যাদা দাবি করার অধিকার নেই। রাসূলে আকরাম ﷺ নিজে সাহাবীদের এই মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন এবং উম্মতকে সাহাবীদের, বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করতে বলেছেন। এদের সুন্নাতের বাইরে সকল নব উদ্ভাবনকে বিদআত বলেছেন।

(৮). উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের সুন্নাত

আমরা দেখেছি, সাহাবীগণ ইবাদতের ক্ষেত্রে যে-কোনো নতুন পদ্ধতির কঠোরভাবে নিন্দ করেছেন এবং এই ধরনের সকল উদ্ভাবনকে বিদ'আত বলেছেন। আযান, নামায, যিক্‌র, দোয়া, সালাত, সালাম, খুত্‌বা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলে আকরাম ﷺ -এর সময়ের সামান্যতম ব্যতিক্রম তাঁরা মেনে নেননি, বরং তাঁকে বিদ'আত বলেছেন। কিন্তু নতুন ভাষা, নতুন পোশাক, নতুন বাড়িঘর বা জাগতিক বিভিন্ন প্রয়োজনে উদ্ভাবিত নতুন নিয়ম-পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁরা অনুরূপ বিরোধিতা করেননি। উপরন্তু তাঁরাই নতুন নতুন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জাগতিক, উপকরণমূলক ও কল্যাণমূলক অনেক বিষয় উদ্ভাবন করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, মুআমালাত, আদাত বা জাগতিক কর্মের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর যে সুযোগ আছে তা ইবাদতের ক্ষেত্রে নেই। তবে মুয়ামালাত বা জাগতিক আচার আচরণ, অভ্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সুন্নাতের মধ্যে থাকা উত্তম।

(৯). সাওয়াবের জন্য উদ্ভাবনের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করা

জাগতিক বা উপকরণ জাতীয় বিষয়ে পরিবর্তন, উদ্ভাবন বা নতুন নিয়ম প্রচলন করে কেউ কখনই চিন্তা করে না যে, এই রীতির জন্য তার সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো সাওয়াব হচ্ছে বা সে সুন্নাত অনুসারীর চেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করছে। কোনো মুসলমান কোরমা, পোলাও, পিযা, স্যান্ডুইজ ইত্যাদি খেয়ে কখনও চিন্তা করে না যে এ সকল খাদ্য খাওয়ার জন্য তার খুরমা, খেজুর, সারীদ, রুটি ইত্যাদি খাওয়ার চেয়ে বেশি কোনো সাওয়াব হচ্ছে। কেউ চিন্তা করেন না যে, বহুতলা বাড়িতে থাকার ফলে মাটির বাড়ি বা তাঁবুতে থাকার চেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য বা বরকত হাসিল হয়। অনুরূপভাবে কোনো মুসলমান মনে করেন না যে গাড়িতে চড়ে নামাযের জন্য মসজিদে গমন করলে হেঁটে বা উটের পিঠে যাওয়ার চেয়ে বেশি সাওয়াব বা বরকত পাওয়া যাবে। যদি কোনো মুসলমান স্বরচিহ্নহীন কুরআন দেখে বিশুদ্ধভাবে সুন্নাত-মতো তিলওয়াত করেন, তা দেখে কোনো মুসলমান মনে করবেন না যে স্বরচিহ্ন-সহ কুরআন দেখে পড়লে তাঁর সাওয়াব বেশি হতো বা বরকত বেশি পেতেন। এ জন্য এ সকল কর্মের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করা বা তাঁর অবমূল্যায়নের কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয় না।

পক্ষান্তরে ইবাদতের ক্ষেত্রে যারা নব-রীতি প্রচলন করেছেন তারা এই নব-রীতির মধ্যে মাসনূন বা সুন্নাত রীতির অতিরিক্ত সাওয়াব, বরকত বা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়া যাবে বলেই এই নব-রীতির প্রচলন করেছেন বা তা পালন করছেন। নইলে সুন্নাত-মতো ইবাদতে তাদের বাধা কোথায়? এ সকল নব-রীতি পালনকারীগণ মনে করেন: যারা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের যুগের পদ্ধতিতে আমল করছেন তারা ভুল করছেন। তারা অপূর্ণতার মধ্যে রয়েছেন। নব-রীতি পালন করলে তারা পূর্ণতা পেতেন। যেমন, যিনি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিক্‌র করছেন তিনি বিশ্বাস করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো বসে বসে ব্যক্তিগতভাবে নীরবে যিক্‌র করার চেয়ে তিনি বেশি সাওয়াব বা বরকত অর্জন করছেন। যিনি অবিকল সুন্নাত-মতো যিক্‌র করছেন তিনি কিছুটা অপুর্ণতা ও ভুলের মধ্যে রয়েছেন। অনুরূপভাবে যিনি দাঁড়িয়ে দরুদ বা সালাম পাঠ করছেন তিনি মনে করছেন, যে ব্যক্তি অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মত পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে বসে বসে দরুদ বা সালাম পাঠ করছেন তাঁর ইবাদতটি অপূর্ণ বা তিনি ভুলের মধ্যে রয়েছেন।

এভাবে তিনি সুন্নাতকে অপূর্ণ ও নতুন রীতিকে পূর্ণতা দানকারী বলে মনে করছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজটি করেননি সেই কাজটিকে দ্বীন, ইবাদত, সাওয়াব বা আল্লাহর অধিক নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবে মনে করা, বা তিনি যা করেছেন তা বর্জন করাকে দ্বীন, ইবাদত, সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম মনে করাই বিদ'আত। বিদ'আতকারী স্পষ্টত অথবা কার্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপূর্ণ মনে করে ও অপছন্দ করে। তিনি কার্যত বলছেন যে, এই ফযীলত, বরকত ও পুন্যময় কাজটি না করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ চলে গিয়েছেন।

(১০). ইসলামের সর্বজনীনতা বনাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতি সংরক্ষণ

ইসলাম সকল যুগের সকল জাতির সকল মানুষের বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এতে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে : একদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন যুগ, সমাজ, সামাজিক রুচি ও আচার আচরণের পরিবর্তনের ফলে ইসলামের ধর্মীয় রূপে পরিবর্তন না আসে। হাজার হাজার বছর পরের ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের ইসলামের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও আচার অনুষ্ঠান এক ও অভিন্ন থাকবে। তেমনি হাজার মাইলের ব্যবধানেও এর রূপের কোনো পরিবর্তন হবে না। এ জন্য ধর্মীয় বিষয়ে, ইবাদত বন্দেগির সকল পদ্ধতি, প্রকরণ ও রূপে সকল যুগের সকল মুসলমানকে 'সর্বোত্তম আদর্শ' রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের মতোই থাকতে হবে। নিজেদের অভিরুচি, ভালোলাগা বা মন্দলাগার আলোকে ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো রীতি প্রচলন করতে পারবে না।

অপর দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যুগ, সমাজ, আচার-আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে ইসলামের আহকাম পালনে যেন কারো কোন অসুবিধা না হয়। সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা যেন সহজেই জীবন ধর্ম ইসলাম পালন করতে পারে। এজন্য ইবাদতের উপকরণ, স্থান, জাগতিক প্রয়োজন, সামাজিক আচার, শিষ্টাচার ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষ প্রশস্ততা প্রদান করেছে। সাধারণ কিছু মূলনীতির মধ্যে থেকে সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা প্রয়োজন অনুসারে বিবর্তন পরিবর্তন পরিবর্ধনের সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য সকল মুসলিমের আকীদা, নামায, রোযা, হজ্ব, তিলাওয়াত, যিক্‌র, তাসবীহ, জানাযা, দোয়া ইত্যাদি সকল ইবাদত-মূলক কর্ম সকল দিক থেকে প্রথম যুগের মতোই হবে। তবে হজ্বের যানবাহন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, মসজিদের গঠন পদ্ধতি আবহাওয়া বা অন্যান্য প্রয়োজনে বিভিন্ন হতে পারে, কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি মৌখিক, লিখিত বা ইলেক্ট্রনিক হতে পারে। এগুলির পদ্ধতির মধ্যে কেউ কোনো বিশেষ সাওয়াব আছে বলে মনে করেন না, সাওয়াব মূল ইবাদত পালনে। তেমনি খাওয়া দাওয়া, আবাস, ভাষা, চাষাবাদ ইত্যাদি ব্যাপারেও বিভিন্নতার ও বিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

(১১). উদ্ভাবনের প্রথম ক্ষেত্র : উপকরণ ও জনস্বার্থ

তাঁরা আরো বলেন যে, হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, উম্মতের জন্য কোনো ইবাদত তৈরির অনুমতি নেই। শুধুমাত্র ৩টি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে প্রাসঙ্গিক উপকরণ বা মু'আমালাত জাতীয় কর্মে প্রয়োজনীয় সংযোজনের অনুমতি দিয়েছেন। প্রথমত, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দান করেছেন তা সঠিকভাবে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পালন করার জন্য যদি কেউ কোনো নিয়ম উদ্ভাবন করে, তবে তা 'সুন্নাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। যেমন তিনি দানের নির্দেশ দেওয়ার পরে যে ব্যক্তি প্রথম দান শুরু করল তার কর্মকে তিনি 'সুন্নাতে হাসানা' বলেছেন। এক্ষেত্রে 'সাওয়াব' মূলত তাঁর নির্দেশিত ইবাদত পালনের মধ্যে, পদ্ধতির মধ্যে নয়। অর্থাৎ, লোকটি দান করার জন্য সাওয়াব পাবেন, এবং প্রথমেই দান শুরু করার জন্য বিশেষ সাওয়াব পাবেন, কিন্তু বিশেষভাবে 'রূপার পুটলি' দান করেছেন, স্বর্ণ দান করেননি, সে জন্য কোনো সাওয়াব পাবেন না।

তেমনিভাবে বিশুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করা, অনুধাবন করা, শিক্ষাদান করা, হাদীস শিক্ষা করা, শেখানো, মিথ্যা হাদীস থেকে আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত ও আচরিত কর্ম বা ব্যাপক অর্থে 'সুন্নাত'। যদি যুগের পরিবর্তনের কারণে

মুসলিমগণ সুন্নাত পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালন করতে অক্ষম হন দেখে কেউ এ সকল 'সুন্নাত' কর্মকে পরিপূর্ণ 'সুন্নাত' মেনে আদায় করার জন্যই কোনো পদ্ধতি চালু করেন তাহলে তা 'সুন্নাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে। তবে স্বভাবতই উদ্ভাবিত পদ্ধতির মধ্যে কোনো সাওয়াব হবে না, মূল মাসনূন কর্মের মধ্যেই সাওয়াব হবে। যেমন , বিশুদ্ধ 'সুন্নাত' পদ্ধতিতে কুরআন পাঠের জন্য স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা। স্বরচিহ্ন ব্যবহার মূলত কোন ইবাদত নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের মতো কুরআন তিলাওয়াতই ইবাদত। স্বরচিহ্ন ব্যবহারে শুধুমাত্র 'সুন্নাত' আদায়ে সহযোগিতার সাওয়াব রয়েছে। যদি কেহ মনে করেন যে স্বরচিহ্ন ব্যবহারই বিশেষ ইবাদত এবং স্বরচিহ্নসহ কুরআন তিলাওয়াতে অতিরিক্ত সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য রয়েছে বা স্বরচিহ্ন ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ 'সুন্নাত' তিলাওয়াত করলেও সাওয়াব কম হবে, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

(১২). উদ্ভাবনের দ্বিতীয় ক্ষেত্র : নতুন পরিস্থিতির জন্য ইজতিহাদ

যদি সমাজে কোনো এরূপ বিষয় বা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না, তবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে 'সুন্নাত' নির্দেশিত কর্মকে সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে আরবগণ জন্মগতভাবে বিশুদ্ধ আরবি বলত, পড়ত এবং বুঝতে পারত। সাহাবীগণের যুগে বিপুল সংখ্যক অনারব ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা আরবি বুঝতেন না বা বিশুদ্ধভাবে বোঝার, পড়ার ও বলার জন্য তাদের শিক্ষার প্রয়োজন হতো। কিছুদিনের মধ্যে আরব সন্তানদের মধ্যেও অনাররদের প্রভাবে আরবি ভাষায় দুর্বলতা দেখা দিল, তারাও শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। তখন আলী (রা.) সর্বপ্রথম, এবং পরে অন্যান্যরা আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি চালু করলেন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণ যেন সুন্নাত মোতাবেক কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন এবং কুরআন, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞান বিশুদ্ধভাবে 'সুন্নাত' মানে পড়তে ও বুঝতে পারেন। এগুলিও 'সুন্নাতে হাসানা' বলে গণ্য হবে এবং সুন্নাতের সাহায্য করার জন্য সাওয়াবের কারণ হবে।

আরবি ভাষা শিক্ষা মূলত কোনো ইবাদত নয়। অসংখ্য আরবীয় খ্রিষ্টান ও ইহুদি মাতৃভাষা হিসাবে আরবি শিখেছে এবং শিখছে। তবে কেউ কুরআন বা ইসলাম বোঝার উদ্দেশ্যে শিখলে নিয়্যাত অনুযায়ী মুআমালাতের সাওয়াব পাবে। যেমন, খাদ্য গ্রহণ একটি জাগতিক কাজ, সকল ধর্মের ও ধর্মহীন মানুষেরাই খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু যদি কেউ ইবাদতের শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খাদ্য গ্রহণ করে তাহলে খাদ্য গ্রহণেও সাওয়াব পাবে।

অনুরূপভাবে যখন হাদীসের নামে মিথ্যা বলা শুরু হলো, তখন হাদীসের নির্দেশ অনুসারে মিথ্যা রোধ করতে সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ বিভিন্ন সতর্কতামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এগুলি সবই সুন্নাতে হাসানা। ইবাদত পালনের নিয়্যাতে এগুলি পালন করলে ইবাদত আদায়ে সাহায্যের পরিমাণ অনুসারে এতে সাওয়াব রয়েছে।

যেসকল সমস্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না এবং যেসকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো নির্দেশ নেই, সেসকল বিষয়ে এভাবে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্য প্রকাশ করেন, তাহলে তা ইসলামের দলিল বলে বিবেচিত হবে। এই অর্থেই ইবনু মাসঊদ বলেছেন : "মুসলিমগণ যা ভালো মনে করে তা আল্লাহর কাছে ভালো, আর মুসলিমগণ যা খারাপ মনে করে তা আল্লাহর কাছে খারাপ।" আমরা দেখেছি যে, একথাটি তিনি সাহাবাগণের ফযীলত ও তাঁদের এজমার বিষয়ে বলেছেন। এছাড়া সকল যুগের মুসলমানদের ইজমাও দলিল। যেসকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই সেসকল বিষয় সমাজে উদ্ভূত হলে মুসলিম উম্মাহর ইজমাই দলিল বলে গণ্য হবে। সকল মুসলিম একত্রে যদি এ ধরনের কোনো বিষয়কে ভালো বলে গ্রহণ করেন, তাহলে তা ভালো বলে শরীয়তে গণ্য হবে। আর মুসলিম উম্মাহ কোনোদিনই কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলার বিষয়ে ইজমা করেনি। বরং যখনই কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলা হয়েছে, তখনই উম্মতের সুন্নাত প্রেমিক উলামায়েকেরামগণ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

আমরা জানি, সকল বিদ'আতকেই কিছু মুসলমান ভাল এবং কিছু মুসলমান খারাপ বলে দাবি করেছেন। কাজেই সকল মুসলিমের সুস্পষ্ট ইজমা ছাড়া 'মুসলিমগণের' মতামত মূল্যহীন। ইজমার ক্ষেত্র ও শর্ত মোতাবেক ইজমা ছাড়া শুধু কিছু মুসলিমের বা অধিকাংশ মুসলিমের কোনো অধিকার নেই সুন্নাতের নির্দেশনার বাইরে কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানানোর অথবা দীনের অংশ হিসেবে ভালো বা মন্দ বলার। তাহলে তো আর নবী রাসূলের প্রয়োজন থাকে না, কুরআন সুন্নাহ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। আমরা দেখেছি সাহাবায়ে কেরাম কী কঠোরভাবে এই ধরনের ভালো-মনে-করার প্রতিবাদ করেছেন, এই ধরনের ভালো কাজকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নিষেধের জন্য তাঁদের একমাত্র দলিল – রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই কাজ সেই পদ্ধতিকে করেননি। এছাড়া অন্য কোনো দলিলের উপর তাঁরা নির্ভর করেননি।

(১৩). উদ্ভাবনের তৃতীয় ক্ষেত্র: বিশেষ কারণে পরিত্যক্ত সুন্নাত প্রতিপালন:

যদি কোনো কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালো জেনেছেন বা করেছেন, কিন্তু বিশেষ কারণবশত তিনি নিয়মিত করেননি বা পূর্ণ করেননি, সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে 'সুন্নাতের' নির্দেশ মতো তা পালন করা যাবে। যেমন, তিনি কুরআন কারীম লেখাতেন, সংকলন করাতেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা একত্রে সংকলিত করাতে বা 'বাইন্ডিং' করাতে পারেননি, কারণ তাঁর জীবদ্দশায় ওহী নাযিলের ধারা অব্যাহত ছিল, সংকলনের পরে ওহী নাযিল হলে আবার 'বাইন্ডিং' খুলতে হতো। তাঁর ইন্তিকালের পরে আবু বকর (রা) কুরআনের লিখিত সূরাগুলিকে একত্রে 'সংকলিত' করেন। কারণ তাঁর ইন্তিকালের ফলে ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে যায়, ফলে সংকলন না-করার কারণ দূরীভূত হয়। অপরদিকে সমাজে কিছু নতুন কারণ উদ্ভাবিত হয় যা সংকলনকে অতি প্রয়োজনীয় করে তোলে। বিভিন্ন যুদ্ধে হাফিজ সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, যাতে কুরআন কারীম সংকলিত না হলে তার কিছু অংশ হারিয়ে যাওয়ার ভয় দেখা দেয়।

অনরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সাহাবীগণ মাঝে মাঝে হাদীস লিখতেন, তবে কুরআন যেহেতু সংকলিত ছিল না সেহেতু কুরআনের পৃষ্ঠা ও হাদীসের পৃষ্ঠা মিশে গিয়ে পরবর্তী যুগে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সবাইকে

ঢালাওভাবে হাদীস লেখার অনুমতি দেননি। তবে তিনি হাদীস মুখস্থ করতে ও প্রচার করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং মিথ্যা থেকে হাদীসকে রক্ষা করতে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে কুরআন সংকলিত হয়। কুরআনের সহিত হাদীসের মিশে যাওয়ার কোনো ভয় থাকে না। অপরদিকে হাদীস মুখস্থ, প্রচার ও সংরক্ষণের মাসনূন ইবাদত পালনের জন্য হাদীস সংলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এজন্য তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উমর (রা) কর্তৃক সালাতুল্লাইল বা 'তারাবীহ' নামাযের জামাত নিয়মিত করাও এই ধরনের কাজ। তারাবীহ আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের আলোকে তাঁরা জানতেন যে, তিনি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তা আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন, নিজে সর্বদা আদায় করেছেন, সবাইকে নিয়ে জামাতে কয়েকদিন আদায় করেছেন, শুধু ফরয হওয়ার ভয়ে নিয়মিত জামাতে তারাবীহ আদায় করেননি। তাঁর ইন্তিকালের পরে ফরয হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়, তখন উমর সুন্নতের আলোকে নিয়মিত জামাতের ব্যবস্থা করেন।

সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই ইবাদতের ক্ষেত্রে কখনই কোনো নতুন রীতি প্রচলন করেননি। বরং তাঁরা যেকোন ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারতেন না। আমরা এই জাতীয় অনেক হাদীস আলোচনা করেছি।

(১৪). সকল বিদ'আতই সুন্নাত বিনষ্ট করে

বিদ'আতে হাসানা ও সাইয়্যেআহর পরিচিতির আলোকেই সকল বিদ'আত "সাইয়্যেআহ" বলে গণ্য হবে। কারণ শ্রেণিভাগকারীগণ বলেন যে, "যে সকল বিদ'আত সুন্নাতের প্রতিকূল বা কোনো সুন্নাতকে বিনষ্ট করে তা বিদ'আতে সাইয়্যেআহ। আর যে বিদ'আত কোনো সুন্নাতকে বিনষ্ট করে না, বরং সুন্নাতের অননুকূলে হয় তা বিদ'আতে হাসানা বলে গণ্য হবে।" এ সংজ্ঞা অনুযায়ী শুধুমাত্র জাগতিক, জনস্বার্থ বিষয়ক ও উপকরণ বিষয়ক উদ্ভাবন বিদ'আতে হাসানা হবে, কারণ এ সকল বিদ'আত মাসনূন ইবাদতকে পরিপূর্ণ সুন্নাত-সম্মতভাবে আদায় করার জন্য সহায়ক হয়। এগুলি তো মূলত বিদ'আতই নয়। এগুলিকে বিদ'আতে হাসানা না বলে সুন্নাতে হাসানা বলতে হবে। বাকি ইবাদত সংশ্লিষ্ট সকল বিদ'আতই বিদ'আতে সাইয়্যেআহ হতে বাধ্য। কারণ সকল বিদ'আতই সুন্নাতকে বিনষ্ট করে। যা কিছু সুন্নাতের অতিরিক্ত তাই মূল সুন্নাতকে নষ্ট করে দেয়। সুন্নাতের বাইরে কোনো কাজ যত ভালোই মনে করা হোক তা যদি রীতি হিসাবে প্রচলিত করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সুন্নাত রীতি বিনষ্ট হবেই।

যেমন, বাগদাদী, নাদিয়া বা নূরানী কায়দা উদ্ভাবনের ফলে তিলাওয়াতের কোনো সুন্নাত বিনষ্ট হয় না, বরং বিশুদ্ধ ও মাসনূন তিলাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 'দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত' উত্তম বলে রীতি প্রচলন করলে বসে তিলাওয়াতের সুন্নাত বিনষ্ট হবে। অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে বা নেচে নেচে যিক্র করার রীতি প্রচলিত হলে একা একা বসে বসে নীরবে যিক্রের সুন্নাত রীতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। শবে বরাতে দলবদ্ধ ইবাদত করার রীতি প্রচলন করলে একা একা ইবাদতের রীতি উঠে যাবে।

বিদ'আতের পরিচিতি : উপসংহার

আমরা দেখলাম যে, যারা বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করেছেন এবং যারা করেননি সকলের নিকটই 'সুন্নাত'-ই একমাত্র মানদণ্ড। মূল বিষয়টি ছিল 'সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয়' নিয়ে। যারা 'সকল নব- উদ্ভাবিত বিষয়' বলতে জাগতিক ও ধর্মীয় সকল বিষয় বুঝেছেন তাঁরা বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করেছেন। এরা মূলত ৩টি ক্ষেত্রে 'নব-উদ্ভাবন' জায়েয বলেছেন এবং তাকে বিদ'আতে হাসানা বলেছেন : (১). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশিত কোনো কর্ম পালন করার জন্য আনুসঙ্গিক উপকরণের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্ভাবন, যেমন – আরবি ভাষা শিক্ষা, কুরআন কারীমে স্বরচিহ্ন ব্যবহার, মাদ্রাসা মক্তব প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা ও শেখান ইত্যাদি। (২). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের পরে উদ্ভাবিত কোনো নতুন পরিস্থিতিতে বা কারণে কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে ইজতেহাদের মাধ্যমে কোনো বিধান প্রদান অথবা ইবাদত পালনের জন্য জাগতিক উপকরণ জাতীয় বিষয়ের উদ্ভাবন করা। (৩). জাগতিক ও অভ্যাসমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে নব-উদ্ভাবন। এই সকল ক্ষেত্রে নব-উদ্ভাবনকে তারা বিদ'আতে হাসানা বলেছেন। প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে এর গুরুত্ব নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া তাঁরা কখনেই কোনো ইবাদতের উদ্ভাবন জায়েয মনে করেননি। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা কোনো ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে বিদ'আত জায়েয বলেননি। বরং এ ক্ষেত্রে বিদ'আতকে তাঁরা 'সাইয়্যেআহ' বলেছেন।

অপর পক্ষে যারা বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করেননি তাঁরাও এই তিন ক্ষেত্রে নব-উদ্ভাবন জায়েয ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো এগুলিকে বিদ'আত বলেননি। তারা শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের জন্য বা 'ইবাদত' অর্থে কোনো নব-উদ্ভাবনকে বিদ'আত বলেছেন এবং সকল বিদ'আতকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলেছেন।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আত-কে সবাই নিন্দা করেছেন। কিন্তু অনেক সময় বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। অনেক বিদ'আত-প্রেমিক বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগের সুযোগে ইবাদতমূলক বিদ'আতকে 'বিদ'আতে হাসানা' বলে চালানর চেষ্টা করেছেন। আবার অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই শ্রেণিবিভাগের কারণে বিভ্রান্তিতে পড়ে ইবাদতমূলক কোনো কোনো নব-উদ্ভাবিত কাজতে 'বিদ'আতে হাসানা' বলেছেন। এভাবে নাচগান, মাদকদ্রব্য সেবন, কবর সাজদা, মানুষ সাজদা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজকে অনেকে বিদ'আতে হাসানা বলেছেন।

মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী ও বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ

(১). সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, সকল বিদ'আতই সাইয়্যেয়াহ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অনেক আলেম বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগের বিরোধিতা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। আমি এখানে শুধু মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী, শাইখ আহমদ ফারুকী সারহিন্দী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (৯৭১-১০৩৪ হি.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করেই এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করছি। তিনি এ বিষয়ে তাঁর মাকতুবাতের বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগের নিন্দা করেছেন। বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ যেন তাঁকে বিভ্রান্ত না করে এবং তিনি বা তাঁর কোনো অনুসারী যেন বিদ'আতে হাসানার প্রতি আকৃষ্ট না হন সেজন্য সকাতরে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। এক স্থানে তিনি লিখছেন :

"আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপনে এবং প্রকাশ্যে অপদস্থ, ভগ্নপ্রায় এবং মোহতাজির সহিত কাঁদাকাটি করিয়া আশ্রয় চাহিতেছি যে, দ্বীনের মধ্যে যাহা কিছু নূতনত্ব হইয়াছে, যাহা নবীয়ে কারীম (ﷺ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল না, যদিও উহা প্রভাতের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়, তথাপি যেন হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ-এর ওসীলায় আমাকে এবং আমার সহিত সম্বন্ধিত যাহারা তাহাদিগকে উক্ত কার্যসমূহে আকৃষ্ট না করেন এবং উক্ত বিদ'আতের সৌন্দর্য-মুগ্ধ না করেন।

আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, বিদ'আত দুই প্রকার – 'হাসানা', ও 'সায়্যেআহ্'। হাসানা (ভালো বিদ'আত) ঐ নেক আমলকে বলা হইয়া থাকে যাহা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানায় ছিল না বটে, কিন্তু উহা কোনো সুন্নাতকে উঠাইয়া দেয় না। 'সায়্যেআহ' (খারাপ বিদ'আত) ঐ আমলকে বলা হয় যাহা সুন্নাতকে উঠাইয়া দেয়। এ ফকীর কোনো বিদ'আতের মধ্যেই সৌন্দর্য এবং নূর (আলো) অবলোকন করিতেছে না ; উহাতে সে শুধুই তমশাময় অনুভব করিতেছে। দৃষ্টিহীনতাহেতু বিদ'আতিগণের কার্য যদিও এখন চাকচিক্যময় দৃষ্টিগোচর হইতেছে কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ করিলে জানিবেন যে, ইহাতে ক্ষতি ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত কোনোই লাভ হয় না। (প্রত্যুষে জানিবে তুমি দিবসের ন্যায় : নিশীথে কাহার সাথে করেছ প্রণয়।)

সাইয়্যেদুল বাশার হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ ফরমাইয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমাদের এই কার্যে (শরীয়তের কার্যে) নূতনত্ব করিবে যাহা ইহার মধ্যে নাই তাহা মরদুদ– (পরিত্যক্ত)।" অতএব যাহা মরদুদ তাহার মধ্যে সৌন্দর্য আর কোথা হইতে আসিবে! আরও তিনি ফরমাইয়াছেন, "অতঃপর নিশ্চয় উৎকৃষ্ট বাক্য আল্লাহর কেতাব এবং উৎকৃষ্ট আদর্শ হযরত মোহাম্মাদ ﷺ -এর আদর্শ। যাবতীয় নবউদ্ভাবিত কার্যই গোমরাহী (পথ ভ্রষ্টতা)।" আরও তিনি ফরমাইয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকিবে অবশ্য সে বহু মতভেদ দেখিতে পাইবে; তখন তোমরা আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিও এবং চর্বনকারী দন্ত দ্বারা তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিও। তোমরা নূতন কার্যসসূহ হইতে বিরত থাকিও। যেহেতু প্রত্যেক নূতন কার্য বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা।" অতএব, যখন প্রত্যেক নূতন কার্য বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা, তখন বিদ'আতের মধ্যে সুন্দর হওয়ার কী অর্থ হয়। উক্ত হাদীস এ ধরনের কথা বাতিল করিয়া দেয়। হাদীসের আলোকে বিদ'আতের মধ্যে কোনো বিদ'আতকে বাদ দেওয়ার অবকাশ বা বিশিষ্টতা নাই (এমন কোনো কথা নাই যে, কোনো বিদ'আত ভালো ও কোনো বিদ'আত খারাপ)। সুতরাং, প্রত্যেক বিদ'আতই সায়্যেআহ্ বা নিকৃষ্ট।

হযরত নবীয়ে করিম (ﷺ) ফরমাইয়াছেন যে, "যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয় ; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করা হইতে উত্তম।" হযরত হাসান (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন : "যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করে তখনই আল্লাহ তাহাদের মধ্য হইতে অনুরূপ সুন্নাত তুলিয়া নেন, পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তাহাদের মধ্যে সেই সুন্নাত ফিরাইয়ে দেন না।"[১]

(২). বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাত বিনষ্টকারী

মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন যে, বিদ'আত হাসানা হোক বা সাইয়্যেআহ হোক, সবধরণের বিদ'আতই সুন্নাতের বিনষ্টকারী। যেসকল বিদ'আতকে হাসানা বলা হয় এবং মনে করা হয় যে তা সুন্নাত নষ্ট করে না, প্রকৃতপক্ষে সেসকল বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাত বিনষ্ট করে। কাজেই, সকল প্রকার বিদ'আত, হাসানা হোক বা সাইয়্যেআহ হোক, পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র সুন্নাতের মধ্যে আবেদের কর্ম সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তিনি বলেন :

"জানা আবশ্যক যে, কোনো কোনো বিদ'আত বা নূতন কার্য যাহাকে আলেমগণ 'হাসানা' - উৎকৃষ্ট বলিয়া ভাবিয়াছেন, যখন তাহাতে ভালোভাবে চিন্তা করিয়া দেখা যায় তখন বুঝা যায় যে, সেইগুলিও সুন্নাত বিনষ্টকারী। যথা, মৃত ব্যক্তির কাফনের সহিত পাগড়ি প্রদান, ইহাকে আলেমগণ বিদ'আতে হাসানা বলিয়াছেন ; অথচ এই বিদ'আতই সুন্নাত বিনষ্টকারী। কেননা তিন বস্ত্র প্রদান সুন্নাত , ইহা তাহা হইতে অতিরিক্ত, কাজেই উক্ত সুন্নাতকে অপসারিত করা হইল। আর এই অপসারণ করাই উঠাইয়া দেওয়া। এইরূপ কোনো কোনো মাশায়েখ পাগড়ির শামলা (লেজ) বা পুচ্ছ বামদিকে রাখা উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, অথচ উহা স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখাই সুন্নাত। অতএব, ইহা যে সুন্নাত বিনষ্টকারী তাহা প্রকাশ্য কথা। এইরূপ আলেমগণ নামাযের নিয়্যাতের সময় দেলে এরাদা করা সত্ত্বেও মুখে উচ্চারণ করা উৎকৃষ্ট কার্য বলিয়াছেন। কিন্তু উহা হযরত নবীয়ে কারীম (ﷺ) হইতে সাব্যস্ত হয় নাই। 'সহীহ্' কিংবা 'যয়ীফ' কোনো প্রকারের রেওয়াতই এ বিষয়ে নাই। কোনো সাহাবী বা কোনো তাবেয়ী হইতেও বর্ণিত নাই যে, তাঁহারা জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করিয়া নিয়্যাত করিয়াছেন। বরঞ্চ বর্ণিত আছে যে, যখন ইকামত বলা হইত তখন তাহারা তাকবীরে তাহরীমা বলিতেন। কাজেই, ইহা বিদ'আত এবং (তাঁহারা) ইহাকে হাসান বলিয়া থাকেন। আমি জানি যে, এই বিদ'আত কি পরিমাণ সুন্নাত বরং ফরয অপসারিত করে। কেননা ইহা জায়েয রাখার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিই জিহবা দ্বারা উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, অমনোযোগিতার প্রতি কোনোই ভ্রূক্ষেপ করে না। কিন্তু দেলের (অন্তরের) নিয়্যাত যাহা ফরয তাহা পরিত্যক্ত হইয়া নামাজ বিনষ্ট হওয়ার পর্যায় উপনীত হয়।

অন্যান্য যাবতীয় বিদ'আত ও নূতন কার্যসমূহও এই প্রকারের। ইহারা , হাসানা বা সাইয়্যেআহ যে কোনো প্রকারেই হউক না কেন , সুন্নাত হইতে অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ততাই মিটাইয়া দেওয়া ও মিটাইয়া দেওয়াই উঠাইয়া দেওয়া। অতএব, হযরত নবীয়ে

কারীম (ﷺ) -এর অনুসরণের প্রতিই সংক্ষেপ করা কর্তব্য এবং সাহাবাগণের পায়রবী বা অনুসরণ যথেষ্ট মনে করাই উচিত।... অবশ্য 'কেয়াস' বা তুলনা করিয়া মাসআলা উদ্ধার করা এবং 'এযতেহাদ' অর্থাৎ, চেষ্টা করিয়া মাসআলা আবিষ্কার করা কোনো ক্রমেই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা উহা কুরআন শরীফের অর্থ প্রকাশক, অতিরিক্ত কোনো কার্যের নির্দেশক নহে। সুতরাং, "হে দূরদর্শীগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[১]

অন্য এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "সর্বশ্রেষ্ঠ নসীহত ইহাই যে, হযরত নবীপাক (ﷺ) -এর দ্বীন অনুসরণ করা ও তাহার সুন্নাত আদায় করা ও বিদ'আত হইতে বাঁচিয়া থাকা। যদিও বিদ'আত প্রাতঃকালের নির্মল অবস্থা হইতেও উজ্জ্বল হয়, তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোনো নূর নাই। উহাতে কোনো রোগের ঔষধও নাই। কেননা তাহা দুই অবস্থা হইতে মুক্ত নহে, হয় ইহা সুন্নাতকে একবারে দূর করিয়া দিবে, না হয় নিস্তেজ করিয়া দিবে। নিস্তেজ অবস্থায় অবশ্যই উহা সুন্নাতের অতিরিক্ত হইবে যাহা প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতকে দূরকারী (মনসুখকারী), কেননা কোনো দলিলের অতিরিক্ত কথা সেই দলিলের দূরকারী।

অতএব, জানা গেল বিদ'আত যে কোনো রকমেরই হউক না কেন, হয় উহা সুন্নাতকে উৎপাটন করিবে, না হয় উহার দুর্বল অবস্থা হইবে। ইহার মধ্যে কোনো রকমের সৌন্দর্য নাই। বড় দুঃখ যে, যখন দ্বীন ইসলাম পূর্ণ তখন তাহারা বিদ'আতকে কেমন করিয়া 'হাসানা' বলিয়া হুকুম দেন। ইহারা কি জানেন না যে "আকমাল" (নিখুঁত) ও "আতমাম" (পূর্ণ) ও "রেজা" (সন্তুষ্টি) হাসেল হওয়ার পর দ্বীনের মধ্যে কোনো নূতন কাজ পয়দা করা হাসান বা সুন্দর হইতে বহু দূরে। "ফামাজা বায়দাল হাক্কে ইল্লাদ্দালাল্" –নির্ভুলের অতিরিক্ত হইল ভুল। যদি তাহারা ইহা জানিতেন যে দ্বীনের মধ্যে নতুন কার্যকে হাসান বলা দ্বীনকে 'কামেল নহে' এই কথা বলা হইবে এবং নেয়ামতকে অসম্পূর্ণ বলা হইবে। এইরূপ হুকুম দেওয়া কখনই উচিৎ নয়।"[২]

(৩). বিদ'আত শয়তানের পছন্দ, সকল বিদ'আতই খারাপ

তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে বলেন যে, বিদ'আতে হাসানাকে অস্বীকার করা ও সকল বিদ'আতকে খারাপ বলাই একমাত্র হক্ব পথ, বর্তমান যুগে তা যত কঠিনই হোক। তিনি বলেন : "যাবতীয় সুন্নাত আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়, অতএব ইহার বিপরীত অর্থাৎ বিদ'আত শয়তানের পছন্দনীয়। ইদানীং বিদ'আত-সমূহের প্রচলন হেতু ইহা (বিদ'আতে হাসানা বিরোধী এই মত) অনেকের নিকট কঠিন বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু আগামীতে বা কেয়ামতে তাহারা জানিবে যে আমরা হেদায়েতের পথে আছি না তাহারা।

কথিত আছে যে, 'মেহদী' স্বীয় রাজত্বকালে যখন দ্বীনের প্রচলন প্রদান করিবেন এবং সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করিবেন তখন বিদ'আতকে হাসানা (উৎকৃষ্ট) জানিয়া দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করত আমল করা যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে এইরূপ মনিদার কোনো এক আলেম আশ্চর্য হইয়া বলিবে যে, "এই ব্যক্তি অর্থাৎ হজরত ইমাম মেহদী আমাদের দ্বীনকে উঠাইয়া নিতেছে এবং আমাদের ধর্মকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে"– তখন হজরত মেহদী তাহাকে বধ করিবার আদেশ প্রদান করিবেন এবং তাহার উক্ত বিদ'আতে হাসানাকে, তিনি সাইয়্যেআ বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।"[৩]

(৪). ইবাদতের নতুনত্ব বিদ'আত, জাগতিক বিষয়ে নতুনত্ব বিদ'আত নয়

ইমাম সারহিন্দীর (রাহ) এ মতবাদ তৎকালীন আলেম সমাজের নিকট প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তাঁরা বিভিন্নভাবে তার বিরোধিতা করেন। তিনি জহরী যিক্র বা সশব্দে যিক্র করা বিদ'আত হিসাবে নিষেধ করতেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মাঝেমধ্যে কোনো কোনো যিক্রের শব্দ জোরে বলেছেন, তবে সাধারণ যিক্র সশব্দে করতেন না। সকাল-সন্ধ্যার যিক্র বা সাধারণ সকল যিক্র সশব্দে করা তাদের পদ্ধতির বাইরে। এজন্য যিক্রের বাক্য, যিক্রের সময় সবকিছু সুন্নাত মোতাবেক হলেও যিক্রের পদ্ধতি সুন্নাত মোতাবেক না হওয়াতে তিনি একে বিদ'আত হিসাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেন।

একজন আলেম তাঁর এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি করে প্রশ্ন করেন যে, জলি যিক্র বা যিক্রে জহর, অর্থাৎ শব্দ করে যিক্র করা তরীকতপন্থীদের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী ইবাদত, এতে তাঁরা বিশেষ মজা, আনন্দ, উৎসাহ পেয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও আপনি একে বিদ'আত বলে নিষেধ করেন, শুধু এ যুক্তিতে যে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না। তাহলে তো বিভিন্ন প্রকারের পোশাক বা খাদ্য যা তাঁদের যুগে ছিল না তাকেও আপনার বিদ'আত বলে নিষেধ করা উচিত, আপনি তা করেন না কেন?

উত্তরে তিনি লিখেন : "আপনি আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি যিক্রে জহর (সশব্দে যিক্র করা) নিষেধ করিয়া থাকি, যেহেতু উহা বিদ'আত বা নূতন কার্য, কিন্তু উহা আনন্দদায়ক ও উৎসাহজনক। হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর জামানায় বহু কিছু ছিল না, যথা ফজী, শাল ও শালওয়ার ইত্যাদি তাহাতো নিষেধ করেন না? হে মান্যবর! হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর কার্যকলাপ দুই প্রকার, এক প্রকার আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগি জাতীয় এবং দ্বিতীয় প্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার ও অভ্যাস জাতীয়। ইবাদত জাতীয় কোনো কাজ তাঁহার (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যকলাপের) বিপরীত হইলে তাহাকে "দোষণীয়", "নূতন কার্য" (বিদ'আত) বলা হয় এবং ইহাকেই আমি কঠোরভাবে নিষেধ করিয়া থাকি। কেননা উহা ধর্মের মধ্যে নূতনত্ব করা, যাহা পরিত্যক্ত। পক্ষান্তরে সমাজ ও অভ্যাসানুযায়ী যে কার্য তাহা তাহার (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যকলাপের) বিপরীত হইলে তাহাকে দোষণীয় নূতন কার্য বা বিদ'আত বলিয়া গণ্য করি না। যেহেতু, ধর্মের সহিত উহার কোনোই সম্বন্ধ নাই। উহার অবস্থিতি ও অন্তর্হিতি সমাজের প্রতিই নির্ভরশীল, ধর্মের প্রতি নহে। কেননা, বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি বিভিন্ন প্রকারের এবং এক দেশেই কালের পরিবর্তনে আচার ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তা সত্ত্বেও ব্যবহারিক বিষয়েও সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখা ফলপ্রদ ও মঙ্গলজনক।"[৪]

(৫). আপেক্ষিক-অর্থে ছাড়া কোনো বিদ'আত হাসানা হতে পারে না

তাঁর মতে কোনো বিদ'আত কখনো ভালো হতে পারে না। তবে যে সকল আলেম কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলেছেন তাঁদের মতের তিনি দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন : **প্রথমত,** তাঁরা কোনো কোনো বিদ'আতকে 'হাসানা' বা ভালো বলেছেন আপেক্ষিক অর্থে, সাধারণ অর্থে নয় ; অর্থাৎ, এ সকল বিদ'আত অন্যান্য বিদ'আত থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো, যদিও মূলত তা খারাপ। এবিষয়ে তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন : *"সুন্নাত এবং বিদ'আত পরস্পর বিপরীত। অতএব, একটির অবস্থান অপরটির অন্তর্ধানের কারণ। সুতরাং, একটিকে পুনরুজ্জীবিত করিলে অপরটির মৃত্যু অনিবার্য, সুন্নাতের প্রচলন বিদ'আতের ধ্বংসের কারণ, অথবা ইহার বিপরীত (অর্থাৎ বিদ'আতের প্রচলন সুন্নাতের ধ্বংসের কারণ)। সুতরাং, বিদ'আত হাসানা (উৎকৃষ্ট) হউক বা সাইয়্যেআহ (নিকৃষ্ট) তাহা নিশ্চয় সুন্নাত অপসারিত করিবে। অবশ্য কোনো সম্বন্ধ হেতু তুলনামূলক সুন্দর বলিয়া গণ্য করা হয়, সাধারণভাবে 'সুন্দর' হওয়ার কোনোই অবকাশ নাই।"*[1]

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী যুগে যখন সুন্নাতেরই প্রাধান্য ছিল তখন ২/১ টি বিদ'আতকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিদ'আতের ছড়াছড়ি হয়ে গিয়েছে, তখন আর কোনো বিদ'আতকেই গ্রহণ করা ঠিক নয়, বিদ'আতে হাসানাকেও বিদ'আতে সাইয়্যেআহর মতো পরিহার করা উচিত। পূর্ববর্তী যে সকল আলেম কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলেছেন তাঁদের কথামতো ফতওয়া দেওয়া তাঁর যুগে উচিত নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন : *"অতীতের দিনে মনে হয় কেউ বিদ'আতের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য দেখিয়া থাকিবেন। সেকারণে তাহারা কোনো কোনো বিদ'আতকে 'হাসানা' বলিয়াছেন, কিন্তু এই ফকির এই কথায় একমত নহেন। বিদ'আতকে কোনো রকমেই 'হাসানা' জানা চলিবে না। তাহাতে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। নবী কারীম (ﷺ) বলিয়াছেন, "কুল্লু বিদ'আতীন দালালাতুন" – "প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।" আল্লাহ তা'আলা বর্তমান যুগের আলেমগণকে যেন এমন ক্ষমতা দেন যাহাতে তাঁহারা কোনো বিদ'আতকে আমল করা যেন জায়েয না বলেন। যদিও ঐ বিদ'আত তাহাদের দৃষ্টিতে প্রাতঃকালের ন্যায় নির্মল হয়, তথাপি তাহারা যেন তাহা শুভ বলিয়া গ্রহণ না করেন। অতীত কালে ইসলাম শক্তিশালী ছিল, সেইজন্য বিদ'আতের অন্ধকারকে দূর করা সম্ভব হইত। কোনো কোনো বিদ'আতের ভিতর ইসলামের সৌন্দর্যের জন্য তাহাও আলোকিত মনে হইত এবং সেইজন্য 'হাসান' এর পর্যায়ে আসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কোনো নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল না।"*[2]

(৬). তিনটি কারণে বিদ'আতে হাসানাকেও পরিত্যাগ করতে হবে

বিদ'আত যত ভালো বা হাসানা হোক তাকে পরিত্যাগ করার জন্য তিনি অত্যন্ত মূল্যবান ৩টি কারণ প্রদর্শন করেছেন : (১). বিদ'আত যত ভালোই দেখাক বা যত নির্মল দেখাক তার মধ্যে শয়তানের প্রবেশের পথ থাকে, কারণ তা মানুষের আবিষ্কার, মানুষের উদ্ভাবন। আর সুন্নাতের মধ্যে শয়তানের ধোঁকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না, কারণ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রচলিত ও আচরিত। কাজেই, সকল প্রকার বিদ'আতে হাসানা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র সুন্নাত মোতাবেক আমল করা প্রয়োজন। (২). সুন্নাতের মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্তা; কারণ, যে ব্যক্তি কোনো আমল শুধুমাত্র সুন্নাত পরিমাণ পালন করবে সে নিশ্চিত মনে আশা করতে পারবে যে, সে একটি সাওয়াবের কাজ আঞ্জাম দিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো বিদ'আতে হাসানার উপর আমল করল সে এই নিরাপত্তা পাবে না। তাঁর কর্মটির পক্ষে বিপক্ষে কথা আছে ; অতএব, তার কাজটি ভালো হতেও পারে নাও পারে। (৩). বিদ'আত পরিহার করে শুধু সুন্নাত পরিমাণ আমল করলে সুন্নাতকে জীবিত করার সাওয়াব পাওয়া যাবে, যা বিদ'আতে হাসানা পালন করলে পাওয়া যাবে না, বরং বিদ'আতে হাসানা পালন করলে সুন্নাত বিনষ্ট করার শাস্তি হবে, কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাতকে বিনষ্ট করে বা দুর্বল করে। তাই যে কোনো বিদ'আত- হাসানা বা সাইয়্যেআহ- পালন করা তাঁর মতে শয়তানের দলকে শক্তিশালী করার নামান্তর। – এ বিষয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি তাঁর পুত্র ও মুরীদদেরকে লিখেছেন :

"সর্বশ্রেষ্ঠ নসিয়ত, যাহা আমার প্রিয় ছেলে ও তামাম বন্ধুবর্গগণকে করা যাইতেছে, উহা এই যে – সুন্নাতের অনুসরণ করা এবং বিদ'আত হইতে বাঁচা। ইসলাম দিন দিন গরিব হইয়া যাইতেছে এবং মুসলমানের সংখ্যা অল্প হইয়া যাইতেছে। যতই মুসলমান মরিতে থাকিবে ততই ইসলাম গরিব হইতে থাকিবে। এমন কি পৃথিবীর উপর একজনও 'আল্লাহ আল্লাহ...' বলা লোক থাকিবে না। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যিনি ইসলামের এই দরিদ্র অবস্থায় কোনো পরিত্যক্ত সুন্নাত হইতে একটিকে বাঁচাইয়া রাখেন এবং প্রচলিত বিদ'আতের একটিকে মারিয়া ফেলেন।

এখন ঐ সময় যে হজরত নবীপাক ﷺ -এর পর হাজার বৎসর চলিয় গিয়াছে এবং কেয়ামতের আলামতগুলি ছায়া দিয়াছে। সুন্নাত বা সত্য নবুয়্যাতের যুগ দূরে চলিয়া যাওয়ার জন্য গোপন হইয়াছে এবং মিথ্যা বেশি আসার জন্য বিদ'আত বেশি প্রকাশিত হইয়াছে। এখন এইরূপ একজন শক্তিশালী লোকের আবশ্যক যিনি সুন্নাতকে সাহায্য (জীবিত) করেন এবং বিদ'আতকে দূর করেন। বিদ'আতকে প্রচলিত করিলে দ্বীন ধ্বংস হইয়া যাইবে। হাদীস শরীফে আছে : 'যিনি কোনো বিদ'আতীকে সম্মান করিলেন তিনি ইসলামকে ধ্বংস করিতে সাহায্য করিলেন।'

আপনি শুনিয়াছেন যে, সম্পূর্ণভাবে এইদিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, সুন্নাতসমূহের মধ্যে কোনো একটি সুন্নাত জারি হইয়া যায় এবং বিদ'আতের ভিতর হইতে কোনো (একটি) বিদ'আত দূর হইয়া যায় ; বিশেষ করিয়া এই যুগে। কেননা ইসলাম খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছে। ইসলামী রসুমত (প্রথা ও ভাবধারা) তখনই জারি হইয়া যাইবে যখন সুন্নাতকে সম্পূর্ণভাবে পালন করা হইবে এবং বিদ'আতকে দূর করা যাইবে। অতীত দিনে মনে হয় কেহ বিদ'আতের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য দেখিয়া থাকিবেন। সে কারণে তাহারা কোনো কোনো

বিদ‘আতকে ‘হাসানা’ বলিয়াছেন, কিন্তু এই ফকির এই কথায় একমত নহেন। বিদ‘আতকে কোনো রকমেই ‘হাসানা’ জানা চলিবে না। তাহাতে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। নবী কারীম (ﷺ) বলিয়াছেন : ‘কুল্লু বিদ‘আতীন দালালাতুন’ –‘প্রত্যেক বিদ‘আতই পথ ভ্রষ্টতা।’

ইসলামের এই দুর্দিনে নিরপত্তা নির্ভর করে সুন্নাত আদায় করার উপর এবং সমস্ত অমঙ্গল বিদ‘আত হইতে আসিয়াছে। প্রত্যেক বিদ‘আতই কুঠারের ন্যায়। ইহা ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করে। সুন্নাতকে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহা গোমরাহীর অন্ধকারে পথ প্রদর্শক।

আল্লাহ তা‘আলা বর্তমান যুগের আলেমগণকে যেন এমন ক্ষমতা দেন যাহাতে তাঁহারা কোনো বিদ‘আতকে আমল করা যেন জায়েয না বলেন। যদিও ঐ বিদ‘আত তাহাদের দৃষ্টিতে প্রাতঃকালের ন্যায় নির্মল হয়, তথাপি তাহারা যেন তাহা শুভ বলিয়া গ্রহণ না করেন। কেননা সুন্নাতের বাহিরে শয়তানের ধোঁকা দেওয়ার সম্ভাবনা অত্যান্ত অধিক।

অতীতকালে ইসলাম শক্তিশালী ছিল, সেইজন্য বিদ‘আতের অন্ধকারকে দূর করা সম্ভব হইত। কোনো কোনো বিদ‘আতের ভিতর ইসলামের সৌন্দর্যের জন্য তাহাও আলোকিত মনে হইত এবং সেইজন্য ‘হাসান’-এর পর্যায়ে আসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার মধ্যে কোনো নিজস্ব সৌন্দর্য ছিল না। এখন ইসলাম অত্যান্ত দুর্বল, সেই জন্য বিদ‘আতের অন্ধকারকে দূর করা যেন সম্ভব নয়। এখন পূর্বের ন্যায় পরের আলেমদিগের কোনো ফতোয়া দেওয়া উচিত নহে। কেননা প্রত্যেক সময়ের হুকুম বিভিন্ন। এখন দুনিয়াতে বিদ‘আতের আধিক্যবশত সবই অন্ধকারের সমুদ্র হইয়া গিয়াছে এবং সুন্নাত ক্ষণিক প্রভাদানের পর লুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বিদ‘আতের আগমন এ অন্ধকারকে আরও গভীর করিতেছে এবং সুন্নাতের নূর কম হইয়া যাইতেছে। সুন্নাত অনুসারে কাজ করা এই অন্ধকার দূর করার ন্যায়। ইহাতে সুন্নাতের সৌন্দর্য আরও ধীরে ধীরে অধিকতর হইয়া যাইবে। এখন আপনাদের ইচ্ছা যে আপনারা বিদ‘আতের অন্ধকারকে বাড়াইতেও পারেন আবার সুন্নাতের সৌন্দর্যকেও উজ্জ্বলতর করিতে পারেন। হয় আল্লাহর দলকে পুষ্ট করেন বা শয়তারেন দলকে পুষ্ট করেন। (আলা ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল মুফলেহুন আলা ইন্না হিজবাশ্‌শায়তানে হুমুল খাসেরুন –সতর্ক হও, আল্লাহ তা‘আলার দল সাফল্য পাইবে এবং শয়তানের দল ধ্বংস হইবে।)”[১]

(৭). সুন্নাতের অনুসরণ ও পুনরুজ্জীবনই মুজাদ্দিদের একমাত্র স্বপ্ন

এভাবে তিনি সকল প্রকার বিদ‘আতকে নিন্দনীয় প্রমাণিত করেছেন, তথাকথিত বিদ‘আতে হাসানা-সহ সকল প্রকার বিদ‘আত পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ করাকে সকল কল্যাণ, সকল বেলায়াত, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতীর একমাত্র পথ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর অনেক চিঠিতেই প্রাপকের জন্য দোয়া করেছেন যে, আল্লাহ তাকে সকল প্রকার বিদ‘আত পরিহার পূর্বক শুধু সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করেন।

যেমন : *“আল্লাহপাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ - এর পুর্ণ পায়রবী করিতে সুযোগ সুবিধা প্রদান করুন, আমীন।”[২] “আল্লাহ তা‘আলা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে যেন, হজরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অনুসরণের উপর সুদৃঢ় রাখেন। যে ব্যক্তি এই দোওয়ার প্রতি ‘আমিন’ বলিবে তাহাকেও আল্লাহ তা‘আলা যেন স্বীয় রহমত প্রদান করেন।”[৩] “ইহ-পরকালের সৌভাগ্য সাইয়্যেদুল কাওনায়েন হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণের উপর নির্ভর করে।... আল্লাহ পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে শরীয়তের কর্তা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণের প্রতি দৃঢ়তা প্রদান করুন।”[৪]* ইত্যাদি।

ছোট-বড়, সামন্য ক্ষুদ্র, যে কোনো মৃত সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করাকে তিনি তাঁর একমাত্র স্বপ্ন সাধনা বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, এক চিঠিতে লিখেছেন: *“ইদানীং হজরত নবীয়ে কারীম (ﷺ) -এর সুন্নাতসমূহের যে কোনো সুন্নাত হউক না কেন, তাহা প্রচলিত করা ব্যতীত আমার কোনো স্পৃহা নাই।”[৫]*

(৮). বিদ‘আতমুক্ত সুন্নাতের অনুসরণই বেলায়াতের ও কামালাতের পথ

মুজাদ্দিদে আলফে সানী আল্লাহর পথের পথিকদের নৈকট্য বা বেলায়াত অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন। সকল বেলায়াতের উৎস হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ। অনুসরণের পূর্ণতা ও গভীরতার উপরেই বেলায়াতের স্তর বৃদ্ধি পাবে। বেলায়াতের সর্বোচ্চ স্তরের মানুষদের পরিচয়ের মধ্যে অন্যতম হলো যে, তাঁরা বিদ‘আতে হাসানাকেও বিদ‘আতে সাইয়্যেআহর মতো পরিত্যাগ করেন এবং শুধু প্রথম যুগের কর্মের মধ্যে, অর্থাৎ সুন্নাতের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেন। উপরন্তু তিনি মনে করেন যে, তাসাউফের রিয়াজাত, মুজাহাদা ছাড়াও একজন মুসলমান সকল বিদ‘আত বর্জন ও শুধু সুন্নাত পালনের মাধ্যমে বেলায়াতের উচ্চ মাকামে পৌঁছাতে পারেন। তিনি বলেন:

“হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্যের পুঁজি। তাহার কয়েকটি মর্তবা ও পর্যায় আছে – অনুসরণের যে স্তরে নাফস মুতমায়িন্নাহ (শান্তিপ্রাপ্ত) হয় ও শরীয়াতের হাকীকাতে পৌঁছানো যায়, উহা কখনও ফানা, বাকা, সুলক, জজবার ওসিলা ভিন্ন লাভ হয় এবং কখনও এমনও হয় যে, হালসমূহ ও তাজাল্লীসমূহ কিছুই মাঝখানে থাকে না, অথচ এই দৌলত লাভ হয়। ... এই ফকিরের খেয়ালে অন্য রাস্তার অর্থ সুন্নাতের অনুসরণ করা ও বিদ‘আতের প্রথাসমূহ হইতে দূরে থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ‘আতে হাসানা থাকে, বিদ‘আতে সাইয়্যেআর ন্যায় তাহাকে বাছিয়া না চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমুদয়ের গন্ধও পর্যন্ত মস্তিষ্কে পৌঁছায় না। (কোনো বিদ‘আতে হাসানা পালনকারী এই উচ্চ বেলায়াতের গন্ধও পাবেন না- এ কথা) আজ খুব কঠিন কথা বলিয়া মনে হইতেছে। কেননা সমস্ত দুনিয়া

বিদ'আতরূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত বিদ'আতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কাহার শক্তি আছে যে বিদ'আত দূর করিতে সাহস করে এবং সুন্নাতকে জীবিত করার দাবি করে।

এই যুগে অধিকাংশ আলেমগণ বিদ'আতী প্রথাসমূহ চালনা করিতেছেন, এবং সুন্নাতকে মিটাইতেছেন। প্রচলিত বিদ'আতগুলিকে আসল বোধ করত জায়েয বরং সুন্দর বলিয়া ফতোয়া দিতেছেন এবং লোকদিগকে বিদ'আতের দিকে চালিত করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, যদি ভ্রষ্টতা প্রচারিত হয় ও বাতেল বিখ্যাত হইয়া যায়, তখন উহা আসলে পরিণত হয়। কিন্তু ইহারা জানে না যে, ইহা আসল ও সুন্দর হওয়ার দলিল নহে। যে আসল গ্রহণযোগ্য, উহা কেবল সেই আসলগুলি যাহা প্রথম সত্য যুগ হইতে আসিয়াছে, অথবা সমস্ত লোকগণ যাহার উপর একত্রিত হইয়াছেন।...

অবশিষ্ট রহিল প্রথম সত্যযুগের কার্যাবলী, প্রকৃতপক্ষে যাহা রাসূল কারীম ﷺ -এর স্বীকৃত ও যেগুলিকে সুন্নাত বলা হয়। এখানে বিদ'আত ও বিদ'আতে হাসানাই বা কোথায়? সাহাবাগণের পক্ষে সমস্ত প্রকারের কামালাত লাভের জন্য নবী কারীম ﷺ -এর সঙ্গলাভই যথেষ্ট ছিল। অগ্রবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্য হইতে যাহারা, সূফীগণের তরীকা অবলম্বন ব্যতীত, সুলুক ও জজবা অতিক্রম না করিয়া, ওলামায়ে রাসেখের (এই উচ্চ স্তরের বেলায়াতের) সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহারা কেবল সুন্নাতের অনুসরণ ও অপছন্দনীয় বিদ'আতসমূহ হইতে পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকার জন্য এই সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন।"[১]

অন্য চিঠিতে তিনি লিখেছেন : *"আসল কথার দিকে যাই। যে বস্তুতে স্বীয় প্রিয়জনের হাব-ভাব, স্বভাব, চরিত্র পরিলক্ষিত হয়, প্রিয় ব্যক্তির অনুকরণ হেতু তাহাকেও ভালো লাগে। এই রহস্যের বর্ণনাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা ফরমাইয়াছেন: 'ফাত্তাবেউনী ইউহবেব কুমুল্লাহ্' – 'তোমরা আমার অনুগামী হও, তাহা হইলে আল্লাহপাক তোমাদিগকেও ভালবাসিবেন।' অতএব, হজরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণ মাহবুবিয়াতের মাকামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। সুতরাং, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর জাহের-বাতেনের পূর্ণ অনুসরণ করা কর্তব্য।"*[২]"

মানব যতদিন পর্যন্ত নানারূপ আকর্ষণের কালীমায় কলুষিত থাকিবে, ততদিন সে বঞ্চিত ও বিরহী থাকিবে। হকীকতকে জামেয়া (প্রকৃত বস্তুর সমষ্টি) অর্থাৎ ক্বলবকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের মহব্বতের মরিচা দূর করণার্থে রেত দ্বারা ঘর্ষণ করা ব্যতীত উপায় নাই। উহা পরিষ্কার করার উৎকৃষ্ট রেত হজরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর সুন্নাতের পায়রবী করা।"[৩]

সুন্নাতকে জীবিত করা এবং বিদ'আতকে মেরে ফেলা সালেকের জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদার পথ। তিনি এক চিঠিতে লিখেন : *"অপর একটি গুণ – মুহয়ী, মুহয়ী অর্থ জীবন প্রদান কারী। যখন আধ্যাত্মিক ভ্রমণকারী পরিত্যক্ত সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করে, তখন সে উক্ত গুণে গুণময় হইয়া যায়। দ্বিতীয় আর একটি গুণ – "মুমিত"। সাধক যখন সুন্নাতের পরিবর্তে যে বিদ'আত বা অসৎকাজসমূহের প্রচলন হইয়াছে, তাহা ধ্বংস করত মৃতবৎ করিয়া দেয়, তখন সে উক্ত গুণধারী হয়।"*[৪]

(৯). সুন্নাতের বাইরে সকল রিয়াজত, মুজাহাদা ও সাধনা পথভ্রষ্টতা

সুন্নাতের বাইরে, সুন্নাতের অতিরিক্ত বা বিদ'আত পদ্ধতিতে যে কোনো আমল, যে কোনো কর্ম বা সাধনা প্রবঞ্চনা, পণ্ডশ্রম ও বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয় ; তাকে যতই হাসানা, ভালো, উপকারী, আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান ও ফলদায়ক মনে করা হোক না কেন। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : *"যাঁহারা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর পূর্ণ অনুসরণ করেন, তাঁহারাও এই দুষ্প্রাপ্য মাকামের পূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব, কেহ যদি এই উচ্চ দরজা (স্তর) ও মহান সৌভাগ্য লাভ করিতে চায়, তবে সে তাঁহার পূর্ণ অনুসরণের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করুক।"*[৫]

অন্যত্র লিখেছেন : *"গ্রিসের দার্শনিকগণ ও ভারতের যোগী-সন্ন্যাসীগণ কঠোর সাধনা করিতে কোনোরূপ ত্রুটি করে নাই। কিন্তু উহা শরীয়তের অনুকূল নহে বলিয়াই উপেক্ষিত এবং পরকালের মুক্তি হইতে তাহারা বঞ্চিত। সুতরাং, আপনাদের উপর কর্তব্য যে যিনি আমাদের সর্বপ্রধান কর্তা এবং শাফায়াতকারী ও আমাদের আত্মার চিকিৎসক হযরত মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, তাঁহার এবং তাঁহার খলিফ চতুষ্টয়ের দৃঢ়তার সহিত পদানুসরণ করিতে থাকেন।"*[৬]

(১০). সুন্নাত-মতো সামান্য কর্ম কঠিনতম সাধনার চেয়ে উত্তম

সুন্নাতের অনুসরণ করার অর্থই হলো, সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কর্ম না করা। কারণ যা কিছু সুন্নাতের অতিরিক্ত তা সবই অন্যায় ও প্রতারণা। তিনি লিখেছেন : *"প্রিয় বৎস, আগামীতে যাহা কার্যে আসিবে, তাহা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণ। আত্মিক অবস্থা ও লম্ফ-ঝম্প এবং আধ্যাত্মিক ইল্‌ম, মারেফাত ও ইশরা ইঙ্গিতাদি যদি শরীয়তের অনুকূল হয় তবেই ভালো, অন্যথায় অন্যায় ও প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।... অতএব, হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ দৃঢ়তার সহিত করিবেন... ।"*[৭]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন : *"যদি কেহ সহস্র বৎসর ধরিয়া ইবাদত বন্দেগি, কঠোর ব্রত ও অসাধ্য সাধন করে এবং পয়গম্বর (আ.)-গণের অনুসরণের নূরের আলোতে আলোকিত না হয়, তবে উক্ত সাধনার এ কদর্পকও মূল্য হইবে না। দ্বিপ্রহরের নিদ্রা, যাহা পয়গাম্বর (আ.)- গণের সুন্নাত এবং যাহা সরাসরি অচৈতন্য (অর্থাৎ, যাহা কোনো কর্মই নয়, শুধু আরামে অচেতন হওয়া) উল্লেখিত কঠোর*

সাধনাবলী ইহারও সমতুল্য নহে... ।"[১]

১১) অনুসরণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে হতে হবে

অনেক ধার্মিক মানুষ 'সুন্নাত' বললেই বাহ্যিক সুন্নাত বা পোশাক পরিচ্ছদ ও জাগতিক বিষয়ের সুন্নাত বুঝে নেন। মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী বিভিন্ন স্থানে বুঝিয়েছেন যে, মূল বিষয় এর সম্পূর্ণ উল্টো। সুন্নাত ও সুন্নাতের অনুসরণ মূলত ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে। পোশাক পরিচ্ছদ ও জাগতিক বিষয়ে সুন্নাতের খেলাফ কর্ম করার সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি অনুসরণ শুধু বাহ্যিক কর্মে হলেই হবে না। হৃদয়ের কর্মেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্ণ অনুসরণ আবশ্যক। এজন্য ইমাম সারহিন্দী বিভিন্ন চিঠিতে অনুসরণের কথা উল্লেখ করে 'বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ' অনুসরণ করার উপরে তা'কিদ প্রদান করেছেন। এক চিঠিতে লিখেছেন : *"মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ইবাদতসমূহ প্রতিপালন করা এবং সদা সর্বদা তাঁহারই দিকে লক্ষ্য রাখা। ইহ-পরকালের সরদার নবীয়ে কারীম ﷺ -এর আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত ইহা লাভ করা সম্ভবপর নহে। আল্লাহ পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে কথাবার্তায় ও কার্যকলাপে বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে আমল দ্বারা ও বিশ্বাস দ্বারা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর পূর্ণ অনুসরণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।"*[২]

এখনে সুন্নাত বলতে স্বভাবতই তিনি পূর্ণ "শরীয়তে মুহাম্মাদী" বুঝাচ্ছেন। অর্থাৎ, শরীয়তের সকল কাজে তাঁরই পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর কর্মের অতিরিক্ত কিছুই করা যাবে না। এই অর্থে তিনি মাঝে মাঝে সুন্নাত, অনুসরণ, এত্তেবা, শরীয়ত ইত্যাদি শব্দ পরস্পরের সম্পূরক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এক চিঠিতে লিখেছেন : *"সকল প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং বোজর্গীর আধিক্য তাঁহার, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর, অনুসরণ ও উজ্জ্বল শরীয়ত প্রতিপালনের উপর নির্ভর করে। যথা, হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণ করিয়া দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যাওয়া তাঁহার অনুসরণের বিপরীত শত সহস্র রাত্রি জাগরণ হইতে শ্রেষ্ঠ।... সুন্নাতের অনুসরণ করা যাবতীয় সৌভাগ্যের মূলধনস্বরূপ এবং শরীয়তের বিপরীত কার্য অনর্থের মূল। আল্লাহ পাক আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণের প্রতি সুদৃঢ় রাখুক।"*[৩]

অন্যত্র লিখেছেন : *"ইহ পরকালের সৌভাগ্যরত্ন হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। সুন্নাত জামাতের আলেমগণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, সর্ব্বপ্রথমে তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। তৎপর হালাল, হারাম, ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত, মোস্তাহাব, মোবাহ-বৈধ ও সন্দিগ্ধ বিষয়সমূহ জানিয়া লইতে হইবে ও তদ্রূপ আমল করিতে হইবে। যখন আমল ও বিশ্বাস এই দুই 'বাজু' লাভ হইবে, তখন ভাগ্য সহায়তা করিলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র দরবারের দিকে উড্ডীয়মান হইতে পারিবে। ইহ ব্যতীত মেহনত বরবাদ। নিকৃষ্ট দুনইয়া এবং উহার ধন-দৌলত, মন-সম্মান লাভ, উদ্দিষ্ট-বস্তু হইবার যোগ্যতা রাখে না। উচ্চলক্ষ্যধারী হওয়া উচিত। মাধ্যমে হউক অথবা বিনা মাধ্যমে হউক আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাঁহাকেই যাচঞা করা কর্তব্য। ইহাই প্রকৃত কার্য, আর সবই অনর্থক।"*[৪]

(১২). বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতের অনুসরণই সঠিক মহব্বতের পরিচায়ক

বিদ'আতকারীর মহব্বতের দাবি বাতুলতা মাত্র। একজনের মহব্বতের দাবি করে আরেক জনের অনুসরণ কী-ভাবে করা যায়। পরিপূর্ণ অণুসরণই মহব্বতের দাবি। একজন আশেকে-রাসূল (ﷺ) কখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের বাইরে কোনো কর্ম বা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না, তা যত ভালোই হোক না কেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন : "হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত অভ্যান্তরীণ মিরাস (উত্তরাধিকার) লাভ হয় না। অতএব, তাঁহার অনুসরণ ও আদেশ নিষেধাদি প্রতিপালন একান্ত কর্তব্য এবং তাহার পূর্ণ অনুসরণ পূর্ণ মহব্বতের শাখা মাত্র। [যে জন যাহার প্রেমে নিমজ্জিত হয়, সে জন তাহার বাধ্য হইবে নিশ্চয়]।"[৫]

১৩) সূফীগণের কয়েকটি বিদ'আতের প্রতিবাদে মুজাদ্দিদে আলফে সানী

(ক). প্রথম যুগের সূফীয়ায়ে কেরাম বনাম পরবর্তী যুগের সূফীগণ

আমরা ইতঃপূর্রে উল্লেখ করেছি যে, প্রথম যুগের সূফীয়ায়ে কেরাম ছিলেন পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী। তাঁরা একদিকে যেমন ছিলেন কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের জ্ঞানে পারদর্শি, অপরদিকে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অনুসরণে ও অনুকরণে আধ্যাত্মিক সাধনা ও উৎকর্ষতায় অগ্রগামী। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের সূফীগণ মূলত কুরআন, সুন্নাহ ও সাহবীগণের জীবনাদর্শের আলোকে বেশি বেশি নফল ইবাদত, পার্থিব লালসা ত্যাগ, প্রবৃত্তির বিরোধিতা, নির্জনবাস ইত্যাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করতেন। তাঁরা সকলেই মূলত কুরআন সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা ও অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। এ বিষয়ে ৩য় শতকের কয়েকজন প্রখ্যাত সূফীর বাণী আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

কিন্তু, পরবর্তী কালে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক অস্থিরতা, ফিকাহ, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান চর্চার অভাব, বিজাতীয় প্রভাব ইত্যাদি কারণে সূফীদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন পদ্ধতি বিদ'আতে হাসানা বা জায়েয হিসাবে প্রসার লাভ করে, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি সুপরিচিত বিদ'আতে হাসানার কথা মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বিদ'আত : 'জলি যিক্র' বা সশব্দে যিক্র করা

যিক্র ইসলামের অন্যতম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী শব্দে যিক্র করতে হবে, কখন কী-ভাবে করতে হবে তা সবই

শিখিয়েছেন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ তা পালন করেছেন। তাঁরা কখনো সমবেতভাবে সশব্দে যিক্র করেননি। কখনো কখনো কোনো কোনো যিক্রের শব্দ ব্যক্তিগতভাবে সশব্দে বলেছেন। যেমন, বিতর নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' বলতেন। শেষবারে সশব্দে টেনে টেনে বলতেন। অনেক সময় নামাযের সালাম ফেরানর পরে দু'একবার তাকবীর তাহলীল শব্দকরে বলেছেন। এধরনের কিছু ঘটনা ছাড়া সাধারণভাবে সকল নিয়মিত যিক্র নীরবে মনে মনে আদায় করতেন। তাঁর এই দু'একবার সশব্দে যিক্রের উপর ভিত্তি করে সশব্দে যিক্র জায়েয বলা হয়েছে। এরপর সূফীগণ শব্দ করে যিক্রকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অধিকাংশ যিক্র সশব্দে বা জোরে জোরে আদায় করাই তাঁদের রীতিতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিদ'আত : দাঁড়িয়ে বা লাফালাফি করে যিক্র করা

কয়েক শতাব্দী যাবৎ সূফীদের মধ্যে সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হেলেদুলে বা লাফালাফি করে যিক্রের রীতি প্রচলিত। অনেক আলেম এসব সমর্থন করেন। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো যে, এই পদ্ধতির যিক্র যদিও সাহাবীদের যুগে ছিল না, কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুযায়ী দাঁড়িয়ে, বসে সর্বাবস্থায় যিক্র করা জায়েয। এই নতুন পদ্ধতিতে যিক্রের ফলে যিক্রকারী অনেক বেশি আল্লাহর মহব্বত ও হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন। কাজেই, এতে কোনো দোষ থাকতে পারে না। সুন্নাত না হলেও তা বিদ'আতে হাসানা ও মুস্তাহাব হবে।

তৃতীয় বিদ'আত : চেল্লাকাষি ও নির্জনবাস

ব্যক্তি হৃদয়কে পবিত্র করতে এবং পার্থিব আকর্ষণ থেকে বিমুক্ত করতে নির্জনবাসের ফল অতুলনীয়। এ জন্য বিভিন্ন ধর্মের সাধকগণ প্রাচীনকাল থেকে নির্জনবাস বা সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন। তারা জগতের সকল কোলাহল হতে মুক্ত থেকে একাগ্র মনে শুধু তাদের প্রেমাস্পদ স্রষ্টার উপাসনা ও ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন। এভাবে তারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও উন্নতি অর্জন করেছেন। ইসলামে এ ধরনের নির্জনবাস বা সন্ন্যাসকে কখনই সমর্থন করা হয়নি। বরং সমাজে থেকে সমাজের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে নিজে ভালো থাকতে ও সমাজকে ভালো পথে পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণভাবে সমাজ পাপময় হলে সমাজের মধ্যে থেকেই ব্যক্তিগত জীবনে কিছুটা একাকী হয়ে যাওয়াকে সমর্থন করা হয়েছে। এ সকল সাধারণ নিষ্ক্রীয়তার হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেক সূফী সাধক পুরোপুরি নির্জনবাস বা বনে জঙ্গলে অবস্থান বেছে নিয়েছেন। তাঁরা এগুলিকে আল্লাহ প্রেমের উচ্চ শিখরে আরোহণের, বেলায়াত ও কারামাত অর্জনের অন্যতম পথ মনে করেছেন। মধ্যযুগীয় যে কোনো সূফী সাধকের গ্রন্থে বা জীবনীতে আমরা এধরনের অনেক ঘটনা দেখতে পাব। চিশ্‌তিয়া ও অন্যান্য সূফী তরীকায় চেল্লাকাষি বা ৪০ দিন অথবা কয়েক ৪০দিন নির্ধারিতভাবে নির্জনবাসকে বিশেষভাবে তরীকতের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

চতুর্থ বিদ'আত : সামা সঙ্গীত ও গান বাজনা

ইসলামের প্রথম যুগগুলিতে 'সামা' বা শ্রবণ বলতে শুধুমাত্র কুরআন শ্রবণ ও রাসূলে আকরামের জীবনী, কর্ম ও বাণী শ্রবণকেই বোঝান হতো। এগুলিই তাঁদের মনে আল্লাহ-প্রেমের ও নবী-প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। কোনো মুসলিম কখনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম সৃষ্টি করার জন্য গান শুনতেন না। সমাজের বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিনোদন হিসাবে গানবাজনার সীমিত প্রচলন ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম জানতেন। ২/১ জন বিনোদন হিসাবে একে জায়েয বলার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনই এসকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয়নি।

গান বাজনা এক পর্যায়ে সূফী ও ধার্মিক মানুষদের ধর্মকর্মের অংশ হয়ে যায়। তারা একে 'সামা' বা শ্রবণ বলতেন। এই 'সামা' বা সঙ্গীত ৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে সূফী সাধকদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম অংশ হয়ে যায়। সামা ব্যতিরেকে কোনো সূফী খানকা বা সূফী দরবার কল্পনা করা যেত না। সাধারণ গায়কদের প্রেম, বিরহ ও মিলনমূলক গান সূফীগণ গাইতেন ও শুনতেন। এ সকল গান তাঁদের মনে আল্লাহর প্রেম, তাঁর সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও বিরহের বেদনার আবেশ সৃষ্টি করত। তখন তাঁরা গানের তালে তালে নাচতে থাকতেন এবং অনেকেই আবেগে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলতেন। কেউ বাজনাসহ, কেউ-বা বাজনা ব্যতিরেকে গান গেয়ে ও নেচে নিয়মিত সামার মাজলিস করতেন। কারণ, এ সকল গান গজল আল্লাহ প্রেমিক ভক্তদের মনে আল্লাহর প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করত। তাঁরা সামাকে আল্লাহ প্রাপ্তির ও আল্লাহ প্রেম অর্জনের অন্যতম মাধ্যম মনে করতেন।

সামা, গান বাজনা ও ইমাম গাযালী

সমাজে যখন কোনো কাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, বিশেষত ধার্মিক ও ভালো মানুষদের মধ্যে, তখন অনেক আলেম এসকল কর্মের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন এবং এগুলোকে জায়েয বা ইসলাম-সম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। গান বাজনার ক্ষেত্রেও এই অবস্থা হয়। কোন কোন আলেম সূফীদের প্রতি সম্মান হেতু এবং হৃদয়ে গানের ফলে যে আল্লাহ প্রেমের আবেশ ও আনন্দ পাওয়া যায় তার দিকে লক্ষ্য করে এগুলোকে জায়েয বলেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.)। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন" –এ সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে গান বাজন ও নর্তন কুর্দনকে জায়েয বা শরীয়ত-সঙ্গত বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এসকল কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না। তিনি দাবি করেছেন – গান, বাজনা, গান বাজনার মাহফিল, গানের মাহফিলে নাচা, পাগড়ি খুলে ফেলা, কাপড় ছেড়া ইত্যাদি বিদ'আতে হাসানা এবং জায়েয। শুধু তাই নয়, এ সকল কর্মকে আল্লাহর পথের পথিকদের পাথেয় বলে মনে করেছেন।[1]

সামা গান বাজনা ও শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী

অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের বহুল প্রচলনকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী

ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন। এ সকল যুগে যেহেতু গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ইত্যাদি কখনই আল্লাহর পথের পথিকদের কর্ম ছিল না, বরং সমাজের পাপী অশ্লীলতায় লিপ্ত লোকেদের কর্ম ছিল, তাই সূফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে বহুল প্রচলন সত্ত্বেও তাঁরা এগুলিকে মেনে নেননি, বরং তা রোধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা অনুভব করতেন যে, তাঁদের কথা সাধারণ সূফীগণ মেনে নিচ্ছেন না এবং তাঁরা গান বাজনা ও নর্তন কুর্দনের জোয়ারকে থামাতে পারছেন না। শাইখ আব্দুল কাদের জীলানীর (৫৬১ হি.) কথায় আমরা তা অনুভব করি। তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের অন্যতম আলেম ও সাধক। তিনি নিজে বাজনা ও নৃত্যসহ সামার বিরোধী হলেও সেই যুগের সূফী সাধকদের মধ্যে এ ধরনের বাজনা ও নাচসহ সামার বহুল বিস্তারের কথা স্বীকার করেছেন এবং প্রকারান্তরে অবস্থার প্রেক্ষিতে তা মেনে নিয়েছেন। তিনি তাঁর "গুনিয়াতুত্ব ত্বালিবীন" গ্রন্থে সেমা অনুষ্ঠানকালীন আদব শীর্ষক অধ্যায়ে লিখছেন :

"সেমার অনুষ্ঠান চলাকালে মুর্শিদের সম্মুখে কোনোরূপ অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা নৃত্যাদি করিয়া উঠা চাই না। এ সময় যদি মুরিদের প্রতি মুর্শিদের কোনো খাস তাওয়াজ্জুহের ফলে তাহার ভিতরে কোনো বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তাহার কারণে আত্মবিস্মৃতির ভাব সৃষ্টি হইয়া তাহার মধ্যে অঙ্গভঙ্গী কিংবা দেহ নাড়াচাড়া শুরু হইতে থাকে, এমতাবস্থায় সৃষ্ট অবস্থাকে মাফ করা যাইতে পারে... । সেমা সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা হইল, কাওয়ালী, বাজনা ও নৃত্যকে আমরা জায়েয মনে করি না। তবে দেখা যাইতেছে, এ যুগের বহু দরবেশ নিজ নিজ খানকায় উহার আম প্রচলন শুরু করিয়াছেন। তবে এই ব্যাপক প্রচলনের কারণেই যে একটি নিষিদ্ধ জিনিস সিদ্ধ হইয়া যায় তেমন কোনো কথা নয়। এ কথা অবশ্য সত্য যে, বাজনা ও নৃত্যহীন আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর স্তুতি এবং নাত ও হামদসূচক সেমা অত্যন্ত খালেস ও পবিত্র দিলে যদি করা হয় এবং অনুষ্ঠানে কোনোরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উহা বিভিন্ন ওলী-আউলিয়া কর্তৃক সিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তবে সিদ্ধ কি নিষিদ্ধ যাহাই হউক না কেন, সেমার অনুষ্ঠানেও মুরীদদিগের মুর্শিদের আদব রক্ষা করা কর্তব্য। সেমার মজলিসে খোদ মুর্শিদ উপস্থিত থাকিলে মুরীদগণ কাওয়ালকে কখনও একা বলিবে না যে, তুমি তোমার এই গজল বন্ধ রাখিয়া অমুক বিষয়ের একটি গজল বল বা তোমার এই গজলটি খুবই উত্তম ইহা আর একবার বল। এইসব ব্যাপার শুধু মুর্শিদের উপরই নির্ভর করা চাই।"[১]

আলফ-ই-সানীর যুগে সামা সঙ্গীত তাসাউফের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল

এভাবে ক্রমান্বয়ে বাজনা ছাড়া বা বাজনাসহ 'সামা' ও সেই সঙ্গে আবেগে নৃত্যকরা, জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলা তাসাউফের অন্যতম অংশে পরিণত হয়। কেউ যদি মধ্য যুগের সূফীদের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থাদি, অথবা অন্যন্য সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখকদের লেখা তাদের জীবনী পড়েন তাহলে মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানীর যুগে বিষয়টির ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা বুঝতে পারবেন। ভারতের সূফীদের মধ্যে, বিশেষত চিশ্‌তিয়া তরীকার সূফীদের মধ্যে সামা গান, তৎসঙ্গে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নাচ ও বেহুঁশ হওয়ার ব্যাপকতা অনুধাবন করার জন্য আমি পাঠককে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর "আনিসুল আরওয়াহ", খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কীর "দলীলুল আরেফীন", খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকরের "ফাওয়ায়েদুস সালেকীন", খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার "রাহাতিল কুলূব", "রাহাতুল মুহিব্বীন", আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর "আখবারুল আখইয়ার" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(খ). মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানীর প্রতিবাদ

এরূপ পরিবেশে ইমাম সারহিন্দী এ সকল বিদ'আতে হাসানার কঠিন বিরোধিতা করেছেন। প্রথম যুগের সূফীদের পদ্ধতিতে চলার পরামর্শ প্রদান করেছেন। অন্য সকল পদ্ধতিকে বাতুলতা বলেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে, নক্শাবন্দিয়া তরিকার মূল মাশায়েখগণ সকল বিদ'আত বর্জন ও শুধু সুন্নাতের অনুসরণ করে চলেছেন এবং এতেই তাঁরা মর্যাদা লাভ করেছেন। শুধু সুন্নাতের অনুসরণই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র আশা ও বাসনা। এজন্য তরীকতের আর কোনো নেয়ামত, তৃপ্তি, আনন্দ, মারেফাত কিছুই না পেলেও তাঁদের কোনো কষ্ট ছিল না। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : *"যেহেতু এই বুজর্গগণ সুন্নাতের অনুসরণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছেন এবং বিদ'আত হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকেন।এই হেতু ইঁহারা যদি সুন্নাতের অনুসরণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা কিছুই অনুভব না করেন তথাপি সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু উক্ত হালতসমূহ লাভ হওয়া সত্ত্বেও যদি (সুন্নাতের) অনুসরণে ব্যতিক্রম ঘটে তবে উহা মোটেই পছন্দ করেন না।"[২]*

(গ). সুন্নাত প্রেমিক সূফীদের অনুসারীগণও বিদ'আত প্রেমিক হয়ে গেল

সকল সংস্কার আন্দোলনই ক্রমান্বয়ে বিদ'আতের মধ্যে চলে যায়। সংস্কারকদের ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তি, অনুসারীদের ভুলব্যাখ্যা, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি কারণে অনুসারীদের মধ্যে বিদ'আত ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ইমাম সারহিন্দী খুবই আফসোস করেছেন যে,তাঁর যুগে নকশাবন্দীয়া তরীকার অনুসারীদের মধ্যেই ব্যাপক বিদ'আতের প্রচলন ঘটে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

"আপনি জানিবেন যে, এই নকশাবন্দিয়া তরীকার উচ্চতা সুন্নাতের অনুসরণ এবং বিদ'আত হইতে পূর্ণরূপে বিরত থাকার কারণেই হইয়াছে। এইহেতু এই তরিকার বোজর্গগণ জেহরী যিক্‌র বা সশব্দে যিক্‌র করা নিষেধ করিয়াছেন এবং যিক্‌রে-ক্বলবী অর্থাৎ অন্ত র দ্বারা যিক্‌র করিতে আদেশ দিয়াছেন। নাচ গান ও লম্ফ-ঝম্প করা যাহা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ --এর জামানা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানায় ছিল না তাহা নিষেধ করিয়াছেন। নির্জন বাস ও চেল্লাকষি যাহা সাহবাগণের যুগে ছিল না তাহার পরিবর্তে ইহারা জনতার মধ্যেই নির্জন বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব, তাঁহারা সুন্নাতের অনুসরণ দ্বারা বহু ফল লাভ করিয়াছেন।... এ জামানায় উক্ত নেসবত আনকা (আকাশ কুসুম) বা গুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। ... (এখন নকশাবন্দিয়া তরীকার অনুসারীগণ) অস্থির হইয়া অনেকে

স্বীয় পূর্ববর্তী বোজর্গদের পথ পরিত্যাগ করত জেকরে জহর বা সশব্দে যিক্র করিয়া শান্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কখনো বা নাচ গানের মধ্যে শান্তি খুঁজিতেছেন। জনতার মধ্যে তাঁহারা নির্জন বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া চেল্লাকাষি ও নির্জন বাস আরম্ভ করিয়াছেন। আশ্চার্যের বিষয় যে, তাঁহারা এই বিদ'আত কার্যসমূহকে এই তরিকার নেসবতের পূর্ণতাকারী মনে করিতেছেন এবং ধ্বংসকেই তাহারা আবাদ করা ভাবিতেছেন।... মখদুম ভাই, বিদ'আতসমূহ এই তরিকায় এত প্রচলন পাইয়াছে যে, যদি বিপক্ষ দল বলে যে, এই তরীকা বিদ'আত প্রচলন ও সুন্নাত বিসর্জনের তরিকা তাহাও বলিতে পারে।...”[১]

বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ : আমাদের কথা

সুপ্রিয় পাঠক, উপরের আলোচনা থেকে আমরা বিদ'আতের ব্যাখ্যা ও তার প্রকারভেদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত জানতে পারলাম। এই গ্রন্থের লেখকের এমন কোনো যোগ্যতা নেই যে, সে তার নিজের কোনো মত বর্ণনা করবে। তবে সাধারণত পাঠক লেখকের মতও জানতে চান। এজন্য আমি বিনয়ের সাথে বলছি যে, এ বিষয়ে আমি দ্বিতীয় মতটিকেই সুন্নাতের আলোকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছি। অর্থাৎ, বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করা বা কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পরে দ্বীনের অংশ হিসাবে অথবা সাওয়াব ও তাকওয়ার কাজ হিসাবে উদ্ভাবিত সকল নতুন কর্ম, রীতি ও পদ্ধতিই বিদ'আত। এবং সকল বিদ'আতই সাইয়্যেআহ, পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী।

আমাদের বিশ্বাস হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যখন, যেভাবে, যতটুকু যে গুরুত্ব দিয়ে করেছেন তা তখন সেভাবে সেই পরিমাণ ও সেই গুরুত্ব দিয়ে করাই সুন্নাত। তিনি যা করেননি তা না করাই সুন্নাত। তাঁর সুন্নাতের পরিমাণগত, পদ্ধতিগত, গুরুত্বগত বা অন্য যে কোনো ব্যতিক্রম 'খেলাফে-সুন্নাত' বলে গণ্য হবে। 'খেলাফে-সুন্নাত' কর্ম বা বর্জন সুন্নাতের নির্দেশনার আলোকে জায়েয, মাকরুহ বা হারাম হতে পারে।

যে কোন 'খেলাফে সুন্নাত' কর্ম বা বর্জনের মধ্যে কোন প্রকার ইবাদত, সাওয়াব বা পূর্ণতা কল্পনা করলে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। সকল বিদ'আত ইসলামে নিষিদ্ধ। নিষেধের ন্যুনতম স্তর হলো মাকরুহ। তাই বিদ'আত সর্বাবস্থায় মাকরুহ হবে। উপরন্তু সুন্নাতের ব্যতিক্রম ও বিরোধিতার পরিমাণ ও ক্ষেত্র হিসাবে হারাম বা কুফরী হতে পারে।[২]

আমরা দেখেছি এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে দুটি মত রয়েছে। এই মতটি আমরা গ্রহণ করছি তার কারণ :

(১). সুন্নাতের অনুসরণ

আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল বিদ'আতকে গোমরাহী বললে বিদ'আত বিষয়ক হাদীসগুলির অর্থ ও আবেদন ঠিক থাকে। আর বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করলে এ সকল হাদীস সবই অর্থহীন ও আবেদনহীন হয়ে যায়। যে সকল উলামায়ে কেরাম বিদ'আতের প্রকারভেদ করেছেন তাঁদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও হৃদয়ভরা ভালবাসা নিয়ে আমরা তাঁদের জন্য ওজরখাহী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথাকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে বলতে চাই যে, "সকল বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী"। আমরা স্পষ্ট দেখেছি যে, বিদ'আতের সম্পর্ক ইবাদত, সাওয়াব অর্জন বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাথে। এ ক্ষেত্রে সুন্নাতের বাইরে সকল ধরনের নব-উদ্ভাবিত কর্ম, পদ্ধতি, রীতি, নিয়ম সবই বিদ'আত, এবং সকল বিদ'আতই গোমরাহী।

কোনো কোনো বুজুর্গ যেহেতু বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করেছেন এবং তাঁদের আমরা খুবই শ্রদ্ধ করি সেহেতু আমরা বিদ'আতের এই শ্রেণিবিভাগের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করি। অথচ বিদ'আতকে হাসানা বললে বা বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করলে অন্যান্য বুজুর্গগণের, সাহাবীগণের, তাবেয়ীগণের অবমূল্যায়ন হয় সেটা আমরা চিন্তা করি না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, সকল বিদ'আতকে পথভ্রষ্টতা বললে কোনো কোনো মহান বুজুর্গের কথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু মহানবী রাসূলে মুসতাফা ﷺ -এর কথা ব্যাখ্যাহীন থাকে। অপর পক্ষে বিদ'আতকে শ্রেণিভাগ করলে এ সকল বুজুর্গের কথার সম্মান রাখা হয় এবং তা ব্যাখ্যাহীন থাকে, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, বরং অর্থহীন হয়ে যায়। আমরা বুজুর্গগণের কথার শত ব্যাখ্যা ও হাজারো ওজরখাহী করতে রাজি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথাকে প্রকাশ্য অর্থে, ব্যাখ্যাহীনভাবে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে চাই।

(২). সুন্নাতের মহব্বত

বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করার ফলে আমাদের মনে সুন্নাতের মহব্বত কমে যায়। আমরা বিদ'আতের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপকরণ ও জাগতিক বিষয়কে বিদ'আতের মধ্যে গণনা করতে থাকি। কারণ, যত বেশি বিদ'আত উল্লেখ করতে পারব ততই প্রমাণ করতে পারব যে, বিদ'আত কোনো দোষণীয় বিষয় নয়। ক্রমান্বয়ে আমাদের মধ্যে ধারণা জন্মাতে থাকে যে, বিদ'আত ভিন্ন বাঁচা সম্ভব নয়। এত বিদ'আত যখন করলাম আরো বিদ'আত করলে দোষ কী? কেউ বিদ'আত করতে নিষেধ করলে বলি : আপনিও তো কত বিদ'আত করেন, বিদ'আত ছাড়া বাঁচা যাবে না। আমরা বুঝতে পারি না যে, এভাবে আমরা মূলত বলতে চাচ্ছি যে, সুন্নাতের মধ্যে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মুসলমানের ধর্ম পালনের জন্য শুধুমাত্র সুন্নাত যথেষ্ট নয়। আমরা অনেকটা মনের অজান্তেই সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে সুন্নাতকে অবহেলা করার চেষ্টা করি।

অপরদিকে সকল বিদ'আতকে গোমরাহী বললে সুন্নাতের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও আগ্রহ দৃঢ় হয় এবং বিদ'আতের প্রতি আমাদের ঘৃণা অব্যাহত থাকে। যদি বাধ্য হয়ে কোনো বিদ'আত আমরা করি তখন মনের মধ্যে সুন্নাতের প্রতি আগ্রহ থাকবে, সম্ভব হলে সুন্নাত পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা থাকবে। এভাবে সুন্নাতের প্রতি মহব্বত অব্যাহত থাকে। আর বিদ'আতের বিরোধিতার অর্থই হলো সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। যখন কোনো ব্যক্তি বলেন যে, মুখে নামাযের নিয়্যাত করবে না, কারণ তা বিদ'আত, তখন তাঁর

উদ্দেশ্য হলো ঠিক অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা, সে পদ্ধতি যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।

বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করার অর্থ হলো হাল ছেড়ে দেওয়া, সুন্নাতে আর চলবে না, কাজেই চেষ্টা করে লাভ নেই। আর বিদ'আতের ভাগাভাগি না করে কর্মের ভাগাভাগি করে দ্বীনী কর্মের মধ্যে নতুনত্বকে বিদ'আত বলার অর্থ হলো হাল ছাড়লাম না, প্রমাণ করব যে, সুন্নাতই সকল যুগে সকল মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। সম্মানিত পাঠক, সুন্নাতকে ভালবাসায় কি কোনো দোষ আছে। আপনার কাছে দোষ মনে হলে কি এই ভেবে এই লেখককে ক্ষমা করতে পারবেন না যে, লোকটির জ্ঞান বুদ্ধি কম হলেও অন্তত আমার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মপদ্ধতি হুবহু অনুকরণ করতে চাচ্ছে, কাজেই লোকটাকে ক্ষমা করা যায়?

(৩) শাস্তির ভয়

আমরা দেখেছি যে, বিদ'আতকারীর জন্য বিভিন্ন হাদীসে ভয়ানক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। বিদ'আত কর্মটি কবুল না হওয়া, অন্য কোনো নেক কর্ম কবুল না হওয়া, কোনো তওবা কবুল না হওয়া, আল্লাহ ও রাসূলের (ﷺ) অভিশাপ পাওয়া, কেয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাউযের পানি ও শাফাআত থেকে বঞ্চিত হওয়া, তাঁর বদদোয়া পাওয়া ইত্যাদি। বিদ'আতের শ্রেণিভাগ করে কোনো কোনো বিদ'আতকে ভালো বলে পালন করলে এ সকল শাস্তির মধ্যে পড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে পুরোপুরি। কারণ এ সকল হাদীসে কখনোই বলা হয়নি যে, শুধুমাত্র বিদ'আতে সাইয়েঅ্যাহ পালন করলে এ সকল শাস্তি পেতে হবে। বরং হাদীসের স্পষ্ট অর্থ এই যে, সকল প্রকার বিদ'আতেরই এই শাস্তি।

এরপরেও ভাবুন। শুধু বিদ'আতে সাইয়্যেআহর জন্যও যদি এই শাস্তি হয় তাহলেও ভয় থেকেই যাচ্ছে। কারণ কোন্‌টি বিদ'আত হাসানা ও কোন্‌টি সাইয়্যেআহ সে বিষয়ে হাজারো মতবিরোধ রয়েছে। সবাই দলিল প্রমাণ পেশ করছেন। পক্ষের ও বিপক্ষের সকলেরই কাশফ ও কারামতের কথা শোনা যাচ্ছে। কার মত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য তা নিশ্চিত হওয়ার মতো ওহী কারো কাছেই নেই। আমি যে বিদ'আতকে হাসানা বলে পালন করছি তা সাইয়্যেআহ হতে পারে। সেক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত শাস্তি আমাকে পেতে হবে। কী প্রয়োজন আমার এভাবে বিপদের আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটানোর?

অপরদিকে সকল প্রকার বিদ'আতকে খারাপ বলে বর্জন করলে কোনো শাস্তির ভয় নেই। কারণ একটি হাদীসেও বলা হয়নি যে, কোনো বিদ'আত পালন না করলে কোনো শাস্তি হবে। বিদ'আতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমরা যত কথাই বলি না কেন, বিদ'আত বিরোধিদের যতই গালাগালি করি না কেন, কেউই বলতে পারব না যে, বিদ'আত না করলে কোনো গোনাহ হবে একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোথাও বলেছেন। যে ব্যক্তি সকল কাজে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করে এবং শুধুমাত্র তাঁরা যা করেছেন তাকেই ভালবাসে তাঁর তো কোনো ভয় থাকতে পারে না।

(৪). বুজুর্গগণের মতামত

বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ না করা এবং সকল বিদ'আতকে গোমরাহী বলে মনে করা সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, প্রথম যুগের অধিকাংশ আলেম ও মুজতাহিদ ইমাম ও পরবর্তী কালের অনেক বুজুর্গের মত। এদের বিপরীতে অন্যান্য আলেম ও ইমাম বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। একদলের মত মানলে আরেক দলের মত অমান্য করতেই হবে। আমরা মনে করি মতের বিরোধিতার মধ্যে বা মতপার্থক্যের মধ্যে কোনো অবমাননা বা অবমূল্যায়ন নেই। সকল আলেমদের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে আমরা প্রথম দলের আলেমরদের মত গ্রহণ করতে চাই।

(৫). বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ বিভ্রান্তিকর

প্রথম যুগের দু'এক জন ইমাম ও আলেম নেক নিয়্যাতে ভালো অর্থে এই শ্রেণিবিভাগ করেছেন এবং জাগতিক ও উপকরণ জাতীয় প্রয়োজনীয় নব-উদ্ভাবনকে বিদ'আতকে হাসানা বলেছেন, কারণ এগুলি কোনো সুন্নাতকে নষ্ট করে না। আর ইবাদত সম্পর্কিত সকল বিদ'আতকে সাইয়্যেআহ বলেছেন, কারণ এধরনের সকল বিদ'আতই সুন্নাত নষ্ট করে। কিন্তু তাদের এই শ্রেণিবিভাগ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, অসংখ্য ইবাদত বিষয়ক বিদ'আতকে হাসানা বলে চালু করা হয়েছে। সকল বিদ'আতপন্থী নিজ নিজ বিদ'আতকে হাসানা বলে দাবি করছেন, প্রতিপক্ষের সকল যুক্তিকে তিনি উড়িয়ে দিয়ে নিজের মতে অটল থাকছেন। বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ না করে সুন্নাতের সরাসরি ও পরিপূর্ণ অনুসরণ করলে এই বিভ্রান্তি থাকে না।

(৬). বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ অন্তহীন সমস্যার সৃষ্টি করে

বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগের ও কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলার আরো একটি বাস্তব সমস্যা রয়েছে। কোনো কোনো বিদ'আতের প্রশংসা করে আবার কোনো কোনো বিদ'আতের নিন্দা করে আমরা সমস্যায় পড়ে যাই। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে : আপনার বিদ'আতটি হাসানা হলো আর আমার বিদ'আতটি সাইয়্যেআহ হবে কেন ? কুরআন-হাদীসের সাধারণ অর্থবোধক নির্দেশাবলীর সাহায্যে দলিল প্রদান তো সব বিদ'আতের পক্ষেই করা সম্ভব। যেমন, মনে করুন : একজন ধার্মিক মানুষ সমস্বরে সমবেতভাবে বসে বসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধাক্কা দিয়ে যিক্‌র করেন, কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা নেচে নেচে সমস্বরে যিক্‌র করতে নিষেধ করেন। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ও নেচে নেচে যিক্‌রকারী প্রশ্ন করবেন : দাঁড়িয়ে যিক্‌র কি নিষেধ ? কুরআনে তো দাঁড়িয়ে,বসে ও শুয়ে যিক্‌রের প্রশংসা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি ? তাতে কি ? তাঁরা তো আপনার পদ্ধতিতেও যিক্‌র করেননি। আপনারটা যদি জায়েয হয় বা বিদ'আতে হাসান হয় তাহলে আমার পদ্ধতিটা সাইয়্যেআহ হবে কোন্‌ যুক্তিতে ? বিভিন্ন কেতাবের কথা ? সেখানেও সমস্যা নেই। সব কাজের পক্ষেই কোনো না কোনো কেতাবের উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে।

অপর ব্যক্তি হয়ত মীলাদ, কেয়াম, কুলখানী ইত্যাদির পক্ষে। কিন্তু ধূমপান, গাজা, কাওয়ালী ও গানবাজনার বিপক্ষে। তাঁর সমস্যাও একই। ধূমপান, কাওয়ালী ও নাচগানের পক্ষের ব্যক্তি স্বভাবতই প্রশ্ন করবেন : আপনার কাজগুলি বিদ'আতে হাসানা হতে

পারল, আমারগুলি হবে না কেন? যেসকল গ্রন্থে মীলাদকে বিদ‘আতে হাসানা বলা হয়েছে, সেসকল গ্রন্থেই ধূমপান, কাওয়ালী ইত্যাদিকে জায়েয বলা হয়েছে। ধূমপানে দুর্গন্ধ হয়? তাতে কি? পিয়াজ রসুনেও তো দুর্গন্ধ, তা খাওয়াতো নিষেধ না। গন্ধ পরিষ্কার করে নিলেই হলো। বিভিন্ন প্রকার কায়িক প্ররিশ্রমমূলক কাজে গা ঘামলে অনেক বেশি দুর্গন্ধ হয়। এজন্য কি কায়িক পরিশ্রম ও ময়লা পরিষ্কার করার কর্ম সব নিষিদ্ধ হয়ে যাবে? তাছাড়া এখন কত সুগন্ধ সিগারেট বেরিয়েছে। এছাড়া ধূমপানে অনেক উপকার, ক্লান্তি দূর হয়, ইবাদতে মনোযোগ আসে। অপকারিতা ? চা খেলেও তো অপকারিতা আছে বলে ডাক্তারগণ বলেন। মিষ্টি খেলে বহুমূত্র রোগীর অপকার হয়? সেজন্য কি মিষ্টি তার জন্য শরীয়তে হারাম হয়ে যাবে? গান বাজনার নিষেধ আছে বলে আপনি কাওয়ালী ও নাচগানকে নিষেধ করছেন? কারো সম্মানে দাঁড়ানোও তো নিষেধ? সে নিষেধ যেমন অন্য দলিলে অমান্য করা যায় অনুরূপভাবে নাচগানের ক্ষেত্রেও অন্য দলিলের জন্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা যায়। গাযালীর মতো এতবড় সাহেবে কাশফ ওলী, আলেম ও হুজ্জাতুল ইসলাম যাকে বিদ‘আতে হাসানা বলেন আপনি তাকে সাইয়্যেআহ বলার কে ? আপনি কি গাযালীর চেয়েও বড় আলেম?

এরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যাবে। এভাবে আমরা দেখছি যে, কোনো কোনো বিদ‘আতকে ভালো বলার পর অন্য কোনো বিদ‘আতের বিরোধিতা করা যায় না। কারণ ‘হাসানা’ বানানোর জন্য যুক্তি প্রমাণ সকল বিদ‘আতের পক্ষেই খুঁজে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে সকল বিদ‘আতকে খারপ বললে এবং সুন্নাতের বাইরে সকল বিদ‘আতকে বর্জনীয় বললে এই অন্তহীন বিতর্কের সমাধান হয়ে যায়। কর্ম ও বর্জনে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করুন, দেখবেন সকল বিতর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে।

সুন্নাত বনাম বিদ‘আতে হাসানা : সুন্নাতেই নিরাপত্তা

সম্মানিত পাঠক, এরপরও কথা থাকে। না হয় আমরা কিছু সময়ের জন্য বিদ‘আতের শ্রেণিবিভাগকারীদের কথা বিবেচনা করলাম। কিন্তু আমরা সবাই জানি এবং সবাই একমত যে, বিদ‘আত যতই হাসানা হোক তা সুন্নাত নয়, সুন্নাতের বাইরে। সুন্নাত হলে তো আর তাকে বিদ‘আতে হাসানা নাম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সুন্নাতই বলতে পারতাম, বলতাম রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেছেন বা সাহাবীগণ করেছেন। তাহলে বিদ‘আতে হাসানা ভালো হলেও তা সুন্নাত নয়। সুন্নাত সেই কর্ম বা সেই পদ্ধতি ও রীতি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, বা তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীন করতেন, বা সাহবীগণ করেছেন। আর বিদ‘আতে হাসানা হলো সেই কম বা পদ্ধতি ও রীতি যা পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেম বা বুজুর্গ চালু করেছেন ও পছন্দ করে ‘হাসানা’ বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই কর্ম বা পদ্ধতি রাসূলে আকরাম ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল না, তবে তা উদ্ভাবন করার পক্ষে যুক্তি আছে, কুরআন ও হাদীসের সাধারণ বিধানের আলোকে তা উদ্ভাবন করা যায় বলে তিনি দাবি করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, তাঁর উদ্ভাবিত নতুন রীতি বা পদ্ধতি প্রচলনের ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো সুন্নাত বিনষ্ট হবে না। তাঁর এই পছন্দের সাথে অনেকে একমত হননি। একটি বিদ‘আতকে কেউ ভালো বললে অন্যকেউ তাকে খারাপ বলেছেন। যিনি ঐ বিদ‘আতকে হাসানা বা ভালো বলেছেন এবং যিনি তাকে খারাপ বলেছেন কেউই নির্ভুল, নিষ্পাপ বা মা‘সূম নন।

(১). আমাদের পুঁজি ও আমাদের ব্যবসা

প্রিয় পাঠক, আমরা ব্যবসায়ী। আমাদের পুঁজি একটি মাত্র জীবন। এই জীবনে যা অর্জন করতে পারব তাই আমাদের সম্বল হবে। দ্বিতীয় সুযোগ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। দেখে এসে ভুল শুধরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আর বিনিয়োগ করতে পারব না। কী দরকার রিস্ক নেওয়ার? মনে করুন আপনার কাছে এক লক্ষ টাকা পুঁজি আছে। আপনার সামনে দুটি বিনিয়োগের খাত আছে। একটি খাতে লাভ নিশ্চিত। অপর খাতে কেউ বলছেন লাভ হবে; কেউ বলছেন লাভ না হলেও ক্ষতি হবে না, আর কেউ বলছেন ক্ষতি হবে। আপনি কোন্ খাতে বিনিয়োগ করবেন? নিশ্চয় যে খাতে লাভ সুনিশ্চিত। একান্ত বাধ্য না হলে তো আপনি কখনো ঝুকি নিয়ে বিনিয়োগ করবেন না।

তাহলে আখেরাতের ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য না হলে ঝুকি নেব কেন ? দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতের মূল্য কম বলে ? আখেরাতের ক্ষেত্রে একবার ক্ষতি হলে পুনর্বার পুষিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু দুনিয়ার ক্ষেত্রে তা নেই বলে?

আসুন আমরা আমাদের আখেরাতের পুঁজি ও ব্যবসা বিবেচনা করি। কোনোরূপ হ্রাস বৃদ্ধি না করে কর্মে ও বর্জনে সুন্নাত পালন করলে যে লাভ হবে সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ বা বিতর্ক নেই। সুন্নাতের ব্যতিক্রম হলেই মতবিরোধ : কেউ বলছেন লাভ হবে, কেউ বলছেন ক্ষতি নেই, কেউ বলছেন ক্ষতি হবে। এখন আমরা কী করব ? সাধ্যমতো সুন্নাতের মধ্যে থাকার চেষ্টা করব ? না কি সুযোগ পেলেই নতুন খাতে বিনিয়োগ করে ঝুকি নিয়ে দেখব ?

আমাদের ভালবাসা, আগ্রহ ও ভক্তি কোন্‌টির প্রতি বেশ হওয়া উচিত – সুন্নাতের প্রতি না বিদ‘আতে হাসানার প্রতি ? আমরা অনেকেই অগণিত বিদ‘আতে হাসানার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে রত রয়েছি। কিন্তু এগুলিকে হাসানা কে বলেছে ? আমি, আপনি বা আমাদের মতো কোনো এক ব্যক্তি, যার ভুল হতে পারে। এ-যে মাকবুল হবেই তা নিশ্চিত হতে পারি না। এর চেয়ে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই কি ভালো নয় ? সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দীপনা বেশি থাকাই কি ভালো নয়?

(২). বিদ‘আতে হাসানার চেয়ে সুন্নাতের প্রতি মহব্বত বেশি থাকা উচিত

স্বভাবতই যুক্তি, বিবেক ও ঈমানের দাবি হলো যে, বিদ‘আত ভালো বা হাসানা হলেও আমাদের মহব্বত, উদ্দীপনা, আগ্রহ থাকবে সুন্নাতের প্রতি। যে কাজ বা পদ্ধতি নবীয়ে মা‘সূম, রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন তাঁর প্রতিই তো আমাদের উদ্দীপনা থাকবে। তাতেই রয়েছে নিরাপত্তা। সুন্নাত পালনের সময় আমরা হৃদয়ে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করি যে, আমি একটি সাওয়াবের কাজই করছি। আর যারা বিদ‘আতে হাসানাকে প্রচলন করেছেন ও ভালো বলেছেন তাদের ভুল হতে পারে; কাজটি প্রকৃতপক্ষে ভালো নাও হতে পারে। এর

জন্য আমাদের উদ্দীপনা স্বভাবতই কম হওয়া উচিত। এমনটি হয়ত হতে পারে যে, সর্বদায় সুন্নাত কর্ম ও সুন্নাত পদ্ধতির মধ্যে থাকতে চাই, একান্ত বাধ্য হলে, গত্যান্তর না থাকলে বিদ'আতে হাসানা করি।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাই ? অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজের অধিকাংশ আশেকে রাসূলের অবস্থা দেখলে বড় আশ্চার্য হতে হয় ! বিদ'আতে হাসানর জন্য আমাদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, মহব্বত, ভক্তি শুধু বেশিই নয়, আমরা এ সকল বিদ'আতে হাসানাকে ঈমানের মূল আলামত বলে মনে করি !!

আমরা সাধারণত পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়েই সুন্নাতের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করি। এ ক্ষেত্রে বিদ'আতে হাসানা বর্জন করে চলি। ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে আমরা বিদ'আতে হাসানা পাওয়া গেলে সুন্নাতের দিকে ফিরেও তাকাই না। এ জন্যই আমরা জামা, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুন্নাত কি তা নিয়ে ঝগড়া করি। রাসূলুল্লাহ কী ধরনের জামা পরেছেন, টুপি পরেছেন, কী-ভাবে পাগড়ি বেঁধেছেন এগুলি জানার চেষ্টা করি। কিন্তু মীলাদ, কিয়াম, যিক্‌র, দরুদ, সালাম, তাবলীগ, রিয়াজাত, মুজাহাদা, মুরাকাবা, তাসাউফ, তরীকত, তাবলীগ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুন্নাত নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কিভাবে এগুলি করতেন তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই না।

কোনো মানুষের সত্যিকার মুত্তাকী বা সত্যিকার আশেকে রাসূল কিনা তা বিবেচনা করার জন্য অধিকাংশ "সুন্নাত প্রেমের দাবীদার" মুসলিম দেখতে চান যে, তিনি কত বেশি বিদ'আত পালন করছেন, তিনি কত বেশি সুন্নাত পালন করছেন তা তাঁদের কাছে মোটেও বিবেচ্য নয়। তাঁরা যদি কাউকে দেখেন যে তিনি সকাল, সন্ধ্যা ও সারাক্ষণ সুন্নাত পদ্ধতিতে দরুদ ও সালাম পাঠ করছেন তাহলে তাঁরা মোটেও তৃপ্ত হবেন না, তাকে কখনই ভালো বলতে পারবেন না যতক্ষণ না তিনি মীলাদ ও কিয়ামের মাধ্যমে দরুদ ও সালাম পাঠ করেন। যদিও আমরা স্বীকার করি যে তা সুন্নাত নয়, বিদ'আতে হাসানা। এমনকি মীলাদের কোনো সুন্নাত পদ্ধতি আছে কিনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সকাল সন্ধ্যায় কী কী শব্দে যিক্‌র করতেন, কী-ভাবে করতেন এগুলো জানার ও পালনের জন্য কোনো চেষ্টাই তাঁরা করেন না।

সম্ভবত এ সকল আশেকে রাসূল সুন্নী ভক্তগণ মনে করেন যে, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয়ে রাসূলে আকরাম ﷺ আমাদের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তাই এ ক্ষেত্রে আর বিদ'আতে হাসানার প্রয়োজন নেই। আর ইবাদতের জন্য, আল্লাহর নৈকট্যের জন্য, বেলায়াতের জন্য তার অনুসরণ যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে সুন্নাত পাওয়া গেলেও তা ছেড়ে আমাদের বিদ'আতে হাসানার অনুসরণ করা প্রয়োজন। সম্ভবত এঁরা ভাবেন যে, শুধু সুন্নাত পালন করে আল্লাহর পরিপূর্ণ নৈকট্য, সর্বোত্তম মর্যাদা ও পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া সম্ভব নয়।

(৩). বিদ'আত প্রেম ও আমাদের গতিপ্রকৃতি

বর্তমান যুগে আমাদের সমাজের সুন্নাত প্রেমের দাবিদার সুন্নী মুসলমানদের যত মতভেদ, ফেরকাবাজী, দলাদলি সবই বিদ'আতে হাসানকে কেন্দ্র করে। কে কতটুকু সুন্নাত আঁকড়ে ধরে আছেন তা তাঁদের বিবেচ্য নয়, কে কতটুক বিদ'আতে হাসানা আঁকড়ে ধরছেন, দৃঢ়তার সাথে পালন করছেন – তা-ই তাঁদের বিবেচ্য। একজনের বিদ'আতে হাসানা অন্যের নিকট বিদ'আতে সাইয়্যেআহ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিদ'আতকে হাসানা প্রমাণিত করতে অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করছেন, অপর পক্ষ তাকে সাইয়্যেআহ প্রমাণিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

যিনি পীরকে সাজাদা করা, গানবাজনা, নর্তন কুর্দনকে বিদ'আতে হাসানা বলছেন তিনি নিজেকে প্রকৃত সুন্নী বলে দাবি করছেন এবং এগুলি যারা না করছেন তারা যত বেশিই সুন্নাত পালন করুন তাদেরকে সুন্নী হিসাবে মানতে কখনই রাজি হচ্ছেন না, বরং তাদেরকে ওহাবী বলে গালি দিচ্ছেন। আবার অপরপক্ষ তাকে বিদ'আতী বলছেন। যিনি ধূমপানকে বিদ'আতে হাসানা বলছেন তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ ধূমপান বিরোধী যতবেশিই সুন্নত মেনে চলুক তাকে সুন্নী বলে মানতে রাজি নন; বরং তাকে তিনি ওহাবী বলে গালি দিচ্ছেন। অপর পক্ষ তাকে বিদ'আতী বলছেন। যিনি মাজারে ফুল বাতি, শিরনী, গেলাফ প্রদানকে বিদ'আতে হাসানা বলে পালন করছেন, তিনি তার বিরোধীকে, যিনি এগুলি করছেন না অথচ জীবনের ১০০% অবিকল রাসূলুল্লহ ﷺ -এর সুন্নাত মোতাবেক চলছেন, তাকে কখনই সুন্নী বলে মানবেন না; বরং তাকে নিশ্চিত ওহাবী বলেই তিনি জানবেন। যিনি মীলাদ, কেয়াম বিদ'আতে হাসানা বলে পালন করছেন, তিনি মীলাদ কেয়াম বর্জনকারীকে শত সুন্নাত পালন করলেও সুন্নী বলে মানতে রাজি হচ্ছেন না। অপরপক্ষ এগুলিকে বিদ'আতে সাইয়্যেআহ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এরূপ শত শত উদাহরণ আমরা সমাজে দেখতে পাই।

চিন্তা করুন, কেউ যদি বলে, আমার পীর বা আমর আদর্শিক নেতা যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন আমি তাই করব, তার বাইরে একটুকুও যাব না, তা যত জায়েযই হোক। তিনি যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিক্‌র করেছেন, নামায পড়েছেন, রোযা রেখেছেন সেভাবেই করব, একটুও বাইরে যাব না। তিনি যে যিক্‌র করেননি বা আমাদেরকে শেখাননি তা করব না, তা যত জায়েযই হোক। তিনি যে দিনে রোযা রাখেননি বা আমাদেরকে রাখতে শেখাননি সে দিনে রাখব না, তাতে যত সাওয়াবই হোক। তিনি যে কবিতাগুলি দিয়ে যেভাবে যে সূরে মীলাদ পড়েছেন, আমি অবিকল সেই কথায় সেই সূরেই মীলদ পড়ব, একটুও বেশি-কম করব না, অন্য বুজুর্গগণ যেভাবেই পড়ুন না কেন, ... ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিনি দোযখে গেলে আমি তার সাথে দোযখে যেতেও রাজি। এই ব্যক্তির কথায় আমরা কোনো আপত্তি করব না; বরং তাকে অনুকরণীয় পীরভক্তি বলে প্রশংসা করর।

কিন্তু কেউ যদি উপরের কথাগুলিই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কেন্দ্র করে বলে তাহলে সমাজের অধিকাংশ আশেকে রাসূল সুন্নী মুসলিম ঘোর আপত্তি করবেন, নিন্দা করবেন এবং তাকে বিভিন্ন ভাবে গালাগালি করবেন। কি বিচিত্র তাঁদের নবী প্রেম!!

(৪) সুন্নাত প্রেম বনাম বিদ'আত প্রেম : ভয়াবহ পরিণতি

আমাদের ভয় হয় আমরা সেই দলের মধ্যে পড়ে যাব যাদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

.

"আমার আগে যে কোনো উম্মতের মধ্যে যখনই আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেছেন তখনই তাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর কিছু একান্ত আপন সাহায্যকারী সহচর ও সঙ্গী তৈরি হয়। যাঁরা তাঁর সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। অতঃপর তাঁদের পরে উম্মতের মধ্যে এমন কিছু খারাপ শ্রেণির মানুষ পয়দা হয় যারা যা বলে তা করে না, আর যা করতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি তাই করে। যে ব্যক্তি এদের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মু'মিন। যে ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপরে আর শরিষা পরিমাণ ইমানও থাকবে না।"[১]

আমাদের সাথে কি এদের চিত্র মিলে যায় না ? আমরা মুখে সুন্নাতের মহব্বতের কথা বলি, কিন্তু অধিকাংশ কর্ম খেলাফে-সুন্নাতভাবে করি। মুখে আমরা নবী-প্রেমের কথা বলি, কিন্তু কাজে আমরা নবীজী ﷺ -এর অনুসরণ করি না। আবার আমরা এমন সব কর্ম করি যে কাজ করতে কুরআন বা হাদীস আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেনি এবং আমরা সেসকল কাজই বেশি করি। যেমন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বুজুর্গদেরকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে, কিন্তু আমাদেরকে তাঁদেরকে সাজদা করতে বা তাঁদের কবরে সাজদা করতে বা তাঁদের কবরের উপর বড় বড় ইমারত তৈরি করে তা গেলাফ ও বাতি দিয়ে সজ্জিত করতে কোনোরূপ নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়নি। আমরা যা নির্দেশ দেওয়া হয়নি সেসকল কাজই করছি। এখন আমাদের অবস্থান কোথায় তা আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার।

সুপ্রিয় পাঠক, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার আরো কঠিন পরিণতির কথা হাদীস শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত সাহল ইবনু সা'দ, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

/) :

. (

"আমি তোমাদের আগে হাউযে (কাউসারে) গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয) থেকে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব : এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী-সব নব উদ্ভাবন করেছিল। (অন্য বর্ণনায় : আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না। অন্য বর্ণনায়: আপনার পরে এরা কি উদ্ভাবন করেছিল সে বিষয়ে আপনার কোনোই জ্ঞান নেই) তখন আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তিত করেছে তারা দূর হয়ে যাক, তারা দূর হয়ে যাক!"[২]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন,

ﷺ . :

. . :

. :

রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) গোরস্থানে গিয়ে বললেন : 'হে বাড়ির মু'মিন বাসিন্দাগণ, আপনাদের উপর সালাম। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব।' আমার ইচ্ছা হয় যে আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবীগণ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন : তোমরা আমার সাহাবী, সঙ্গী, আমাদের ভাইয়েরা হচ্ছেন যারা এখনো আসেননি (পরবর্তী যুগের মু'মিনগণ)। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার উম্মতের যারা এখনো আসেননি তাঁদেরকে আপনি কী-ভাবে চিনতে পারবেন ? তিনি বলেন : আচ্ছা বলোতো, অনেক কালো ঘোড়ার পালের মধ্যে কারো যদি কিছু সাদা মুখ ও সাদা পা ওয়ালা ঘোড়া থাকে

তাহলে কি সে তার এই ঘোড়াগুলিকে চিনতে পারবে না ? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে অবশ্যই তার ঘোড়াগুলিকে চিনতে পারবে। তিনি তখন বললেন : আমার পরবর্তী যুগের উম্মতগণ ওযুর কারণে মুখ ও হাত সমুজ্জ্বল নূরে চমকিত অবস্থায় (কেয়ামতের দিন) আসবেন। আমি তাদের জন্য আগে থেকেই হাউযে (কাউসারে) গিয়ে অপেক্ষা করব। সাবধান! তোমরা শুনে রাখ!! অনেক মানুষকে পথহারা উটের মত আমার হাউয থেকে খেদিয়ে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলব : এদিকে এস। তখন বলা হবে : এরা আপনার পরে পরিবর্তন করেছিল। তখন আমি বলব : দূর হও, দূর হও।"[১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, অনেক নিয়মিত ওযু ও নামায আদায়কারী মুসলমানও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ও নব-উদ্ভাবনের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাউযের পানি থেকে বঞ্চিত হবে, তাঁর বদদোয়া পাবে। একজন বেদুঈন তার নিজের উটের জন্য যে খাবার ও পানির ব্যবস্থা রাখে সেখানে কোনো পথহারা মালিক-বিহীন উট খাবার বা পানি খেতে আসলে তাকে তাড়িয়ে দেয়। ঠিক তেমনিভাবে এ সকল মুসলমানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাউযে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কী কঠিন কথা ! কী ভয়ানক পরিণতি!!

সম্মানিত পাঠক, আমরা যে বিদ'আতকে এত ভালবাসি, বিদ'আত ছাড়া চলা সম্ভব নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করি, আমরা কি একটি হাদীসেও দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদ'আত না করলে এ ধরনের কোনো শাস্তির কথা বলেছেন। যদি কেউ কোনোরূপ বিদ'আতে হাসানা পালন না করেন, শুধুমাত্র সুন্নাতের মধ্যে থাকেন তাহলে কি তাঁর কোনো ভয়ের কারণ আছে ?

আমরা দু'জন মুসলমানের কথা চিন্তা করি। একজন মুসলমান, সর্বদা সুন্নাতের মধ্যে থাকতে চান, বাধ্য হয়ে কখনো দু'একটি সুন্নাত পরিত্যাগ করলে বা বাধ্য হয়ে উপকরণে বা জাগতিক বিষয়ে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করলে মনে ব্যাথা পান, মনের আকুতি থাকে উপকরণে ইবাদতে সকল বিষয়ে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের মধ্যেই থাকার। অন্য মুসলমান তিনি পরিবর্তনকেই পছন্দ করেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিদ'আতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে গিয়ে সুন্নাতের অচলত্ব প্রমাণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম, কর্মপদ্ধতি ও রীতিনীতি অবিকল অনুসরণ করার চেয়ে কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি ও কিছু পরিবর্তন ভালো মনে করেন। নব-উদ্ভাবন ও পরিবর্তন করতে নিষেধ করলে বিরক্ত হন। অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতিতে পোশাক পরতে, যিক্‌র করতে, দরুদ ও সালাম পড়তে, তাবলীগ, তাসাউফ, তাযকিয়া, জিহাদ ইত্যাদি সকল ইবাদত আদায় করতে অপছন্দ করেন। সকল বিষয়ে বিদ'আতে হাসানার প্রতি তাঁর মনের টান বেশি। উপরের হাদীসের আলোকে এ দু'জন কি সমান হবেন ? কার বিপদের পড়ার সম্ভাবনা বেশি ? আপনিই চিন্তা করে দেখুন।

(৫) সুন্নাতকে বেশি ভালবাসতে হবে ও ভালবাসার মানদণ্ড বানাতে হবে

প্রিয় পাঠক, সম্ভাবত আমাদের উচিত বিদ'আতে হাসানার চেয়ে সুন্নাতকে একটু বেশি ভালবাসা। আমরা বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করি অথবা নাই করি, কোনো কোনো বিদ'আতকে হাসানা বলি অথবা না বলি, সর্বাবস্থায় আমাদের উচিত সুন্নাতকে বেশি মহব্বত করা। বিদ'আতে হাসানার চেয়ে সুন্নাতকে বেশি ভালবাসা। কোন বিষয়ে সুন্নাত পদ্ধতি জানতে পারলে বিদ'আতে হাসানা পদ্ধতি ত্যাগ করে সুন্নাত পদ্ধতিমতো চলার চেষ্টা করা উচিত আমাদের। আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, বেশি সাওয়াব, উঁচু স্তর ও পরিপূর্ণ মর্যাদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতই চূড়ান্ত, সুন্নাতের অনুসরণই যথেষ্ট। একান্ত বাধ্য না হলে, মা'যুর না হলে আমাদের বিদ'আতের স্বরণাপন্ন হওয়া উচিত নয়, বিদ'আত যত হাসানাই হোক।

সম্মানিত পাঠক, সম্ভবত আমাদের উচিত একটি নতুন ধারা তৈরি করার। যেখানে মতবিরোধ, ইখতেলাফ, মহব্বত, ইত্তিফাক সবকিছু 'সুন্নাত' কেন্দ্রিক হবে। যেখানে সবাই বলবেঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যতটুকু যেভাবে করেছেন ততটুকু সেভাবেই করব, তিনি যে কথা যতটুকু বলেছেন তা ততটুকুই বলব, বেশিও নয় কমও নয়। বেশি কম যদি হয় তবে তা বাধ্য হয়ে, খারাপ জেনে, কখনই উত্তম মনে করে নয়। তিনি কোনো কাজ করেছেন তা জানার পরে আমি আর কারো কথা চিন্তা করব না, শুধু এতটুকই দেখব যে, বর্ণনাটি সহীহ কি-না এবং অন্যকোনো বর্ণনা আছে কি-না। তিনি কোনো কাজ করেননি জানতে পারলে আমি সে কাজ বর্জন করতে আর কোন চিন্তা করব না, শুধু এতটুকই দেখব যে, বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য কি-না এবং অন্যকোনো বর্ণনা আছে কি-না ? তিনি যে কাজ যেভাবে যতটুকু যে সময়ে করেছেন আমি তা সেভাবে ততটুকুই করব। তিনি যা যেভাবে যে শব্দে বলেছেন আমি তা সেভাবেই বলব। তিনি যদি নাজাত পান তাহলে তো আমিও পাব। তাঁর নাজাতে কি কোনো সন্দেহ আছে ? তাহলে যে ব্যক্তি শুধু তাঁর কাজই করে, বেশি-কম কিছুই করে না তাঁর নাজাতের বিষয়ে সন্দেহ কোথায় ?

সম্মানিত পাঠক, এ কাজ বড় কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসের ভাষায় এ কাজ 'গুরাবা' বা বান্ধবহীন মুমিনগণের কাজ। যুগের আবর্তনের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে শত শত খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাতের অতিরিক্ত কাজকর্ম, নিয়মপদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান আমাদের সমাজগুলির উপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। এ সকল কর্ম, আচার অনুষ্ঠান প্রথমে শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে, ক্রমে ক্রমে তা সমাজে প্রসার লাভ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের যুগে এগুলি এভাবে করা হতো না বলে অনেকে আপত্তি করেন। আবার কুরআন বা হাদীসের দুই একটি সাধারণ ফযীলতমূলক বাক্য বা দুই একটি সত্য বা মিথ্যা বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করে কেউ তাকে জায়েয বলেছেন। নতুনের মজা সবসময় বেশি। এছাড়া এসবের অধিকাংশই অনুষ্ঠানমূলক। আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে তৃপ্তিই আলাদা। তাই এসব আচার অনুষ্ঠান ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এর পক্ষে কথা বলার, যুক্তি পেশের মানুষের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অবশেষে এগুলিই এখন দ্বীন, এগুলিই এখন সুন্নাত। এগুলির বিরোধিতা তো দূরের কথা, এগুলির বর্জনই এখন যুগ যুগ ধরে আচরিত ধর্মের সাথে বিদ্রোহ বলে বিবেচিত। আপনি কি পারবেন সমাজের আক্রোশকে অবহেলা করে শুধু সুন্নাত মতো চলতে?

সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ বিদ'আতই 'আনুষ্ঠানিকতা' কেন্দ্রিক। আর আনুষ্ঠানিকতা অর্থই 'আলিম'-দের কিছু জাগতিক- অর্থ বা

মর্যাদা- লাভ। আপনি যদি আলিম, পীর বা ধর্মীয় নেতা হন এবং পরিপূর্ণ সুন্নাতের মধ্যে চলতে চান তবে এরূপ অনেক মর্যাদা ও অর্থ আপনাকে বিসর্জন দিতে হবে। এছাড়া আপনার মতামত ও কর্ম যাদের স্বার্থ নষ্ট করবে তাদের আক্রোশের মুখে আপনকে পড়তে হবে। সত্যিকার অর্থেই আপনাকে 'গুরাবা' বা বান্ধবহীন হয়ে পড়তে হবে? আপনি কি তা পারবেন? যদি পারেন তবে নিঃসন্দেহে তা চূড়ান্ত সফলতা। আর যদি নাও পারেন তবে না পারার বেদনা, অসহায়ত্ব ও সুন্নাতের মহব্বত অন্তত গোপন করবেন না। এগুলি হৃদয়ে নিয়ে আল্লাহর কাছে তাওফীকের জন্য দোয়া করতে থাকুন। আমাদের জন্যও দোয়া করবেন।

(৬) সুন্নাত না বিদ'আত সন্দেহ হলে তা পরিত্যাগ করতে হানাফী মযহাবের নির্দেশ

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে প্রথম শতাব্দীগুলি অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহ বিদ'আতের শ্রেণিবিভাগ করতেন না। তাঁরা সকল বিদ'আতকে বর্জন করতে নির্দেশ প্রদান করতেন। শুধু তাই নয়, কোনো কাজ বিদ'আত না সুন্নাত সে বিষয়ে সন্দেহ হলে তাকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। হানাফী মযহাবের অন্যতম আলেম আল্লামা সারাখসী , আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু সাহাল খুরাসানী (৪৮৩ হি.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাবসূতে লিখেছেন :

.

"যে কাজটি ওয়াজিব হতে পারে আবার বিদ'আতও হতে পারে তা সাবধানতামূলকভাবে পালন করতে হবে; কারণ ওয়াজিব পরিত্যাগের কোনো কারণ নেই। আর যে কাজটি বিদ'আতও হতে পারে আবার সুন্নাতও হতে পারে, দুই প্রকারের সম্ভাবনাই রয়েছে সে কাজটি পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ বিদ'আত পরিত্যাগ করা আবশ্যকীয় ও জরুরি, আর সুন্নাত পালন করা জরুরি নয়।"[১]

অন্যত্র লিখেছেন :

"এই কাজটি বিদ'আতও হতে পারে, নফল-মুস্তাহাবও হতে পারে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের কাজ, যা বিদ'আত না মুস্তাহাব সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, তা করা যাবে না।"[২] অন্য এক স্থানে লিখেছেন :

...

"যে কাজ মুবাহ হতে পারে আবার বিদ'আতও হতে পারে সে কাজ করা যাবে না ; কারণ বিদ'আত পরিহার করা ওয়াজিব... এবং যে কাজ সুন্নাত হতে পারে আবার বিদ'আতও হতে পারে, উভয় সম্ভাবনা রয়েছে সে কাজ করা যাবে না।"[৩]

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি.) বলেন :

.....

"বিদ'আত কর্ম করার চেয়ে সুন্নাত কর্ম পরিত্যাগ করা উত্তম।"[৪] ... "বিদ'আত বর্জন করা ফরয।"[৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লামা সারাখসী, কাসানী বা পূর্ববর্তী অন্যান্য ইমাম ও আলিম এক্ষেত্রে বিদ'আতকে সাইয়েয়াহ ও হাসানাহ বলে ভাগ করেন নি বা বলেন নি যে, 'বিদ'আতে সাইয়েয়াহ বর্জন করা ফরয বা ওয়াজিব', যদিও পরবর্তী সময়ের কেউ কেউ সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে দাবি করছেন যে, তাঁরা বিদ'আত বলতে 'বিদ'আতে সাইয়েয়াহ' বুঝিয়েছেন, কাজেই বিদ'আতে হাসানা বর্জন করা জরুরী নয়, বরং তা পালন করাই জরুরী!

তাঁদের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, তাঁরা বিদ'আতকে ভাগ করেন নি, বরং সকল বিদ'আতকেই বর্জনীয় বলে গণ্য করেছেন। এবিষয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হজ্ব ও ঈদুল আজহার তাকবীরের বিষয়ে সাহাবীগণের সুন্নাত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কোনো কোনো সাহাবী ৯ই জিলহাজ্ব ফজর থেকে ১৩-ই জিলহজ্ব আসর পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। কেউ কেউ ৯ তারিখ ফজর থেকে ১০ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। ইমাম আবু হানীফা এই দ্বিতীয় সুন্নাতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতের পক্ষে দলিল পেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

ইমাম আবু হানীফার দলিল হলো, শব্দ করে তাকবীর বলা মূলত বিদ'আত। কারণ তাকবীর এক প্রকারের যিক্র, আর যিক্রের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো চুপেচুপে যিক্র করা। আল্লাহ বলেছেন : "তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয়ভীতির সাথে ও চুপে চুপে ডাক।"[৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "নিঃশব্দে চুপে চুপে যিক্রই সবচেয়ে উত্তম যিক্র।" এছাড়া এভাবে যিক্র করা আদব ও ভয়ভীতির জন্য বেশি উপযোগী, আর রিয়া থেকে বেশি দূরে। একারণে সুস্পষ্ট বিশেষ দলিল ছাড়া চুপে চুপে যিক্র করার এই মূলনীতি পরিত্যাগ করা যাবে না। শুধুমাত্র ৯ ও ১০ তারিখের বিষয়েই বিশেষ দলিল এসেছে। ... ১০ তারিখের পরে তাকবীরের

ক্ষেত্রে যেহেতু সাহাবীগণ মতবিরোধ করেছেন, সেহেতু ১০ তারিখের পরে তাকবীর সুন্নাত হতে পারে বা বিদ'আতও হতে পারে।... এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে (১০ তারিখের পরে) সশব্দে তাকবীর বলা কোনো সাবধানতা নয়, সশব্দে তাকবীর বর্জন করাই সাবধানতা; কারণ বিদ'আত কর্ম পালন করার চেয়ে সুন্নাত কর্ম বর্জন করা উত্তম।[১]

তাহলে দেখুন আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ কিভাবে বিদ'আত বর্জনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বিদ'আতের ভয়ে তাঁরা সুন্নাত পরিত্যাগ করতে রাজি ছিলেন তবুও বিদ'আত করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা বারবার বিদ'আত বর্জন করাকে ফরয বলেছেন। এক্ষেত্রে বিদ'আতের কোনো শ্রেণিভাগ তাঁরা করেননি। তাকবীর, তাহলীল ও যিক্র ইসলামের অন্যতম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার যিক্রের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে সর্বদা যিক্রে লিপ্ত থাকতেন।[২] সাহাবীগণ সকাল-সন্ধ্যায় ও সর্বসময়ে যিক্রে লিপ্ত থাকতেন। এ সকল সাধারণ দলিলের আলোকে আমরা মনে করতে পারি যে, ইমাম আবু হানীফার উচিত ছিল বেশি দিন জোরে তাকবীর পাঠের হাদীস গ্রহণ করা। কারণ তাতে সুন্নাত পরিপূর্ণ পালনের সম্ভাবনা বাড়ত। সুন্নাতের অতিরিক্ত হলে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। জোরে তাকবীর পাঠ একটি মাসনূন ইবাদত, বেশি দিন আমল করলে সুন্নাত না হলেও মুস্তাহাব তো হবে।

কিন্তু সুন্নাত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জন উভয়কেই সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করতেন। উপরন্তু তাঁর বেশি আমল ও কম আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। যিক্রের ফযিলতের বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। তবে এই ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের স্বাভাবিক সুন্নাত হচ্ছে নিঃশব্দে ও চুপে চুপে যিক্র করা। ঈদুল আযহার তাকবীরের ন্যায় দুই-চারটি স্থানে ছাড়া বাকি সকল স্থানে তাঁরা সশব্দে যিক্র বর্জন করেছেন। এ থেকে জানা যায় যে তাঁরা যেখানে সশব্দে যিক্র করেননি সেখানে সশব্দে যিক্র করা খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ'আত। এ জন্য নিশ্চিতভাবে যে স্থানে সশব্দে যিক্র প্রমাণিত হয়েছে সে স্থান ছাড়া সকল স্থানে নীরবে নিঃশব্দে যিক্র করতে হবে।

ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মাদ ১৩-ই জিলহাজ্ব আসর পর্যন্ত সশব্দে তাকবীব বলার হাদীস সহীহ হওয়ার কারণে গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁরাও এরপরে অন্য সকাল সময়ে অন্যান্য পালনীয় যিক্রসমূহ সশব্দে পালন নিষেধ করেছেন। তাঁরা কেউই সুন্নাত-পদ্ধতিতে নীরবে চুপে চুপে যিক্র করতে বা তাকবীর তাহলীল করতে নিষেধ করেননি। কেবলমাত্র সুন্নাতের খেলাফ হবে বলে শব্দ করে যিক্র করতে নিষেধ করেছেন। কারণ যেখানে সশব্দে যিক্র প্রমাণিত নয়, সেখানে শব্দ করলে বিদ'আতের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাঁদের মতে বিদ'আতে নিপতিত হওয়ার চেয়ে সুন্নাত পরিত্যাগ করা উত্তম।

তৃতীয় অধ্যায়
সুন্নাতের উৎস

(ক). হাদীসই 'সুন্নাত'-এর উৎস

(১). কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের একমাত্র উৎস হাদীস

সুন্নাতের একমাত্র উৎস হাদীস। হাদীস বলতে বুঝান হয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে বর্ণিত বা তাঁর নামে কথিত কথা, কাজ, অনুমোদন ও আকৃতি-প্রকৃতিগত বর্ণনা।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করেছেন কি-না, কী করেছেন, কী-ভাবে করেছেন, কোন্ সময়ে করেছেন, কী-পরিমাণে করেছেন তা আমরা শুধুমাত্র হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা থেকে জানতে পারি। যদি হাদীস থেকে জানতে পারি যে, তিনি কোনো কাজ করেছেন তাহলে আমরা তা করব। হাদীসই আমাদের বলে দেবে যে, তিনি কী-ভাবে তা করেছেন, কতটুকু করেছেন এবং কতটুকু বর্জন করেছেন।

তিনি কোনো কাজ করেননি বা বর্জন করেছেন তা জানার উৎসও হাদীস। দুইভাবে আমরা তা জানতে পারি। প্রথমত, কোনো সাহাবী যদি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক কাজ করেননি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি তা বর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা থেকে যায় যে, উক্ত সাহাবী হয়ত তাঁকে এই কাজ করতে দেখেননি, অন্য কেউ দেখেছেন। এজন্য অন্য কোনো সাহাবীর কর্মমূলক সহীহ বর্ণনা আছে কি-না তা ভালোভাবে হাদীসের গ্রন্থসমূহে দেখতে হবে। যদি আর কারো কোনো বর্ণনা না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি তা করেননি। যেমন, ইবনু আব্বাস, জাবির প্রমুখ সাহাবী (﵁) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামাযে কোনো আযান দেননি।[২] অন্য কোনো সাহাবী আযান দিয়েছেন বলে বর্ণনা করেননি। অপরদিকে আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি।[৩] কিন্তু হুযাইফা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছেন।[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করেননি বা বর্জন করেছেন তা জানার দ্বিতীয় মাধ্যম হলো যে, তিনি তা করেছেন বলে কোনো হাদীসে উল্লেখ থাকবে না। উপরে আমরা দেখেছি যে, কোনো সাহাবী যদি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করেননি, তাহলেও আমাদের খুঁজতে হবে ও দেখতে হবে যে, তিনি করেছেন বলে কোনো বর্ণনা আছে কি-না। আর যদি তিনি কোনো কাজ করেছেন বলে কোনো সাহাবীই উল্লেখ না করেন তাহলে আমরা পরিপূর্ণ নিশ্চিত হতে পারি যে, সে কাজ তিনি কখনো করেননি। যেমন, তারাবীহ নামাযের জন্য আযান দেওয়া, প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা, নামাযে দুইবার রুকু করা, দুই বারের বেশি সাজদা করা, নামাযের মধ্যে কুরআনের সূরা আগেপিছে করে পড়া ... ইত্যাদি। ইসলামের অধিকাংশ না-বোধক বা বর্জনীয় বিধান আমরা এভাবে পেয়েছি। কোনো কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বলে কোনো হাদীসে উল্লেখ না থাকলেই আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, তিনি তা করেননি। একথা কেউই কল্পনা করেন না যে, তিনি হয়ত করেছিলেন, কিন্তু সাহাবীগণ হয়ত বলেননি।

(২). সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের জীবনে রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদীস

সাহাবীগণের হৃদয়ের পুরোটুকই জুড়ে ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্ত্রী ও সন্তানদের অবস্থাও ছিল একইরূপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘিরেই তাঁদের জীবন এবং তাঁর জন্যই তাঁদের মরণ। যথাসম্ভব তাঁর কাছে থাকা, তাঁকে দেখা, তাঁর কথা ও কর্ম হৃদয়ে ধারণ করা ও তা অনুসরণ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র স্বপ্ন, সাধনা, কর্ম ও বাসনা। আমরা ইতঃপূর্বে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখেছি। তাই তাঁরা সর্বদা তাঁর দরবারে, তাঁরই আশেপাশে এবং তাঁরই সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতেন। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যা শুনতেন বা তাঁকে যা করতে দেখতেন তা সবই তাঁরা গভীরভাবে হৃদয়ের পটে এঁকে নিতেন। তারই আলোকে জীবনকে পরিচালিত করতেন।

সবাই সর্বদা থাকতে পারতেন না। কখনো কখনো সাংসারিক ও জাগতিক কাজকর্মে তাঁর থেকে দূরে থাকতে হতো। অনেকেই বাসস্থানের দূরত্বের কারণে তাঁর দরবারে বেশি আসতে পারতেন না। তাঁরা অন্যদের থেকে তাঁর (নবীর) সকল কাজকর্ম, কথা ও নির্দেশনা জানার চেষ্টা করতেন। তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হলে তাঁদের আলোচ্য বিষয়বস্তু হতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত, তাঁরই জীবন, তাঁরই কর্ম এবং তাঁরই নির্দেশনা। এভাবে সাহাবীগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন সুন্নাত এবং সমষ্টিগতভাবে নবী-জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল কর্ম সকল কথা, সকল প্রকারের অভ্যাস, পদ্ধতি, আকৃতি, প্রকৃতি সবকিছু সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের জীবনে তা অনুসরণ করেছেন।

সাহাবীগণের মতোই ছিলেন তাঁদের ছাত্রগণ, ইসলামের দ্বিতীয় যুগের মানুষেরা বা তাবেয়ীগণ। সাহাবীগণের মতোই তাঁরা ছিলেন অনুসরণ ও অনুকরণমুখী। তাঁদের আপসোস যে তাঁরা নবীয়ে মুসতাফা ﷺ -কে পাননি। এই বেদনা ভুলতে তাঁরা সাহাবীগণের নিকট নবী-জীবনের সবকিছু বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করতেন, তা হৃদয়ের পটে ধারণ করতেন, তা অনুসরণ ও কর্মের

মাধ্যমে অনুবাদ করতেন এবং সর্বোপোরি তা সমাজে প্রচার করতেন। তাঁদের ছাত্রগণ, তাবে-তাবেয়ীগণও তাঁদের মতো নবী-জীবনের ছোট-বড় সকল কাজকর্ম, চলাফেরা, অভ্যাস, আচার, আকৃতি-প্রকৃতি জেনেছেন, মুখস্থ করেছেন, লিখে রেখেছেন, প্রচার করেছেন এবং সর্বোপরি তাঁরা তা বিভিন্ন একক গ্রন্থে সংকলনের চেষ্টা শুরু করেন।

হাদীসের গ্রন্থাদিতে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তাঁর জীবনের খাওয়া, পেশাব-পায়খানা, ঘুম, কথা, ইবাদত, পারিবারিক জীবনের সামান্যতম অভ্যাস, সামান্যতম ঘটনা বা সামান্যতম কাজ বর্ণনা করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে যে কোনো মুসলিম বা অমুসলিম গবেষক নিশ্চিত হন যে, তাঁর জীবনের সামান্যতম কোনো কথা, কাজ, আচরণ, অভ্যাস, আকৃতি বা প্রকৃতিও তাঁরা না বলে থাকেননি। তাঁর জীবনের কিছুই অজানা নেই। এটাই তো বিশ্বনবীর শা'ন। যিনি সকল যুগের সকল মানুষের পথপ্রদর্শক ও একমাত্র আদর্শ তার সুন্নাত তো এভাবেই রক্ষিত হতে হবে। আল্লাহ তাই করেছেন।

(৩). বিশ্বনবী হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মর্যাদা ও হাদীসের সংরক্ষণ

এছাড়া এমন কী হতে পারে যে, উম্মতের দুনিয়া বা আখেরাতের উন্নতি ও সফলতার জন্য সামান্যতম অবদান রাখতে পারে এমন কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে না শিখিয়ে চলে গিয়েছেন ? এ কথা কল্পনা করলেও তাঁর নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে সন্দেহ করা হয়। অথবা আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ নবীজীবনের কিছু জেনেও তা পালন করেননি এবং কাউকে শেখাননি। একথা কল্পনা করলে শুধু তাঁদেরকেই অবমাননা করা হবে না, বরং তাঁদের যিনি নিজ হাতে গড়লেন, যাঁদের তিনি এত প্রশংসা করলেন সেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও অপবাদ দেওয়া হয়।

আমরা কি কল্পনা করতে পারব যে, নামাযের মধ্যে হয়ত তিনি কোনো কোনো দিন হাত না বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু হাদীসে তা বর্ণিত হয়নি ; কাজেই, আমরা আন্দাজের উপর মাঝে মাঝে বা সবসময় হাত না বেঁধে দাঁড়াব? অথবা তিনি মাঝে মাঝে ওযুর সময় পাঁচ বার করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করেছেন, কিন্তু সাহাবীগণ তা জানতেন না ; কাজেই, আমরা মাঝে মাঝে বা সর্বদা পাঁচ বার করে ধৌত করব? অনুরূপভাবে কখনো কি আমরা কল্পনা করতে পারি যে, তিনি কিছু খেয়েছেন, কোন্ পদ্ধতিতে ইস্তিঞ্জা করেছেন, কোন্ পদ্ধতিতে রোযা রেখেছেন, তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন, কিন্তু সাহাবীগণ তা জানেননি বা আমাদের বলেননি? আমরা কি কল্পনা করতে পারব যে, উম্মতের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কোনো সামন্যতম কাজ, পদ্ধতি বা রীতি তিনি পালন করেছেন অথচ সাহাবীদেরকে জানাননি বা সাহাবীগণ পরবর্তীদেরকে বলেননি ? কখনই তা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজকেও সাহাবীগণ যে যতটুকু দেখেছেন হৃদয়ের কন্দরে তুলে রেখেছেন, আমল করেছেন এবং সুন্নাতপ্রেমিক তাবেয়ীগণের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তা মুখস্থ করেছেন, লিখে রেখেছেন, হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে আমল করেছেন এবং তাঁদের ছাত্রদের কাছে প্রচার করেছেন। তাঁদের ছাত্ররাও একইভাবে মুখস্থ করেছেন, লিখে রেখেছেন, নিজেরা তা অনুসরণ করেছেন এবং গ্রন্থাকারে তা সংকলিত করেছেন।

কাজেই, হাদীসের বর্ণনায় তিনি যে কাজ যেভাবে করছেন, অথবা করতে বলেছেন সেভাবে করাই সুন্নাত। হাদীসের বর্ণনায় তিনি যে কাজ বর্জন করেছেন, তা বর্জন করাই সুন্নাত। হাদীসের বর্ণনায় যদি তিনি কোনো কাজ করেছেন বলে খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে তিনি তা করেননি বলে আমরা নিশ্চিত হব এবং তা বর্জন করাই সুন্নাত। অনুরূপভাবে, হাদীসের বর্ণনায় যদি দেখা যায় যে তিনি একটি কাজ এক পদ্ধতিতে করেছেন, অন্য পদ্ধতির কোনো উল্লেখ পাওয়া না যায়, তাহলে আমরা নিশ্চিত হই যে, ঐ কাজটির জন্য উল্লিখিত পদ্ধতিই একমাত্র সুন্নাত, এর বাইরে যেকোনো পদ্ধতি বর্জন করাই সুন্নাত।

(খ). সহীহ বা গ্রহণযোগ্য হাদীসই 'সুন্নাত'-এর উৎস

(১). হাদীস সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট হতে পারে

হাদীসের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, হাদীসের নামে অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলা হয়েছে।[১] অনেকে ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা প্রচার করেছেন। অনেক হাদীস বর্ণনাকারী তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, হাদীস সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অবহেলা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে হাদীস বলতে গিয়ে অনেক ভুল করেছেন, তাঁদের বর্ণনাকে দুর্বল হাদীস বলা হয়। অনেকে এভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা হাদীস নামে বর্ণনা করেছেন। এগুলির বিপরীতে রয়েছে সহীহ (নির্ভরযোগ্য বা বিশুদ্ধ) হাদীস। শুধুমাত্র সহীহ এবং হাসান (গ্রহণযোগ্য) হাদীসই সুন্নাতের উৎস।

হাদীসের এই স্তরগুলি বুঝতে হলে আমাদের কিছু আলোচনা করা দরকার। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কিভাবে সাহাবীগণ সমষ্টিগতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমগ্র জীবন তাঁদের হৃদয়পটে ধারণ করেছেন, কর্মে বাস্তবায়িত করেছেন, তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাবেয়ীগণও অনুরূপভাবে পরের যুগের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাবে-তাবেয়ীগণ হাদীস গ্রন্থাকারে সংকলন শুরু করেন। এই কাজের ধারাবাহিকতা পরবর্তী ২০০ বৎসরেরও বেশি চালু থাকে।

(২). হাদীস বর্ণনায় ভুল ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনার পটভূমি

সাহাবীদের জীবদ্দশাতেই বিস্তীর্ণ নতুন এলাকা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে অনেকে তাদের দেশে অবস্থিত সাহাবীদের সাথে থেকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সত্যিকারের ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন। আবার অনেকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট হননি। এদের মধ্যে পূর্ববর্তী ধর্মের ও দেশজ অনেক কুসংস্কার বহাল থাকে। ওসমানের (রা) খিলাফতের সময় থেকে কিছু ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কোনো কোনো সাহাবীর নামে

বিভিন্ন মিথ্যা কথা এসব নও-মুসলিমদের মধ্যে ছড়াতে থাকে, এক পর্যায়ে যা বৃহৎ ফিৎনায় রূপান্তরিত হয় এবং ৩৫ হিজরীতে খলীফা উসমান (ﷺ)-এর শাহাদতের কারণ হয়। তখন থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দলাদলি ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার অভাবে অনেক নও মুসলিম নিজ নিজ দলের পক্ষে, মতামতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যাকথা বানিয়ে বলতে শুরু করে।

তখন সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সনদের প্রচলন করেন। সনদ হলো কে কার নিকট থেকে শুনে হাদীসটি বলছে তা স্পষ্ট করে বলা, যেন ঐ ব্যক্তি কেমন ছিলেন, মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলার পক্ষে ছিলেন কি-না, এই ব্যক্তি সত্যিই তাঁর কাছ থেকে শুনেছে কি-না ইত্যাদি জেনে তার আলোকে নিশ্চিত হয়ে তারপর হাদীসটি গ্রহণ করা যায়। নিশ্চয়তা না আসলে হাদীসটি বানোয়াট, দুর্বল বা সন্দেহযুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। তাঁদের এই সতর্কতার উদ্দেশ্য হলো – হাদীসে রাসূল ﷺ -কে মিথ্যা থেকে রক্ষা করা এবং মিথ্যা হাদীস মুখে উচ্চারণ করা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বার বার বিভিন্নভাবে সাহাবীদেরকে সর্তক করেছেন যেন কেউ তাঁর নামে সামন্য বাড়িয়ে কমিয়েও কোনো কথা না বলে, বা মিথ্যা সন্দেহ হয় এমন হাদীসও যেন কেউ তাঁর নামে না বর্ণনা করে। কেউ করলে তাঁর জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিনতম শাস্তি।

(৩). সাহাবীগণের যুগ থেকেই হাদীস গ্রহণে কঠোরতা ও সতর্কতা

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল করার দুটি পর্যায় থাকতে পারে : ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। উভয় ধরনের ভুল ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাসূলূল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ মোতাবেক খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ সহীহ হাদীস বেছে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন ও শুধুমাত্র সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের যুগে কোনো সাহাবী মিথ্যা বলতেন না, হাদীস বলতে ভুল করতেন না, তবুও তাঁর সাহাবীর কোনো ভুল হতে পারে সন্দেহ হলেই তাঁকে বলতেন আরো সাক্ষী আনতে যারা এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনেছেন। আবু বকরের (ﷺ) কাছে মুগীরা ইবনু শু'বা (ﷺ) একটি হাদীস বলেন। তিনি তাঁকে সাক্ষী আনতে নির্দেশ দেন।[১] উমরের কাছে আবু মূসা আশআরী (ﷺ) একটি হাদীস বলেন। উমর তাঁকে বলেন : আপনি যদি এই হাদীসের সত্যতার উপর সাক্ষী আনতে না পারেন তাহলে আমি শাস্তি প্রদান করব।[২] এভাবে অন্য কেউ তাঁদের নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তাঁরা বর্ণনাকারীর কোনো ভুল হয়নি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনে তাঁরা সাক্ষী চাইতেন।[৩] আলীর (রা) নিকট কেউ হাদীস বললে তিনি তাকে শপথ করাতেন যে, তিনি ঠিকমত শুনেছেন এবং ঠিকমত মুখস্থ রেখে হুবহু বলতে পেরেছেন কি-না।[৪] প্রয়োজনে একবার হাদীস শোনার পরে অনেকদিন পরে পুনরায় আবার তাঁকে ঐ হাদীস বা হাদীসগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, পরীক্ষা করে দেখতেন তিনি হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কি-না, বা দুইবারের বর্ণনার মধ্যে কোনো হেরফের হয়েছে কি-না।[৫] এভাবে তাঁরা সাহাবীগণের ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোনো হাদীস বর্ণনায় সামান্যতম ভুল ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা বলে দিতেন।[৬] সামান্য সন্দেহ হলে তাঁরা সে হাদীস গ্রহণ করতেন না।[৭]

অপরদিকে তাবেয়ী পর্যায়ের অনেকের মধ্যে যখন ইচ্ছাকৃত মিথ্যার প্রবণতা দেখা দিল তখন তাঁরা আরো বেশি সতর্কতা শুরু করেন। বর্ণনাকারীর সততায় সন্দেহ হলে তার হাদীস তাঁরা শুনতেন না। কারো মিথ্যা ধরা পড়লে তার সম্পর্কে সবাইকে বলতেন, যেন কেউ তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে। হাদীসের সনদ উল্লেখের ক্ষেত্রে তাঁরা অত্যন্ত কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকেন।[৮]

(৪). তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে মিথ্যা হাদীস

এভাবে সাহাবীগণ যেমন একদিকে হাদীসের শিক্ষাপ্রদান করতে থাকেন, অপরদিকে কেউ যেন মিথ্যা কথা হাদীসের নামে না বলতে পারে এ জন্য সনদের দিকে লক্ষ্য রাখতে থাকেন। তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণও সাহাবীদের পথে হাদীসের শিক্ষাদান ও সনদের মাধ্যমে তার সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বলার প্রবণতা বাড়তে থাকে। তাছাড়া অনেক বর্ণনাকারী স্বরণশক্তির দুর্বলতা, বার্ধক্য ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক হাদীস বানোয়াট বলে ফেলতেন। অনেক সময় কোনো তাবেয়ীর কথা, প্রাচীন যুগের কোনো জ্ঞানের কথা বা প্রচলিত বাক্যকে হাদীস বলে বর্ণনা করে বসতেন অনেকেই। এছাড়া কোনো কোনো অজ্ঞ মুসলিম মানুষদেরকে ভালো কাজে উৎসাহ দানের জন্য বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে মূর্খতাবশত মনগড়া বা মিথ্যা হাদীস বলতেন।

যেমন, কোথাও মানুষদেরকে একটি পাপে লিপ্ত দেখে তিনি বললেন : এই কাজ থেকে বিরত হও, কারণ এই কাজ করলে এত পরিমাণ গোনাহ হবে বা শাস্তি হবে বলে হাদীসে বলা হয়েছে। তিনি জানেন যে এই কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেননি, কিন্তু এধরনের মূর্খ সৎ লোকেরা ভাবতেন মিথ্যা বলে যদি কিছু মানুষকে ভালো করা যায় তাহলে হয়তো আল্লাহ খুশি হবেন এবং তারা পুণ্য লাভ করবেন, যদিও তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের জন্য জাহান্নামের ঠিকানা নির্ধারিত করে নিতেন। এভাবে অজ্ঞতা, অনিচ্ছাকৃত ভুল, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়

মতবিরোধে স্বপক্ষের সমর্থন, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ, ইসলাম বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মানুষের মনে বিরাগ বা ঘৃণা জন্মান ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ মিথ্যা বা বানোয়াট কথাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে সামাজে চালানর চেষ্টা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।[১]

(৫). মিথ্যা হাদীস প্রতিরোধে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তীদের প্রচেষ্টা

এ সকল যুগের মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁরা সকল 'রাবী' বা 'হাদীস-বর্ণনাকারীর' পরিচয়, তার ধার্মিকতা, তার হাদীস বর্ণনার মান ইত্যাদি জেনে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। এ বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। তাঁরা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সকল বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস সংকলন করতেন। এরপর তা তুলনামূলকভাবে বিবেচনা করে কোন্ বর্ণনাকারীর বর্ণনা নির্ভুল তা যাচাই করতেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ যে পদ্ধতিতে হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীর (রাবীর) সত্যাসত্য যাচাই করতেন সেই পদ্ধতিকে আমরা কোর্টের বিচারক, উকিল ও জুরিগণের পদ্ধতি বা (Cross Examine) -এর সাথে তুলনা করতে পারি।

এ যুগের মুহাদ্দিস ইমামগণ জীবনপাত করেছেন হাদীসের হেফাজতের জন্য। তাঁরা জীবনের বড় অংশ কাটিয়েছেন তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল শহর, জনপদ ও প্রসিদ্ধ গ্রামগঞ্জ ভ্রমণ করে সকল আলেম ও হাদীস বর্ণনাকারীর হাদীস সংগ্রহ ও সংকলিত করে। সংগ্রহের সময় তাঁরা বর্ণনাকারীকে বিভিন্নমুখী প্রশ্ন (Cross Questions) করে তাঁর দেওয়া তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন। এরপর সেগুলিকে একত্রিত করে তুলনামূলক পরীক্ষা নিরীক্ষা বা (Cross Examine) -এর মাধ্যমে সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন। পাশাপাশি সকল হাদীস বর্ণনাকারীর জীবনী, কর্ম, ধর্মজীবন, শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ ইত্যাদি সকল বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। এরপর তাঁরা তাদের সংকলিত এ সকল তথ্য দুই প্রকার গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। এক প্রকার গ্রন্থে সকল প্রকার বর্ণিত হাদীস তাঁরা সনদ বা সূত্রসহ সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। অন্য প্রকার গ্রন্থে তাঁরা এসকল তুলনামূলক পরীক্ষার ফলাফল, হাদীসের "রাবী" বা বর্ণনাকারীগণের পরিচয়, তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা, তাঁদের মধ্যে কারা মিথ্যা বলতেন বলে প্রমাণিত হয়েছে ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমরা একটি নমুনা বিবেচনা করতে পারি। আবু হুরাইরা (রা.) একজন সাহাবী। বহুসংখ্যক তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন। এঁদের মধ্যে কিছু তাবেয়ী আজীবন বা দীর্ঘদিন তাঁর সাথে থেকেছেন এবং অনেকে অল্পদিন থেকেছেন। হাদীসের ইমামগণ আবু হুরাইরার (রা.) সকল ছাত্রের বর্ণিত সকল হাদীস একত্রিত করেছেন। সাধারণত আবু হুরাইরার (রা.) বর্ণিত সকল হাদীসই এরা শুনেছেন। একই হাদীস তাঁরা সকলেই বর্ণনা করেছেন। যদি দেখা যায় যে, ৩০ জন তাবেয়ী একটি হাদীস আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করছেন, তন্মধ্যে ২০/২৫ জনের হাদীসের শব্দ একই প্রকার কিন্তু বাকি ৫/১০ জনের বাক্য অন্য রকম। তাহলে বুঝা যাবে যে, প্রথম ২০/২৫ জন হাদীসটি আবু হুরাইরা যে শব্দে হাদীসটি বলেছেন হুবহু সেই শব্দে মুখস্থ ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আর বাকিরা হাদীসটি ভালভাবে মুখস্থ রাখতে পারেননি। এতে তাদের মুখস্থ ও ধারণ শক্তির দুর্বলতা প্রমাণিত হলো।

যদি আবু হুরাইরার কোনো ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ১০০ টি হাদীস শিক্ষা করে বর্ণনা করেন এবং তন্মধ্যে সবগুলি বা অধিকাংশ হাদীসই তিনি এভাবে হুবহু মুখস্থ রেখে বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে পারেন তাহলে তা তার গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। অপরদিকে যদি এরূপ কোনো তাবেয়ী ১০০ টি হাদীসের মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, তার বর্ণনা অন্যান্য তাবেয়ীর বর্ণনার সাথে মেলে-না, তাহলে বুঝা যাবে যে, তিনি হাদীস ঠিকমত লিখতেন না ও মুখস্থ রাখতে পারতেন না। তিনি হাদীস শিক্ষায়, শোনায়, লেখায় ও মুখস্থ করায় অবহেলা করতেন এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তিনি ভুল করতেন। এই বর্ণনাকারী তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তিনি "যয়ীফ" বা দুর্বল রাবী বা বর্ণনাকারী হিসাবে চিহ্নিত হন। ভুলের পরিমাণ ও প্রকারের উপর নির্ভর করে তার দুর্বলতার মাত্রা বুঝা যায়। যদি তার কর্মজীবন ও তাঁর বর্ণিত এ সকল উল্টোপাল্টা হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হতো যে তিনি ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর থেকে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বেশি-কম করেছেন অথবা ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বানোয়াট কথা বলেছেন তাহলে তাকে "মিথ্যাবাদী" রাবী (বর্ণনাকারী) বলে চিহ্নিত করা হতো। যে হাদীস শুধু এ ধরনের "মিথ্যাবাদী" বর্ণনাকারী একাই বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে কোনো অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা হিসাবে গ্রহণ করা হতো না। বরং তাকে মিথ্যা, জাল বা বানোয়াট বা (মাওযূ) হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

অপরদিকে যদি দেখা যায় যে, আবু হুরাইরার (রা.) কোনো ছাত্র এমন একটি বা একাধিক হাদীস বলছেন যা অন্য কোনো ছাত্র বলছেন না, সেক্ষেত্রে উপরের নিয়মে পরীক্ষা করেছেন তাঁরা। যদি দেখা যায় যে, উক্ত তাবেয়ী ছাত্র আবু হুরাইরার সাহচর্যে অন্যদের চেয়ে বেশি ছিলেন, তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস তিনি সঠিকভাবে হুবহু লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ রাখতেন বলে তুলনামূলক নিরীক্ষা (Cross Examine) -এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর সততা ও ধার্মিকতা সবাই স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে তার বর্ণিত অতিরিক্ত হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হিসাবে বা সহীহ হিসাবে গ্রহণ করা হতো। আর যদি উপরিউক্ত তুলনামূলক পরীক্ষায় প্রমাণিত হতো যে তাঁর বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসের বর্ণনার সাথে কম-বেশি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহলে তার বর্ণিত এই অতিরিক্ত হাদীসটিও উপরের নিয়মে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য হাদীস হিসাবে চিহ্নিত করা হতো।

সাধারণত একজন তাবেয়ী একজন সাহাবী থেকেই হাদীস শিখতেন না। প্রত্যেক তাবেয়ী চেষ্টা করতেন যথাসম্ভব বেশি সাহাবীর কাছে হাদীস শুনতে। এজন্য তাঁরা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যে শহরেই কোনো সাহাবী বাস করতেন সেখানে সফর করে যেতেন। মুহাদ্দিসগণ উপরের নিয়মে সকল সাহাবীর হাদীস, তাদের থেকে সকল তাবেয়ীর হাদীস একত্রিত করে তুলনামূলক

নিরীক্ষার মাধ্যমে ও বর্ণনাকারীগণের ব্যক্তিগত জীবন, সততা, ধার্মিকতা ইত্যাদির আলোকে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করতেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই ধারা অব্যহত থাকে। একদিকে মুহাদ্দিসগণ সনদসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে কথিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। অপরদিকে বর্ণনাকারীগণের বর্ণনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাদের বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ধারণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমি আমার লেখা **'হাদীসের নামে জালিয়াতিঃ প্রচলিত জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা'** নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, মুহাদ্দিসগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম, সারাজীবন সাধনা ও সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করে সনদের সকল বর্ণনাকারীর মান নির্ধারণ করেছেন।

(৬). গ্রন্থাকারে হাদীস সংকলন

তাবে-তাবেয়ীদের যুগ থেকে উলামা ও মুহাদ্দিসগণ হাদীসে রাসূল ﷺ বিভিন্ন গ্রন্থে সনদসহ সংকলন শুরু করেন। এর আগে সাহাবীগণ শুধু নিজের শোনা হাদীসগুলি অনেক সময় লিখতেন, অনেক সময় শুধু মুখস্থ শক্তির উপর নির্ভর করতেন। তাদের চিন্তার জগতে দ্বিতীয় কোনো ঝামেলা ছিল না। তাবেয়ীগণ বিভিন্ন সাহাবী থেকে শোনা হাদীস লিখে রাখতেন ও মুখস্থ করে রাখতেন। মুখস্থ এবং লিখা দু'টি একত্রে মিলিয়ে তাঁরা হাদীস বর্ণনা করতেন। কিন্তু এরা কখনো বিভিন্ন সাহাবীর হাদীস একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার চিন্ত করেননি। তাবে-তাবেয়ীগণ হাদীস গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৯৮ হিজরীতে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর ইন্তেকালের ৮৭ বৎসর পরে তাবেয়ী উমর ইবনু আব্দুল আজীজ (রাহ.) মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি নিজে একজন বড় আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি হাদীসের সংকলিত গ্রন্থের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করেন। হাদীস সংকলনের ধারাকে জোরদার করতে তাঁর অবদান ছিল খুবই বেশি। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে এই সংকলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তী প্রায় ৪০০ বৎসরে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং প্রায় শতাধিক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল হাদীস সংকলিত হয়।

মুহাদ্দিসগণের সংকলন-পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক মানুষ মনে করেন যে, হাদীসের নামে যা কিছু বলা হয় তা সবই সহীহ। অথবা মুহাদ্দিসগণ বা আলিমগণ তাদের গ্রন্থে যা কিছু সংকলন করেছেন তা যাচাই-বাছাইয়ের পরেই করেছেন, কাজেই সংকলিত সব হাদীসই বোধহয় সহীহ। হাদীস সংকলন সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞতাই এরূপ চিন্তার কারণ। আল্লামা ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি) বলেন: "বুখারী ও মুসলিমের বাইরে সহীহ হাদীস খুজতে হবে মাশহুর হাদীসের বইগুলিতে, যেমন আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু খুযাইমা, দারাকুতনী ও অন্যান্যদের সংকলিত গ্রন্থ। তবে এ সকল গ্রন্থে যদি কোনো হাদীস উদ্ধৃত করে তাকে সুস্পষ্টত 'সহীহ' বলে উল্লেখ করা হয় তবেই তা সহীহ বলে গণ্য হবে, শুধুমাত্র এ সকল গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে বলেই হাদীসটিকে সহীহ মনে করা যাবে না; কারণ এ সকল গ্রন্থে সহীহ এবং যয়ীফ সব রকমের হাদীসই রয়েছে।"[১]

আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) বলেন: "দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগের অধিকাংশ মুহাদ্দিসের রীতি ছিল যে, সহীহ, যয়ীফ, মাউযূ, বাতিল সকল প্রকার হাদীস সনদ-সহ সংকলন করা। তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, সনদ উল্লেখ করার অর্থই হাদীসটি বর্ণনার দায়ভার রাবীদের উপর ছেড়ে দেওয়া, সংকলকের আর কোনো দায় থাকে না।"[২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীস সংকলনের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নামে বা তাঁর সাহাবীদের নামে বর্ণিত সকল প্রকার বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদীস সনদসহ সংকলন করা, যেন প্রয়োজনে সনদের মাধ্যমে পরবর্তীতে সহীহ হাদীস ও বানোয়াট হাদীস পৃথক করা যায়। এভাবে শতাধিক হাদীস গ্রন্থে এবং তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ক কিছু গ্রন্থে সহীহ, যয়ীফ বা মাউযূ সনদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সকল প্রকার কর্ম, কথা, তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, জীবনী, অভ্যাস ইত্যাদির পাশাপাশি সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বিভিন্ন কথা ও কর্মের বিবরণ সংকলিত হয়েছে। এ সকল গন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম বা তাঁর জীবনের সামান্যতম ঘটনাও সংকলিত হয়েছে, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রথম যুগের মুসলিমগণ - সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কী গভীর আগ্রহ নিয়ে মহানবীর জীবনের সামান্যতম ঘটনা জানতে ও শিখতে চাইতেন, এবং তা অনুসরণ করতেন !

(৭). গ্রন্থাকারে বর্ণনাকরীগণের পরিচয় ও বর্ণনার মান নিধারণের বিধান সংকলন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হাদীস সংকলনের শুরু থেকেই তাবে-তাবেয়ীগণ এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ আরেক ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন হাদীস শাস্ত্রে ; তা হলো – হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম ঠিকানা, পরিচয়, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, তাঁর ধর্ম-কর্মের ধারা, কে কার নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন, উপরিউক্ত তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তির পরিমাণ, তিনি মিথ্যা হাদীস বলতেন কি-না ইত্যাদি সকল তথ্য। তাঁরা এ সকল তথ্যের আলোকে উক্ত ব্যক্তির নির্ভরতা বা গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা উল্লেখ করতেন।

এ সকল তথ্য সংকলনের পাশাপাশি এ সকল তথ্যের আলোকে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হাদীস সমূহের নির্ভরযোগ্যতা, বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা তারা উল্লেখ করেছেন। যেসকল হাদীসের সনদে বর্ণিত সকল ব্যক্তি সৎ বলে প্রমাণিত, তাঁদের স্মরণশক্তি নির্ভুল বলে প্রমাণিত এবং তাঁরা একে অপর থেকে সরাসরি হাদীস শুনেছেন বলে প্রমাণিত তাদের হাদীসকে শুদ্ধ বা নির্ভরযোগ্য (সহীহ বা হাসান) হাদীস বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ, হাদীসটি সত্যিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বা কর্ম বলে বুঝা যায়। অপরদিকে যেসকল হাদীসের সনদ জানা যায়

না, বা হাদীসের বর্ণনাকারী সঠিকভাবে সম্পূর্ণ সনদ উল্লেখ করতে পারেন না, অথবা সনদে বর্ণিত কোনো রাবীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল ছিল বলে জানা যায়, অথবা তার জীবনী ও ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্পর্কে কিছু জানা না যায় তাহলে সেই হাদীসকে দুর্বল হাদীস বা যয়ীফ হাদীস বলে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী বলে প্রমাণিত নয়। এ ধরনের হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলা ঠিক নয়, কারণ তা তাঁর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। একে তাঁর হাদীস বললে তাঁর নামে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে, আর তাঁর নামে মিথ্যা বলার একমাত্র পরিণতি জাহান্নাম।

আর যদি কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যা হাদীস প্রচার করতো বলে জানা যায়, তাহলে তার বর্ণিত হাদীসকে মিথ্যা বা মাউযূ হাদীস বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

(৮). অধিকাংশ গ্রন্থেই সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস সনদসহ সংকলিত হয়েছে

আমরা দেখেছি যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের উদ্দেশ্য ছিল বাছাই বিহীন সংকলন। তাই অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বিশুদ্ধ, অশুদ্ধ, বানোয়াট সকল প্রকার হাদীস সংকলিত হয়েছে। সনদ বিচারে অভিজ্ঞ আলেম ছাড়া এ সকল গ্রন্থের হাদীস থেকে উপকৃত হওয়া সাধারণ মুসলিম বা সাধারণ আলেমদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ঢালাও সংকলন না করে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন করার চেষ্টা করেন। এসকল গ্রন্থকে সাধারণত "সহীহ" গ্রন্থ বলা হয়। এ ধরনের গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হলো দুটি গ্রন্থ: (১). ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী (২৫৮ হি.) সংকলিত "সহীহুল বুখারী" এবং (২). ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল কুশাইরী (২৬২ হি.) সংকলিত "সহীহ মুসলিম"। এই দুই গ্রন্থের সংকলক সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেছেন এবং পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ এই দুই গ্রন্থের সকল হাদীস সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবিশ্লেষণ করে সংকলকদ্বয়ের চেষ্টা সফল হয়েছে বলে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। এছাড়া আরো কয়েকটি হাদীস গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে মুহাদ্দিসগণ বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন। বাকি গ্রন্থাবলী থেকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞ মুহাদ্দিগণই ফায়দা নিতে পারেন।

(৯). হাদীসের গ্রন্থাবলীর মান নির্ধারণে শাহ ওয়ালিউল্লাহর আলোচনা

১২শ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬হি./ ১৭৬২খ্রি.) হাদীসের গ্রন্থগুলিকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তিনটি গ্রন্থ : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক। এ তিনখানা গ্রন্থের সকল হাদীসই গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে সেসকল গ্রন্থ যাদের হাদীসসমূহ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হলেও সেগুলিতে কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীসও রয়েছে। মোটামুটিভাবে মুসলিম উম্মাহ এসকল গ্রন্থকে গ্রহণ করেছেন ও তাদের মধ্যে এগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই শ্রেণিতে রয়েছে তিনখানা গ্রন্থ: সুনানে আবী দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী। ইমাম আহমদের মুসনাদও প্রায় এই পর্যায়ের।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ঐ সকল গ্রন্থ যা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসদের আগের বা পরের যুগে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে বিশুদ্ধ, দুর্বল, মিথ্যা, ভুল সবধরনের হাদীসই রয়েছে, যার ফলে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিস ভিন্ন এসকল গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। এ সকল গ্রন্থ মুহাদ্দিসদের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এই পর্যায়ে রয়েছে : মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা, মুসনাদে আবদ ইবনু হুমাইদ, মুসনাদে তায়ালিসী, ইমাম বাইহাকীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (সুনানে কুবরা, দালাইলুন নুবুওয়াত, শুয়াবুল ঈমান,... ইত্যাদি), ইমাম তাহাবীর সংকলিত হাদীসগ্রন্থসমূহ (শরহ মায়ানীল আসার, শরহ মুশকিলিল আসার,... ইত্যাদি), তাবারানীর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহ (আল-মু'জামুল কবীর, আল-মু'জামুল আওসাত, আল-মু'জামুস সাগীর,... ইত্যাদি)। এ সকল গ্রন্থের সংকলকগণের উদ্দেশ্য ছিল যা পেয়েছেন তাই সংকলন করা। তাঁরা বিন্যাসের দিকে মন দেননি।

চতুর্থ পর্যায়ের গ্রন্থগুলি হলো ঐ সকল গ্রন্থ যা কয়েক যুগ পরে সংকলিত হয়। এ সকল গ্রন্থের সংকলকরা মূলত নিম্ন প্রকারের হাদীস সংকলন করেছেন : (১). যেসকল পূর্ব যুগে অপরিচিত বা অজানা থাকার কারণে পূর্ববতী গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়নি, (২). যেসকল হাদীস কোনো অপরিচিত গ্রন্থে সংকলিত ছিল, (৩). লোকমুখে প্রচলিত বা ওয়ায়েজদের ওয়াজে প্রচারিত বিভিন্ন কথা যা কোনো হাদীসের গ্রন্থে স্থান পায়নি, (৪). বিভিন্ন দুর্বল ও বিভ্রান্ত মানুষদের মধ্যে প্রচলিত কথাসমূহ, (৫). সাহাবী ও তাবেয়ীনদের কথা, ইহুদিদের গল্পসমূহ, পূর্ববতী জামানার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা যা ভুলক্রমে বা ইচ্ছাপূর্বক কোনো বর্ণনাকারী হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৬). কুরআন বা হাদীসের ব্যাখ্যা জাতীয় কথা যা ভুলক্রমে কোনো সৎ বা দরবেশ মানুষ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন, (৭). হাদীস থেকে উপলব্ধিকৃত অর্থকে কেউ কেউ ইচ্ছাপূবক হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন, অথবা (৮). বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের বাক্যকে একটি হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। এধরনের হাদীসের সংকলন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ইবনু হিব্বানের আদ-দুয়াফা, ইবনু আদীর আল-কামিল, খতীব বাগদাদী, আবু নুয়াইম আল-আসফাহানী, ইবনু আসাকের, ইবনুন নাজ্জার ও দাইলামী কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থসমূহ। খাওয়ারিজমী কর্তৃক সংকলিত মুসনাদ ইমাম আবু হানীফাও প্রায় এই পর্যায়ে পড়ে। এ পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের হাদীস হয় দুর্বল অথবা বানোয়াট।

পঞ্চম পর্যায়ের গ্রন্থসমূহে ঐসকল হাদীস রয়েছে যা ফিকাহশাস্ত্রবিদ আলেমগণ, সূফীগণ, ঐতিহাসিকগণদের মধ্যে প্রচলিত ও তাদের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়। যেসকল হাদীসের কোনো অস্তিত্ব পূর্বের চার পর্যায়ের গন্থে পাওয়া যায় না। এসব হাদীসের মধ্যে এমন হাদীসও রয়েছে যা ধর্মচ্যুত ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত পাপাচারী মানুষ তৈরি করেছেন। তিনি তার বানোয়াট হাদীসের জন্য এমন সনদ

তৈরি করেছেন যার ত্রুটি ধরা দুঃসাধ্য, আর তার বানোয়াট হাদীসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে সহজেই বিশ্বাস হবে। এ সকল বানোয়াট হাদীস ইসলামের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিপদ ও ফিতনা সৃষ্টি করেছে, তবে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদীসের ভাষা ও সূত্রের (সনদের) তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তার ত্রুটি খুঁজে বের করতে সক্ষম হন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ বলেন : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাদীস গ্রন্থের উপরেই শুধুমাত্র মুহাদ্দিসগণ নির্ভর করেছেন। তৃতীয় পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে হাদীস শাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইলমুর রিজাল ও ইলাল শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ ছাড়া কেউ উপকৃত হতে পারেন না, কারণ এ সকল গ্রন্থের সংকলিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে মিথ্যা হাদীস ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের মধ্যে পার্থক্য শুধু তাঁরাই করতে পারেন। আর চতুর্থ পর্যায়ের হাদীসগ্রন্থসমূহ সংকলন করা বা পাঠ করা এক ধরনের জ্ঞান বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। সত্য বলতে, রাফেজী, মুতাযেলী ও অন্যান্য সকল বিদ'আতী ও বাতিল মতের মানুষেরা খুব সহজেই এসকল গ্রন্থ থেকে তাদের মতের পক্ষে বিভিন্ন হাদীস বের করে নিতে পারবেন। কাজেই, এ সকল গ্রন্থের হাদীস দিয়ে কোনো মত প্রতিষ্ঠা করা বা কোনো মতের পক্ষে দলিল দেওয়া আলেমদের নিকট বাতুলতা ও অগ্রহণযোগ্য।[১]

(১০). যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না

প্রথমত, সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করার বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা

হাদীসের বিষয়ে এই দীর্ঘ আলোচনার কারণ হলো, সকল মুসলিম সমাজেই হাদীসের নামে অসংখ্য বানোয়াট ও মিথ্যা কথা ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলি বিভিন্ন বিদ'আত ও খেলাফে সুন্নাত রীতিনীতি ও কাজ কর্মের উৎস। এ জন্য আমাদের জানতে হবে যে, সুন্নাতের উৎস একমাত্র সহীহ ও হাসান হাদীস বা নির্ভরযোগ্য হাদীস। শুধুমাত্র এধরনের হাদীসের উপরে নির্ভর করে সুন্নাতকে জানতে হবে। সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুন্নাত মেনে চলতে হবে। এ বিষয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আবু হানীফা (১৫০ হি.) বলতেন : "যদি আমরা কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো হাদীস সহীহ সনদে পেয়ে যাই, তাহলে আমরা তার উপরেই নির্ভর করি এবং এর বাইরে আর কিছুর দিকেই ফিরে তাকাই না।"[২]

দ্বিতীয়ত, যয়ীফ বা দুর্বল হাদীস অনুসারে কর্ম করার শর্তাবলী

যয়ীফ হাদীস সুন্নাতের উৎস নয়। যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করে কোনো সুন্নাত বা রীতি চালু করা যাবে না। তবে সামান্য দুর্বল বা যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রীতির মধ্যে আমল করা যাবে বলে অনেক আলেম মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে কোনো যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের উপর আমল করার জন্য নিম্নরূপ শর্ত রয়েছে :

(১). যয়ীফ হাদীসটি খুব বেশি যয়ীফ বা দুর্বল হবে না। অর্থাৎ, দুর্বল বা যয়ীফ হাদীসের দুর্বলতার পর্যায় রয়েছে। বর্ণনাকারী যদি সাধারণভাবে নিভরযোগ্য হন, শুধুমাত্র তাঁর কোনো কোনো হাদীসে শব্দগত ভুল হয়, যাতে স্মরণশক্তিগত কিছু দুর্বলতা ধরা পড়ে তাহলে তা বিবেচনা করা যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তিনি ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন বলে বুঝা যায় না, তবে কোনো হাদীসই ঠিকমতো বলতে পারেন না। তিনি যতগুলি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই অন্যদের বর্ণনার বিপরীত, উল্টাপাল্টা ও ভুলে ভরা। অথবা হাদীসটির পরিপূর্ণ সনদই জানা যাচ্ছে না। এধরনের ক্ষেত্রে হাদীসটি বেশি দুর্বল বলে গণ্য হবে।

(২). এ ধরনের অল্প যয়ীফ বা সামান্য দুর্বল হাদীসকে শুধুমাত্র ফযীলতমূলক কর্মের ক্ষেত্রেই বিবেচনা করা জায়েয। বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রে কোনো দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করা একেবারেই জায়েয নয়।

(৩). যয়ীফ হাদীসটি এমন একটি কর্মের ফযীলত বর্ণনা করবে যা মূলত শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও ভালো। জায়েয-নাজায়েয বা হালাল-হারাম বিধান প্রদানে দুর্বল হাদীস ব্যবহার করা যাবে না। দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করে বলা যাবে না যে, এই কাজটি জায়েয বা না-জায়েয। যয়ীফ হাদীস দ্বারা নতুন কোনো কর্ম বা পদ্ধতি তৈরি করা যাবে না, তবে যে সকল কর্ম মূলত অন্যান্য হাদীসের আলোকে জায়েয সেই ধরনের কাজে যদি কোনো যয়ীফ হাদীসে বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হয় তাহলে সেই হাদীসের ভিত্তিতে ঐ কর্মটি করা যাবে।

(৪). যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে একথা মনে করা যাবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যিই একথা বলেছেন। সাবধানতামূলকভাবে আমল করতে হবে। অর্থাৎ মনে করতে হবে, হাদীসটি নবীজী ﷺ -এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, তবে যদি হাদীসটি সত্য হয় তাহলে এই সাওয়াবটা পাওয়া যাবে, কাজেই আমল করে রাখি। আর সত্য না হলেও মূল কাজটি যেহেতু সহীহ হাদীসের আলোকে মুস্তাহাব সেহেতু কিছু সাওয়াব তো পাওয়া যাবে। একটি উদাহরণ হয়ত পূর্বের শর্তগুলি বুঝতে সাহায্য করবে। মাগরিব ও ইশা'র নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। সাহাবায়ে কেরাম এ সময়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধামতো নফল নামায আদায় করতেন। সাধারণত তারা মাগরিবের ফরয নামায সেরেই মসজিদ থেকে বাড়িতে যেতেন। বাড়িতে তাঁরা মাগরিবের সুন্নাত নামায, ও তারপর দীর্ঘক্ষণ নফল নামায আদায় করতেন। এবিষয়ে সহীহ হাদীস রয়েছে। একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের নামাযের পরে ৬ রাক'আত নফল নামায আদায় করলে ১২ বৎসর ইবাদত করার সাওয়াব হবে। এই হাদীসটির উপর আমল করা উপরিউক্ত শর্ত সাপেক্ষ জায়েয। কারণ

এসময়ে নফল নামায আদায় মূলত জায়েয ও সুন্নাত-সম্মত। তবে রাকআতের ও সাওয়াবের নির্ধারণ শুধু এই যয়ীফ হাদীসের। কেহ মনে করতে পারেন, আমি এই হাদীস অনুযায়ী ৬ রাক'আত নামায পড়ি। যদি হাদীসটি সত্য হয় তাহলে আমি উল্লিখিত সাওয়াব পাব। নইলে সাধারণ নফল নামাযের সাওয়াব তো পাবই।[১]

আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারি যে, এ ধরনের সাবধানতামূলক আমল শুধু তারাই করবেন যারা সকল সহীহ হাদীসের উপর আমল করে শেষ করেছেন, আরো আমল করার আগ্রহ, উদ্দীপনা ও সময় তাঁদের রয়েছে। তা না-হলে সহীহ হাদীস রেখে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার অবকাশ কোথায়?

অন্য অনেক আলেম যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করতে সর্বোতভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেন, যেখানে অসংখ্য সহীহ হাদীসে নির্দেশিত কর্ম করার সময়ই অধিকাংশ মুসলিম পান না, সেখানে এসকল যয়ীফ হাদীস বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারণ, হাদীস দুর্বল হওয়ার অর্থই হলো হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, হয়ত-বা হতেও পারে। আর হাদীসটি সহীহ হওয়ার অর্থ হলো হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বলে আমরা বুঝতে পারছি। এখন সহীহ হাদীস ছেড়ে যয়ীফ হাদীসের পিছনে যাওয়ার যৌক্তিকতা কি?

এ ছাড়া তাঁরা বলেন যে, যারা যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয বলেছেন তাঁরা শর্ত করেছেন যে, বিশ্বাস বা আকীদাগত বিষয়ে কখনোই যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করা যাবে না, শুধুমাত্র কর্মের ক্ষেত্রে সাবধানতামূলক কর্ম করা যাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো বিশ্বাস ও কর্ম বিছিন্ন করা মুশকিল। কারণ যয়ীফ হাদীসের উপর যিনি আমল করছেন তিনি অন্তত বিশ্বাস করছেন যে, এই আমলের জন্য এই ধরনের সাওয়াব পাওয়া যেতে পারে। এজন্য এঁদের মতে যয়ীফ হাদীস, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা না বলেই বিবেচিত, তার পিছনে শ্রম ব্যয় অর্থহীন।

সর্বাবস্থায়, সকল আলেম ও মুসলিম উম্মাহ একমত যে, মাওযু বা বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করা বা তার উপর আমল করা একেবারেই নিষিদ্ধ ও হারাম।[২]

(গ). হাদীসের সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট হওয়ার মানদণ্ড

প্রথমত, হাদীসের নির্ভরতার একমাত্র মানদণ্ড মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত

কোনো হাদীস সহীহ, যয়ীফ অথবা মিথ্যা কি-না তা জানার জন্য সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের মতামতের আলোকে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ বিস্তারিত বিধানাবলী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। একমাত্র তাঁদের বক্তব্যের আলোকেই হাদীসের মান নির্ধারণ করা যায়।

আমরা অনেকে অজ্ঞতার ফলে প্রচলিত সকল হাদীস মেনে চলার যুক্তি হিসাবে বলি যে, বর্তমান যুগে কোনো হাদীসকে সহীহ বা যয়ীফ বলার যোগ্যতা কারো নেই ; কাজেই, মুহাদ্দিসগণ যা সংকলন করে রেখেছেন তার উপরেই আমল করতে হবে। কথাটি অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিভ্রান্তিকর। কারণ, অতীত যুগের মুহাদ্দিসগণ শুধু হাদীস সংকলনই করেননি, উপরন্তু তাঁরাই বলে দিয়েছেন, কোন্ হাদীস সহীহ ও কোন্ হাদীস যয়ীফ।

তাঁরা তাঁদের সংকলিত হাদীসগ্রন্থে এবং পৃথক গ্রন্থাদিতে হাদীসের সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের জীবনকে বাজি রেখে, সমগ্র জীবন অক্লান্ত ও অমানুষিক পরিশ্রম করে হাদীস সংগ্রহ করেছেন, সংকলন করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারীগণকে অথবা সমকালীন আলেমদেরকে প্রশ্ন করে তাঁদের সততা, নিষ্ঠা, ধার্মিকতা সম্পর্কে যাবতীত তথ্য সংগ্রহ করে তা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। সর্বোপরি তাঁরা হাদীস বর্ণনাকারীদের সকল বর্ণনা একত্রিত তুলনামূলক বিবেচনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল বর্ণনাকারীর ও তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেছেন এবং সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট নির্ধারণ করেছেন। আমাদের প্রয়োজন তাঁদের নির্দেশনা অনুসরণ করা। কাজেই বর্তমান যুগে হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ বলার মৌলিক যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। অতীত যুগের মুহাদ্দিসগণই নির্ধারণ করেছেন। আমাদের দায়িত্ব তাঁদের নির্দেশনা অনুসরণ করা।

(ক). হাদীস বিচারে প্রাচীন ইমামদের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করতে হবে

বর্তমান যুগে হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ নির্ধারণের যোগ্যতার চেয়েও আমাদের প্রয়োজন হাদীসের বিষয়ে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ইমামদের মতামত জানা ও পালন করা। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, তাবারানী, বাইহাকী, যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী ও অন্যান্য অসংখ্য হাদীস জ্ঞানের ইমাম হাদীস শাস্ত্রের সকল রাবী বা বর্ণনাকারীর অবস্থা ও তাদের বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গিয়েছেন। উপরন্তু অধিকাংশ হাদীসেরও সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার বিষয়ে তাঁরা স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের এখন শুধু তাঁদের নির্দেশনার আলোকে চলতে হবে। আমরা বর্তমান যুগে যখন বলি যে, অমুক হাদীসটি যয়ীফ তখন মূলত পূর্ববর্তী আলেমদের কথারই উদ্ধৃতি প্রদান করি, নিজেরা কিছুই বলি না।

(খ). একটি উদাহরণ : হাফেজদের ফযীলতের হাদীস

আমাকে একজন শ্রদ্ধেয় গবেষক আলেম প্রশ্ন করলেন : একজন কুরআন অনুযায়ী আমলকারী হাফেজ তাঁর পরিবারের

দশজন মানুষের জন্য শাফাআত করবেন বলে যে হাদীসটি ইমাম তিরমিযী সংকলন করেছেন[১] হাদীসটি কি সহীহ না যয়ীফ? আমি বললাম: হাদীসটি যয়ীফ। তিনি প্রতিবাদ করে বললেন: আপনি হাদীটিকে যয়ীফ বললেন, অথচ পূর্বের মুহাদ্দিসগণ তা রেওয়ায়েত করেছেন, তাঁরা কি কিছুই বুঝতেন না? আমি বললাম: জনাব, তাঁরাই তো বুঝতেন, আমরা আর কতটুকু বুঝি! তাঁরা হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন বলেই তো আমরা তাকে যয়ীফ বলছি। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং সাথে সাথে হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন, শুধু তাই নয় যয়ীফ হওয়ার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের সমস্যা হলো আমরা তাঁদের আলোচনা কষ্ট করে পড়তে চাই না। ইসলামের মহব্বতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর মহব্বতে, তাঁরই নির্দেশ পালনার্থে তাঁরা ইসলামের উৎস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসকে সকল প্রকার মিথ্যা, বানোয়াট ও শয়তানের শয়তানী থেকে রক্ষা করার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন, জীবনের সকল আরাম আয়েশ ত্যাগ করেছেন। তাঁদের সারা জীবনের সাধনার ফল তাঁরা একত্রিত করে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা কিছু সময় ব্যয় করে তা পড়তে ও শিখতে চাই না।

(গ). অন্য উদাহরণ : "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য"

অন্য একজন আলেমকে বলা হয় যে, "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র তুল্য" হাদীসটি সহীহ নয়, বরং অত্যন্ত যয়ীফ বা বানোয়াট। তিনি এর উত্তরে খুব আবেগের সাথে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ কত কষ্ট করে সাবধানতার সাথে হাদীস সংকলন করেছেন, যয়ীফ হাদীস গ্রহণ করেননি সে কথা বর্ণনা করে বললেন যে, তাঁদের এই প্রচেষ্টার পরে আমাদের এই যুগে কোনো হাদীসকে যয়ীফ বলার অধিকার কারো নেই। তিনি বললেন না, বা হয়ত জানেন না যে, পূর্ববর্তী যুগের ঐসব আলেমগণই তাঁদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টার আলোকে এই হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য বলে নির্ণয় করেছেন। কোনো নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীসের গ্রন্থে তাঁরা এই হাদীসটি উল্লেখ করেননি। তাঁরাই বলে গিয়েছেন যে, এই হাদীসটির কোনো গ্রহণযোগ্য সনদ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ মুহাদ্দিস একমত যে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হাদীস। অনেকেই একে বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস বলে সাব্যস্ত করেছেন।[২]

সবচেয়ে আশ্চার্যের বিষয় হলো, সাহাবীগণের মর্যাদা প্রমাণের জন্য আমরা এই ধরনের মিথ্যা ও অনির্ভরযোগ্য হাদীসের উপর নির্ভর করি, অথচ কুরআনে সুস্পষ্টভাবে তাঁদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের মর্যাদার বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ সংকলিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কোনো বুজুর্গের গ্রন্থে উল্লেখ থাকা হাদীসের সহীহ হওয়ার প্রমাণ নয়

(১). কোনো হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত থাকার দ্বারা বুঝা যায়-না যে হাদীসটি সহীহ

হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা, দুর্বলতা বা জালিয়াতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ সমস্যা হলো, কারো সংকলন বা উল্লেখের উপর নির্ভর করা। আমরা যখনই শুনি যে, হাদীসটি অমুক আলেম, অমুক ওলী বা অমুক মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন, তখনই মনে করি হাদীসটি সহীহ না হলে তিনি তা নিজের গ্রন্থে সংকলিত করলেন কেন? আমাকে একদিন একজন আলেম প্রশ্ন করলেন: তাফসীরে তাবারীতে যে সকল হাদীস আছে তার মধ্যে কোনো দুর্বল হাদীস আছে কি? আমি বললাম তাফসীরে তাবারীতে সহীহ, যয়ীফ, বানোয়াট সবধরনের হাদীস রয়েছে, তাছাড়া ইসরাঈলিয়্যাত বা ইহুদিদের কথা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তিনি কঠিন আপত্তি করে বললেন: তাঁর মতো অত বড় আলেম কী-ভাবে যয়ীফ হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি বললাম: কারণ তিনি তো জানতেন না যে, এক যুগে মুসলিম জগতের আলেমগণ সনদের কথা ভুলে যাবে এবং সহীহ যয়ীফ নির্ণয়ের চেষ্টা করবে না। তৎকালীন আলেমগণ তো সনদসহ সকল কথা সংকলন করেছেন যে, আমরা সনদের উপর ভিত্তি করে ভালো-মন্দ চিনে নেব। তাঁরা কোনো কথাকেই হাদীস বলে সরাসরি উল্লেখ করেননি। তাঁরা বলেছেন : অমুক বলেছে যে এই কথাটি নাকি হাদীস। – এতটুকুই মাত্র।

কোনো যুগে কোনো ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ বা আলেম কখনো বলেননি যে, কোনো হাদীসের গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণিত থাকলেই হাদীসকে সহীহ বলা যাবে। বরং প্রতিটি হাদীসেরই সনদ বিচার করে ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের মতামতের আলোকে তাকে সহীহ বা যয়ীফ বলতে হবে। এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সনদ বিচারের মাধ্যমেই মুহাদ্দিসগণ নির্ণয় করেছেন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুমাল্লাহ) সংকলিত "সহীহ" গ্রন্থদ্বয়ের বাইরে সকল হাদীস গ্রন্থেই সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট হাদীস রয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রসারতার কারণে অনেক সময় আলেম নামধারীও বলে বসেন: অমুক মুহাদ্দিস, ফকীহ বা বুজুর্গ কি কিছুই জানতেন-না যে, তিনি তাঁর গ্রন্থে যয়ীফ হাদীস বা মিথ্যা হাদীস উল্লেখ করবেন। ইলমু হাদীসের মূলনীতি ও মুহাদ্দিসগণের সংকলন পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এরূপ কথা বলা হয়। এদের মুর্খতার স্বরূপ ও এ বিষয়ে ইমাম বুখারী, মুসলিম, হাকিম নাইসাপূরী, নববী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ মুহাদ্দিসের বক্তব্য ও এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের মূলনীতি বিস্ত ারিত আলোচনা করেছি আমি আমি আমার লেখা **'বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস (**) নামক আরবী গ্রন্থে। আগ্রহী আলিম পাঠককে বইটি পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। এ পুস্তকের পরিসরে আমরা বলতে পারি যে, এক্ষেত্রে আমাদের নিম্নের বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন:

(২). অধিকাংশ সংকলক বাছবিচার ছাড়া সকল কথা সনদসহ সংকলন করেছেন

অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আলেম ও ইমাম হাদীস সংকলন করেছেন সহীহ, যয়ীফ বা বানোয়াট সকল প্রকার হাদীস সনদসহ একত্রিত করার উদ্দেশ্যে, যেন রাসূলুল্লাহর নামে কথিত বা প্রচারিত সককিছুই সংরক্ষিত হয়। তাঁরা কোনো হাদীসই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর

কথা বা কাজ হিসাবে সরাসরি বর্ণনা করেননি। বরং সনদসহ, কে তাদেরকে হাদীসটি কার সূত্রে বর্ণনা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মূলত বলেছেন: "অমুক ব্যক্তি বলেছেন যে, 'এই কথাটি হাদীস', আমি তা সনদসহ সংকলিত করলাম"। হাদীস প্রেমিক পাঠকগণ এবার সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট বেছে নিন। এ সকল সংকলকের কেউ কেউ আবার হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তার সনদের আলোচনা করেছেন এবং দুর্বলতা বা সবলতা বর্ণনা করেছেন।

(৩). কয়েকজন শুধু সহীহ হাদীস সংকলনের চেষ্টা করেন, সবাই সফল হননি

শতাধিক হাদীসগন্থের মধ্যে শুধমাত্র ৭/৮ টি গন্থের সংকলক শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন এবং চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমঃ ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (২৬১ হি.), ইমাম ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি.), ইমাম ইবনু হিব্বান (৩৫৪ হি.), ইমাম দারাকুতনী (৩৮৫ হি.), ইমাম হাকিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি.), যিয়াউদ্দীন মাকদিসী (৬৪৩ হি.), রাহিমাহুমুল্লাহ। এরা তাঁদের গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন বলে দাবি করলেও পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ কখনই বিস্তারিতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁদের সংকলিত প্রতিটি হাদীসের সনদ বিচার না করে তাকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেননি। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁরা শুধু বুখারী ও মুসলিম সংকলিত 'সহীহ' গ্রন্থদ্বয়ের সকল হাদীস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বাকি গ্রন্থগুলির লেখকগণের দাবি তাঁরা মেনে নেননি। কারণ, সনদ বিচারে দেখা গিয়েছে যে, বাকি গ্রন্থগুলির সংকলকগণ সহীহ হিসাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছেন তার মধ্যে অনেক হাদীস যয়ীফ ও কিছু হাদীস বানোয়াটও রয়েছে, কাজেই সনদ বিচার না করে তাদের গ্রন্থের কোনো হাদীস সহীহ বলা যাবে না।[১]

এ হচ্ছে সেসব গ্রন্থের অবস্থা যেসব গ্রন্থের সংকলকগণ শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাহলে অন্যান্য গন্থের সংকলকগণ, যারা সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল হাদীস জমা করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের গ্রন্থের হাদীস কী-ভাবে সনদ বিচার করে গ্রহণ করতে হবে তা একটু চিন্তা করে দেখুন। আমরা যদি মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলার অধিকার আমাদের আছে তাহলে অন্য কথা।

(৪). 'সিহাহ সিত্তা'-র বাকি ৪টি গ্রন্থেও কিছু যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস আছে

আমাদের সমাজে 'সিহাহ সিত্তাহ' নামে প্রসিদ্ধ ৬ টি গ্রন্থের মধ্যে ২টি সহীহ গ্রন্থ: "সহীহ বুখারী" ও "সহীহ মুসলিম" ছাড়া বাকি ৪টির সংকলকও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস বর্ণনা করবেন বলে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলিতে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি অনেক দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসও সংকলিত করেছেন। তবে তাঁদের গ্রন্থগুলির অধিকাংশ হাদীস নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে তাঁদের গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করেছেন, সাথে সাথে তাঁরা এসকল গ্রন্থে সংকলিত দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বিধান প্রদান করেছেন। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন : "এই চার গ্রন্থে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ নয়। বরং এসকল গ্রন্থে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও বানোয়াট সকল প্রকারের হাদীস রয়েছে।"[২]

ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহর (রাহ) বিবরণ দেখেছি।

(৫). প্রত্যেক শাস্ত্রের পৃথক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের কাজ ভিন্ন

আমাদের জানতে হবে যে, প্রত্যেক ইসলামী শাস্ত্রের জন্য বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। হাদীস শাস্ত্রের অনেক বিশেষজ্ঞ ফিকহের বিষয়ে অন্যান্য ইমামগণের অনুসরণ করতেন। ফিকহ শাস্ত্রের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ অনেক সময় হাদীসের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সনদ বিচার করেননি, বিচারের সময় পাননি। অনেকে এ বিষয়ে সীমিত জ্ঞান রাখতেন। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে নির্বিচারে যা শুনেছেন বা পড়েছেন সব হাদীসই লিখে রেখে গিয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ তাদের গ্রন্থের হাদীসগুলির সনদ বিচার করে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে ওয়াজ নসীহত, তাসাউফ, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রখ্যাত আলেমগণও সাধারণত হাদীসের মান নির্ধারণের জন্য চেষ্টা করেননি। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থে বাছবিচার ছাড়া প্রচলিত সকল হাদীস সংকলিত করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল উপদেশ প্রদান। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণ তাঁদের গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের মান নির্ধারণ করেছেন এবং অনেক হাদীসকে বানোয়াট বলে নির্ণয় করেছেন।

যেমন ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবু বকর আল-মারগীনানী (৫৯৩ হি.) তাঁর লেখা ফিক্হ শাস্ত্রের প্রখ্যাত গ্রন্থ "হেদায়া"-য় অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি ফকীহ হিসাবে ফিকহী মাসায়েল নির্ধারণ ও বর্ণনার প্রতিই তাঁর মনোযোগ ও সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। হাদীস উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনি যা শুনেছেন বা পড়েছেন তা বাছবিচার না করেই লিখেছেন। তিনি কোনো হাদীসের সহীহ বা যয়ীফ বিষয়ে কোনো মন্তব্যও করতে যাননি। পরবর্তী যুগে আল্লামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ যাইলায়ী হানাফী (৭৬২ হি.), আল্লামা আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস এসকল হাদীস নিয়ে সনদভিত্তিক গবেষণা করে এর মধ্যথেকে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস নির্ধারণ করেছেন।

অনুরূপভাবে প্রখ্যাত দার্শনিক, ফকীহ ও সূফী হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-গাযালী (৫০৫ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন"-এ ফিক্হ ও তাসাউফ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি দার্শনিক ও ফকীহ ছিলেন, মুহাদ্দিস ছিলেন না। এজন্য হাদীসের সনদের বাছবিচার না করেই যা শুনেছেন বা পড়েছেন সবই উল্লেখ

করেছেন। পরবর্তী যুগে আল্লামা যাইনুদ্দীন আবুল ফযল আব্দুর রহীম ইবনু হুসাইন আল-ইরাকী (৮০৬ হি.) ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস তাঁর উদ্ধৃত হাদীসসমূহের সনদ-ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীসগুলি নির্ধারণ করেছেন । মহান আল্লাহ এঁদের সকলকে এবং আমাদের এ গ্রন্থে উল্লিখিত সকল আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও বুজুর্গকে অফুরন্ত রহমত প্রদান করুন।

(৬). কোনো ফকীহ বা বুজুর্গের গ্রন্থের হাদীস সনদ বিচার ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো ফকীহ, সূফী, দার্শনিক বা অন্য কোনো আলেমের গ্রন্থে কোনো হাদীসের উল্লেখ থাকার অর্থ কখনই এই নয় যে, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য। তাঁরা নিজেরাও তা দাবি করেননি। আমরা দেখেছি যে, কোনো মুহাদ্দিস কোনো হাদীস সংকলন করার দ্বারা এ কথা কখনো বুঝান-না যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন। তবে তিনি যদি সংকলনের পরে তা সহীহ বলে ঘোষণা করেন তাহলে তা তাঁর মতে সহীহ বলে বিবেচিত হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য মুহাদ্দিস তা পুনর্বিবেচনা করবেন। অনুরূপভাবে যদি কোনো ফকীহ, সূফী বা আলেম তাঁর কোনো গ্রন্থে কোনো হাদীস উল্লেখ করেন তাহলে একথা বুঝা যাবে না যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন। বরং এতটুকু বোঝা যাবে যে, তিনি হাদীসটি শুনেছেন বা পড়েছেন এবং কোনো মন্তব্য ছাড়াই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। তবে তিনি যদি হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন, তাহলে তা ভিন্ন কথা।

(৭). ইমাম নববী, সুয়ূতী, আলী কারী ও লাখনবীর মতামত

উপরের কথাগুলি কারো কারো কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন ইসলামী দেশে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে স্থবিরতা নেমে আসে। অনেক আলেমও সুযোগের অভাবে, গবেষণার পরিবেশ না পেয়ে এ ধরনের ধোঁকায় পতিত হতে থাকেন। তাঁরা অনেক সময় অনেক হাদীসের নির্ভরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বুজুর্গের গ্রন্থে উল্লেখ থাকাকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়। যদি কেউ মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য বলেন তাহলে তাঁরা তার প্রতিবাদ করতে থাকেন। তাঁরা চিন্তা করেন হাদীসটি শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী বা ইমাম গাযালী বা ইবনু আরাবী বা খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাহ) বা অন্য কোনো প্রখ্যাত সূফী, ফকীহ বা ওয়ায়েজের গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে, কী-ভাবে তা যয়ীফ বা বানোয়াট হয় ?

(ক). কুতুল কুলূব, এহ্‌ইয়াউ উলূমুদ্দীন, সা'লাবী, বাইযাবী ও কাশ্‌শাফে মিথ্যা হাদীস

সমস্যাটি দেখা দেওয়ার পরে অনেক প্রাজ্ঞ আলেম এ বিষয়ে কথা বলেন। আল্লামা আলী কারী (১০১৪ হি.) তাঁর বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীস সম্পর্কিত গ্রন্থ "আল-আসরারুল মারফুয়া"–এ কোনো কোনো হাদীসকে বানোয়াট বলে ঘোষণা দেওয়ার পরে লিখেছেন : "কুতুল কুলুব" বা "এহ্‌ইয়াউ উলূমুদ্দীন", "তাফসীরে সা'লাবী" ইত্যাদি গ্রন্থে হাদীসটির উল্লেখ আছে দেখে ধোঁকা খাবেন না।[১]

আল্লামা মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ আন-নাবাবী (৬৭৬ হি.) তাঁর "তাকরীব" গ্রন্থে ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.) তাঁর "তাদরীবুর রাবী" গন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে অনেক মিথ্যা কথাকে কিছু বুজুর্গ দরবেশ মানুষ হাদীস বলে সমাজে চালিয়েছেন। কোনো কোনো মুফাসসির, যেমন – আল্লামা আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আস সা'য়লাবী নিশাপূরী (৪২৭ হি.) তাঁর "তাফসীর" গ্রন্থে, তাঁর ছাত্র আল্লামা আলী ইবনু আহমাদ আল-ওয়াহিদী নিশাপূরী (৪৬৮ হি.) তাঁর "বাসীত", "ওয়াসিত", "ওয়াজীয" ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে, আল্লামা আবুল কাসেম মাহমূদ ইবনু উমর আয-যামাখশারী (৫৩৮ হি.) তাঁর "কাশ্‌শাফ" গ্রন্থে, আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর আল-বাইযাবী (৬৮৫ হি.) তাঁর "আনওয়ারুত তানযীল" বা "তাফসীরে বাইযাবী" গ্রন্থে এসকল বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাঁরা এই কাজটি করে ভুল করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন : "আল্লামা ইরাকী (৮০৬ হি.) বলেছেন যে, প্রথম দুইজন – সা'লাবী ও ওয়াহিদী সনদ উল্লেখপূর্বক এসকল বানোয়াট বা জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁদের ওজর কিছুটা গ্রহণ করা যায়, কারণ তাঁরা সনদ বলে দিয়ে পাঠককে সনদ বিচারের দিকে ধাবিত করেছেন, যদিও মাওযূ বা মিথ্যা হাদীস সনদসহ উল্লেখ করলেও সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'মাওযূ' না বলে চুপ করে যাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু পরবর্তী দুই জন – যামাখশারী ও বাইযাবীর-এর ভুল খুবই মারাত্মক। কারণ, তাঁরা সনদ উল্লেখ করেননি, বরং রাসূলুল্লাহর কথা বলে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে এ সকল বানোয়াট কথা উল্লেখ করেছেন।[২]

আল্লামা সুয়ূতী (৯১১ হি.), আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪ হি.) প্রমুখ আলেম এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা ইমাম গাযালীর "এহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দীন" ও অন্যান্য গ্রন্থে, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী লিখিত কোনো কোনো গ্রন্থে উদ্ধৃত অনেক মাউযূ বা বানোয়াট হাদীসের আলোচনা প্রসংঙ্গে বলেন যে, কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন : এতবড় আলেম ও এতবড় সাহেবে কাশফ ওলী, তিনি কি বুঝতে পারলেন না যে, এই হাদীসটি বানোয়াট ? তাঁর মত একজন ওলী কী-ভাবে নিজ গ্রন্থে মাউযু হাদীস উল্লেখ করলেন ? তাঁর উল্লেখের দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, হাদীসটি সহীহ? এই সন্দেহের জবাবে তাঁরা কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

(খ). বুজুর্গগণ যা শুনেন তা-ই লিখেন, মুহাদ্দিসগণ সহীহ যয়ীফ নির্ধারণ করেন

প্রথমত, কোনো গ্রন্থে কোনো হাদীস মন্তব্য ছাড়া উল্লেখ করার অর্থ কখনই এই নয় যে, গ্রন্থাকার হাদীসটিকে সহীহ মনে করেন। বরং তাঁরা যা পড়েছেন বা শুনেছেন সেভাবেই উল্লেখ করেছেন মাত্র। তাঁরা আশা করেছেন হয়ত এর কোনো সনদ থাকবে, হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ তা খুঁজে দেবেন।

(গ). হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে কাশফের কোনো অবদান নেই

দ্বিতীয়ত, হাদীস বিচারের ক্ষেত্রে কাশফের কোনোই অবদান নেই। কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নেয়ামত মাত্র, আনন্দ ও শুকরিয়ার উৎস। ইচ্ছামতো প্রয়োগের কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা উমর (ﷺ)-কে কাশফের মাধ্যমে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত সারিয়ার সেনাবাহিনীর অবস্থা দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর সতর্কবাণীও তাঁদেরকে শুনিয়েছিলেন। অথচ সেই উমর (রা- কে হত্যা করতে তাঁরই পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল আবু লু'লু, তিনি টের পেলেন না।

এছাড়া কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদি দ্বারা কখনোই হক বাতিলের বা ঠিক বেঠিকের ফয়সালা হয় না। নবীগণের পরে সর্বযুগের সকল ওলীর শ্রেষ্ঠ ওলী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ ও সমস্যা ঘটেছে, কখনোই একটি ঘটনাতেও তাঁর কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে হক বা বাতিল জানার চেষ্টা করেননি। খুলাফায়ে রাশেদীন – আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর দরবারে অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীর ভুলভ্রান্তির সন্দেহ হলে তাঁরা সাক্ষী চেয়েছেন অথবা বর্ণনাকারীকে কসম করিয়েছেন যে, তিনি বিশুদ্ধভাবে বলতে পেরেছেন। কখনো কখনো তাঁরা বর্ণনাকারীর ভুলের বিষয়ে বেশি সন্দিহান হলে তার বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফ, ইলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে হাদীসের সত্যাসত্য বিচার করেননি। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন, শুনেছেন ও হাদীসের সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট নির্ধারণের জন্য সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা নিয়েছেন। বর্ণনাকারীর অবস্থা অনুসারে হাদীস গ্রহণ করেছেন বা যয়ীফ হিসবে বর্জন করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদির উপর নির্ভর করেননি। হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য সনদের উপর নির্ভর করা সুন্নাতে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সুন্নাতে সাহাবা। আর এ বিষয়ে কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নের উপর নির্ভর করা খেলাফে-সুন্নাত, বিদ'আত ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা।

তৃতীয়ত, বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক প্রখ্যাত সাধক, যাঁদেরকে আমরা সাহেবে কাশফ বলে জানি, তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক কথা লিখেছেন যা নিঃসন্দেহে ভুল ও অন্যায়। মুহাম্মাদ ইবনু আলী, মুহিউদ্দীন ইবনু আরাবী (৬৩৮ হি.) যিনি সূফীদের কাছে শাইখে আকবার বা সর্বশ্রেষ্ঠ পীর হিসাবে খ্যাত, লিখেছেন যে, ফেরাউন মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর ঈমানও মূসার ঈমানের মতোই ছিল। শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.) লিখেছেন যে, আবু হানীফা নু'মান ইবনু সাবেত ও তাঁর অনুসারীগণ বিভ্রান্ত জাহান্নামী ৭২ দলের একটি দল। ইমাম গাযালী লিখেছেন যে, গানবাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার পথে সহায়ক ও বিদ'আতে হাসানা। এরূপ অগণিত উদাহরণ তাঁদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেউই ভুলের ঊর্ধে নন। কাজেই, তাঁরা যদি কোনো হাদীসকে সহীহ বলেও ঘোষণা দেন তারপরও তার সনদ বিচার ব্যতিরেকে তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, সকল বানোয়াট কথাকে চিহ্নিত করা দ্বীনের অন্যতম ফরয। কেউ সন্দেহযুক্ত হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে বর্ণনা করলেও তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কাজেই, এ ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতার অবকাশ নেই।[১]

(৮). হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সংসারত্যাগী পবিত্র হৃদয় দরবেশদের সমস্যা

বস্তুত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন সূফী, দরবেশ ও সরলমনা সংসারত্যাগী নেককার মানুষগণ। এরা সরলমনে যা শুনেছেন তাই বিশ্বাস করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে কেউ মিথ্যা বলতে পারে তা কখনো তাঁরা চিন্তা করেননি। তাঁরা যা শুনেছেন সবই ভক্তের হৃদয় দিয়ে শুনেছেন, সরল বিশ্বাসে মেনে নিয়েছেন, আমল করেছেন এবং অন্যকে আমল করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এজন্য তাবে-তাবেয়ীদের যুগ থেকেই মুহাদ্দিসগণ এধরনের নেককার দরবেশদের হাদীস গ্রহণ করতেন না। ইমাম মালিক (১৭৯ হি.) বলতেন: মদীনায় অনেক দরবেশ আছেন, যাদেরকাছে আমি লক্ষ টাকা আমানত রাখতে রাজি আছি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত একটি হাদীসও আমি গ্রহণ করতে রাজি নই।[২]

আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (১৯৮ হি.) বলেন: "আল্লাহওয়ালা দরবেশেদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা যায় না, তাঁরা হাদীস সঠিকভাবে মুখস্থ রাখতে পারেন না, উল্টে পাল্টে ফেলেন, অধিকাংশ সময় মনের আন্দাজে হাদীস বলেন।"[৩] আল্লামা সাইয়্যেদ শরীফ জুরজানী হানাফী (৮১৬ হি.) লিখেছেন: "(মাওযূ বা বানোয়াট হাদীসের প্রচলনে) সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন দুনিয়াত্যাগী দরবেশগণ, তাঁরা অনেক সময় সাওয়াবের নিয়্যাতেও মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলেছেন।"[৪] ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) বলেন: "বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো সূফী সাওয়াবের বর্ণনায় ও পাপাচারের শাস্তির বর্ণনায় মিথ্যা হাদীস বানানো ও প্রচার করা জায়েয বলে মনে করতেন।"[৫]

আল্লামা আলী কারী (১০১৪ হি.) লিখেছেন: "অত্যধিক ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত সংসারত্যাগী দরবেশগণ শবে বরাতের নামায, রজব মাসের নামায ইত্যাদি বিভিন্ন ফযীলতের বিষয়ে অনেক বানোয়াট কথা হাদীস নামে প্রচার করেছেন। তাঁরা মনে করতেন এতে তাঁদের সাওয়াব হবে, দ্বীনের খেদমত হবে। বানোয়াট হাদীসের ক্ষেত্রে নিজেদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন এই সকল মানুষেরা। তাঁরা এই কাজকে নেককাজ ও সাওয়াবের কাজ মনে করতেন, কাজেই তাঁদেরকে কোনো প্রকারেই বিরত করা সম্ভব ছিল না। অপরদিকে তাঁদের নেককর্ম, সততা, ইবাদত বন্দেগি ও দরবেশীর কারণে সাধারণ মুসলিম ও আলেমগণ তাঁদের ভালবাসতেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের কথাবার্তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতেন ও বর্ণনা করতেন। অনেক

সময় ভালো মুহাদ্দিসও তাঁদের আমল আখলাকে ধোঁকা খেয়ে তাঁদের বানোয়াটি ও মিথ্যা হাদীস অসতর্কভাবে গ্রহণ করে নিতেন।"[১]

তৃতীয়ত, হাদীস গ্রহণে কঠোরতা ও সতর্কতা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয

(১). মুহাদ্দিসগণ সুন্নাতে মুহাম্মাদীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত

সূফী দরবেশ আল্লাহওয়ালা মানুষেরা সরলমনা ভালো মানুষ। সবাইকে সরলমনে বিশ্বাস করা ও দয়া করাই তাঁদের কাজ। আর মুহাদ্দিসের কাজ দারোগার কাজ। ইসলামের অনেক শত্রু ইসলামের বিজয় রোধে সক্ষম না হয়ে গোপনে ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত হয়। তারা মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করা, ইসলাম বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মানুষের মনে বিরাগ বা ঘৃণা জন্মানোর উদ্দেশে কিছু মানুষ মিথ্যা বা বানোয়াট কথাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা বলে সামাজে চালানোর চেষ্টা করছে। অপরদিকে অনেক মুসলমান নিজ স্বার্থে বা ইসলামের উপকার হবে মনে করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে বানোয়াট হাদীস লোক সমাজে প্রচার করেছে। এরাও ইসলামের ঘোরতম শত্রু, এরা ভেবেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা যথেষ্ট নয়, মানুষের হেদায়েতের জন্য, ইসলামের বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আরো কিছু বলা দরকার। এরা নিজেদেরকে নবীর স্থানে বসিয়ে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এ ধরনের অপচেষ্টা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করেন। তিনি বলেছেন :

"শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে কিছু মানুষের আবির্ভাব হবে যারা তোমাদেরকে এমন সকল হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহরা কখনো শোনেনি। খবরদার ! তোমরা এসকল মানুষদের থেকে সাবধান থাকবে।"[২]

ইসলামের এ সব দুশমনের ষড়যন্ত্র থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে রক্ষা করতে অতন্দ্র প্রহরী হচ্ছেন মুহাদ্দিস। এখানে সরলতা বা সরল বিশ্বাসের স্থান নেই। এখানে জিজ্ঞাসাবাদ ও সন্দেহের স্থান বেশি। মুহাদ্দিস হাদীস শুনেই তা মেনে নেন না। বরং প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করেন বর্ণনাকারীকে বা তার উস্তাদকে। তাদের বর্ণনাকে অন্যান্যদের বর্ণনার সাথে তুলনা করে দেখেন। এরপর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেই তিনি অর্থের দিকে লক্ষ্য করেন।

(২). হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও কড়াকড়ির প্রয়োজনীয়তা

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সতর্কতা প্রত্যেক মুসলিমের উপরেই ফরয। রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার তাঁর উম্মতকে তাঁর নামে বানোয়াট কথা বলতে নিষেধ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের শিক্ষা একই: খবরদার! আমার সম্পর্কে, আমার নামে সামান্যতম বানোয়াট কথাও বলবে না, আমি যা বলেছি বলে তোমরা নিশ্চিত জান-না তা তোমরা কখনো বলবে না। কারণ আমি যা বলিনি তা আমার নামে বললে তাকে জাহান্নামে থাকতেই হবে। এ অর্থে শতশত হাদীস বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এক হাদীসে তিনি বলছেন :

"আমার নামে মিথ্যা বলবে না ; কারণ যে আমার নামে মিধ্যা বলবে তাঁকে জাহান্নামে প্রবেশ করতেই হবে।"[৩]

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন :

"আমি যা বলিনি সে কথা যে আমার নামে বলবে তাকে জাহান্নামে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।"[৪]

তিনি যাচাই না করে হাদীস গ্রহণ করতে ও বলতে নিষেধ করে বলেছেন:

"একজন মানুষের জন্য পাপ হিসাবে বড় পাপ এই যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।"[৫]

হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ হলেও তা বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন:

"যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কোনো হাদীস বর্ণনা করবে যা তার নিজের কাছে মিথ্যা বলে মনে হবে বা সন্দেহ হবে, সে ব্যক্তিও একজন মিথ্যাবাদী।"[৬]

এরপরও কি আমাদের কোনো শিথিলতা দেখান ঠিক হবে? আমি যদি জীবনে কোনো হাদীস না বলি তাহলে কোনো সমস্যায় আমাকে পড়তে হবে না। কিন্তু একটি হাদীসও যদি বলি বা লিখি বা সহীহ বলে দাবি করি, অথচ হাদীসটি সহীহ না হয়, তাহলে হয়ত আমাকে কঠিন বিপদে পড়তে হতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে থাকার তৌফিক দান করুন।

সম্মানিত পাঠক, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা, দুর্বলতা ও জালিয়াতির বিষয়ে কিছু জানতে হলে

আমাদেরকে একমাত্র মুহাদ্দিসগণের মানদণ্ডের উপরেই নির্ভর করতে হবে। এ বিষয়ে যেকোন শিথিলতা আমাদের আখেরাতকে নষ্ট করবে।

(ঘ). 'সুন্নাত' -এর উৎস নির্ধারণে বিভ্রান্তি

প্রথমত, বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস দ্বারা কোনো রীতি প্রচলন করা যাবে না

সুন্নাতের উৎস নির্ণয়ে আমরা কয়েকভাবে ভুলের মধ্যে নিপতিত হই। প্রথম বিভ্রান্তি হলো বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসের উপর নির্ভর করা, অথবা খুবই দুর্বল হাদীস, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস নয় বলেই প্রতিয়মান, তার উপর নির্ভর করে কোনো কাজ প্রচলন করা।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ'আত রীতি পদ্ধতির উৎস বিভিন্ন বানোয়াট ও মিথ্যা কথা যা হাদীস নামে প্রচলন করা হয়েছে। সংক্ষেপে কিছু উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগে মুসলমানদের অন্যতম দিবস হচ্ছে শবে মি'রাজ বা মি'রাজের রাত। আমরা ২৭-শে রজবের রাতকে এই নামে আখ্যায়িত করি। আমরা এই রাতে বিশেষভাবে ইবাদত বন্দেগি করে থাকি বিশেষ সাওয়াবের আশায়। এসব ইবাদত বন্দেগি খেলাফে-সুন্নাতভাবে আমরা করি।

(১). মি'রাজের রাত্রিতে ইবাদত বন্দেগি

ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা বিভিন্নভাবে কুরআন কারীমে ও অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয়নি। সাহাবীগণ কখনো তাঁকে তারিখ সম্পর্কে প্রশ্নও করেছেন বলে জানা যায় না। পরবর্তী যুগের তাবেয়ীদেরও একই অবস্থা ; তাঁরা এ সকল হাদীস সাহাবীদের থেকে শিখছেন, কিন্তু তাঁরা তারিখ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করছেন না। কারণ, তাঁদের কাছে তারিখের বিষয়টির কোনো মূল্য ছিল না, এসকল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। ফলে তারিখের বিষয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন্ বৎসর হয়েছে, কোন্ মাসে হয়েছে, কোন্ তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এবং প্রায় ২০টি মত রয়েছে।

মাসের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন রবিউল আউআল মাসের ২৭ তারিখ। কেউ বলেছেন রবিউস সানী মাসে, কেউ বলেছেন রজব মাসে, কেউ বলেছেন, রমযান মাসে, কেউ বলেছেন শাওয়াল মাসে এবং কেউ বলেছেন যুলকাদা মাসে। তারিখের বিষয়ে আরো অনেক মতবিরোধ আছে। হিজরী ৮ম শতকের ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.), ৯ম শতকের প্রখ্যাত আলেম ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), দশম শতকের আল্লামা আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-কাসতালানী (৯২৩হি.), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ আশ-শামী (৯৪২ হি.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।[১]

এত মতবিরোধের কারণ হলো হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি এবং সাহাবীগণও কিছু বলেননি। তাবে-তাবেয়ীদের যুগে তারিখ নিয়ে কথা শুরু হয়, কিন্তু কেউই সঠিক সমাধান না দিতে পারায় তাঁদের যুগ ও পরবর্তী যুগে এত মতবিরোধ হয়। এই মতবিরোধ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কয়েক শতক আগেও শবে মি'রাজ বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাত নির্দিষ্ট ছিল না।

সর্বাবস্থায় মি'রাজের তারিখ নিয়ে এই মতবিরোধ আমাদের মূল আলোচ্য নয়। মি'রাজের রাত্রিতে ইবাদত বন্দেগি করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব হবে এ বিষয়ে একটিও সহীহ বা যয়ীফ হাদীস নেই। মি'রাজের রাত কোন্‌টি তাই হাদীসে বলা হয়নি, সেখানে রাত পালনের কথা কী-ভাবে আসে। তবে কয়েকটি মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি মূলত তাবেয়ীদের যুগ পর্যন্ত কেউই জানতেন না। পরে তা বানানো হয়েছে, আরো অনেক পরে তা কোনো কোনো মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে পালন করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তা আমাদের অন্যতম ইবদাতের রাতে পরিণত হয়েছে।[২]

কেউ হয়ত বলবেন কোনো রাতেই তো ইবাদত বন্দেগি না-জায়েয নয়। একথা অবশ্যই ঠিক। যিনি সকল রাতে ইবাদত করেন তিনি স্বভাবতই এই রাতে ইবাদত করবেন। কিন্তু এই রাতের জন্য বিশেষ ফযীলত একমাত্র ওহীর মাধ্যমে জানা যাবে এবং সেই ফযীলত পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের উপর নির্ভর করতে হবে। যিনি সাধারণত রাত্রে ইবাদত করেন না, তিনি এই রাত্রে বিশেষভাবে ইবাদত করছেন কেন ? কারণ, তিনি এই রাতের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব কল্পনা করছেন। যিনি এই রাত্রে বিশেষভাবে ইবাদত করছেন তিনি মনে করছেন যে, এই রাত্রে ইবাদত করা বিশেষ সাওয়াবের কাজ, অন্যান্য সাধারণ রাত্রে ইবাদত করলে যে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এভাবে তিনি একটি 'সাওয়াবের কাজ' উদ্ভাবন করলেন যা কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি। অর্থাৎ, কার্যত তিনি ভাবছেন যে, তিনি এমন একটি সাওয়াব, মর্যাদা ও আখেরাতের নেয়ামত অর্জন করলেন যে নেয়ামত চেখে দেখার সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি। এই পর্যায়কেই বলা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করা।

সাধারণভাবে ইবাদত করা আর বিশেষ সময়ে বিশেষ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ইবাদত করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোনো সময়ে বা কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো ইবাদত করলে বিশেষ সাওয়াব হবে একথা মনে করতে হলে অবশ্যই 'সুন্নাত' প্রয়োজন। সুন্নাতের বাইরে কোনো বিশেষ সময়কে বা বিশেষ পদ্ধতিকে সাওয়াবের মনে করে ইবাদত করার অর্থই হলো এই সাওয়াবের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন না, তাঁরা তা অর্জনও করতে পারেননি, কিন্তু আমরা তা অর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করলাম। এটা কি সম্ভব ? এর চেয়েও বড় কথা হলো – এই খেলাফে-সুন্নাত কর্মটিকে রীতিতে পরিণত করা, এরপর তাকে ঈদে পরিণত করা। আমরা এমন একটি রাত সমারোহে ইবাদত বন্দেগির মধ্যে জাতীয় রাত হিসাবে পালন করি যা রাসূলূল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো করেননি। আমরা

এমন একটি রাতকে নৈকট্যের বিশেষ কারণ বলে মনে করি যাকে তাঁরা মনে করতেন না। আমরা এমন একটি কাজ করি যা তাঁর বর্জন করেছেন।

(২). শবে বরাতের মিথ্যা হাদীস কেন্দ্রিক ইবাদত

"লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান" বা শবে বরাতের রাত্রে আল্লাহ বান্দাদের গোনাহ মাফ করেন বলে নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই রাতে একাকী গোরস্থান যিয়ারত করে মুর্দাদের জন্য দোয়া করেছেন, নিজের ঘরে একাকী নামায পড়েছেন ও দোয়া করেছেন। অনেক আলেমের মতে এসকল যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে। কিন্তু এই রাত্রের ফযিলতে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট কথা প্রচলিত আছে। যেমন – গোসল করা, নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাক'আত নামায পড়া ইত্যাদি। আমরা এগুলির উপর নির্ভর করে অনেক বিদ'আত প্রচলন করেছি। এছাড়া রুটি খাওয়া ও বিতরণ করা ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছি। শেষমেশ রাতটিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছি যা কখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল না। আমরা এই খেলাফে সুন্নাতকেই বেশি সাওয়াবের মনে করছি এবং একে পরিপূর্ণ রীতি বা সুন্নাত বানিয়ে ফেলেছি।[১]

অথচ এই রাতটি সাহাবীগণের যুগে কেউ পালন করেননি। তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ থেকে কেউ কেউ এই রাত পালন শুরু করেন। তখন অন্যান্য তাবেয়ী তাঁদের এই কাজের প্রতিবাদ করে বলেন যে, যেহেতু কোনো সাহাবী বা মশহুর তাবেয়ী ইমাম ও ফকীহ এই রাত পালন করেননি, সেহেতু তা পালন করা আমাদের উচিত হবে না। এই রাত পালনের প্রতিবাদে মদীনার প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু যাইদ ইবনু আসলাম (১৮২ হি.) বলেন : আমাদের কোনো উস্তাদ, আমাদের মদীনার কোনো ফকীহ, কোনো আলেমকে দেখিনি যে, শাবান মাসের মাঝের রাতের দিকে কোনো রকম মনোযোগ দিয়েছেন বা ভ্রুক্ষেপ করেছেন। এ বিষয়ে সিরিয়ার তাবেয়ী মুহাদ্দিস মাকহুল (১১৩ হি.) যে হাদীস বর্ণনা করেন সে হাদীস তাঁদের কারো মুখে কখনো শুনিনি।[২]

তাঁরা সর্বদা ফযীলতের বিষয় পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের উপর নির্ভর করতেন। ফযীলত প্রমাণিত হলেও তা পালনের পদ্ধতিতে সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। তাঁদের যুগের অবস্থা ও আমাদের যুগের অবস্থা একটু মিলিয়ে দেখা দরকার।

দ্বিতীয়ত, স্বপ্ন, কাশ্‌ফ, ইলহাম, ফিরাসাত ইত্যাদি সুন্নাতের উৎস নয়

সুন্নাত জানার জন্য দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো এক্ষেত্রে স্বপ্ন, কাশফ, ইলহাম, ফিরাসাত ইত্যাদির উপর নির্ভর করা। সুন্নাত জানার উৎস হিসাবে অনেক সময় আমরা এগুলির উপর নির্ভর করি। আমরা আগেই দেখেছি যে, কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্ন হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইয়ের মাধ্যম নয়, বরং এই মাধ্যম ব্যবহার করা খেলাফে সুন্নাত ও বিদ'আত। এই বিদ'আত প্রবণতার আরেকটি দিক হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করেছেন, কী-ভাবে করেছেন তা জানার জন্য এ সকল মাধ্যমের উপর নির্ভর করা। আমরা বলি : অমুকব্যক্তি স্বপ্নে বা কাশফের মাধ্যমে এই সুন্নাতটি জানতে পেরেছেন। অথবা বলি যে, তিনি কাশফ বা স্বপ্নের মাধ্যমে জেনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধরনের পোশাক, টুপি, পাগড়ি, যিকির, দরুদ, সালাম, দোয়া, ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন বা করতে বলেছেন। অথবা তাঁকে বিশেষ পদ্ধতিতে কোনো ইবাদত আদায় করতে বলেছেন। এই বিভ্রান্তিকর চিন্তা আমাদেরকে অন্তহীন সংঘাতের মধ্যে নিপতিত করে। সকল পরস্পর বিরোধী দল, উপদল ও ফিরকা নিজ নিজ মতের পক্ষে তাদের বুজুর্গগণের কাশফ, স্বপ্ন বা ইলকা'-ইলহামকে দলিল হিসাবে পেশ করছে এবং অন্য দলের সকল কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদি বাতিল বলে দাবি করছে।

(ক). পরিপূর্ণ সুন্নাতে নববী আল্লাহ সাহাবীগণের মাধ্যমে হেফাযত করেছেন

এখানে আমরা প্রথম যে ভুল করি তা হলো আমরা মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিপূর্ণ সুন্নাত মহান আল্লাহ সাহাবীদের মাধ্যমে হেফাযত করেননি, ফলে আমাদেরকে অন্যান্য সূত্র থেকে সুন্নাত জানতে হচ্ছে। এ ধরনের চিন্তা একদিকে যেমন আমাদের ঈমানের পরিপন্থী, তেমনি তা বাস্তবতারও পরিপন্থী।

(খ). কাশফ, স্বপ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্নাত জানার চেষ্টা সুন্নাত-বিরোধী

দ্বিতীয়ত, আমরা এভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণের সুন্নাতের খেলাফ কর্ম করি। তাঁরা কখনোই কোনো সুন্নাত জানার জন্য এ সকল মাধ্যমের উপর নির্ভর করেননি। তাঁরা সর্বদা হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। হাদীসের বিশুদ্ধতায় কোনো সন্দেহ থাকলে আলোচনা ও গবেষণা করেছেন। যে বিষয় হাদীসে কোনোভাবে বর্ণিত হয়নি সে বিষয় তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন বা উন্মুক্ত রেখেছেন। প্রয়োজনে তাঁরা সুন্নাতের নির্দেশনা মোতাবেক ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে ইজতিহাদ করেছেন। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁরা হাজারো মতবিরোধ করেছেন, আলোচনা করেছেন এবং গবেষণা করেছেন। তাঁদের পক্ষে কি সম্ভব ছিল না যে, একটু কাশফ, মুরাকাবা, ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে অতি সহজেই এ সকল মতবিরোধের সমাধান করে নেবেন ? আমাদের যুগে যদি সম্ভব হয় তাহলে তাঁদের যুগে অনেক বেশি সম্ভব ছিল।

কিন্তু কখনোই তাঁরা এ সকল মাধ্যম ব্যবহার করেননি। কারণ, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত ও তাঁর নির্দেশের খেলাফ। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কুরআন বা হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেখানে ইজতিহাদ করতে হবে। কিন্তু কখনোই বলেননি যে, সেখানে কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে আমরা জানতে পারি যে, সুন্নাত জানার জন্য এসকল মাধ্যমের

উপর নির্ভর করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের খেলাফ, তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ ও স্পষ্টতই নিষিদ্ধ ও বিদ'আত।

(গ). কাশ্‌ফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদি কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার মাধ্যম নয়

তৃতীয়ত, আমরা মনে করি যে, কাশফ, স্বপ্ন, ইলহাম ইত্যাদি সত্যাসত্য যাচাইয়ের, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার একটি মাধ্যম। এই ধারনা ইসলামী আকীদার একেবারেই পরিপন্থী। ইসলামী আকীদার বিভিন্ন গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, কাশফ, স্বপ্ন বা ইলহাম কখনই শরীয়তের দলিল নয়। ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী আলেম আল্লামা উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭ হি.) তাঁর "আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" ও অষ্টম শতকের প্রখ্যাত শাফেয়ী ইমাম আল্লামা সা'দ উদ্দীন মাসঊদ ইবনু উমর আত-তাফতাযানী (৭৯১ হি.) তাঁর "শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ" –তে লিখেছেন :

"হক্কপন্থীগণের নিকট ইলহাম বা ইলকা কোনো কিছুর সঠিকত্ব জানার কোনো মাধ্যম নয়।"[১]

(ঘ). স্বপ্ন, কাশ্‌ফ, ইলহাম সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর মতামত

যারা কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা রাখেন তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে, এগুলি বুঝার, ব্যখ্যা করার ও মনে রাখার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা রয়েছে। সবকিছুর পরেও তা শুধুমাত্র দ্রষ্টাকে আনন্দই দেয়, তাছাড়া শরীয়তের কোনোরূপ মানদণ্ড নয়। বরং শরীয়ত বা সুন্নাত হচ্ছে কাশফ, ইলহাম, স্বপ্ন ও অনুভূতির সঠিকত্বের মাপকাঠি। এ বিষয়ে প্রখ্যাত আলেম, ওলী ও সূফীগণের অসংখ্য বাণী রয়েছে। আমি এখানে মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানীর (রাহ.) কিছু কথা উল্লেখ করছি, কারণ আমরা সাধারণত পূর্ববর্তীদের চেয়ে পরবর্তী যুগের আলেমদের কথায় বেশি তৃপ্ত হই। তিনি বিভিন্ন স্থানে কাশফ, স্বপ্ন, ইলকা, ইলহাম ইত্যাদির উপর নির্ভর করার কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

(১). কাশফ-ইলহাম সন্দেহযুক্ত বিষয়, সেখানে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে

তিনি লিখেছেন : " *'ওহী' সন্দেহ-বিহীন, দৃঢ়-বিশ্বসযোগ্য এবং 'ইলহাম' সন্দেহযুক্ত ; যেহেতু, ওহী ফেরেশতার মাধ্যমে আগত। ফেরেশতাবৃন্দ মাসুম, পাপ হইতে সুরক্ষিত তাহাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইলহামের স্থান যদিও অতি উচ্চ অর্থাৎ 'ক্বলব' এবং 'ক্বলব' আলমে- আমর (সূক্ষ্ম-জগৎ)–এর বস্তু, কিন্তু ক্বলবের সহিত আকল বা জ্ঞান ও নফছের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে। নফছ যদিও পবিত্রতা অর্জন করিয়া মোৎমায়েন্না বা প্রশান্ত হইয়াছে তথাপি (মোৎমায়েন্না হইলেও তার, জন্ম-স্বভাব যায়-না কো আর), সুতরাং, তথায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে।*"[২]

(২). সুন্নাতই কাশফের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার মানদণ্ড

অন্যত্র লিখেছেন: *"স্মরণ রাখিও, স্বপ্ন ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য নহে।..."*[৩] *"সূফীগণের বাতুল বাক্যসমূহ দ্বারা আর কী লাভ হইবে ? এবং তাহাদের আত্মিক অবস্থা (রুহানী হালত) দ্বারা আর কী উন্নতি হইবে ! তথায় (আল্লাহর নিকট) লম্ফ ঝম্ফ এবং আত্মিক অবস্থাসমূহকে শরীয়তের তুলাদণ্ডে পরিমাপ না করা পর্যন্ত অর্ধ কপর্দক মূল্যেও গ্রহণ করা হয় না এবং কাশফ ইলহামসমূহ কোরআন-হাদীসের কষ্টি পাথরে ঘর্ষণ না করা পর্যন্ত অর্ধ যবের পরিবর্তেও পছন্দ করেন না।"*[৪] *"অনেক সময় অনেক ইলহামী ইলম ও ঐশিক বিজ্ঞপ্তির মধ্যে ভুল হইয়া থাকে... ফল কথা কোরআন-হাদীস যাহা অকাট্য ওহী কর্তৃক ও ফেরেস্তার অবতরণ দ্বারা প্রমাণিত,তাহাই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য।... "*[৫]

(৩). কাশফ ভিত্তিক 'ওহদাতুল ওজুদ' মতবাদ খেলাফে-সুন্নাত ও বিভ্রান্তিকর

তিনি "অহদাতুল ওজুদ" "হামা উস্ত" (সবই তিনি) মতবাদ সম্পর্কে সূফীগণের বিভিন্ন কাশফ ও ইলহাম ভিত্তিক কথা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যদিও তাঁদেরকে মত্ততা হেতু মা'যুর গণ্য করেছেন। মত্ততার কারণে তাঁরা ভুলের জন্য নিন্দিত হবেন না, কিন্তু তাদের কথা অনুসরণ করা কোনো মতেই জায়েয নয়, অনুসরণকারী নিন্দিত হবেন এবং তার জন্য কোনো ওজর থাকবে না। বিষয়টি তিনি বিভিন্ন চিঠিতে বিভিন্নভাবে বারবার উল্লেখ করেছেন, কারণ তিনি 'ওহদাতুল ওজুদ' অস্বীকার করার কারণে তৎকালীণ আলেম ও সূফী সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁর এই মতবাদ সকল আলেম, বুজুর্গ ও সূফীর মতের বিপরীত, বরং 'এজমার' বিপরীত বলে তাঁরা গণ্য করেন। তিনি এই পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন 'ওহদাতুল ওজুদের' প্রবক্তা ও কাশফের মাধ্যমে তাঁর সমর্থনকারী অগণিত খ্যাতিমান সূফী সাধকের নিন্দা না করে ওজর প্রকাশের চেষ্টা করেছেন, অপরদিকে কাশফভিত্তিক মতামতের অনুসরণের কঠিন নিন্দা করেছেন। কখনো নরম ভাষায়, কখনো কঠিন ভাষায়।[৬] তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, ইবনু আরাবী ও তাঁর অনুসারী পরবর্তী জামানার অগণিত 'অহদাতুল ওজুদ'-পন্থী "কাশফ নির্ভর" সূফীরাই এজমা-বিরোধী কথা বলে সূফীদেরকে সুন্নাত বিরোধী বা শরীয়ত বিরোধী অবস্থানে ফেলেছেন এবং তিরস্কার, নিন্দা ও লাঞ্ছনার কারণ হয়েছেন। তাঁর 'অহদাতুশ শুহুদ' বা 'হামা আজ উস্ত' বা 'সবই তিনি হইতে' মতটিই আলেমদের ইজমার পক্ষে।[৭]

(৪). সুন্নাত অনুসারী আলেমগণ বনাম কাশফ অনুসারী সূফীগণ

একস্থানে লিখেছেন : *"সুন্নাত জামাতের আলেমগণই সত্যের উপর আছেন, কারণ তাহদের ইলমসমূহ নবুয়্যতের তাক – কুরআন ও সুন্নাহ হইতে গৃহীত, যাহা অকাট্য ওহীর সাহায্যে প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে সূফীদের পেশওয়া বা অগ্রগামী (তাদের পথনির্দেশক) কাশফ ও ইলহাম, যাহার মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহাই। আহলে সুন্নাতের আলেমগণের মতের অনকূল হওয়াই কাশফ, ইলহামের সত্যতার চিহ্ন। যদি তাহাদের মতের সহিত লোমাগ্র বরাবর ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে উহা সত্যের বৃত্তের বহির্ভূত। ইহাই প্রকাশ্য সত্যকথা। সত্যের পর ভ্রষ্টতা ব্যতীত কিছুই নাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ অনুসরণের প্রতি আমল এবং বিশ্বাস দ্বারা সুদৃঢ় রাখুক।"*[১]

(৫). ওলীদের কথার দিকে না-তাকিয়ে শুধু কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করা

অনেক উচ্চু স্তরের বিখ্যাত সূফী মাশায়েখের বিভিন্ন কাশফ ভিত্তিক মতামতের তিনি কঠোর প্রতিবাদ করেছেন এবং এসকল কাশফভিত্তিক পুস্তকাদি না পাঠ করে সুন্নাতের উপর নির্ভর করতে জোর তাকিদ প্রদান করেছেন। এধরনের এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : *"আপনি লিখিয়াছেন যে, শায়খ আব্দুল কবীর ইয়ামানী বলিয়াছেন যে, 'হক সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আলেমে গায়েব (গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী) নহেন।' হে মান্যবর, এরূপ বাক্য শ্রবণের মতো ধৈর্য এ ফকীরের মোটেই নাই। আমার ফারুক বংশীয় শিরা ক্রোধে অনিচ্ছাকৃত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, এমনকি ঐ কথার কোনো ওজর পেশ করিবার জন্যই সময় দিতেও যেন রাজি নহে, এ বাক্যের বক্তা শায়েখ কবীর ইয়ামানীই হউক অথবা আকবার শামীই (ইবনু আরাবী) হউক না কেন। এ স্থলে মোহাম্মাদ আরাবীর ﷺ -এর বাক্য আবশ্যক, মহিউদ্দীন আরাবী বা সদরুদ্দিন কুবীনাবী এবং আব্দুর রাজ্জাক কাশীর বাক্য নহে। আমাদের নস্স বা কুরআন ও হাদীসের পরিষ্কার অকাট্য বাণীর সহিত কারবার, (ইবনু আরাবীর কাশফ ভিত্তিক) ফস্স বা ফুসূসুল হিকামের সহিত নহে। ফুতূহাতে মাদানীয়া বা মাদানী নবী ﷺ -এর হাদীস আমাদেরকে ইবনু আরাবীর ফতূহাতে মাক্কীয়া জাতীয় গ্রন্থাদি থেকে বেপরওয়া করিয়া দিয়াছেন।"*[২]

(৬). শুধু কুরআন-হাদীসের উপর নির্ভর করাই প্রকৃত সূফীর পথ

নকশাবন্দীয়া তরীকার মূল মাশায়েখদের প্রশংসা করে লিখেছেন : *"তাঁরা সূফীগণের অনর্থক বাতুল বাক্যসমূহের প্রবঞ্চনায় পতিত হন না। তাহারা নসস, কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বাণী,পরিত্যাগ করত শেখ মহিউদ্দীন ইবনু আরাবীর ফসস বা ফুসূসুল হিকাম পুস্তকে লিপ্ত হন না এবং ফুতূহাতে মাদানীয়া, অর্থাৎ হাদীস শরীফ বর্জন করত ইবনু আরাবীর ফুতূহাতে মাক্কীয়ার প্রতি লক্ষ্য করেন না।"*[৩] অন্যত্র লিখেছেন : *"যেহেতু এই বোজর্গগণ সুন্নাত দৃঢ় অনুসরণ করা এবং বিদ'আত হইতে বিরত থাকা অনির্বায বলিয়া জানেন... অন্যান্য সূফীগণের বাতুল বাক্যে ইঁহারা গর্বিত ও প্রবঞ্চিত হন না। নস্স বা আল্লাহর বাণী পরিত্যাগ করত ফসস বা মহিউদ্দীন আরবীর পুস্তক আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং ফতূহাতে মাদানীয়া বা পবিত্র হাদীস বর্জন করত ফুতূহাতে মাক্কিয়া পুস্তকের দিকে লক্ষ্য করেন না।"*[৪]

(৭). আলফে সানী নিজের কাশফ্ ভিত্তিক কথার জন্যও অনুতাপ করেছেন

নিজে অনেক সময় কাশফের ভিত্তিতে কিছু লিখলে, তা যে অকাট্য নয়, তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আফসোস করেছেন ও ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি তার লেখা কেতাব "মাবদা ওয় মা'আদ"–এ কাশফ ভিত্তিক কিছু কথা লিখে পরে অনুতাপ করে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : *"এইরূপ উক্ত রেসালায় উলূল আজম পয়গম্বর (আ.)-গণের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যখন উহা কাশফ, ইলহাম অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে, যাহা সন্দেহযুক্ত তখন উক্ত বিষয়ে লেখার জন্য এবং শ্রেষ্ঠত্বে তারতম্য করার জন্য আমি অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যেহেতু, অকাট্য প্রমাণ ব্যতীত এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা অনুচিত। আসতাগ-ফিরুল্লাহা ওয়া আতুবু ইলাইহি মিন জামিয়ে মা কারেহাল্লাহু কওলান ওয়া ফি'লান।"*[৫]

তৃতীয়ত, কোনো আলেম ও বুজুর্গের ব্যক্তিগত কর্ম বা মতামত সুন্নাতের উৎস নয়

সুন্নাত জানার ক্ষেত্রে আমাদের তৃতীয় ভুল হলো – এক্ষেত্রে কোনো বুজর্গের নিজস্ব কর্ম বা মতামতের উপর নির্ভর করা। সুন্নাতের মুকাবিলায় আর কারো মত, পথ বা কর্মকে দাঁড় করান যায় না। তবে সুন্নাত বুঝার ক্ষেত্রে কারো কর্ম বা মত হয়ত আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। সুন্নাত জানার ও বুঝার মানদণ্ড কী তা জানতে আমাদেরকে সুন্নাতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। সুন্নাতের আলোকে আমরা জানি যে, এ ক্ষেত্রে একক মর্যাদা সাহাবীগণের, এরপর পরবর্তী দুই যুগের। পরবর্তী আর কারো কোনো বৈশিষ্ট্য সুন্নাতে বর্ণিত হয়নি।

বস্তুত সমষ্টিগতভাবে সাহাবীগণ ছাড়া কেউই সুন্নাত বুঝার, জানার বা পালন করার ক্ষেত্রে মানদণ্ড নন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে অনেক সাহাবী অনেক সুন্নাত জানতেন না এবং বিভিন্ন সুন্নাতের বিষয়ে তাঁদের মতভেদ রয়েছে, কিন্তু সামষ্টিকভাবে তাঁরাই আমাদের একমাত্র মানদণ্ড। বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁর সাহাবীগণকে এই মর্যাদা দান করেছেন। যুক্তি, বিবেক ও ইতিহাসও তা সমর্থন করে।

তাঁদের পরবর্তী দুই স্তর : তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী পর্যায়ের আলেম, ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতামত সুন্নাত বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের সহায়ক। যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা কেউ মা'সূম বা নিস্পাপ নন ও ভুলের ঊর্ধে নন। সুন্নাত বুঝার ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ হলে, সমস্যা হলে বা অস্পষ্টতা থাকলে আমরা সাহাবীগণের, বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্ম ও মতামতের সাহায্য গ্রহণ করব। সহীহ সনদে তাঁদের থেকে যে সকল কর্ম ও মতামত বর্ণিত হয়েছে তা আমাদেরকে সুন্নাত বুঝতে সাহায্য করবে। এছাড়া পরবর্তী দুই যুগের প্রখ্যাত আলেমদের মতামত আমাদেরকে সুন্নাত সম্পর্কিত যে কোনো অস্পষ্টতা বা বিরোধিতা দূর করতে সাহায্য করবে।

কিন্তু আমাদের দুঃখজনক মানসিকতা হলো আমরা সুন্নাতের চেয়েও বুজুর্গদের মতামতকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি। কোনো সুন্নাতকে স্পষ্টভাবে জানার পরেও আমরা তা পালনে দ্বিধা করি, এই ভেবে যে, অমুক বুজুর্গ তো এই সুন্নাত পালন করেননি। কোনো কাজ খেলাফে সুন্নাত জানার পরেও আমরা তা করতে থাকি, এই যুক্তিতে যে, অমুক বুজুর্গ তো এই কাজ করেছেন, আমরা কি তাঁর চেয়েও বেশি জানি ? আমরা একথা ভাবতে চাই না যে, তিনি হয়তো কোনো কারণে বা ওজরে এভাবে করেছেন, আমি যেহেতু সুন্নাত জানতে পেরেছি কাজেই, আমি তা পালনের সুযোগ হারাতে পারি না।

(ক). বুজুর্গদের অনুসরণের মাধ্যমে বিদ'আতের প্রসার: আলফ-ই-সানীর মতামত

প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতের অপসারণ ও বিদ'আতের প্রসার লাভ করার একটি উৎস হলো পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণ। অনেক সময় অনেক বড় বড় আলেম বা আবেদ আগ্রহের কারণে, অথবা এ বিষয়ে প্রকৃত সুন্নাত তাঁর নিকট অজানা থাকার ফলে, অথবা জাগতিক উপকরণ হিসাবে, অথবা বিদ'আতে হাসানা মনে করে সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কাজ করেন। তাঁর অনুসারী বা ভক্তগণ সাধারণত অন্ধভাবে তাঁর অনুকরণ করেন এবং এ সকল বিদ'আতের বিরুদ্ধে সকল কথা এই বলে রদ করেন যে, আমাদের অনুসরণীয় আলেম তা করেছেন।

(১). পীরের কর্মে খেলাফে-সুন্নাত কিছু থাকলে তা অনুসরণ করা চলবে না

অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুদৃঢ় হচ্ছেন মুরীদগণ। সকল বিষয়ে পীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ মুরীদ নিজের সফলতার উৎস মনে করেন। 'পীর করেছেন' এই বাহানা দিয়ে মুরীদেরা বিদ'আত পালন করতে থাকেন। মুজাদ্দিদে আলফেসানী সংস্কারক হিসাবে বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভব করেন। তিনি যদিও পীরের ভক্তি ও ভালবাসার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু তিনি বিদ'আতের প্রসারের বিষয়টি অনুধাবন করে অনুসরণের ক্ষেত্রে 'সুন্নাত'-কে মানদণ্ড হিসাবে ধরতে বলেছেন। পীরের কর্মের মধ্যে কোনো বিদ'আত থাকলে তা অনুসরণ না করে শুধুমাত্র সুন্নাতের ক্ষেত্রে পীরের অনুসরণ করার জন্য তিনি তাকিদ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

"বর্তমানে সূফীগণ যদি কিছু বিবেচনা করেন এবং ইসলামের দুর্বলতা এবং মিথ্যার আধিক্যকে লক্ষ্য করেন তাহা হইলে তাহাদের উচিৎ যে সুন্নাত ভিন্ন অন্য জিনিসে নিজের পীরের অনুসরণ না করেন এবং পীরের বাহানা করিয়া এই সমস্ত অন্যায় কার্যের উপর আমল না করেন। সুন্নাতের অনুসরণ নিশ্চয়ই মুক্তি দিবে এবং মঙ্গল আনিবে। সুন্নাতের বিপরীত পথে অত্যন্ত ভয় ও অসুবিধা আছে। 'অমা আলার রসুলে ইল্লাল বালাগ,' (কুরআন) –দূতের কর্তব্য হুকুম পৌঁছান। আমাদের পীরদিগকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের তরফ হইতে সুফল দান করুন। তাহারা নিজেদের অনুসরণ দ্বারা কোনো ক্ষতিকারক অন্ধকারের মধ্যে কাহাকেও ফেলেন নাই এবং সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো রাস্তায় চলিতে আদেশ দেন নাই এবং নবীপাক ﷺ –এর অনুসরণ এবং শ্রেষ্ঠত্বের অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোনোপথে হেদায়েত করেন নাই।"[১]

(২). অনুসরণের একমাত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ

মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাঁর অন্য গ্রন্থ "মাবদা ওয়া মা'আদে" এ বিষয়ে আরো কথা বলেছেন। তিনি অন্য কারো অনুসরণ না করে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর অনুসরণের উপর তাকিদ দিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, বিদ'আতে হাসানার ক্ষেত্রেও কারো মতামত মানা যাবে না, কারণ বিদ'আতে হাসানাও সুন্নাতকে অপসারিত বা বিনষ্ট করে। তিনি বলেন :

"ঐ জামা'আতের ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ হয়, যারা দ্বীনের মধ্যে নিত্যনতুন বিষয় সংযোজন করে, অথচ দ্বীন সবদিক থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পূর্নতার শেষ প্রান্তে উন্নীত হয়েছে। যারা দীনের মধ্যে নতুন বিষয়ের সংযোজনের মাধ্যমে এর পূর্ণতা প্রদানের জন্য সচেষ্ট ; তাদের কি এতটুকু আশংকা নাই যে, আল্লাহ না করুন – এই নতুন বিষয়ের সংযোজনের ফলে হয়তো দ্বীন খতম হয়ে যাবে? যেমন, পাগড়ির শামলা (বা ঝুলন্ত অংশ) কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে রাখা সন্নাত। কিন্তু অনেক লোক একে বামদিকের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করে এবং এই ব্যাপারে তারা মৃতদের অনুসরণে আগ্রহী। আর বহু লোক এই ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করছে। তারা একথা জানে না যে, তাদের এই ধরনের আমল সুন্নাতের পরিপন্থী। তারা সন্নাতকে পরিত্যাগ করে, বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যা পরিশেষে হারামের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। হজরত মোহাম্মদ ﷺ –এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা উত্তম, না মৃতদের সঙ্গে? ...

ঐ সমস্ত লোকেরা মুরদার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়, অথচ তাদের উচিত ছিলো হুজুর পুর নুর ﷺ –এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো : মৃতের কাফনের মধ্যে পাগড়ি ব্যবহার করাই তো বিদ'আত, এমতস্থায় পাগড়ির শামলার ব্যাপারে কি বলার আছে ! অবশ্য পরবর্তীকালের কিছু 'উলামাদের অভিমত হলো : যদি মৃতব্যক্তি দ্বীনের আলেম হয়, তবে তাঁর কাফনের সময় পাগড়ি দেওয়া মুসতাহসান বা ভালো। কিন্তু ফকীরের অভিমত এই যে, কাফনের সুন্নাত পরিমাণের মধ্যে বেশি করা,

সুন্নাতের পরিবর্তনের মতোই এবং আসল সুন্নত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, সুন্নাতকে পরিত্যাগ করা। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে হজরত মোস্তফা ﷺ –এর বুলন্দ সুন্নাতের পায়রবীর উপর সুদৃঢ় রাখুন। আর আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার উপরও রহম করুন, যে আমার এই দোয়ার উপর আমীন বলে (আল্লাহুম্মা আমীন!)।"[১]

(খ). সকল আলেম বা বুজুর্গই সুন্নাতের পথে ডেকেছেন এবং তাঁরা ভুলের জন্যও পুরস্কৃত হবেন

আসলে মুসলিম উম্মার ধর্মীয় ইতিহাসের একটি বেদনাদায়ক দিক এই যে, যে সকল মহান ইমাম, ওলী, মুজাদ্দিদ, পীর-মাশায়েখ ও উলামায়ে দ্বীন তাঁদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন উম্মাতকে বিদ'আত মুক্ত করে সুন্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাঁরা জীবনভর সুন্নাত পালনের জন্য তাঁদের অনুসারীদের প্রেরণা যোগালেন, পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীদের বাড়াবাড়ির কারণে তাঁরাই সুন্নাত ও উম্মাতের মধ্যে প্রাচীর হয়ে পড়লেন। উম্মাতের সকল সংস্কারক, আলেমে দ্বীন ও বুজুর্গই আজীবন বলে গিয়েছেন : সুন্নাতের অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ। সুন্নাতের অতিরিক্ত যা কিছু আছে সবই আনুসঙ্গিক, প্রকৃতপক্ষে সবই মূল্যহীন। সুন্নাতের বাইরে রিয়াযাত, মুজাহাদা, ইবাদত বন্দেগি, জিহাদ, শাহাদাত, কাশফ, ফিরাসাত, সাইর, জজবা, হালাত কোনো কিছুরই কোনো মূল্য নেই। এ বিষয়ে তাঁদের উক্তি উল্লেখ করতে গেলে বড় বড় বই লিখতে হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সকল ইমাম, মাশাইখ ও আলেমদের সবার মধ্যেই কোনো না কোনো ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। নির্ভুল থাকা ও নিষ্পাপ হওয়া তো একমাত্র নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট্য। স্বভাবতই এঁদের অনেকের জীবনে কিছু 'খেলাফে-সুন্নাত' কর্ম থেকেছে। হয়ত তাঁরা ব্যক্তিগত অসুবিধা বা আগ্রহের কারণে সুন্নাতের অতিরিক্ত বা খেলাফে সুন্নাত কাজ করেছেন। কেউ বা তৎকালীন পরিবেশের প্রয়োজনে কিছু খেলাফে সুন্নাত কর্ম অনুমোদন করেছেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁরা এই খেলাফে-সুন্নাত কাজকে সুন্নাত বা সাওয়াবের কাজ হিসাবে করেননি, সুবিধা বা অসুবিধার জন্য করেছেন। কেউ বা কোনো বিষয়ে সুন্নাত না জানায় খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেছেন। কেউ-বা কোনো বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসের বিষয়ে সজাগ না হওয়ার ফলে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেছেন। কেউ-বা বিদ'আতে হাসানার নামে খেলাফে-সুন্নাত করেছেন। সর্বাবস্থায় এসকল বিষয় ছিল তাঁদের জীবনের খুবই ক্ষুদ্র দিক। তাঁদের জীবনের উৎস, উদ্দেশ্য ও চালিকাশক্তি ছিল সুন্নাত। এসকল ব্যতিক্রম বা খেলাফে-সুন্নাতের কারণে তাঁদের বেলায়াতের কোনো ক্ষতি হয়নি। সার্বিক কর্মকাণ্ডের উপরে মানুষের বিচার, দুই একটি বিশেষ কাজের উপরে নয়। এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজের জন্য হয়তোবা ইজতিহাদি বিষয় হিসাবে তাঁরা সাওয়াব পাবেন। অথবা তাঁদের অগণিত সাওয়াব ও নেক কাজের ভীড়ে তা হারিয়ে যাবে।

(গ). বুজুর্গগণের ভক্তি ও ভালবাসা বনাম সুন্নতের অনুসরণ

বুজুর্গগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁদেরকে ভালবাসা, ভক্তি করা, তাঁদের সাহচার্য ও জ্ঞান থেকে লাভবান হওয়া ও সর্বাবস্থায় তাঁদের জন্য দোওয়া করা। কিন্তু আমরা অনুসারীগণ অনেক সময় বেখেয়ালে বা আবেগের আতিশয্যে তাঁদেরকে বুজুর্গের স্তর থেকে নবুয়্যতের স্তরে নিয়ে চলে যায়। যে বুজুর্গগণ সারাজীবন বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সুন্নাতকে সবকিছুর উর্ধে রাখবে, সুন্নাতের বাইরে কারো অনুসরণ করবে না, তাঁরই অনুসারীরা তাঁরই অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর এই নীতি মানল না। যদি পরবর্তীকালে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বুঝা যায় যে, তিনি কোনো খেলাফে-সুন্নাত কাজ- যে কোনো কারণেই হোক- চালু রেখেছেন বা নিষেধ করেননি, তখন তাঁদের অনুসারীরা তা মানতে রাজি হবেন না। তাঁদের দাবি হলো, এত বড় বুজুর্গ, ইমাম ও আল্লাহর ওলী, তিনি কি সুন্নাত বুঝেননি? তাঁর চেয়ে কি আমরা বেশি বুঝি ?

কী দুঃখজনক কথা ! আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ সুন্নাত বুঝার জন্য মানদণ্ড, কিন্তু তারপরও কোনো সাহাবীর কর্ম সুন্নাতে নববীর খেলাফ হলে সাহাবীর কর্মের দোহাই দিয়ে সুন্নাতে নববী পরিত্যাগ করা যায় না, বরং সাহাবীর কর্মের সম্মানজনক ব্যাখ্যা দিয়ে তার ওজর পেশ করে সুন্নাতে নববী গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী যুগের বুজুর্গদের ক্ষেত্রেও একই কথা।

যে বুজুর্গ নিজে আজীবন অসংখ্য বুজুর্গের কাজ ও রীতি পরিত্যাগ করে সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করলেন, অনেক বুজুর্গের খেলাফে-সুন্নাত কাজের সমালোচনা করে শেখালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহবীগণই একমাত্র মানদণ্ড, আর সবারই ভুল হতে পারে, তারই অনুসারীরা এভাবে তাঁকে নির্ভুলতা ও নিষ্পাপতার স্তরে বা মা'সূমিয়্যাতের স্তরে পৌঁছে দিল।

এর চেয়েও দুঃখজনক কথা হলো যে, আমরা আমাদের বুজুর্গগণকে তাঁদের সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করি না, শুধুমাত্র খেলাফে-সুন্নাতের ক্ষেত্রেই তাঁদের অনুসরণ করতে চাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই বুজুর্গগণের দোহাই দিয়ে, সামা, কাওয়ালী, জোরে যিকির, মুখের নিয়্যাত, ধূমপান, লাফালাফি, মীলাদ-কিয়াম ইত্যাদি খেলাফে-সুন্নাত কাজ করি। তাঁরা কোন্ পরিস্থিতিতে, কী-ভাবে, কী-জন্য ও কতটুক গুরুত্ব দিয়ে তা করেছেন সেদিকে মোটেও লক্ষ্য রাখি না। উপরন্তু পর্দা, শরীয়ত পালন, হালাল ভক্ষণ, সন্দেহজনক বিষয় বর্জন, দাওয়াত, জিহাদ, তাহাজ্জুদ, রোযা, তাকওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের রীতিনীতির কোনোই খেয়াল রাখি না।

হয়ত আমাদের অনুসরণীয় বুজুর্গগণের জীবনের ১০০টি কর্মের মধ্যে ৯৫টি ছিল সুন্নাত অনুসরণে এবং ৫টি ছিল খেলাফে-সুন্নাত। আমরা তাঁদের এই ৫টি খেলাফে সুন্নাতকে পুঁজি করে আমাদের জীবনের শতকরা ২৫ভাগ খেলাফে সুন্নাত, ২৫ ভাগ সুন্নাত ও বাকি ৫০ ভাগ তাকওয়া হীনতা, পাপ ও অবহেলায় ভরে ফেলেছি। এরপরও আমরা দাবি করছি যে, তাঁদের অনুসরণে ৯৫টি সুন্নাত কাজ আদায় করতে না পারলেও, এবং তাকওয়াহীনতা ও অবহেলার মধ্যে ডুবে গেলেও যেহেতু তাঁদের অনুসরণে উক্ত ৫টি খেলাফে সুন্নাত বা বিদ'আত কাজ আমরা করছি সেহেতু তাঁদের সাথেই আমরা জান্নাতে যেতে পারব!

চতুর্থত, দ্বীনের বিষয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করার পরিণতি

"সুন্নাত" বা দ্বীনের বিধান জানার ও গ্রহণ করার জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক উৎস হলো ব্যক্তিগত বা সামাজিক পছন্দ অপছন্দ। অর্থাৎ দ্বীনের নামে প্রচলিত যে কাজটি আমরা পছন্দ হলো তাকে আমি "সুন্নাত" বা দ্বীন বলে গ্রহণ করলাম এবং যে কাজটি আমার পছন্দ নয় সেটিকে আমি "সুন্নাত" বা "দ্বীন" নয় বলে মনে করলাম। আমার পছন্দই হলো মূল, অন্য কে কী বললেন বা কোন দলিল কতটুকু শক্তিশালী তা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবেচ্য। আমার পছন্দের পক্ষে কিছু পাওয়া গেলে ভালো, নইলে যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণিত করার চেষ্টা করব। কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে চুপ করে যাব, কিন্তু নিজের পছন্দ পরিত্যাগ করব না।

দ্বীন পালন, ইবাদত, আল্লাহর পথে চলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো আত্মসমর্পণ ও অনুসরণ। আল্লাহর বিধানের নিকট নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিধাহীন অন্ধ অনুসরণই ইসলাম। এক্ষেত্রে নিজের পছন্দ বা অপছন্দের উপর নির্ভর করার অর্থ নিজেকে বা নিজের পছন্দ অপছন্দকে "মা'বুদ" বলে গণ্য করা। এর পরিণতি ভয়াবহ। কুরআন কারীম থেকে আমরা দেখি যে, যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ ছিল এই বিষয়টি। আমাদের সমাজের অনেক আবেগী ও আগ্রহী মুসলিমও এই কঠিন বিপদের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

(১). অনুসারীরা মূলত কোনো ইমাম বা বুজুর্গকে পুরোপুরি মানেন না

সমাজের যারা বিভিন্ন ইমাম, আলেম বা বুজুর্গের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন বিদ'আতে লিপ্ত তাঁদের কর্ম প্রমাণ করে যে, তাঁর মূলত এ সকল ইমাম বা আলেমের অনুসরণ করছেন না, বরং নিজেদের পছন্দ অপছন্দের অনুসরণ করছেন।

আমরা কথায় কথায় যে সকল আলেম বা বুজুর্গের কথা বলি তাঁদের কাউকেই পুরোপুরি মানি না বা এঁদের সকল মত গ্রহণ করি না। এদের সকল কর্মে আমরা এঁদের অনুসরণ করি না। বরং আমরা তাঁদের এত প্রশংসার পরেও কোনো কোনো মত মানি, কোনো কোনো মত মানি না। অনেক সময় তাঁদেরকে নিন্দা না করলেও তাঁদের এ সকল মতামত বা কর্ম যারা করেন তাদের কঠোরভাবে নিন্দা করি।

(২). অনুসারীরা আকীদার ক্ষেত্রে আবু হানীফাকে (রাহ) মানেন না

শত শত উদাহরণ এবিষয়ে দেওয়া যায়। আমরা ফিকহী বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অনুসরণ করি, আবার আকীদার বিষয়ে তাঁর মতামত অনেকগুলিই মানি না। যেমন, তিনি আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন গুণবাচক আয়াত ও হাদীসকে, যেমন আল্লাহর হাত, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর আরশের উপরে অবস্থান ইত্যাদি আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করতে বলেছেন। আমরা পরবর্তী আলেমদের আশআরী ও মাতুরীদী মত অনুযায়ী ব্যাখ্যাকে শুধু উত্তমই বলি না বরং ব্যাখ্যা না করার মতামতকে অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার মতকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে করি।[১] ইমাম আবু হানীফা কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করতে, কারো দোহাই বা ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে নিষেধ করেছেন, মাকরূহ বলেছেন,[২] কিন্তু আমরা তাঁর এই মতের অনুসারীদেরকে ঘৃণা করি।

(৩). ভক্তগণ আকীদা বা ফিকহের ক্ষেত্রে জীলানীকে (রাহ) মানেন না

অনেকেই শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর অনুসরণের দাবিতে অনেক বিদ'আত বা শিরকে লিপ্ত হন। কিন্তু ফিকহ বা আকীদায় তাঁর কোনো মতামতই মানেন না। তিনি শুধু মুখ ও দুই হাতের পিঠ মুছে তায়াম্মুম করতে বলেছেন, ওহাবীদের পদ্ধতিতে ইকামত দিতে, নামাযের মধ্যে জোরে আমীন বলতে, নামাযে রুকুতে যেতে, রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠাতে (রাফাদাইন করতে) উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও ফেরকায়ে নাজীয়ার আলামত বলে গণ্য করেছেন এবং ঈমানের হ্রস-বৃদ্ধি না মানাকে বাতিলদের আলামত বলে গণ্য করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, কোনো মুসলমানের উচিত নয় যে সে বলবে : 'আমি নিশ্চয় মুমিন', বরং তাকে বলতে হবে যে, 'ইন্শা আল্লাহ আমি মুমিন'। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ যেহেতু ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করেন না ও আমলকে ঈমানের অংশ মনে করেন না সে জন্য তিনি তাঁকে ও তাঁর অনুসারীগণকে বাতিল ফিরকা বলে গণ্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত তা'কিদের সাথে লিখেছেন যে, তিনি আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ক আয়াত শাব্দিক অর্থে বিশ্বাস করেন। তিনি আল্লাহকে শাব্দিক অর্থে আরশের উপরে অবস্থিত বলে বিশ্বাস করেন। তিনি লিখেছেন যে, সকল সাহাবী ও তাবেয়ীও বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ তা'আলা আক্ষরিক অর্থেই আরশের উপর অবস্থিত আছেন। যারা এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁদের নিন্দা করেছেন।[৩] আমরা তাঁর অতি ভক্ত হলেও তাঁর এ সকল মতামত কিছুই মানি না। উপরন্তু যারা এসকল মত মানেন তাঁদেরকে গোমরাহ, বাতিল ও জাহান্নামী বলে মনে করি, যদিও স্বয়ং আব্দুল কাদের জীলানীও (রাহ.) এদের দলের।

(৪). ভক্তগণ গাযালীর (রাহ) অনেক মতামত মানেন না

আমরা ইমাম গাযালী (রহ.)-কে অনুসরণ করি, তাঁর মতামত আমাদের কাছে খুবই বড় দলিল। কিন্তু হানাফী মাযহাবের বিরোধিতায় আমরা তাকে মানি না। তিনি সূফীদের নাচগান ও বাজনার নিয়মিত অনুষ্ঠানকে বিদ'আতে হাসানা হিসাবে জায়েয ও ভালো কাজ বলেছেন, তা আমরা অনেকেই মানি না। আবার যারা এ কথা মানি, তারা অন্য অনেক কথা মানি না।[৪]

অনুরূপভাবে অনেক আলেমের নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁদের নামে বা যাঁদের মতামতের দোহাই দিয়ে আমরা অনেক বিদ'আতে লিপ্ত হই। কিন্তু আমাদের বিদ'আতের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন মতামত পাওয়া গেলে আমরা তা মানতে রাজি হই না। মাযহাব, ইজতিহাদ ইত্যাদি বিভিন্ন দোহাই দিয়ে তাঁদের এ সকল মতামত অস্বীকার করি।

---

(৫). এসব বাছবিচার কিসের ভিত্তিতে

তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে এই বাছবিচার করি ? আমাদের বাছবিচারের মানদণ্ড কী? একজন সুন্নাত-প্রেমিক সুন্নী মুসলিমের মানদণ্ড তো হওয়া দরকার 'সুন্নাত'। আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে, নবীয়ে মুসতাফা ﷺ ছাড়া সবারই মতামতের কিছু গ্রহণ করতে হচ্ছে, কিছু বাদ দিতে হচ্ছে, কাউকেই নির্ভুল ও নিষ্পাপ পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আমরা নবী মুসতাফা ﷺ -কেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করি। যার কথা ও কর্ম যতটুকু তাঁর কথা ও কর্মের সাথে মিলবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করি, বাকিটা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে তাঁদের জন্য দোয়া করি।

(৬). নিজেদের পছন্দের ভিত্তিতে বাছবিচার

কিন্তু আসলে কি আমরা তা করতে পেরেছি? আমার তো ভয় হয়, আসলে আমরা অনুসারীরা এ সব বিষয়ে এ সকল মহান বুজুর্গদের চেয়ে আমাদের নিজেদের নফসের শাহাওয়াত, প্রবৃত্তি, ভালোলাগা, মন্দলাগার বেশি অনুসরণ করি। আমাদের মতামতকে "সুন্নাত" বা শরীয়তের অনুগত না করে আমরা "সুন্নাত"-কে আমাদের মতামতের অনুগত করতে চাই। নিজের হৃদয়কে সকল পছন্দ অপছন্দ থেকে মুক্ত করে সহীহ সুন্নাত খুঁজে তার ভিত্তিতে পছন্দ নির্ধারণ করাই হলো উম্মতের কাজ। কিন্তু আমরা আগেই নিজেদের মতামত ও পছন্দ নির্ধারণ করে ফেলি। এরপর আমাদের পছন্দের পক্ষে "দলিল" খুঁজতে থাকি।

যখন বুজুর্গগণের কারো কথা বা মতামত আমাদের ভালো লাগে তখন আমরা তাঁদের কথাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করি ও বলি : এত বড় আলেম, ওলী, সাহেবে কাশফ, তিনি কি ভুল করতে পারেন? তিনি জানলেন না আমরা জানলাম? আমরা কি তাঁর চেয়েও বেশি জ্ঞানী হয়ে গেলাম? – ইত্যাদি অনেক যুক্তি। আর যখন তাঁরই কোনো কথা আমাদের ভালো লাগে না তখন আমরা এ সব কোনো কথাই বলিনা। কেউ বললে চেষ্টা করি বিভিন্ন ওজুহাত দেখাতে। না হলে মযহাবের কথা বলি অথবা কুরআন সুন্নাহর কথা বলি, তাঁর কথা যেহেতু কুরআন-সুন্নাহ বা শরীয়তের খেলাফ সেহেতু মানা যাবে না।

কোনো অজুহাত দেখিয়ে সুবিধা করতে না পারলে নিজের পছন্দসই মতামতের উপর সুদৃঢ় থাকার সংকল্প মনে নিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে সরে যাই। সুযোগমতো মনে মনে বা প্রকাশ্যে বলি আজকার অধিকাংশ আলেম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, আমার মত যারা না মানছেন তাদের পক্ষে কুরআন, সুন্নাত, এজমা, কেয়াস, আউলিয়া বা ইমামদের বাণী যতকিছুই থাক না কেন তাঁরা সবাই নষ্ট হয়ে গিয়েছেন। আমি এবং আমার মতের পক্ষে যারা আছেন তারাই ভালো আছেন। কারণ, আমাদের কাছে ভালো-মন্দের মাপকাঠি আমারা নিজেরা ও আমাদের নিজেদের ভাললাগা মন্দলাগা।

(৭). নিজেদের পছন্দ ও প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিণাম

এটি এমন একটি মাপকাঠি যার কোনো পরাজয় নেই, যাতে রয়েছে সীমাহীন তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ। আরবিতে এই মাপকাঠিটির নাম ( ), যাকে বাংলা অনুবাদে সাধারণত প্রবৃত্তি বা 'ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ' বলা হয়। কুরআনে কারীমে বিভিন্ন স্থানে এবিষয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন:

"আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তাঁর নিজের পছন্দ অপছন্দ বা নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে ? আপনি কি তার উকিল হবেন?"[১]

অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে :

"তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত ব্যতিরেকে নিজের প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত প্রদান করেন না।"[২]

আবু সা'লাবা খুশানী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

.

"তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে থাক। এরপর যখন দেখবে (মানুষের মধ্যে) অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, দুনিয়ার প্রাধান্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক পণ্ডিত তার নিজ মতকেই সর্বোত্তম মনে করছেন তখন তোমরা সাধারণের বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।"[৩]

অন্য হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে :

"তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে: অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতামতের প্রতি তৃপ্তি ও আস্থা।"[৪]

---

(৮). সুন্নাত-প্রেমিক সুন্নী হৃদয়ের দাবি

এই ধ্বংসের রোগেই আমাদের আক্রমণ করেছে। একজন সুন্নাত-প্রেমিক সুন্নী মুসলমানের অবস্থা তো অন্যরূপ হওয়ার কথা ছিল। তাঁর কাছে একমাত্র মানদণ্ড হলো সুন্নাতে রাসূল ﷺ। সুন্নাতের সামনে সে তাঁর সকল মতামত, সকল ভালোলাগা মন্দলাগা পরিত্যাগ করে। একটি কাজ সে জীবনেও করেনি, তাঁর সম্মানিত বুজুর্গগণও করেননি, কিন্তু আজ সে জানল যে কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, কাজটি সুন্নাত। খুশিতে উদ্বেলিত হবে তাঁর হৃদয়। সে আজ নতুন একটি সুন্নাত জানতে পারল। সে সুন্নাতটি পালন করে সৌভাগ্যবান হবে। আর কেউ করেছেন কি-না এ বিষয়টি তাঁর কাছে খুবই গৌণ। অনুরূপভাবে আজীবন সে একটি কাজ করেছে, ভালবেসেছে, মজা পেয়েছে, কিন্তু আজ জানতে পারল যে কাজটি সুন্নাতের বাইরে, রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি, তাঁর মনে ঐ কাজের প্রতি আর ভালবাসা থাকতে পারে না। কারণ, তাঁর ভাললাগা, ভালবাসা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কেন্দ্র করে। একইভাবে খুশিতে উদ্বেলিত হবে তাঁর হৃদয়। সে আজ একটি নতুন সুন্নাত জানতে পারল, বর্জনের সুন্নাত, সে এই সুন্নাতটি পালন করে সৌভাগ্যবান হবে। আর কে একে বর্জন করেছেন সে প্রশ্ন তার কাছে খুবই গৌণ।

হয়ত সে আজীবন একটি কাজ এক পদ্ধতিতে পালন করেছে, পাগড়িটা একভাবে পরেছে, যিকির একভাবে করেছে, দাওয়াত একভাবে করেছে, জিহাদ একভাবে করেছে, আজ সে জানতে পারল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাজটি অন্য পদ্ধতিতে করতেন। একইভাবে খুশি হবে সুন্নী হৃদয়। সে আজ নতুন একটি সুন্নাত জানতে পেরেছে। তাঁর সামনে সৌভাগ্যের নতুন একটি দরজা উন্মোচিত হয়েছে। আগের খেলাফে সুন্নাত কর্মের জন্য সে চিন্তিত নয়। সেতো তা ভালো উদ্দেশ্যেই করেছে। কিন্তু তাতে অপূর্ণতা ছিল, আজ পূর্ণতা পেল। ইন্‌শা আল্লাহ পূর্ণতার আকুতিতে করা তার অপূর্ণ পদ্ধতির কাজেও আল্লাহ পূর্ণ সাওয়াব দান করবেন।

একজন সুন্নাত প্রেমিক মুসলমান কোনো নতুন সুন্নাত জানলে তার মনে শুধু একটি প্রশ্নই জাগতে পারে : সুন্নাতটি সহীহ সনদে প্রমাণিত কি-না। সুন্নাতটির বিপরীতে অন্য কোনো সহীহ সুন্নাত আছে কি-না? এছাড়া আর কোনো দ্বিধা তো সুন্নী হৃদয়ে থাকতে পারে না। সে কখনই আর কোনো মানুষের কর্মকে সুন্নাতের পাশে বসিয়ে তুলনা করে বেছে নেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে না।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তরে সুন্নাতে নববীর মহব্বত দান করেন, তিনি যেন আমাদেরকে সুন্নাত পালনের তৌফিক দান করেন। আমরা যেন কোনো অজুহাতেই সুন্নাত ত্যাগ না করি, বরং সুন্নাতের অজুহাতে আর সব ত্যাগ করতে পারি।

(৯). ব্যাখ্যা করে সুন্নাত পরিত্যাগ করার অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ করা

সুন্নাতকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং পালন করতে হবে। কোনো বিষয়ে কোনো সুন্নাত জানা গেলে তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বাহ্যিক অর্থের বাইরে নিয়ে যাওয়া বা পরিত্যাগ করা খুবই অন্যায়। কোনো সহীহ হাদীসের বিপরীতে অন্য কোনো সহীহ হাদীস থাকলেই শুধু দুটি হাদীসের সামাঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। যেমন, জামাতে নামাযের সময় মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠ, বিতির নামাযের রাকআতের সংখ্যা, চাশ্‌ত বা দোহার নামায নিয়মিত আদায় বা মাঝে মাঝে আদায় ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস পাওয়া যায়, যার অর্থের মধ্যে বাহ্যিক বৈপরিত্য রয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হলে দুটি হাদীসের উপরেই আমল করতে হবে। অথবা সাহাবীগণের মতামত বা প্রথম দুই যুগের আলেম ও ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে যে কোনো একটির উপর আমল করতে হবে।

অনুরূপভাবে তিনি কোনো কোনো হাদীসে মেয়েদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন, কোনো কোনো হাদীসে অনুমতি প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতে পারে। তিনি হয়ত প্রথমে নিষেধ করেছেন, পরে অনুমতি দিয়েছেন। অথবা বেশি বেশি যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন, মাঝেমধ্যে যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন, ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে এ ধরনের একাধিক হাদীস নেই সেখানে কোনোরূপ অজুহাত সৃষ্টি করে সুন্নাতের পরিপূর্ণ পালন ত্যাগ করার অর্থ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সুন্নাত পরিত্যাগ করা ও অপছন্দ করা।

(ক). খেজুর দ্বারা ইফতার বনাম পানি দ্বারা ইফতার

যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর দ্বারা ইফতার করতে পছন্দ করতেন। খেজুর না থাকলে পানি দ্বারা ইফতার করতেন। এটি একটি স্পষ্ট সুন্নাত। এর বিপরীতে কোনো স্পষ্ট সুন্নাত নেই যে, তিনি কখনো খেজুর থাকা সত্ত্বেও পানি মুখে দিয়ে বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে ইফাতার করেছেন। এখন আমরা একথা বলতে পারি না যে, তাঁর যুগে পানি কম ছিল এজন্য তিনি খেজুরের কথা বলেছেন, আমাদের যুগে যেহেতু পানি সহজলভ্য তাই খেজুর পাওয়া গেলেও আমরা পানি দিয়ে ইফতার শুরু করব। অথবা বলতে পারি না যে, বর্তমান যুগে আমাদের উপার্জন হালাল কিনা সন্দেহ আছে, যে টাকা দিয়ে খেজুর কিনব তা হালাল নাও হতে পারে, কাজেই পানি যেহেতু সর্বাবস্থায় হালাল সেজন্য খেজুর পাওয়া গেলেও পানি মুখে দিয়ে ইফতার করা উত্তম। এ সকল কথার অর্থই হলো নিজেদের পছন্দের ভিত্তিতে সুন্নাতকে অপছন্দ করা।

(খ). সম্মানের জন্য কাউকে সাজদা করা

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। অন্য কোনো হাদীসে তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করার কোনো অনুমতি সুস্পষ্টভাবে প্রদান করেননি। এক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে, তিনি অমুক কারণে নিষেধ করেছেন, বা অমুক প্রকারের সাজদা নিষেধ করেছেন, অমুক আয়াতের বর্ণনায় অথবা অমুক হাদীসের বর্ণনায় তিনি যে কথা বলেছেন তাতে সাজদা জায়েয হওয়ার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে, ইত্যাদি বলে আমরা যদি সাজদা জায়েয করি তাহলে মূলত আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সুন্নাত পরিত্যাগ করলাম।

(গ). বানোয়াট বা মিথ্যা হাদীস বলা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামে মিথ্যা কথা বলতে ও বানোয়াট হাদীস বলতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে তিনি কখনো বলেননি যে, আমার পক্ষে তোমরা মিথ্যা বানাবে। আমরা যদি এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলি যে, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা নিষেধ, তাঁর পক্ষে বা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বললে তা না-জায়েয হবে না তাহলেও আমরা একইভাবে আমাদের প্রবৃত্তির আনুগত্য করলাম ও সুন্নত পরিত্যাগ করলাম।

(ঘ). ঈদের দিনে রোযা রাখা

হাদীস শরীফে ঈদের দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কোনো হাদীসে স্পষ্টভাবে এর বিপরীতে কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। কোনো হাদীস থেকে জানা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণের যুগে ঈদের দিনে রোযা রাখার রীতি ছিল। কিন্তু একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"যদি কেউ রমযানের রোযা রাখে। অতঃপর এর পিছেপিছে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে তার সারা বৎসর রোযা রাখা হবে।"[১]

এই হাদীসের দুটি অর্থ হতে পারে : প্রথম অর্থ হলো – রমযানের পরেই ১লা শাওয়াল থেকেই ৬টি রোযা রাখতে হবে, তাহলেই রমযানের পিছেপিছে রোযা রাখা হবে এবং সারা বৎসর রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো – রমযানের পরে ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা যাবে না, পরবর্তী সময়ে শাওয়ালের মধ্যেই ৬টি রোযা রাখলেই রমযানের পিছেপিছে রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

আমরা বিভিন্ন হাদীসের আলোকে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু কেউ যদি ১ম অর্থ গ্রহণ করে এই দ্ব্যর্থ-বোধক হাদীস দিয়ে ঈদুল ফিতরের দিনে রোযা রাখার স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করেন তাহলে তিনি মূলত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হাদীসকে অস্বীকার করবেন। অনেক যুক্তিই তিনি দিতে পারবেন। হয়ত বলবেন : ঈদের দিনে রোয না রাখার বিধান সাধারণ মানুষদের জন্য, আর রাখার বিধান খাস বান্দাদের জন্য। অথবা বলবেন ঈদের দিনে রমযানের মতো ফরযের পদ্ধতিতে রোযা রাখলে তা নিষেধ হবে, আর ব্যক্তিগতভাবে শাওয়ালের নফল ৬ রোযার ১ম দিন হিসাবে রাখলে তা এই হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জায়েয হবে। এরকম অনেক কথাই বানানো যাবে। তবে সবই হবে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্পষ্ট হাদীসকে দিয়ে স্পষ্ট সুন্নাতকে অমান্য করা।

(ঙ). কবর পাকা করা, বাতি দেওয়া ইত্যাদি

পাঠক হয়ত আশ্চর্য হচ্ছেন, এভাবে ঈদের দিনের রোযা জায়েয বলতে তো কাউকে শুনিনি। আপনার কথা ঠিক। তবে অবিকল একইভাবে আমরা অনেক সুন্নাতকে মনগড়াভাবে বহুসংখ্যক স্পষ্ট সুন্নাতকে বিভিন্ন দ্ব্যর্থবোধক হাদীস বা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে পরিত্যাগ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরে বাতি প্রদান করতে, কবরে মসজিদ তৈরি করতে, কবরের উপর ঘর তৈরি করতে, কবরের উপরে লিখতে ও চুনকাম করতে, কবরকে উৎসব বা মিলনস্থান বানাতে বা কবর কেন্দ্রিক উরস, উৎসব ইত্যাদি করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে কোনো হাদীসে তিনি এগুলি করার স্পষ্ট অনুমতি প্রদান করেননি বা কোনো ক্ষেত্রে কারো জন্য এগুলি করলে কোনো সাওয়াব আছে তাও বলেননি। তা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন কারণ, ব্যাখ্যা, বিভিন্ন আয়াত বা হাদীসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও সম্ভাবনা দেখিয়ে এসকল নিষিদ্ধ কাজ করে চলেছি।

মুসলিম সমাজে শত শত কাজকর্ম এভাবে ধর্মকর্মের অংশ হয়ে গিয়েছে, অথচ হাদীস শরীফে তা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ তা সর্বদা বর্জন করেছেন। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

(চ). তাবিল-ব্যাখ্যা শয়তানের চিরন্তন ফাঁদ

তাবিল-ব্যাখ্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ অমান্য করা বা সুন্নাত পরিত্যাগ করা ইবলিসের প্রতারণার মূল সূত্র। আদম ও হাওয়াকে ওয়াসওয়াসা দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন: "অতঃপর শয়তান তাদের গোপনকৃত লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই শুধু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলে যে, আমি অবশ্যই তোমাদের একজন হিতাকাংক্ষী।"[২]

এখানে শয়তান আদম ও হাওআ (আ)-কে এ কথা বলে নি যে, আল্লাহর আদেশ মানার দরকার নেই। বরং সে বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ অবশ্যই মানতে হবে, তবে আল্লাহর আদেশের কারণ, হিকমত ও রহস্য জানতে হবে এবং সে অনুসারে কাজ করতে হবে। এখানে আল্লাহ তোমাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ ফল খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে এবং জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। এখন যদি তোমরা জান্নাতে স্থায়ী থাকতে চাও তবে এ ফল খেতে পার। পাশাপাশি সে আল্লাহর কসম করে বলে যে, কেবলমাত্র তাদের ভালর জন্যই সে কষ্ট করে এ বুদ্ধি দিয়েছে....।

সকল যুগেই শয়তান এভাবেই আদম সন্তানদেরকে প্রতারণা করছে। কুরআন ও হাদীসে সর্বদা সুন্নাতের অবহু অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম করতে বা 'বিদ'আত' করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর বিপরীতে কোথাও বলা হয় নি যে,

অমুক বিষয়ে সুন্নাতের অতিরিক্ত, ব্যতিক্রম বা 'বিদ'আতে হাসানা' কিছু না করলে তোমাদের দীনের কোনো কমতি থাকবে। কিন্তু দীনের রক্ষক সেজে বা মুসলিমদের হিতাকঙ্খী সেজে অনেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কিছু করাকে দীনের জন্য প্রয়োজনীয় বনিয়ে নিচ্ছেন। এমনকি কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে এবং বিপরীতে কোথাও আদেশ বা অনুমতি দেওয়া হয় নি এমন অনেক কর্মকেও অনেক আলিম বিভিন্ন 'কারণ', যুক্তি, হিকমাত, বা 'প্রকৃত রহস্য' দেখিয়ে বৈধ করে দিচ্ছেন। বলা হচ্ছে, অমুক বা তমুক কারণে তা নিষেধ এবং অমুক বা তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। ইমাম বা আলিমগণের বক্তব্য বা কিতাবের উদ্ধৃতিও এভাবে ব্যাখ্যা করে বাতিল করা হয়। সকল শিরক, কুফর ও বিদ'আতের ক্ষেত্রেই শয়তানের মূল যুক্তি এটাই। মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলিকে তাঁর মহান রাসূলের সুন্নাতের মধ্যে পরিতৃপ্ত রাখুন এবং আমাদের কর্ম ও চিন্তা চেতনাকে সুন্নাতের অনুগত করে দিন।

চতুর্থ অধ্যায়

সুন্নাতের প্রকারভেদ

"সুন্নাত"-এর প্রথম শ্রেণিবিন্যাস : ইবাদাত ও আদাত

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, 'সুন্নাত' এবং একমাত্র 'সুন্নাত'ই সকল সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, সকল বেলায়াতের উৎস ও মুক্তির একমাত্র মাধ্যম। সুন্নাতের ব্যতিক্রম করা, কম করা, বৃদ্ধি করা বা সুন্নাতের বাইরে কোনো নতুন কর্ম বা পদ্ধতি চালু করা ভয়ের কারণ, শয়তানের প্রবেশের পথ। নিরাপত্তা একমাত্র সুন্নাতেই। এখন আমরা সুন্নাতের বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণিবিভাগের আলোচনা করব। প্রথমত, সুন্নাতের প্রকৃতি অনুসারে সুন্নাতকে অন্য দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

(১). আহকাম-মূলক সুন্নাত, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসকল কাজ শরীয়তের বিধান হিসাবে, আল্লাহর পথে চলার পাথেয় হিসাবে করেছেন বা করার জন্য উম্মতকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এগুলিই মূলত সুন্নাত এবং তাঁর প্রায় সকল সুন্নাতই এই পর্যায়ের।

(২). সাধারণ জাগতিক অভ্যাসের সুন্নাত। পানাহার, পরিধান, যাতায়াত, বসবাস, ইত্যাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক কাজ করেছেন, যা একজন মানুষের প্রাকৃতিক বা জাগতিক প্রয়োজনে করতে হয় এবং তাঁর সমসাময়িক দেশবাসীর সবাই স্বাভাবিকভাবে করত। এগুলি তিনি শরীয়াতের আহকাম হিসাবে করেননি, বা এগুলির মধ্যে কোনো সাওয়াবের কম-বেশি আছে বলেও জানাননি। তবুও তিনি করেছেন বলে এ সকল কর্ম 'ব্যবহারিক' সুন্নাতের মর্যাদা পেয়েছে। নবী প্রেমিকের কাছে এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

জাগতিক কর্মে সুন্নাতে নববী : পরিধি ও গুরুত্ব

(১). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জাগতিক ও প্রাকৃতিক কার্যাদি

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পথের পাথেয় হিসাবে, বিভিন্ন ইবাদতের অংশ হিসাবে, সাওয়াব, বরকত বা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম হিসাবে উম্মাতকে তাঁর কথা, নির্দেশ ও কাজের মাধ্যমে যা শিক্ষা প্রদান করেছেন তা সঠিকভাবে গ্রহণ করা, তাঁরই শেখানো পদ্ধতিতে হুবহু তাঁর অনুসরণে পালন করা উম্মতের মুক্তি ও সফলতার পথ- এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম, ফকীহ ও আলেম একমত। তবে তিনি যে কাজ কোনোভাবে ইবাদতের অংশ হিসাবে, সাওয়াব বা বরকতের উৎস হিসাবে শিক্ষা দেননি, কোনোভাবে কোনো কথা বা নির্দেশনার মাধ্যমে সে কাজ করতে বলেননি, শুধুমাত্র জাগতিক বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে, পানাহার, বসবাস, যাতায়াত, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে করেছেন সেসকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে কি-না সে বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ কিছু মতভেদ করেছেন।

কোনো কোনো ফকীহ এসকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণকে দ্বীনের অংশ বলে মনে করেন না। তাঁরা শুধুমাত্র ইবাদতের ক্ষেত্রেই তাঁকে অনুসরণ করতে বলেন। কারণ, তিনি মানবজাতিকে আল্লাহর ইবাদতের ও নৈকট্য অর্জনের সঠিক পথ শেখাতেই এসেছিলেন। তিনি যে কাজে ইবাদত হিসাবে করেননি বা তাঁকে অনুসরণের নির্দেশ দেননি সে কাজে তাঁর অনুসরণ তাঁদের মতে অপ্রয়োজনীয়। তবে অধিকাংশ ফকীহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ ধরনের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন : প্রথমত, যে সকল কাজ তিনি করেছেন এবং কোনো না কোনোভাবে করতে মুখে উৎসাহ প্রদান করেছেন, দ্বিতীয়ত, যে সকল কর্ম তিনি করেছেন কিন্তু কোনোভাবে করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দেননি।

দ্বিতীয় প্রকারের এই কাজকে এসকল ফকীহ দুইভাগ করেছেন : (১) যা তিনি করেছেন, কোনোভাবে করতে বলেননি, কিন্তু জানা যায় যে তিনি তা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করেছেন। (২) যা তিনি শুধু জাগতিক বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে করেছেন।

প্রথম প্রকারের কাজ, যা তিনি করেছেন কিন্তু করতে বলেন নি, তবে তাঁর কর্মধারার আলোকে বুঝা যায় যে তিনি তা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করেছেন, এসকল কাজে তিনি যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে করেছেন ঠিক ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে সেভাবে তাঁকে অনুসরণ করা প্রয়োজন বলে অনেক হানাফী ফকীহ মনে করেন। ইমাম শাফেয়ী, তাঁর অনুসারীগণ ও অনেক হানাফী ফকীহ এই ধরনের কাজে তাঁর

অনুসরণ মুস্তাহাব বলে মনে করেন। কোনো কোনো ফকীহ্ এসকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ জায়েয বা মুবাহ বলেছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের কাজ, যা তিনি করেছেন, কিন্তু করতে বলেন নি এবং বুঝা যায় যে, তিনি জাগতিক বা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কাজটি করেছেন, কোনো সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয় তাহলে সেই কাজটি করা হানাফী, শাফেয়ী ও অন্যান্য ফকীহের মতে শুধু জায়েয পর্যায়ের হবে। অর্থাৎ, এ ধরনের কর্মে তাঁর অনুসরণ কোনো সাওয়াবের বিষয় নয়।[১]

(২). সাহাবীগণের জীবনে জাগতিক সুন্নাত

এ হলো ফকীহগণের মতামত। সাহাবীদের জীবনপদ্ধতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তাঁরা এসকল বিষয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ-অনুকরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমসাময়িক হওয়ার কারণে তাঁরা অধিকাংশ জাগতিক বিষয়ে তাঁর মতোই চলতেন। তাঁরা তাঁর মতোই পানাহার, পোশাক, আবাসস্থল ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। একই পদ্ধতিতে তাঁরা অধিকাংশ জাগতিক কর্ম সম্পাদন করতেন। তা সত্ত্বেও যেখানেই তাঁর সামান্যতম ব্যতিক্রম পেতেন সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করতেন, তা যত ক্ষুদ্র জাগতিক অভ্যাসই হোক না কেন।

যেমন, তিনি জাগতিক প্রয়োজনে তাঁর যুগের অন্যান্যদের মতো খাদ্য গ্রহণ করতেন। তবে তাঁর বিশেষ পছন্দ ছিল লাউ। তিনি তরকারির মধ্য থেকে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে গ্রহণ করতেন। তিনি এই কাজ 'সাওয়াবের' জন্য করেছেন, বা বিশেষ করে 'লাউ' খাওয়ার মধ্যে কোনো সাওয়াবের কম-বেশি আছে বলে তিনি কোনোভাবে জানাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু তিনি পছন্দ করে খেয়েছেন, তাই সাহাবীর কাছে তা 'সুন্নতের' মর্যাদা পেয়েছে। একজন নবী-প্রেমিক উম্মতের জন্য এটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সুন্নাতের অনুসরণের পরিপূর্ণ আদর্শ সাহাবীদের নিকট এই ক্ষুদ্র জাগতিক অভ্যাসগত সুন্নাতের মূল্য কত বেশি ছিল তা আমরা প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি।

আমরা দেখেছি, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) সফরের সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গাছের কাছে যেতেন এবং তার নিচে দুপুরের বিশ্রাম করতেন। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে এভাবে বিশ্রাম করতেন। অন্য হাদীসে দেখেছি যে, কুররা ইবনু ইয়াস যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বাইয়াত গ্রহণ করলেন তখন তাঁর জামার বোতাম খোলা ছিল, এজন্য জীবনে শীতে বা গরমে কখনো তিনি জামার বোতাম লাগাতেন না। তাঁর ছেলে তাবেয়ী মুয়াবিয়া ইবনু কুররাও তাই করতেন। সর্বদায়ই তাঁরা জামার বোতাম খুলে রাখতেন।

অনুরূপভাবে ইবনু উমর (রা) সফরের সময় একস্থানে একটু ঘুরে যেতেন, শুধুমাত্র এ জন্য যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে দেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চলার পথে প্রয়োজনের তাগিদে একস্থানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে থেমেছিলেন। তাই ইবনু উমর (রা) সেখানে থেমেছেন। তাঁর ইচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণে তিনিও সেখানে ইস্তিঞ্জা করতে বসবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ধরনের জুতা পরিধান করতেন তিনিও ঠিক সেই ধরনের জুতা পরিধান করতেন। যে রঙের কাপড় পরতেন বা যে রঙ দিয়ে দাড়ি বা চুল খেজাব করতেন সেই রঙই ছিল তাঁদের পছন্দ।

এ ছিল সাহবীগণের ভাক্তি, ভালবাসা ও অনুসরণের নমুনা। সেখানে কোনো যুক্তি ছিল না, অজুহাত ছিল না, ইবাদত না আদাত, সাওয়াবের জন্য না প্রাকৃতিক প্রয়োজনে – এ কথা বিবেচনার কোনো আগ্রহ ছিল না। শুধু ছিল পরিপূর্ণ ভক্তি, ভালবাসা ও সকল ক্ষেত্রে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের ঐকান্তিক আগ্রহ।

(৩). মুসলিম জীবনে জাগতিক সুন্নাত: অবহেলা বনাম বাড়াবাড়ি

বর্তমান যুগে আমরা এ বিষয়ে একদিকে বাড়াবাড়ি ও অপরদিকে অবহেলার মধ্যে রয়েছি। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, সমাজের অনেক ভক্ত আশেক ধার্মিক মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাগতিক অভ্যাসমূলক সুন্নাতগুলিকেই গুরুত্ব সহকারে পালন করেন। যেসকল কাজ তিনি জাগতিকভাবে করেছেন, কখনো করতে বলেননি এরূপ কাজ আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করি এবং তাতে অবহেলা করতে চাই না, আবার সামান্য বেশি-কম বা ব্যতিক্রম করতে চাই না। অথচ যেসকল কাজ তিনি নিজে 'সুন্নাত' হিসাবে শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম হিসাবে পালন করেছেন, হয়তবা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সেসকল সুন্নাত পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ত্রুটি ও অবহেলা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হারাম উপার্জন বর্জন, ধোঁকা বর্জন, হিংসা বর্জন, অহংকার বর্জন, যিক্র, দোওয়া, দরুদ, সালাম, তাহাজ্জুদ, তাওবা, ক্রন্দন, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, পরিবার পালন, পর্দা পালন, সৃষ্টির সেবা, জনকল্যাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেউবা মোটেও 'সন্নাত' পালন করেন না, কেউ বা সুন্নাতকে কম-বেশি, খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আত পদ্ধতিতে পালন করেন। আবার কেউ কেউ খেলাফে-সুন্নাত বা বিদ'আতের প্রতিবাদ করলেও এ সকল কোনো বিষয়েই সুন্নাত পদ্ধতিতে চলতে আগ্রহী হন না।

অপর দিকে অনেক আগ্রহী ধর্মপ্রাণ মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জাগতিক অভ্যাস বা পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ইত্যাদি সুন্নাতকে অবজ্ঞা করেন বা এসব বিষয়ে কোনো 'সুন্নাত' নেই বলে মনে করেন। তাঁদের উচিত সাহাবীগণের জীবনের ঘটনাগুলি চিন্তা করা দরকার। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জাগতিক ও মানবীয় সকল কর্মও সুন্নাতের মর্যাদায় সমাসীন। তাঁর ইবাদতকে ইবাদত হিসাবে, জাগতিক অভ্যাসকে জাগতিক অভ্যাস হিসাবে অনুকরণ করাই 'সুন্নাত'। সার্বিক অনুকরণ আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভক্তি সৃষ্টি করবে। তেমনি তাঁর প্রতি আমাদের সত্যিকার ভালবাসা ও ভক্তি থাকলে তা আমাদের এইরূপ দ্বিধাহীন পরিপূর্ণ অনুসরণের দিকে ধাবিত করবে।

পোশাক, পরিচ্ছদ, উঠাবসা, হাঁটাচলা ইত্যাদি অধিকাংশ জাগতিক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ ফিকহের বিচারে 'মুস্ত াহাব' বৈ কিছুই নয়। অনুসরণ না করলে গোনাহ হবে না। কিন্তু এসকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণের প্রভাব প্রেমিক হৃদয়ে অনেক।

এসকল জাগতিক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ মু'মিনকে যেমন অধিকতর অনুসরণের দিকে ধাবিত করে, তেমনিভাবে তাঁকে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাকে বেঁধে রাখে। তাঁর সাথে তার স্থায়ী অদৃশ্য বাঁধন তৈরি হয়, যা তাঁকে ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বতের ক্ষেত্রে পূর্ণতার দিকে ধাবিত করে। আর তাঁর মহব্বত ঈমান এবং তাঁর মহব্বত ইসলাম।

তাবেয়ী ইবনু সিরীন বলেন : আমি আমার উস্তাদ অন্যতম তাবেয়ী আবীদাহ ইবনু আমর আস-সালমানীকে (মৃত্যু ৭২ হি.) বললাম : আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু চুল আছে, যা আমরা আনাস ইবনু মালিক থেকে পেয়েছি। আবীদাহ বললেন : "জমিনের উপরে যত সোনা চান্দি ও অর্থ সম্পদ সবকিছুর চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটিমাত্র চুল কাছে পাওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়। জমিনের সকল সম্পদ পেলেও আমি তত খুশি হব-না, যত খুশি হব নবীয়ে আকরাম ﷺ -এর একটিমাত্র চুল পেলে।"[১]

এ হলো নবী প্রেম। পার্থিব হিসাব নিকাশ সেখানে অচল। আজ দেড় হাজার বছর পরে তাঁর কোনো স্মৃতি আর সহীহভাবে আমরা আমাদের সকল সম্পদ দিয়েও কাছে পাচ্ছি না। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত হারামাইন শরীফাইনে যাওয়ার সুযোগও অনেকের হচ্ছে না। এখন শুধু তাঁর সাথে সম্পৃক্ত বিশুদ্ধ সুন্নাতগুলিই আমাদের একমাত্র সম্বল। আসুন সকল অজুহাত ত্যাগ করে, অন্য কারো কর্ম, রীতি বা সুন্নাতের দিকে না তাকিয়ে, নিজস্ব অভিলাস, অভিরুচি, অভিপ্রায়, বিচার বিশ্লেষণ দূরে ছুড়ে ফেলে, যথাসম্ভব তাঁর সকল সুন্নাতকে মহব্বত করি, পালন করি, প্রচার করি। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

(৪). জাগতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত সুন্নাত-সমূহের স্তর ও পর্যায়

ইতঃপূর্বে ফকীহগণের মতামত আলোচনার সময় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কোনো কাজ জাগতিক কর্ম হিসাবে সম্পাদন করেন এবং কোনো না কোনোভাবে সেই কাজে উৎসাহ বা নির্দেশনা প্রদান করেন তাহলে তা ইবাদত পর্যায়ের সুন্নাতে পরিণত হয়। সে বিষয়ে তাঁর কর্ম ও নির্দেশনার আলোকে তাঁকে অনুসরণ করা উম্মতের দায়িত্ব হয়ে যায়। অধিকাংশ জাগতিক বিষয়ে এ ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। মলমূত্র ত্যাগ, পানাহার, নিদ্রা, পোশাক পরিচ্ছদ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি অনেক কাজ প্রাকৃতিক ও জাগতিকভাবে করেছেন। কাউকে তাঁর অনুসরণ করতে বলেননি। তৎকালীন তাঁর সমাজের মানুষদের সাথে সেসব বিষয়ে তাঁর মিল ছিল। আবার অনেক কাজ তিনি উম্মতকে দ্বীনের অংশ হিসাবে বা সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে শিক্ষা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন ধরনের সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন।

যেমন তিনি সেলাইবিহীন খোলা লুঙ্গি, চাদর, কামিজ, কোর্তা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের পোশাক পরিধান করেছেন, বিশেষ কোনো পদ্ধতির পোশাকের ফযীলত বর্ণনা করেননি। আমরা এগুলিকে জাগতিক সুন্নাত মনে করতে পারি। টুপি, পাগড়ি, রুমাল ইত্যাদিকেও অনেক আলেম এই পর্যায়ের মনে করেন। তিনি এগুলি ব্যবহার করেছেন বলে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। কিন্তু এগুলি ব্যবহার করার কোনো নির্দেশনা বা ফযীলতের বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। তবে পাগড়ির বিষয়ে কিছু অত্যন্ত যয়ীফ ও মউযূ হাদীস রয়েছে, যাতে পাগড়ি পরিধানের ও পাগড়ি পরিধান করে নামায আদায়ের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম এসকল যয়ীফ হাদীসের ফযীলতের উপর আমল করাকে উত্তম মনে করেছেন।

অপরদিকে তিনি সাদা, সবুজ ইত্যাদি রঙ পরিধান করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন, ফযীলত জানিয়েছেন। কোনো কোনো রঙ নিষেধ করেছেন। পরিধেয় পোশাক টাখনুর নিচে রাখতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। অমুসলিম বা পাপী সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর আদেশ, নিষেধ, নির্দেশনা ও উৎসাহপ্রদানের ফলে এগুলি দ্বীনের অংশ ও ইবাদত বলে গণ্য হবে।

তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কখনো তৈরি ঘরের মধ্যে, কখনো মরুভুমির নির্জন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। এগুলি তাঁর প্রাকৃতিক কর্ম। কিন্তু মলমূত্র ত্যাগের সময় আড়ালে যেতে, ভালোভাবে ইস্তিঞ্জা করতে ও পবিত্র হতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময়ে কথাবার্তা বলতে ও কেবলামুখী হতে নিষেধ করেছেন। এগুলি দ্বীনের অংশ।

পানাহারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সময়ে তাঁর সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো খাদ্য বা পানীয় তিনি বেশি পছন্দ করতেন। কোনো কোনো খাদ্য তিনি স্বভাবজাতভাবে পছন্দ করতেন না। তাঁর যুগের প্রচলিত পদ্ধতিতে পানাহার করেছেন। এগুলি সবই জাগতিক বিষয়।

অপরদিকে তিনি খেজুর, দুধ, মধু ইত্যাদি কোনো কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি সর্বদা অত্যন্ত অল্প আহার করতেন এবং অল্প আহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। নিজে কম খেতে ও নিজের খাদ্য অন্যকে খওয়াতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। পানাহারের জন্য কোনো কোনো পদ্ধতিকে ভালো বা খারাপ বলেছেন। অনেক খাদ্য ও পানীয় তিনি নিষেধ করেছেন। তাঁর নির্দেশনার গুরুত্ব অনুসারে এগুলি উম্মতকে পালন করতে হবে।

তাঁর যুগের ও সমাজের অধিকাংশ মানুষের মতো তিনি বড় দাড়ি রাখতেন। এতটুক ছিল তাঁর জাগতিক বিষয়। কিন্তু তিনি তাঁর উম্মতকে দাড়ি বড় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন। এভাবে তা দ্বীনের অংশে পরিণত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে প্রাকৃতিক ও জাগতিক প্রয়োজনে তিনি ঘুমিয়েছেন। তাঁর দেশের ও সমাজের অন্যান্যদের পদ্ধতিতেই তিনি ঘরে, তাঁবুতে বা বাইরে ঘুমিয়েছেন। এগুলি জাগতিক বিষয়। তবে ওযু অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া, ডান কাতে ঘুমানো, শক্ত বা সাধারণ বিছানায় শোয়া, প্রয়োজনমত যথাসম্ভব কম ঘুমানো এবং বাকী সময় ইবাদত ও কর্মে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তিনি উম্মতকে শিখিয়েছেন ও নিজে পালন করেছেন সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে। এগুলি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম ও দ্বীনের অংশ। উম্মতের প্রয়োজন হলো এগুলি ভালোভাবে জেনে সুন্নাত-পদ্ধতি ও গুরুত্ব-সহকারে তা পালন করা। পদ্ধতি বা গুরুত্ব কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলে তা খেলাফে-সুন্নাতে পরিণত হবে। ইন্‌শা আল্লাহ, আমরা এই পুস্তকের শেষে সুন্নাতের গুরুত্বগত স্তর ও গুরুত্বের ব্যতিক্রম জনিত বিদ'আত গুলি

আলোচনা করব।

সম্মানিত পাঠক, আমাদের বুঝতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যেভাবে, যতটুকু গুরুত্বসহকারে, যে পদ্ধতিতে করেছেন বা বর্জন করেছেন, সেই কাজ সেভাবে, ততটুকু গুরুত্বসহকারে, সেই পদ্ধতিতে করা বা বর্জন করাই সুন্নাত। প্রকার, পদ্ধতি বা গুরুত্বের ক্ষেত্রে বেশি-কম করা সুন্নাতের খেলাফ। একথা শুধু বুঝলেই শেষ হয়ে গেল না। আমাদেরকে তা পালন করতে হবে। আমাদের জাগতিক ও পারলৌকিক সকল সাফল্য একমাত্র রাসূলে মুসতাফা ﷺ -এর অনুসরণের উপরেই নির্ভর করে। তাঁর ভক্তি, ভালবাসা ও অনুসরণ একই সূত্রে গাঁথা। অনুসরণহীন ভক্তি ও ভালবাসার দাবি মিথ্যা ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা মাত্র। অপরপক্ষে ভক্তি ও ভালবাসা ছাড়া পরিপূর্ণ অনুসরণ সম্ভব নয়। জীবনের সকল পর্যায়ে ও সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সকলপ্রকার বেশি-কম বাদ দিয়ে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণই আমাদের সফলতার একমাত্র উপায়। আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে তাঁর খলীল ও হাবীব নাবীয়ে উম্মীর (ﷺ) পূর্ণ অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করেন। আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মতো ভক্তি, ভালবাসা ও অনুসরণের তৌফিক দান করেন। দয়া করে আমাদেরকে তাঁদেরই দলভুক্ত করে হাশরে উঠান এবং জান্নাতের নেয়ামত দান করেন ; আমীন।

'সুন্নাত' -এর দ্বিতীয় শ্রেণিবিন্যাস : কর্ম ও বর্জন

পালন করা এবং বর্জন করা, অনুমোদন প্রদান ও সাধারণ উৎসাহ প্রদানের দিক থেকে সুন্নাতকে চার ভাগে ভাগ করা যায় : কর্মের সুন্নাত, অনুমোদনের সুন্নাত, কাওলী বা নির্দেশনামূলক সুন্নাত ও বর্জনের সুন্নাত।

কর্মের সুন্নাত : যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন সেই কাজ তিনি যেভাবে, যতটুকু করেছেন সেভাবে আদায় করাই সুন্নাত।

অনুমোদনের সুন্নাত : অনুমোদন সুন্নাত অর্থ কোনো কাজ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে না করলেও করতে অনুমোদন প্রদান করেছেন, বা তাঁর সময়ে করা হয়েছে কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি। এ ধরনের কাজও 'সুন্নাতের' অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অনুমোদনের আলোকে তা আদায় করা সুন্নাত।

কাওলী বা নির্দেশনামূলক সুন্নাত : তাঁরা কথা বা কওলী নির্দেশনার সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে বিভিন্ন প্রকারের নেক কর্মে উৎসাহ প্রদান করে নির্দেশনা দান করেছেন। তিনি নিজে এ সকল কর্ম পালন করেছেন এবং সাহাবীগণও তাঁর এসকল নির্দেশিত নেক আমল পালন করেছেন।

বর্জনের সুন্নাত : যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে যতটুকু যে গুরুত্ব দিয়ে বর্জন করেছেন তা সেভাবে বর্জন করাই সুন্নাত।

বর্জনের সুন্নাত : পরিচিতি ও গুরুত্ব

সাধারণত কর্মের সুন্নাত আমরা সহজেই বুঝতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যেভাবে করেছেন তা সেভাবে করা যে সুন্নাত তা সম্ভবত আমরা সবাই বুঝতে পারি এবং স্বীকার করি। আমরা তা পালনেরও চেষ্টা করি। কিন্তু বর্জনের সুন্নাতের বিষয়ে আমাদের ধারণা অনেক সময় স্পষ্ট নয়। আমরা অনেক সময় অনেক বিষয়কে নাজায়েয, মাকরুহ বা হারাম বলি ; – এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেননি। আবার সেই মুখেই অনেক সময় বলি: তিনি করেননি তাতে কি, তিনি কি করতে নিষেধ করেছেন? অনেকের মনেই হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে : কোনো কাজ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ না করেন তাহলেই কি তা নিষিদ্ধ হয়ে গেল ? না-করা আর নিষেধ করা তো এক নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি এজন্যই কি কোনো কাজ করা মাকরুহ বা হারাম হয়ে যাবে ? অথচ অনেকেই বলেন যে, দলিল ছাড়া কোনো কাজকে মাকরুহও বলা যায় না। আমাদের এই একই মুখে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য ও মতামতের কারণ বর্জনের সুন্নাত সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট না হওয়া।

আমাদের বুঝতে হবে যে, **ইবাদত বা মু'আমলাত যে কোনো কর্মের যতটুকু সুন্নাত অনুসারে পালিত ততটুকুরই শুধু সাওয়াব বা কবুলিয়্যতের আশা করা যায়। ইত্তিবায়ে রাসূলের (ﷺ) বাইরে কোনো সাওয়াব নেই।**

বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার আগে এর মূলনীতিটি উল্লেখ করছি: **যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ করেননি তা জায়েয হতে পারে, জাগতিকভাবে বা ইবাদত পালনের উপকরণ হিসাবে জরুরি বা প্রয়োজনীয়ও হতে পারে, তবে কখনই তা ইবাদত, ইবাদতের অংশ, আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের উৎস হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি বা বর্জন করেছেন তাকে ইবাদতের অংশ বা সাওয়াবের কাজ মনে করা নিষিদ্ধ। সাওয়াব ও কবুলিয়্যতের একামত্র উৎস সুন্নাতের অনুসরণ।** এই নীতিটি অনুধাবন করার জন্য আমাদের কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন :

(১). ইবাদত, মুআমালাত ও আদাতের মধ্যে পার্থক্য

ইতঃপূর্বে আমরা বিষয়টি আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে, দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে, আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি যদি কোনো কাজ না করেন তাহলে তা বর্জন হিসাবে গণ্য হবে এবং তা খেলাফে-সুন্নাত বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। তাঁর বর্জনই নিষেধের দলিল। আর নিষেধের ন্যূনতম পর্যায় হলো মাকরুহ হওয়া। যদি আমরা অতিরিক্ত কোনো দলিল প্রয়োজন মনে করি তাহলে ইসলামের অধিকাংশ বিধান অচল হয়ে যাবে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সকল ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ যা কিছু নিষেধ করেছেন, ফকীহগণ যা কিছু মাকরুহ বা হারাম বলেছেন তাঁর অধিকাংশই বর্জনের দলিলের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুআমালাত, আদাত, সামাজিক, জাগতিক, প্রাকৃতিক ও উপকরণ জাতীয় কাজকর্মে বর্জন করা নিষেধ বলে গণ্য করার আগে দেখতে হবে বর্জনের সাথে সাথে তাঁর পক্ষ থেকে নিষেধ আছে কিনা বা রাসূলুল্লাহ ﷺ কী পর্যায়ে তা বর্জন করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁর বর্জনকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি : ইচ্ছাকৃত বর্জন, অনিচ্ছাকৃত বর্জন ও কারণবশত বর্জন।

(২). বর্জনের প্রকারভেদ : ইচ্ছাকৃত, কারণবশত ও অনিচ্ছাকৃত

মুসলিম উম্মাহর ফকীহ, আলেম ও সাধারণ সকল মুসলমান একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল কর্মে তাঁর অনুসরণ আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। কোনো কাজ যদি তিনি না করেন তাহলে না করার ক্ষেত্রেও তাঁকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তিনি উম্মতের পরিপূর্ণ আদর্শ এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ অর্থই কর্মে ও বর্জনে তাঁর অনুসরণ। তিনি যা করেননি তা করতে গেলে স্বভাবতই উম্মতের মনে দ্বিধা আসবে, উৎকণ্ঠা আসবে, ভয় হবে যে, তার এই কাজটি ঠিক হচ্ছে কি-না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ না করে থাকতে পারলেন সে কাজ না-করে কি আমি থাকতে পারি-না? যে কাজ না-করে তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না সে কাজ না-করলে আমার ক্ষতি কী? সকল উৎকণ্ঠা ও ভয় থেকে মুক্ত থাকার সহজ পথ হলো তিনি যা করেননি তা করব না। তাহলে আর কোনো যুক্তি, তর্ক, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়তে হবে না।

(ক) ইচ্ছাকৃত বর্জন : প্রয়োজন ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও করেননি

বিশেষ প্রয়োজনে উপকরণ, জনস্বার্থ, জাগতিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ে তিনি করেননি এমন কোনো কাজ করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের উচিৎ বিশেষভাবে দেখা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন কাজটি করেননি। তাঁর না-করার দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথমত, যে কারণে ও প্রয়োজনে আমরা যেই কাজটি করতে চাচ্ছি সেই কারণ ও প্রয়োজন তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল। যে উপকরণে বা পদ্ধতিতে আমরা করতে চাচ্ছি সেই উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহারও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। এই ক্ষেত্রে তাঁর না-করার অর্থ হলো ইচ্ছাকৃত বর্জন করা, এজন্য এক্ষেত্রে বর্জন করাই আমাদের জন্য সুন্নত। ইচ্ছাকৃত বর্জন একটি কর্ম এবং সকল কর্মে তাঁর অনুসরণ উম্মতের আবশ্যকীয় দায়িত্ব। তিনি এভাবে যা বর্জন করেছেন তা করলে খেলাফে-সুন্নাত হবে। মাকরূহ হতে পারে কিংবা হারামও হতে পারে। কারণ, তিনি ইচ্ছাপূর্বক তা বর্জন করেছেন। আমরা কোনো অবস্থাতেই তা করতে পারি না।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুম'আর নামাযের জন্য আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তিনি ইসতিসকার নামায, ঈদের নামায ও কুসুফের নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা করেননি। আযান মুসলমানদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করার উপকরণ। এখন কেউ যদি ঈদের নামায, ইসতিসকার নামায ইত্যাদির জন্য আযানের ব্যবস্থা করতে চান তাহলে কারণ হিসাবে তিনি বলবেন যে, মুসলমানদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করার জন্যই আমি তা করছি। 'দলিল' হিসাবে বলতে পারবেন যে, এ সকল নামায জামাতে আদায় করতে হয় এজন্য মানুষদেরকে ডাকা ও একত্রিত করার জন্য আযানই সর্বোত্তম ও সুন্নাত সম্মত মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা না করলেও জুম'আ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা করেছেন। অন্য নামাযের জন্য আযান দেওয়া নিষেধ করেন নি। সর্বোপরি আযানে বাক্যগুলি ইসলামের সর্বোচ্চ যিক্র। এগুলি বলাতে তো কোন দোষ হতে পারে না। কাজেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপর কিয়াস করে আমরা এ সকল নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা করব।

পাঠক হয়ত এসকল যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশে কবর পূজা, কবরে গম্বুজ, উরস, মীলাদ, কিয়াম, জুলুস ইত্যাদি অগণিত খেলাফে-সুন্নাত কাজের জন্য যে সকল দলিল প্রমাণ পেশ করা হয় সেগুলির তুলনায় এই দলিলগুলি অনেক জোরালো। সুন্নাতকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে সামনে না-রাখলে আমরা এ সকল যুক্তি ও কিয়াস গ্রহণ করতে বাধ্য। বর্জনের সুন্নাতের জন্যই এসকল দলিল মূল্যহীন। আমরা জানি এই প্রয়োজন ও কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে বিদ্যমান ছিল এবং এই উপকরণ বা আযানের ব্যবহারও তাঁরা জানতেন। কিন্তু তিনি এ সকল নামাযের জন্য আযানের ব্যবস্থা করেননি। কাজেই আমরা তা করতে পারি না।

অনুরূপভাবে, তিনি রাত্রে এবং দিনে কোনো কোনো নামাযে জোরে তিলাওয়াত করেছেন এবং অন্য নামাযে তা বর্জন করেছেন। যেসকল নামাযে তিনি জোরে কিরাআত বর্জন করেছেন আমরা সেসকল নামাযে মুক্তাদীদের শোনানো বা নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির অজুহাতে জোরে কিরাআত পড়তে পারি না ; কারণ, আমাদের এসকল কারণ ও প্রয়োজন তাঁর যুগে ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি তা বর্জন করেছেন। এজন্য তাঁর বর্জনই নিষেধাজ্ঞা হিসাবে বিবেচিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে চলাকালীন সময়ে উটের পিঠে বসা অবস্থায় যেদিকে তাঁর গন্তব্য সেদিকে মুখ করেই নফল নামায আদায় করতেন। কিন্তু এভাবে তিনি ফরয নামায আদায় করেননি। ফরয নামায আদায়ের জন্য তিনি যাত্রা থামাতেন। মাটিতে যথারীতি জামাতবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তিনি ফরয নামায আদায় করতেন। এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, শুধু বর্জন। তাঁর বর্জনই নিষেধাজ্ঞা। কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, জামাতের প্রয়োজনে তিনি থেমেছেন অথবা সাওয়ারী থেকে নেমে নামায আদায় উত্তম হিসাবে তিনি নেমেছেন। কাজেই, ফরয নামাযও ইচ্ছেমতো বিনা ওজরে এভাবে যানবাহনে চড়ে যেদিকে খুশি মুখ করে আদায় করা যাবে। আমরা তার সাথে একমত হতে পারব না, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কারণ ও উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা বর্জন করেছেন, কাজেই তাঁর বর্জনই নিষেধ হিসাবে চূড়ান্ত।

বিতরের নামাযের ফযীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অতিরিক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নামায হিসাবে আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি রমযান মাসে মাঝে মাঝে বিতরের নামায জামাতে আদায় করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে জামাতে বিতর আদায় বর্জন করেছেন। কোথাও বিতর নামায জামাতে আদায়ে নিষেধ করেননি। কিন্তু তাঁর বর্জনই নিষেধ। আমরা এখন বিতরের ফযীলত এবং জামাতের ফযীলতের হাদীসের উপর নির্ভর করে সাওয়াব বৃদ্ধি বা পরস্পরে ভালো কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রমযানের বাইরে বিতরের নামায জামাতে আদায় করতে পারব না। করলে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে।

আরাফাতের দিনের ফযীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিনে সকল প্রকার যিক্র দোয়া ও নেক

আমল বেশি বেশি আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ হজ্জে অংশগ্রহণ না করলে আরাফার দিনে ঘরে বা মসজিদে বসে দোয়ার জন্য সমবেত হননি। তাবেয়ীগণের সময়ে কেউ কেউ এই রীতি চালু করলে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কারণ এই কাজের উদ্দেশ্য হলো নেক আমল করা ও দোয়া কবুলের সময়ে দোয়া করা। এই কারণ ও প্রয়োজন তাঁদের যুগে বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা এই কাজ করেননি। কাজেই, কোনো যুক্তি বা কুরআন ও হাদীসের সাধারণ প্রমাণাদি দেখিয়ে আমরা তা করতে পারি না। তাঁদের ইচ্ছাকৃত বর্জনের ফলে তা বর্জন করাই সুন্নাত। ইন্‌শা আল্লাহ, এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

(খ). কারণবশত বর্জন

বর্জনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো কারণবশত বর্জন। কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করতে পারতেন বা করতে পছন্দ করতেন, প্রয়োজন ও উপকরণ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কোনো বিশেষ কারণবশত তিনি তা করেননি। সেক্ষেত্রে বিশেষ কারণটির অবসান হলে তার বর্জন করা কাজটি করা উম্মতের জন্য জায়েয হতে পারে। যেমন, তারাবীহের নামাযের নিয়মিত জামাত তিনি শুধুমাত্র ফরয হওয়ার ভয়ে বর্জন করেছেন, কুরআন কারীম তিনি লিখিয়ে রাখতেন, কিন্তু ওহী নাযিলের ধারা অব্যাহত থাকায় একত্রিত করে সংকলিত করতে পারেননি। এক্ষেত্রে বর্জনের কারণ দূর হলে তা করলে সরাসরি খেলাফে-সুন্নাত হবে না।

কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুব সতর্কতার সাথে মনে রাখতে হবে। **প্রথমত,** কারণটি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক স্পষ্টভাবে বর্ণিত হতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** শুধু সাহাবীগণ -যাঁরা তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গী ছিলেন এবং প্রত্যেক কাজের কারণ ও শিক্ষা সরাসরিভাবে তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন- শুধু তাঁরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্জিত কাজটি কারণ অপসারিত হওয়ার পরেও করা যাবে কি-না তার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যেমন, তারাবীহের জামা'আত যদি সাহাবীগণ পুনরায় চালু না করতেন তাহলে আমরা হাদীসে কারণ বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও একে পুনরায় চালু করতাম না। আমরা জানতাম যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম থেকে বুঝেছেন, ঐ জামাত তাঁর ইন্তেকালের পরেও চালু করার প্রয়োজন নেই। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করতাম।

আমাদের বুঝতে হবে, কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিপূর্ণ অনুসরণই আমাদের নিরাপত্তা। তিনি যা করেছেন তা বর্জন করা যেমন আমাদের জন্য ভয়ের কারণ, তেমনি তিনি যা বর্জন করেছেন তা করাও আমাদের জন্য ভয়ের কারণ। আমরা জানি-না, আমাদের এই প্রয়োজন, উদ্ভাবন বা ইজতিহাদ আল্লাহ কবুল করবেন কি-না। আমাদের উচিত নয় নিজেদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণের স্থানে কল্পনা করা। একটি উদাহরণ দেখুন :

: ﷺ

ﷺ

.

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় (সাহাবীগণকে নিয়ে উমরা পালনের জন্য) আসলেন তখন মক্কার মুশরিকগণ বলল : দেখবে, ইয়াসরিবের (মদীনার) জ্বর তাঁদেরকে কাহিল করে ফেলেছে। তখন নবীজী ﷺ সাহাবীগণকে মৃদু দৌড়ে দৌড়ে প্রথম তিন চক্কর তাওয়াফ আদায় করতে বললেন, আরো বললেন যে, রুকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদের মাঝের স্থানে তাঁরা হাটবেন। তিনি শুধুমাত্র সাহাবীগণের কষ্ট হবে দেখে পুরো ৭ চক্কর তাঁদের দৌড়াতে নির্দেশ দেননি।"[১]

এখানে লক্ষণীয় যে, হজ্বের ইবাদতের অংশ হচ্ছে কাবা ঘর তাওয়াফ করা। হেঁটে, দৌড়ে বা কোনো যানবাহনে চড়ে, যে কোনোভাবে কাবা ঘরের চারিদিকে তাওয়াফ করলেই তাওয়াফের ইবাদত আদায় হবে। তাহলে হাঁটা বা দৌড়ান আনুষঙ্গিক পদ্ধতি, ইবাদতের মাকসূদ বা উদ্দেশ্য নয়। তা সত্ত্বেও যেহেতু ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট তাই সেক্ষেত্রেও হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের অনুসরণ আমাদের করতে হবে। কোনো কারণ বা যুক্তির আলোকে তাঁর কর্মকে বর্জন করা যাবে না বা তাঁর বর্জন করা কাজ করা যাবে না।

উপরের হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বিশেষ কারণে তাঁদেরকে তাওয়াফের মধ্যে দৌড়াতে বলেন, তা হলো মুশরিকগণকে মুসলমানদের সুস্থতা দেখানো। এই কারণটি এখন আর বিদ্যমান নেই, কিন্তু সেজন্য আমরা তাঁর করা কাজটি বর্জন করতে পারি না। অপরদিকে তিনি শেষের ৪ চক্করে দৌড়ান বর্জন করেন একটি বিশেষ কারণে, তা হলো সাহাবীদের তাকলীফ হওয়ার ভয়। এই কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে না। অনেক মুসলমান একভাবে দৌড়ে বিনা ক্লান্তিতে ২১ বারও তাওয়াফ করতে পারবেন। কিন্তু সে জন্য তিনি কখনই বলতে পারবেন না যে, যেহেতু কারণ বিদ্যমান নেই সেহেতু আমার জন্য সবগুলি চক্করই দৌড়ে দৌড়ে আদায় করাই উত্তম।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে তো বটেই, ইবাদতের আনুষঙ্গিক পদ্ধতি বা উপকরণের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে কর্মে ও বর্জনে হুবহু রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ করতে হবে। অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো কর্মের বা বর্জনের অথবা আদেশ ও নিষেধের কোনো কারণ বর্ণনার অর্থ এই নয় যে, উক্ত কারণ না থাকলে উক্ত কাজ করা বা বর্জন করা আমাদের জন্য জায়েয হয়ে যাবে। কাজটি করা বা বর্জন করার বিধান সর্বদা তাঁর নির্দেশনা ও কর্ম ও বর্জনের উপরে নির্ভর করবে। সাহাবীগণের সুন্নাত এসকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে সুন্নাতে নববী বুঝতে সাহায্য করবে।

(গ). অনিচ্ছাকৃত বর্জন : প্রয়োজন বা উপকরণ ছিল না

যদি এধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি, কারণ তাঁর যুগে এর উপকরণ বিদ্যমান ছিল না। অথবা যে প্রয়োজন বা কারণে কাজটি করা হচ্ছে তা তাঁর যুগে বিদ্যমান ছিল না তাহলে সেই কাজটিকে সরাসরি খেলাফে-সুন্নাত বলা যাবে না। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত ও শিক্ষার আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজটির বিধান নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্যই এই ইজতিহাদ শুধুমাত্র যাঁদের ইজতিহাদের যোগ্যতা আছে তাঁরাই করবেন।

যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো হাম্মাম বা 'পাবলিক গোসলখানা' ব্যবহার করেননি। কারণ তাঁর যুগে তাঁর সমাজে এধরনের গোসলখানা ছিল না এবং সমাজের মানুষেরা এর ব্যবহারও জানত না। পরবর্তী যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রসারের পরে এগুলির উদ্ভব হয় এবং সাহাবায়ে কেরাম, তবেয়ীন ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এগুলির বিধান প্রদান করেন। কেউ এগুলি না-জায়েয, মাকরুহ বা হারাম হওয়ার দলিল হিসাবে বলতে পারেন-না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো হাম্মাম ব্যবহার করেননি। কারণ বিষয়টিই নতুন, পরবর্তী যুগে উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক যুগে উদ্ভাবিত মাইক, টেলিফোন, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, বিমান ইত্যাদি সকল বিষয়ই এইরূপ। এসকল বিষয়ে সুন্নাত বা শরীয়তের আলোকে বিধান প্রদান করতে হবে।

এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য, পানীয়, ফলমূল, ফসলাদি, পোশাক, যানবাহন, আবাসগৃহ রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে হেজাজে বা আরবে ছিল না, অন্য দেশে ছিল অথবা পরবর্তী যুগের মানুষেরা উদ্ভাবন করেছে। এগুলি ক্ষেত্রেও একই বিধান। একথা বলা যায় না যে, এগুলি মাকরুহ কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্জন করেছেন। বরং তাঁর সুন্নাতের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলির বিধান নির্ধারণ করবেন মুজতাহিদগণ। তবে এসকল ক্ষেত্রেও যদি কোনো সুন্নাত-প্রেমিক সুন্নী মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে কোনো মুসলমান যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানাননি। আবু বকরের (রা) সময়ে কিছু মানুষ এই অপরাধে লিপ্ত হয়। তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের বিদ্রোহ দমন করেন। এক্ষেত্রে কেউ বলতে পারবেন-না যে, আবু বকর (রা) খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি তিনি তা-ই করেছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এই কারণটি বিদ্যমান ছিল না, কাজেই আমরা বলতে পারছি না যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ বর্জন করেছেন ; অতএব, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা খেলাফে-সুন্নাত হবে। যেহেতু বিষয়টি নতুন, সেহেতু এখানে সুন্নাতের আলোকে ইজতিহাদ করতে হবে। আর ইজতিহাদের সর্বোচ্চ যোগ্যতা খুলাফায়ে রাশেদীনের। তাঁদের ইজতিহাদী কর্মও পরবর্তী উম্মাতের জন্য সুন্নাত।

কুরআন সংকলন, হাদীস সংকলন, কুরআন ও হাদীসের সঠিক ও সুন্নাত মানের জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ জাতীয় শাস্ত্রের বা পদ্ধতির উদ্ভাবন, সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, জনগণের উন্নত জীবনধারা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাগণের সুন্নাতের আলোকে এসকল ক্ষেত্রে আমরা নব প্রয়োজনে নব পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারব।

(৩). অনিচ্ছাকৃত বর্জন জাগতিক বা উপকরণের ক্ষেত্রেই হতে পারে

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, এই প্রকারের অনিচ্ছাকৃত বর্জন শুধুমাত্র মুআমালাত অর্থাৎ জাগতিক, জনস্বার্থগত, রাষ্ট্রীয়, বিচার বিভাগীয় বা ইবাদত পালনের উপকরণ জাতীয় কাজের মধ্যে হতে পারে। মূল ইবাদতের ক্ষেত্রে কখনোই এ ধরনের বিষয় কল্পনা করা যায় না। ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো চিন্তা, কাজ, পদ্ধতি বা রীতি মহান আল্লাহর পছন্দ, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগে বা তাঁর সমাজে না থাকার জন্য তা পালন করতে পারেন নি বা কামালাতের এই মর্যাদাটুকু অর্জন না করেই তিনি ও তাঁর মহান সাহাবীগণ চলে গিয়েছেন একথা কোন মুসলিমই কল্পনা করতে পারে না।

ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব অর্জন। এই উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে পরিপূর্ণরূপেই ছিল এবং তা অর্জনের পরিপূর্ণ আদর্শ তিনিই। আমরা কল্পনা করতে পারি-না যে, আল্লাহ কোনো ইবাদত পছন্দ করেন, কিন্তু তা পালন করার সুযোগ তাঁর হাবীবকে প্রদান করেননি। সকল যুগের সকল জাতির সকল মানুষের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সর্বোত্তম কর্ম, পদ্ধতি ও রীতি তিনি পালন করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণ পালন করেছেন। আর এজন্যই ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি যা করেন নি তা সবই ইচ্ছাকৃত বর্জন ও উম্মতের জন্য বর্জনীয়। এক্ষেত্রে "অনিচ্ছাকৃত বর্জন" অকল্পনীয়।

ইবাদত পালনের আনুষঙ্গিক উপকরণের ক্ষেত্রেও সকল বর্জনকে যথাসম্ভব "ইচ্ছাকৃত বর্জন" বলেই গণ্য করতে হবে এবং উপকরণ বা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনকে হুবহু অনুসরণ করতে হবে। একটি উদাহরণ দেখি। আয়েশা (রা.) বলেন :

ﷺ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুদ্দ (প্রায় পৌনে এক কেজি) পানি দিয়ে ওযু করতেন এবং প্রায় এক সা' (প্রায় তিন কেজি) পানি দিয়ে গোসল করতেন।"[১]

ওযু ও গোসলের ক্ষেত্রে এটিই তাঁর সুন্নাত বা নিয়ম ও পদ্ধতি। ওযু মূলত নামায বা ইবাদত আদায়ের উপকরণ আর পানি ওযুর উপকরণ মাত্র। পানির পরিমাণ ইবাদতের অংশ নয়, একান্তই উপকরণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানের দায়িত্ব হলো এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা।

তিনি এর চেয়ে বেশি পানি ব্যবহার বর্জন করেছেন। এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, শুধু বর্জন। তাঁর এই বর্জনকে

"অনিচ্ছাকৃত বা কারণবশত বর্জন" হিসাবে গণ্য না করে "ইচ্ছাকৃত" বর্জন হিসাবে গণ্য করে তিনি যা বর্জন করেছেন তা সাধ্যমত বর্জন করাই মুমিনের দায়িত্ব। আমরা কোনো কারণ, যুক্তি বা ওজুহাত দেখিয়ে তাঁর সুন্নাতের বাইরে রীতি তৈরি করতে পরি না, কারণ তা খেলাফে-সুন্নাত হবে। আমরা বলতে পারি-না যে, তাঁর যুগে যেহেতু পানি কম ছিল, অন্যদের পানির প্রয়োজন হতো, বা অন্য অনেক কাজে পানির প্রয়োজন ছিল এজন্য তিনি কম পানি ব্যবহার করতেন, আমরা সর্বদা ২ লিটার পানি দিয়ে ওযু করব এবং ৫ লিটার পানি দিয়ে গোসল করব, তাহলে গোসলে পূর্ণতা আসবে এবং সাওয়াব বেশি হবে।

ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কারণে কারো কর্ম খেলাফে-সুন্নাত হতে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁর চেষ্টা করতে হবে সুন্নাতের-বাইরে-যাওয়া যতটুকু বর্জন করা যায়। আর যদি কেউ খেলাফে-সুন্নাতকেই তাঁর রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন অর্থাৎ সর্বদা বেশি পানি দিয়ে ওযু গোসল করতে থাকেন বা খেলাফে- সুন্নাতকে তাকওয়া, সাওয়াব ও বরকতের জন্য বেশি উপকারী মনে করেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে-অপছন্দ-করার পর্যায়ে চলে যাবেন।[১]

(৪). তিনি যা করেননি তা করলে তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা হয়

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ যতটুকু করেছেন ততটুকু করা এবং যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেই তিনি নিজে তাঁর সুন্নাত বলে জানিয়েছেন। সাওয়াবের কাজ করার ক্ষেত্রে তিনি যা বর্জন করেছেন বা যে পদ্ধতি বর্জন করেছেন তা করলে তাঁর সুন্নাত বা রীতিকে অবমাননা করা হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতির অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রমভাবে তাহাজ্জুদ আদায়, নফল রোযা পালন, সংসার ত্যাগ, দুনিয়ার বিলাসিতা বর্জনও তিনি নিষেধ করেছেন এবং এতে তাঁর সুন্নত অপছন্দ করা হয় বলে নিন্দা করেছেন। অপর দিকে জাগতিক বা প্রাকৃতিক কাজের ক্ষেত্রে এভাবে নিষেধ করেন নি। তার পদ্ধতির ব্যতিক্রম ভাবে চাষাবাদ করলে, চিকিৎসা করলে, বাড়ি বানালে, যানবাহন ব্যবহার করলে বা খাদ্য গ্রহণ করলে "তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা হবে" বলে তিনি জানান নি। এর কারণ হলো ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতের অতিরিক্ত বা ব্যতিক্রমভাবে যা কিছু করা হয় সবই সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য করা হয়। আর সাওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে তিনিই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। এক্ষেত্রে তিনি যা করেন নি তা করার অর্থই হলো তাঁর আদর্শ অপছন্দ করা।

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের কাজের অতিরিক্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন এবং এ ধরনের কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হবে না বলে জানিয়েছেন। স্বভাবতই এক্ষেত্রে নেক কাজের কথাই বলা হয়েছে। কারণ, পাপ কর্ম করে আল্লাহর নিকট সাওয়াব পাওয়া যায় না বা আল্লাহ কবুল করেন-না, তা সকলেই জানে। অনুরূপভাবে, জাগতিক ও প্রাকৃতিক কর্ম কেউ বিশেষ সাওয়াব বা কবুলিয়াতের জন্য উদ্ভাবন করে না। কাজেই, এ সকল হাদীসের একটিই অর্থ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যে নেক কর্ম করেননি তা করলে আল্লাহ কবুল করবেন না বা সাওয়াব হবে না। এরপরও যদি আমরা মনে করি যে, তিনি যা করেননি তা ইচ্ছেমত, প্রয়োজনে বা বিনা প্রয়োজনে করার বা তাকে মুস্তাহাব বানানোর অধিকার আমাদের আছে তাহলে এ সকল হাদীসের কি কোনো মূল্য থাকবে?

(৫). রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি আমরা কেন তা পছন্দ করব ?

আমরা নিজেদেরকে একটি প্রশ্ন করি : রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ করেননি তা আমরা কেন করব? আখেরাতের প্রয়োজনে না দুনিয়ার প্রয়োজনে? তিনি যা করেছেন শুধু তা করেই কি আমরা আখেরাতে মুক্তি পেতে পারব না? তিনি যা করেছেন কেউ যদি শুধুমাত্র সেগুলিই করে তাহলে কি তাঁর পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় ? শুধুমাত্র তাঁর অনুসরণ করে কি আখেরাতের সর্বোচ্চ নেয়ামত লাভ করা সম্ভব নয়? যদি সম্ভব হয় তাহলে আর আমাদের কষ্ট করার দরকার কি?

আরেকটি প্রশ্ন আমাদের নিষ্পত্তি করতে হবে। ধর্ম পালনে, সাওয়াব ও বরকত অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম আদর্শ কি-না? কেউ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের দিকে না তাকিয়ে কুরআন ও হাদীসের সাধারণ আয়াত ও নির্দেশনার আলোকে যুগে যুগে নতুন নতুন ইবাদত ও ইবাদত-পদ্ধতি আবিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহলে কি তিনি প্রকারান্তে এ কথাই বলছেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজ জীবনে ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ নন, তিনি শুধুমাত্র কথা ও নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের মূলনীতি আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন ? এটাই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপছন্দ করা ও তাঁর উম্মতের মধ্যথেকে বের হয়ে যাওয়ার পর্যায় নয় ? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শুধুমাত্র সুন্নাতকে ভালবাসার ও সুন্নাতের মধ্যে জীবন কাটানোর তাওফীক দান করেন ; আমীন।

বর্জনের সুন্নাত ও আমাদের বৈপরীত্য

(১). বর্জনের সুন্নাতের বিষয়ে বাহ্যিক ইজমা

মুসলিম উম্মাহর সম্মানিত আলেমগণের কর্মকাণ্ড ও মতামত থেকে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোনো কাজ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ না করেন তাহলে না-করাটাই সুন্নাত হয়ে গেল, করা হবে খেলাফে-সুন্নাত। এই খেলাফে সুন্নাত কাজটি জায়েয না না-জায়েয সেটি দ্বিতীয় প্রশ্ন। তিনি যদি কোনো পোশাক পরিধান করেন, কোনো পোশাক বিশেষ পদ্ধতিতে পরিধান করেন, কোনো খাদ্য গ্রহণ করেন, কোনো খাদ্য বিশেষ পদ্ধতিতে গ্রহণ করেন তাহলে তা তাঁর সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। সুন্নাতের

খেলাফ কর্ম বা পদ্ধতি জায়েয কি-না তা অন্য প্রশ্ন। অনুরূপভাবে তিনি ইবাদত, বন্দেগি, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিক্র, দরুদ, সালাম, জিহাদ, তাবলীগ, ইশা'আত, তা'লীম, তরিকত, তাসাউফ ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে কর্ম যতটুকু ও যেভাবে করেছেন তা-ই সুন্নাত। সুন্নাতের বাইরে কোনো কর্ম জায়েয কি-না তা ভিন্ন প্রশ্ন। আমাদের উদ্দেশ্য হলো যথাসাধ্য আমাদের সকল কর্ম সুন্নাত পরিমাণে ও সুন্নাত পদ্ধতিতে আদায় করা। একান্ত বাধ্য না হলে কোনো অবস্থাতেই সুন্নাতের বাইরে কোনো ধরনের কাজ না-করা। অন্তত এ বিষয়ে কারো কোনো মতবিরোধ থাকার কথা নয়। সকল কর্মে সুন্নাতের মধ্যে অবস্থানই যে উত্তম, সে বিষয়ে কোনো মুসলমানের সামান্যতম দ্বিধা বা মতবিরোধ থাকবে না, এটাই তো ঈমানের ন্যূনতম দাবি।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা একেবারেই ভিন্ন মনে হয়। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, অনেক ধার্মিক মুসলিম পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত পুরোপুরি মানতে চান। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি যা করেননি তা করতে তাঁরা রাজি নন। এ ক্ষেত্রে তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেই তাঁরা সুন্নাত বলে মনে করেন। কিন্তু ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। এসকল ক্ষেত্রে তিনি যা করেননি বা বর্জন করেছেন তা করতে ও নতুন নতুন পদ্ধতি পালনে তাঁরা খুবই আগ্রহী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর টুপি, পাগড়ি, পোশাক ইত্যাদির খুঁটিনাটি পদ্ধতি ও প্রকার সম্পর্কে অনেকে জানতে চান। যেন হুবহু তাঁর অনুকরণ করা যায় এবং তিনি যা করেননি তা না-করতে হয়। কিন্তু তিনি কী পদ্ধতিতে তিলাওয়াত, যিক্র ইত্যাদি করতেন, তাবলীগ করতেন, দাওয়াত দিতেন, মীলাদ পালন করতেন, দরুদ-সালাম পাঠ করতেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন, তাসাউফ, মুরাকাবা, রিয়াযাত, জিহাদ, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি করেতন সে সম্পর্কে কেউই প্রশ্ন করেন না। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুবহু অনুকরণের আগ্রহ দেখা যায় না। এ সকল ক্ষেত্রে তিনি যা করেননি অধিকাংশ মুসলিম তাই করছেন।

আমি এখানে এ ধরনের কিছু বৈপরীত্যের উদাহরণ পেশ করছি।

(২). বর্জনের সুন্নাত ও আমাদের অদ্ভুত বৈপরীত্য

আমরা দেখেছি যে, বর্জনের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত দুটি পর্যায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা ইচ্ছাকৃত বর্জন করেছেন তা বর্জন করা উম্মতের জন্য জরুরি। অপরদিকে তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে, তাঁর যুগে না থাকার কারণে যেসকল জাগতিক বা উপকরণ জাতীয় বিষয় করেননি তা প্রয়োজনে তাঁর সুন্নাতের আলোকে করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখা যায়।

(ক). মেসওয়াক বনাম যিক্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি নিজেও সর্বদা দাঁত ও মুখ পরিষ্কার রাখতেন। এজন্য তিনি 'মেসওয়াক' ব্যবহার করতেন। মেসওয়াক শব্দের অর্থ দাঁত পরিষ্কার করার যন্ত্র। তবে ব্যবহারিকভাবে গাছের ডাল বা টুকরা বোঝানো হয়, যা দিয়ে তৎকালীন মানুষেরা দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করতেন। আমরা স্বভাবতই বুঝতে পারি যে, এখানে ইবাদত হলো মুখের দুর্গন্ধ দূর করা এবং দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা। 'মেসওয়াক' এই ইবাদতটি পালনের মাধ্যম মাত্র। যদি মেসওয়াক ব্যবহার করেও মুখে দুর্গন্ধ ও দাঁতে ময়লা থেকে যায় তাহলে ইবাদত পূর্ণতা পাবে না। আর যদি 'মেসওয়াক' ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য পালিত হয়, তাহলে ইবাদতের সাওয়াব কম হবে না বলেই বুঝা যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট প্রচলিত ছিল না, কাজেই তিনি তা ব্যবহার করেননি। একে কোনো অবস্থাতেই ইচ্ছাকৃত বর্জন বলা যায় না। আমরা বলতে পারি যে, ব্রাশ ও পেস্ট দ্বারা মুখ ও দাঁত পরিষ্কার হলে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হলে মেসওয়াক ব্যবহারে পূর্ণ সাওয়াবই পাওয়া যাবে এবং এগুলি ব্যবহার খেলাফে-সুন্নাত হবে না। তা সত্ত্বেও অনেক ধার্মিক মুসলমান দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করার উপকরণ হিসাবে মেসওয়াকই ব্যবহার করতে চান। সুন্নাতের মহব্বতই তাঁদেরকে এই উপকরণের পরিবর্তন থেকে বিরত রাখে। ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণেও সুন্নাতের অনুসরণের আগ্রহ প্রশংসনীয়, যদিও ব্রাশ ও পেস্ট ব্যবহারকে কোনো অবস্থাতেই খেলাফে-সুন্নাত বলা যায় না।

কিন্তু একই ব্যক্তিকে যখন দেখতে পাই যে, বিভিন্ন মূল ইবাদতে তিনি সুন্নাতকে পরিত্যাগ করছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছাপূর্বক যা বর্জন করেছেন তা তিনি করছেন তখন আশ্চার্য না হয়ে আমরা পারি না। এই ব্যক্তিকেই হয়ত দেখবেন 'আল্লাহ' শব্দে বা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে যিক্র করছেন। হয়ত সকালে সন্ধ্যায় সমস্বরে জোরে জোরে যিক্র করছেন। তিনি কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত, বিভিন্ন হাদীস বা আরবি ভাষার বিভিন্ন নিয়মকানুনের উপর নির্ভর করে এসকল ইবাদত বা ইবাদত পদ্ধতি জায়েয বলছেন। কিন্তু কোনো সময়েই তিনি বলছেন-না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ নিয়মিত বা মাঝে মাঝে 'আল্লাহ' শব্দে বা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে যিক্র করতেন বা এই শব্দে যিক্র করলে বিশেষ সাওয়াব হবে বলে বলেছেন। তিনি একথা স্বীকার করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সকালে সন্ধ্যায় আমাদের মতো বসে সমস্বরে জোরে জোরে যিক্র করতেন বলে কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

তিনি স্বভাবতই এগুলিকে ইবাদত হিসাবে পালন করছেন। সাওয়াব ও বরকত অর্জনের মাধ্যম মনে করছেন। কিন্তু যিক্রের ফযীলত ও সাওয়াব অর্জনের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের। আমরা যেসকল প্রমাণাদি পেশ করছি তা তাঁদের জানা ছিল এবং এভাবে যিক্র করা তাঁদের জন্য সম্ভব ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তা করেননি। অর্থাৎ, তাঁরা তা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন। এখন দুটি বিষয় তুলনা করুন, –

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অনিচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন আমরা সুন্নাতের মহব্বতে তা বর্জন করছি, অথচ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে যা বর্জন করেছেন তা আমরা পালন করছি।

দ্বিতীয়ত, আমরা জাগতিক উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত বর্জন করছি, কিন্তু মূল ইবাদতের মধ্যে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করছি।

তৃতীয়ত, যে ব্যক্তি ব্রাশ বা পেস্ট ব্যবহার করেন, তিনি সাধারণত মনে করেন-না যে, মেসওয়াকের বদলে ব্রাশ ও পেস্ট ব্যবহার বেশি সাওয়াবের কাজ, অথবা পেস্ট-ব্রাশ ত্যাগ করে মেসওয়াক ব্যবহার করলে তাঁর সাওয়াব ও বরকত কম হবে। তিনি সাধারণত হাতের কাছে পান বলে অথবা মুখের দুর্গন্ধ ভালোভাবে দূর করার প্রয়োজনে তা ব্যবহার করেন। কিন্তু যিনি যিক্‌রের মধ্যে খেলাফে-সুন্নাত শব্দ বা পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তিনি সাধারণত মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিক্‌র করতেন অবিকল সেই শব্দে ও সেই পদ্ধতিতে যিক্‌র করলে সাওয়াব, বরকত বা রূহানী উন্নতী কম হবে এবং এ সকল নতুন শব্দে বা পদ্ধতিতে যিক্‌র করলে তাঁর সাওয়াব ও বরকত বেশি হবে। তা না হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের অতিরিক্ত কিছু করার প্রয়োজন কোথায়?

(খ). একটি শব্দ বনাম অর্ধেক বাক্য :

ঈদের সময়ে তাকবীর পাঠের জন্য হাদীস শরীফে বিভিন্ন বাক্য বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম ও প্রসিদ্ধতম বাক্য হলো : "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।" এখানে দুটি বাক্যের মাঝে একটি 'ওয়া' বা 'এবং' শব্দ আছে। কোনো কোনো আলেমকে দেখেছি এই 'ওয়া' শব্দটি ভুলে বা বে-খেয়ালে উচ্চারণ না করলে তিনি খুবই রাগ করেন, কারণ তাকবীরের সহীহ বর্ণনায় 'ওয়া'-সহ বর্ণিত হয়েছে। দোয়া ও যিক্‌রের ক্ষেত্রে এভাবেই সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর্তব্য।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি এই বুজুর্গ ব্যক্তিই অন্যত্র যিক্‌রের সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যের অর্ধেক ফেলে দিয়ে শুধু 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে যিক্‌র করছেন, অথচ সকল বর্ণনায় এই যিক্‌রটি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কখনো কোনো বর্ণনায় অর্ধেক বাদ দেওয়া হয়নি।

সুবহানাল্লাহু! কয়েকটি বাক্যের মধ্যে একটি শব্দ বাদ দিতে রাজি হলেন না, অথচ ছোট্ট একটি বাক্যের অর্ধেক বাদ দিলেন। যে ব্যাকরণের নিয়মে তিনি এই বাক্যের অর্ধাংশ বাদ দিলেন সেই ব্যাকরণের অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ নিয়মে দুটি শব্দ বা দুটি বাক্যের মধ্য থেকে (ওয়া) বাদ দেওয়া যায়। কুরআন কারীমে অনেক উদাহরণ আছে। কেন সুন্নাতের মুহাব্বতে প্রথম ক্ষেত্রে ব্যাকরণের এত মশহুর নিয়মের দিকে লক্ষ্য করলেন না, অথচ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপ্রসিদ্ধ একটি নিয়ম খুঁজে বের করে তার ওসীলায় মানসূন একটি যিক্‌রকে ভেঙ্গে দু' টুকরো করে অর্ধেক বাদ দিলেন তা জানি না।

(গ). ভাষা, খাদ্য, মাইক ও পোশাক বনাম মীলাদ, কুলখানী বা তাবলীগ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ভাষা সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহত্বের নিদর্শন হিসাবে। সকল ভাষাই তাঁর সৃষ্টি ও ইসলামের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদার। শুধুমাত্র কুরআনের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষা হিসাবে আরবি ভাষার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে মুসলিম মানসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফারসি, বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় কথা বলেননি, কারণ তাঁর সমাজে এসকল ভাষা ছিল না। তা সত্ত্বেও আমরা অনেকে বাংলা বা ইংরেজি ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহার করতে চাই না, ইসলামী সংস্কৃতির বাইরে মনে করি। যেমন, বাংলা মাংস না বলে ফারসি (আরবি নয়) গোশ্‌ত বলা, বাংলা লবণ না বলে ফারসি নেমক (আরবি নয়) বলা উত্তম মনে করি।

জুম'আর দিনে ও দুই ঈদের দিনে খুত্‌বার মাধ্যমে সমবেত মুসল্লীগণকে নসীহত করা, উপদেশ প্রদান করা একটি ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এই ইবাদত পালনে আরবি ভাষা ব্যবহার করেছেন, কারণ তাঁরা অন্য ভাষা জানতেন না। অন্য ভাষার কোনো প্রয়োজনও ছিল-না, কারণ অনারব মুসলমানও আরবি বুঝতেন। তাবেয়ীদের যুগ থেকে ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য অনেক ইমাম ও ফকীহ প্রয়োজনে অনারব ভাষায় খুত্‌বা ইত্যাদি প্রদানের অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের দেশে আমরা আরবি জানি-না ও বুঝি-না। তা সত্ত্বেও যেহেতু খুত্‌বা প্রদানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ অনারব ভাষা বর্জন করেছেন, সেহেতু আমরা অনাবর ভাষায় খুত্‌বা প্রদানকে বর্জন করতে চাই এবং শুধুমাত্র আরবি ভাষার ব্যবহার পছন্দ করি।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া, ছোট পাঞ্জাবী, সেলাই করা লুঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন পোশাক ব্যবহার করেননি, কারণ তা তাঁর যুগে ছিল না। আমরা এসকল বিষয়ে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ ভালবাসি ও তিনি যা পরিধান করেননি তা করতে আপত্তি করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে বা আযানে মাইক ব্যবহার করেননি, কারণ তা তাঁর যুগে ছিল না। তবে তাঁর যুগে ও পরবর্তী যুগে আযানের শব্দ দূরে প্রেরণের জন্য মসজিদের বাইরে, ঘরের ছাদে, মিনারার উপরে আযানের ব্যবস্থা ছিল। নামাযের সময় প্রয়োজনে মুকাব্বির ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান যুগে অনেক দ্বীনদার মুসলিম মাইক ব্যবহার করতে আপত্তি করেন, যদিও অনেক সময় মাইক ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমনি অনেকে বিশাল জামাতের জুম'আর খুত্‌বাতেও মাইক ব্যবহার করেন না, যদিও জুম'আর খুত্‌বার মূল উদ্দেশ্যই হলো যে, মুসল্লীগণকে তা শোনাতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহার করেননি তাই আমাদের এই দ্বিধা।

আরবের নিয়ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ এক খাঞ্চায় অনেকে বসে খেয়েছেন। আমাদের দেশের মতো ভাত-তরকারি খাওয়া বা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক প্লেটে খাওয়ার প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল না, এজন্য তিনি এভাবে খাওয়া দাওয়া করেননি। অনেক ধার্মিক মানুষ এ সকল বিষয়ে অবিকল তাঁর অনুসরণ করতে চান। সুন্নাতের এই মহব্বত প্রশংসনীয়। কিন্তু যখন দেখি যে এসকল নেককার মানুষ অন্য অনেক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা ইচ্ছেকরে বর্জন করেছেন তা করছেন, তখন অবাক হতে হয়।

আমরা অনেকে মৃতব্যক্তির দোয়ার জন্য ৩ দিন, ৭ দিন, ৪০ দিন বা মৃত্যুদিন দোওয়ার মাহফিল, ইসালে সাওয়াব, কুলখানী ইত্যাদি অনুষ্ঠান করি। উদ্দেশ্য হলো তাঁদের জন্য দোয়া করা ও সাওয়াব প্রেরণ করা। মৃতের জন্য দোয়া করতে ও দান করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই নির্দেশ প্রদান করেছেন। মৃত ব্যক্তির উপকার করা ও তাঁদের জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বোত্তম আদর্শ

বলে আমরা মনে করি। তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে হাজারো মানুষ ইন্তিকাল করেছেন, তাঁরা তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন, দান করেছেন, কবর যিয়ারত করেছেন। কিন্তু কখনো তাঁরা দোয়ার জন্য অনুষ্ঠান করেননি। আমরা যে প্রয়োজনে তা করি সেই প্রয়োজন তাঁদের ছিল এবং যেভাবে দোওয়ার অনুষ্ঠান করি সেভাবে তা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা তা করেননি। অর্থাৎ, তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক তা বর্জন করেছেন। অথচ আমরা অনেক ধার্মিক মানুষ, যারা ভাষা, পোশাক, খাবার ইত্যাদি জাগতিক ক্ষেত্রে তাঁর অনিচ্ছাকৃত বর্জন করা কাজকে বর্জন করি, তাঁরাই আবার এক্ষেত্রে খেলাফে সুন্নাত কাজ করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন, ওয়াজ নসীহত করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বংশ, মর্যাদা, জন্ম, জীবনী, আকৃতি, প্রকৃতি আলোচনা করতেন। কিন্তু তাঁরা কখনই সেটা মীলাদ নামে করেননি বা কখনো তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন উদ্‌যাপন করেননি। আমরা এসকল কাজ 'মীলাদ' নামে করি। আমরা যে প্রয়োজনে তা করি এই প্রয়োজন তাঁদের ছিল এবং আমরা যেভাবে করি সেভাবে করতে তাঁদের কোনো বাঁধা ছিল না। আমরা স্বীকার করি যে, তাঁরা মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করেননি, কিন্তু যেহেতু এতে সব ভালো কাজ করা হয় সেহেতু তা বিদ'আতে হাসানা। কিন্তু সমস্যা হলো, যে নেককার মানুষটি পোশাক, ভাষা বা খাদ্য গ্রহণের জাগতিক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত মতো চলতে চান, তিনি কেন এসকল ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে করেন না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য তাঁদের জীবন কাটিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁরা দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। এজন্য তাঁরা অনেকেই স্থায়ীভাবে হিজরত করে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে গিয়েছেন। অনেকে ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো এজন্য ৪০ দিন, ৫০দিন, ২ মাস, ৪ মাস, ১ বৎসর, ২ বৎসর বা কোনোভাবে কোনোরূপ নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে বের হননি। দ্বীন শিক্ষা করা ও দ্বীন শিক্ষা প্রদানের ইবাদত পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি মেনে চলেননি। অনেকে আবার জীবনেও হজ্ব-উমরা ছাড়া নিজদেশ থেকে কোথাও বের হননি। নিজের দেশে বসেই ইল্‌ম শিক্ষা করা, শিক্ষা প্রদান করা, দ্বীনের প্রচার ও তাবলীগের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করেছেন। ইমাম মালেক জীবনেও হজ্ব উমরা ছাড়া নিজ শহর মদীনা শরীফ ছেড়ে বের হননি। আবার ইমাম শাফেয়ী বিভিন্ন দেশে ঘুরে ইল্‌ম শিখেছেন এবং শেষ জীবনে হিজরত করে স্থায়িভবে মিসরে গিয়ে ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন। এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। কেউ কখনো ঘুণাক্ষরে কল্পনা করেননি যে, যিনি নিজ দেশে বসে দ্বীন শিখেছেন, শিখিয়েছেন বা দাওয়াতের কাজ করেছেন তাঁর কাজ অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। ইবাদত হলো ইল্‌ম শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, প্রচার করা, সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। এগুলি মধ্যেই ফযীলত ও সাওয়াব। এগুলি যে যতটুক করবেন ততটুকু সাওয়াব পাবেন। দেশে বা বিদেশের জন্য সাওয়াব বেশি-কম হবে এ চিন্তাও খেলাফে-সুন্নাত।

বর্তমানে অনেক ধার্মিক মানুষ দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য খেলাফে-সুন্নাতভাবে বিভিন্ন নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ করে নিয়েছেন। অনেকে এই সময় ও পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ সাওয়াব আছে বলেও মনে করছেন। অথচ ঠিক এই পদ্ধতিতে বা এভাবে সময় নির্ধারণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনোই দাওয়াত ও তাবলীগ করেননি, যদিও পরিপূর্ণ দাওয়াতের আগ্রহ তাঁদের ছিল এবং এভাবে সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে তাঁদের কোনো বাধা ছিল না। অর্থাৎ, এই পদ্ধতি তাঁরা ইচ্ছাকরে বর্জন করেছেন। প্রশ্ন হলো যে বুজুর্গ মানুষটি খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি, পোশাক পরিচ্ছদ, ভাষা বা মাইক ব্যবহারের মতো জাগতিক বিষয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনিচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করা কাজ করতে চান না, তিনি কেন দাওয়াতের মতো একটি ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন তা করছেন ? অবিকল সাহাবীগণের পদ্ধতিতে করাই কি তাঁর জন্য উত্তম নয় ?

এভাবে আমরা দেখছি যে, অনেক বুজুর্গ টুপি, পাগড়ি, রুমাল, জামা, পানাহার, ঘুম ইত্যাদি সকল জাগতিক কর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চান। তাহলে যিক্‌র, মীলাদ, কিয়াম, তাবলীগ, দাওয়াত, জানাযা, যিয়ারত, কুলখানী, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি ইবাদত অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতিতে করব-না কেন? ঠিক যে সময়ে যে শব্দে যেভাবে তিনি যিক্‌র করেছেন সেভাবেই আমরা করব। ঠিক যে শব্দে, যে ভাষায় ও যেভাবে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ মীলাদ কিয়াম করেছেন, সেভাবেই আমরা করব। ঠিক যেভাবে তিনি দাওয়াত, ওরস, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি করেছেন সেভাবেই করব। তিনি যা করেন নি তা করব না। খেলাফ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

সবচেয়ে বড় কথা যেসকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুসরণ করতে স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেননি, বা যেসকল কাজ করলে সাওয়াব হবে বলেও তিনি বলেননি সেসকল জাগতিক বিষয়েও তাঁর সুন্নাত পালনের এত আগ্রহের বিপরীতে ইবাদত বন্দেগিতে সে আগ্রহ না থাকার, বরং খেলাফে-সুন্নাত কাজ করার বেশি আগ্রহ থাকার কারণ কি ?

(৩). আমাদের বৈপরীত্যের কারণ

যাঁরা এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজ করছেন তাঁদের অধিকাংশই অত্যন্ত বুজুর্গ মানুষ। সুন্নাত পালনে তাঁদের ঐকান্তিকতা প্রশংসনীয়। তাঁদের তাকওয়া-পরহেজগারী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে এভাবে একদিকে জাগতিক বা উপকরণীয় সুন্নাতের প্রতি প্রেম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত কর্মের আগ্রহ দেখতে পাই। প্রশ্ন হলো – এসকল বৈপরীত্যের কারণ কি ? আমরা কয়েকটি সম্ভাবনা উল্লেখ করতে পারি :-

<u>প্রথম সম্ভাবনা :</u> তাদের এধরনের কাজের একটি কারণ হতে পারে যে, তারা হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা সুন্নাত বলে মনে করেন-না। কিন্তু তাদের অবস্থাদৃষ্টে তা মনে হয় না। বরং তাদেরকে এ বিষয়ে খুবই সতর্ক বলে মনে হয়। কারণ, আমরা দেখছি যে, যে পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিধান করেছেন বলে কোনো হাদীসে পাওয়া যায় না, সে পোশাক তিনি পরেননি বলে তারা নিশ্চিতরূপে মেনে নিচ্ছেন এবং সেই পোশাক বর্জন করাকেই সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করছেন। যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পানাহার করেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না, সে পদ্ধতি তিনি বর্জন করেছেন বলে তারা মেনে নিচ্ছেন এবং

সেই পদ্ধতি বর্জন করাকে সুন্নাত বলে গ্রহণ করছেন।

উপরন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনিচ্ছাকৃত বর্জনকেও তারা সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগে না থাকার ফলে যে পোশাক বা খাদ্য বর্জন করেছেন তা বর্জন করাকেই তারা সুন্নাত মনে করছেন। এতটুক সতর্কতা সত্ত্বেও যে কাজ তিনি সুযোগ ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও করেননি তা তারা করছেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : আমরা দেখলাম প্রথম সম্ভাবনা তাদের কাজের ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের এধরনের কাজের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে যে, তারা মনে করেন : পোশাক পরিচ্ছদ, পানাহার ইত্যাদি জাগতিক ক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের সকল মানুষের পরিপূর্ণ আদর্শ। সকল যুগের মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় এ সকল সুন্নাত পালন করা ও সুন্নাতের খেলাফ কিছু না করা। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি এরূপ সকল যুগের সকল মানুষের পরিপূর্ণ আদর্শ নন। ইবাদত বন্দেগি, আল্লাহর নৈকট্য ও বেলায়াত অর্জন করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত পরিপূর্ণ নয়, সেখানে কিছু অতিরিক্ত নিয়ম, পদ্ধতি, কিছু অতিরিক্ত কাজের সংযোজন প্রয়োজন। যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহ নতুন নতুন ইবাদত ও ইবাদত পদ্ধতি তৈরি করে নিতে পারবেন।

অথবা তারা মনে করেন যে, কোনো বিষয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত পরিপূর্ণ নয় বা অনুসারীদের জন্য যথেষ্টে নয়। তবে পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয় তো বেলায়াতের পথে, সাওয়াবের জন্য মূল বিষয় নয়, কাজেই সেখানে আর নূতনত্বের বা অতিরিক্ত সংযোজনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবাদত-বন্দেগি, রিয়াজত, মুজাহাদা, যিক্‌র ওযীফা, তাবলীগ, জিহাদ, দাওয়াত ইত্যাদি বিষয় যেহেতু মূল বিষয়, সেহেতু পরিপূর্ণ বেলায়াত, বেশি সাওয়াব ও সুউচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুন্নাত যথেষ্ট নয়, এতে পূর্ণতা আসবে না। এ জন্য এসকল ক্ষেত্রে যুগে যুগে নতুন কর্ম ও পদ্ধতি সংযোজন করতে হবে।

এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উভয় দিক থেকেই একেবারেই বাতিল। এসকল ধর্মপ্রাণ নেককার মানুষেরা তো দূরের কথা কোনো সাধারণ মুসলমানও এরূপ চিন্তা করতে পারেন না। তাঁদের কাজের মধ্যে যত বৈপরীত্যই থাক এধরনের চিন্তা তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাহলে কেন তাঁরা এরূপ করেন?

তৃতীয় সম্ভাবনা : তাঁদের এধরনের কাজের আরেকটি সম্ভাবনা আছে। তাঁরা হয়ত ভাবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তো আমাদের তুলনা করা যায় না। তাঁর মর্যাদা ছিল আল্লাহর কাছে খুবই বেশি। তাঁর জন্য অল্প ইবাদত বন্দেগি যথেষ্ট ছিল। আমাদের যুগে অবিকল তাঁর পদ্ধতিতে আমল করে আমরা পূর্ণ বেলায়াত ও পরিপূর্ণ সাওয়াব পাব না। কাজেই, তাঁর পদ্ধতি ও তাঁর কর্মকে অসম্মান করার জন্য নয়, বরং আমাদের পূর্ণতার প্রয়োজনে আমরা নতুন নতুন ইবাদত ও ইবাদত-পদ্ধতি চালু করছি। এগুলো চালু হওয়ার পরে এগুলি এখন জরুরি হয়ে গিয়েছে। এখন আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী চলে কেউ পূর্ণ সাওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

তিনি রাত্রের কিছু অংশ ঘুমিয়েছেন এবং বাকি অংশ তাহাজ্জুদে কাটিয়েছেন। তিনি এভাবেই পূর্ণতা পেয়েছেন। কিন্তু আমরা এভাবে পূর্ণ মর্যাদা পাব-না। আমাদেরকে সারারাতই তাহাজ্জুদে কাটাতে হবে। অনুরূপভাবে তিনি মাঝে মাঝে রোযা রেখেই পূর্ণতা পেয়েছেন, কিন্তু আমাদেরকে পূর্ণতা পেতে নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া সারা বৎসর রোযা পালন করতে হবে। তিনি অধিকাংশ যিক্‌র ব্যক্তিগতভাবে বসে বসে নিস্বরে করে পূর্ণতা পেয়েছেন। কিন্তু আমরা শুধু এই সুন্নাত অবলম্বন করে পূর্ণতা পাব না। আমাদেরকে দলবেধে সমস্বরে বা দাড়িয়ে, লাফিয়ে যিক্‌র করতে হবে, তা-না হলে আমরা পূর্ণতা পাব না। তিনি বা তাঁর সাহাবীগণ যে সমস্ত বাক্য দ্বারা যিক্‌র করেছেন, শুধু সে সকল বাক্য দ্বারা যিক্‌র করে আমাদের পূর্ণতা আসবে না। আমাদের আরো নতুন নতুন বাক্য বা শব্দ তৈরি করে নিতে হবে। তিনি শুধু সোমবারে রোযা রেখে মীলাদ পালন করেছেন। আমাদের জন্য আর শুধু সোমবারে রোযা রেখে মীলাদের পরিপূর্ণ সাওয়াব-বরকত লাভ সম্ভব নয়, বরং আমাদেরকে এজন্য নতুন নতুন পদ্ধতি তৈরি করতে হবে।

আর এসকল অতিরিক্ত কাজ বা পদ্ধতি তো শরীয়তের দলিলের ভিত্তিতেই আমরা করছি। কুরআন ও হাদীসে বেশি বেশি তাহাজ্জুদ ও নফল রোযার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কাজেই, সারারাত তাহাজ্জুদে ও হারাম দিন বাদে সারা বৎসর রোযা রাখায় কোন দোষ নেই। কুরআন কারীমে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে যিক্‌রকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। কাজেই, আমরা লাফালাফি করে যিক্‌র করলে তা ভালো বই মন্দ হবে না। তিনি করেননি বলে তো আর না জায়েয হয়ে যাবে না। বর্তমান যুগে যদি কেউ শুধুমাত্র সুন্নাত পদ্ধতিতে তাহাজ্জুদ, রোযা, যিক্‌র, দোয়া, তাবলীগ, দাওয়াত, জিহাদ, দরুদ, সালাম, মীলাদ, ইসালে সাওয়াব ইত্যাদি আদায় করে তাহলে সে পূর্ণতা পেতে পারে না। কারণ, এ যুগ তো আর সে যুগ নয়। এজন্য এযুগে কেউ যদি হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মত এসকল ইবাদত পালন করে পূর্ণতা অর্জনের চিন্তা করে তাহলে তাকে খারাপ বলা বা ওহাবী বলে গালি দেওয়া যাবে।

কিন্তু এধরনের চিন্তা কি কোনো মুসলিম করতে পারে ? এই চিন্তার দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়্যত বাতিল করা হয় না? এর অর্থ কি এই নয় যে, যুগের পরিবর্তনের ফলে তাঁর সুন্নাত অচল হয়ে গিয়েছে, কাজেই এখন নতুন নবী, নতুন ওহী ও নতুন সুন্নাত প্রয়োজন?

আমরা দেখেছি যে, ইবাদতে আগ্রহী সাহাবায়ে কেরাম এত দূরে যাননি। তাঁরা খেলাফে-সুন্নাতকে জরুরি বা উত্তম মনে করেননি। তাঁরা খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতের মতো রীতি বানাতে চাননি। শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে কুরআন হাদীস-সম্মত কিছু ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের অতিরিক্ত করতে চেয়েছিলেন। অথচ তাঁদের এই কাজকে তিনি কী কঠিন ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা বলেছেন। তাঁর উম্মতের তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে বলে জানিয়েছেন। কাজেই, এধরনের চিন্তা করা কোনো মুসলিমের উচিত নয়। মনে হয় এ সকল বৈপরীত্যময় সুন্নাত প্রেমিকগণ কেউ এ চিন্তা করেন না।

চতুর্থ সম্ভাবনা : সমাজের এ সকল পবিত্র হৃদয় নেককার মানুষের বিপরীতমুখী সুন্নাত পালন ও সুন্নাত বর্জনের অন্য একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। তারা হয়তো এ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নাত-পদ্ধতি জানেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি তা না-করাকেই

তারা সুন্নাত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। এজন্য তারা জাগতিক বিষয়ে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করেন।

ইবাদতের ক্ষেত্রেও তারা এভাবেই চলতে চান। কিন্তু তাদের মনের অগোচরে ও জ্ঞানের অজান্তে অসতর্কভাবে তারা এ ধরনের খেলাফে-সুন্নাত কর্ম বা পদ্ধতি পালন করছেন। বিভিন্ন কারণে এগুলি সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও পদ্ধতি কী ছিল তা জানার চেষ্টা না করেই সরল মনে তারা এ সকল কর্ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁরা শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিক্‌রের মাজলিসের প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করছেন যে, তার দলবদ্ধ ঐকতানে বা লফিয়ে, গানগেয়ে ও দেহদুলিয়ে যিক্‌রই বোধহয় সুন্নাত যিক্‌র। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী-ভাবে যিক্‌রের মাজলিস করেছেন, কী কী শব্দ ব্যবহার করে তাঁরা যিক্‌র করতেন এবং কোন শব্দ কতবার কী-ভাবে তাঁরা বলতেন সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না।

তিনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মহব্বত, ভক্তি, দরুদ ও সালাম পাঠ মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব ও সুন্নাত-সম্মত ইবাদত। তিনি মনে করেন এ সকল ইবাদত পালনের একমাত্র বা অন্যতম পদ্ধতি হলো মীলাদ, কিয়াম, জুলুস ইত্যাদি। তিনি এগুলিকেই এ সকল ইবাদত পালনের মাসনূন পদ্ধতি বলে মনে করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী-ভাবে এ সকল ইবাদত পালন করতেন তা জানার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করছেন না।

অনুরূপভাবে তিনি মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা ও দান করার ফযীলত জেনেছেন। কিন্তু কী-ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দোয়া করতেন ও দান করতেন তা জানার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি ভেবেছেন যে, আমাদের প্রচলিত নিয়মটিই বোধহয় তাঁদের যুগ থেকে চলে আসছে। একইভাবে তিনি দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবদাতের ফযীলতের কথা জেনেছেন এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে তা পালন করে চলেছেন। এসব ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত জানার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।

অধিকাংশ নেককার মানুষের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাটিই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য বলে আমার মনে হয়। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এসকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত কী তা জানা এবং কী-ভাবে আমরা সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে চলে যাই তার কারণ অনুধাবন করা। যেন আমরা এভাবে খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত না হই। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ। তাঁর আগে আমরা জায়েয ও না-জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের পর্যায় বিবেচনা করে দেখি।

'খেলাফে সুন্নাত'-এর পর্যায় ও বিধান

সুপ্রিয় পাঠক, উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতই উত্তম। তিনি যে কাজ যে পরিমাণে যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে, যে সময়ে, যেভাবে করেছেন তা ততটুকু, সেভাবে করাই সুন্নাত। তিনি যা করেননি বা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত। আশা করি, আমরা সকলেই এ বিষয়ে অন্তত একমত হব যে, তিনি যা করেননি তা জায়েয অথবা না-জায়েয হতে পারে, তবে সুন্নাত নয়। তিনি যা করেছেন তা না-করা খেলাফে-সুন্নাত। অনুরূপভাবে তিনি যা বর্জন করেছেন তা করাও খেলাফে-সুন্নাত।

(১). মুআমালাতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত: জায়েয ও না-জায়েয

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের জানতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা না-করা এবং যা করেননি তা করার হুকুম কী? তিনি করেননি বলেই কি কাজটা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে? না-কি তা খেলাফে-সুন্নাত হলেও জায়েয হবে? এ পর্যায়ে আমাদেরকে পূর্বে আলোচিত ইবাদাত, আদাত, মূআমালাত ও উপকরণ পর্যায়ের পার্থক্য বুঝতে হবে। জাগতিক, মানবীয় সামাজিক কাজকর্ম ও ইবাদত আদায়ের উপকরণ বা জাগতিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত কর্মটি জায়েয হবে, যতক্ষণ তা সুন্নাত বা শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থাকবে। তবে যদি কেউ এ ধরনের খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম মনে করে বা খেলাফে-সুন্নাতকে দ্বীন হিসাবে বা অধিকতর সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন খাদ্য খেয়েছেন। যদি কেউ ব্যক্তিগত কারণে বা অসুবিধার জন্য তা না-খান তাহলে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে ; তবে মুবাহ বর্জনের জন্য তাতে কোনো অন্যায় হবে না, বরং তা জায়েয বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তিনি এই পরিত্যাগ করাকে সাওয়াবের উৎস বলে মনে করেন তাহলে তা না-জায়েয হবে ও বিদ'আত বলে গণ্য হবে। যেমন, যদি কেউ মনে করেন যে উটের গোশত না খেলে তাঁর সাওয়াব হবে বা ইবাদতে সাহায্য হবে বা কোনোভাবে তার দ্বীনের উন্নতি হবে তাহলে তাঁর কাজটি বিদ'আত বলে গণ্য হবে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে যাবেন।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক খাদ্য গ্রহণ করেননি। হয়তবা তা তাঁর যুগে ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা বা রুচির কারণে তিনি তা খাননি, খেতে নিষেধও করেননি। হয়তবা ঐ খাদ্য তাঁর যুগে তাঁর সমাজে ছিল না, পরবর্তীকালে বা অন্য দেশে তা উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয়েছে। খাদ্যের বিষয়ে সুন্নাত বা শরীয়ত ঘোষিত মূলনীতি অনুযায়ী তা খাওয়া জায়েয। এসকল খাদ্য যদি কেউ নিজের ব্যক্তিগত রুচি, সুবিধা-অসুবিধা অনুসারে গ্রহণ করেন তাহলে 'জায়েয' হবে। কিন্তু যদি কেউ এধরনের খাদ্য গ্রহণ করা বিশেষ সাওয়াবের কারণ বা দ্বীনের অংশ মনে করে তাহলে তা না-জায়েয হবে এবং বিদ'আতের পর্যায়ে চলে যাবে। পোশাক, পরিচ্ছদ, আবাস পদ্ধতি, যাতায়াত ইত্যাদি সকল প্রকার জাগতিক, সামাজিক ও মানবীয় কর্ম এই নিয়মের মধ্যে পড়বে। এসকল ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত বিষয় শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী হালাল, হারাম বা মাকরুহ হবে। একে দ্বীনের অংশ মনে করলে বিদ'আত হবে।

(২). ইবাদতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত মূলত না-জায়েয

ইবাদতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত মূলত না-জায়েজ বা নিষিদ্ধ। আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন তা জায়েয হতে পারে কিন্ত কখনই তা ইবাদত হতে পারে না। কারণ, ইবাদাতের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এক্ষেত্রে সর্বোচ স্তরে রয়েছেন নবীয়ে মস্তাফা ﷺ। এই উদ্দেশ্য সর্বদা তাঁর মনে ছিল। এই উদ্দেশ্য পূরণের এবং তাঁর উম্মতকে তা শেখানোর ক্ষেত্রে তিনি সদা উদগ্রীব থেকেছেন এবং পূর্ণভাবে পালন করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি তিনি কোনো কাজ না করেন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ কাজের মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব নেই । থাকলে তিনি অবশ্যই তা করতেন বা শিক্ষা দিতেন।

এর পরেও তিনি যা বর্জন করেছেন কোনো অনুসারী তা কেন করবেন? যদি তিনি মনে করেন যে, তা করলে সাওয়াব হবে বা তা দ্বীনের অংশ – তাহলে তো তিনি তার নবীকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করলেন। কারণ সাওয়াবের কাজ, দ্বীনের অংশ, তিনি করতে পারতেন, অথচ করেননি। কাজেই, তিনি একটি সাওয়াবের পথ ছেড়ে দিয়েছেন, দ্বীনের একটি অংশ পালনে ব্যার্থ হয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ! বিদ‘আতকারী যদিও সরাসরি এরূপ মনে করেন-না, কিন্তু তার কাজের ফলাফল এই যে, বিদ‘আত পদ্ধতি শুরু করার পরে তার আর সুন্নাত পদ্ধতিতে মন ভরবে না। সুন্নাত পদ্ধতি তার কাছে অপূর্ণ মনে হবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতের কোনোরকম খেলাফকে ‘তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করা’ বলেছেন। এজন্যই ইবনু মাসঊদ (রা.) কুফার যাকিরদেরকে প্রশ্ন করেছেন : “তারা কি সাহাবীদের থেকেও নিজেদেরকে উত্তম মনে করে?”

(৩). ইবাদতের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত জায়েয

এখানে প্রশ্ন হলো, আমরা মুআমালাতের ক্ষেত্রে যেমন তিনটি স্তর পেয়েছি: সুন্নাত, খেলাফে-সুন্নাত জায়েয, বিদ‘আত; ইবাদতের ক্ষেত্রেও কি অনুরূপ তিনটি স্তর হতে পারে? এর উত্তর পেতে হলে আমাদের আরেকটি প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে : মুয়ামালাত বিষয়ক খেলাফে-সুন্নাত কাজ একজন মুসলমান কোনো বিশেষ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয় শুধু জাগতিক কারণে করতে পারেন। কিন্তু ইবাদত বিষয়ক কোনো কাজ কি তিনি শুধুমাত্র জাগতিক প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ সাওয়াবের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে করবেন? কেন করবেন? একজন মুসলিম বিরিয়ানী বা পিজা খান, তিনি জাগতিকভাবেই তা খান। তিনি মনে করেন-না যে, খেজুর বা সারীদ খাওয়ার বদলে বিরিয়ানী বা পিজা খাওয়ার জন্য তার বিশেষ কোনো সাওয়াব হচ্ছে। এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যে কেউ তরমুজ বাদ দিয়ে আম খাবেন না, অথবা উট বাদ দিয়ে হাতীর পিঠে আরোহণ করবেন না। কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে তো এরূপ কল্পনা করা যায় না।

একজন মুসলিম সুন্নাত কর্ম বা সুন্নাত-পদ্ধতি বাদ দিয়ে, অন্য কোনো ইবাদত করবেন কেন? বিশেষ সাওয়াব বরকত বা নৈকট্য পাওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে, অতিরিক্ত পাওনার আশা না থাকলে তো তিনি সুন্নাত মতোই ইবাদত করতে পারতেন। ইবাদতের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবই উদ্দেশ্য। তা না হলে তো কোনো ইবাদত আমরা করব না। একব্যক্তি আল্লাহর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নেচেনেচে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যিক্র অথবা দরুদ-সালাম পাঠ করছেন। তিনি যদি এসকল কাজে অতিরিক্ত কোনো দ্বীনী ফাইদা না আশা করতেন তাহলে তো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মত বসে বসেই এ সকল ইবাদত পালন করতে পারতেন।

এজন্য ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলত দুটি স্তর সুন্নাত ও বিদ‘আত। তা সত্ত্বেও আমরা হয়ত কষ্টেসৃষ্টে, টেনে টুনে মাঝখানে আরেকটি স্তর দাঁড় করাতে পারি। তা হলো যদি কেউ ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা, অসুবিধা, উৎসাহ, অলসতার কারণে খেলাফে-সুন্নাত কোনো কাজ করেন, তাকে কোনো অবস্থায় সুন্নাতে নববীর বিপরীতে রীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না করেন এবং এর মধ্যে সুন্নাতের চেয়ে সাওয়াব ও নৈকট্য কম মনে করেন তাহলে হয়ত তা ‘খেলাফে-সুন্নাত জায়েয’ পর্যায়ে থাকতে পারে।

এই স্তরটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মের সুন্নাত পরিত্যাগের ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন, রাতে কিছু সময় নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া কর্মের সুন্নাত। ফযরের নামাযের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে যিক্র, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে রত থাকা একটি কর্মবিষয়ক সুন্নাত। একজন মুসলিম হয়ত এধরনের সুন্নাত ‘বর্জন’ করেন। তিনি যদি ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কারণে তা বর্জন করেন তাহলে তা খেলাফে-সুন্নাত হলেও বিদ‘আত হবে না। কিন্তু তিনি যদি এই বর্জনকে সুন্নাতের বিপরীত দ্বীনের রীতি বানিয়ে নেন, অথবা এই বর্জনের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব বা নৈকট্য আছে বলে মনে করেন তাহলে তা বিদ‘আত হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ‘বর্জনের’ সুন্নাতকে পালন করার ক্ষেত্রে এই স্তর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কারণ আলস্য বা অসুবিধার কারণে কর্ম বর্জন করা যায়। কিন্তু বর্জন করা দরকার এমন কর কেউ আলস্য বা অসুবিধার কারণে করেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি তা অসুবিধার জন্য কেউ করেছেন তা চিন্তা করা যায় না।

যেমন, রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ বর্জন করা সুন্নাত, মাঝে মাঝে নফল রোযা বর্জন করা সুন্নাত। কেউ অসুবিধার জন্য বা জাগতিক কোনো কারণে এই ‘বর্জনের সুন্নাত’ ত্যাগ করে খেলাফে-সুন্নাতভাবে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করেছে, অথবা অসুবিধার জন্য সারা বৎসর সিয়াম পালন করছে এরূপ ভাবা যায় না। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা হয়ত বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ইবাদত করেননি বা যে পদ্ধতিতে ইবাদত করেননি, কেউ যদি ব্যক্তিগত উৎসাহ, আবেগ বা সুবিধার জন্য করেন, এবং এই খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতের চেয়ে নিম্নস্তরের জেনে করেন, বা পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন খেলাফে-সুন্নাতভাবে পালন করেন এবং কোনো অবস্থাতেই সেই খেলাফে-সুন্নাতকে ‘সুন্নাত’ বা রীতিতে পরিণত না-করেন তাহলে হয়ত তার কর্ম বিদ‘আত হবে না বা তিনি ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে পড়বেন না।

ইতঃপূর্বে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি হাদীস আমাদেরকে এইরূপ ধারণা প্রদান করে। তিনি বলেছেন : “প্রত্যেক আবেদ

বা ধার্মিক মানুষেরই কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয়, আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে স্থিতির পর্যায়ে আসে। (উদ্দীপনা ও স্থিতি) কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার প্রশান্তি বা স্থিতি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার প্রশান্তি বা স্থিতি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" এই হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্থিতির ক্ষেত্রে সুন্নাতের বাইরে অবস্থানকে তিনি ধ্বংসের পথ বলেছেন। এথেকে আমরা আশা করতে পারি যে, উদ্দীপনার সময় সাময়িক খেলাফে-সুন্নাত বা বেশি ইবাদত হয়ত ধ্বংসের কারণ হবে না।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, কোনো আবেদ জানেন যে, রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ বর্জন করে ঘুমানোই সুন্নাত, কিন্তু তিনি তাঁর বিশেষ হাল বা অবস্থার কারণে কিছুতেই ঘুমাতে পারছেন-না বা ইবাদতের আনন্দে তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতে মন চাচ্ছে-না, তাই তিনি সারারাত নামায পড়েছেন, যদিও জানেন যে কিছু সময় ঘুমিয়ে নেওয়া উত্তম ও বেশি সাওয়াবের। অনুরূপভাবে, কেউ জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ দু'এক সময়ে ছাড়া সর্বদা মনেমনে ব্যক্তিগতভাবে যিক্‌র করতেন। এই দু'এক সময় ছাড়া সাধারণভাবে যিক্‌র আযকার মনে মনে বা মৃদুস্বরে করা সুন্নাত। কিন্তু তিনি হৃদয়ের বিশেষ অবস্থার কারণে বা যিক্‌রের আনন্দে সশব্দে যিক্‌র করেছেন। তিনি জানেন যে, তাঁর যা সাওয়াব হবে তা শুধু যিক্‌র করার জন্য, শব্দ করার জন্য নয়। শব্দ করার কারণে তার অন্যায়ও হচ্ছে , খেলাফে-সুন্নাত কর্মও হচ্ছে। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মনোযোগের প্রয়োজনে অথবা আগ্রহের ও আনন্দের অতিশয্যে শব্দ করেছেন। শুধুমাত্র এ ধরনের ব্যতিক্রম অবস্থায় আমরা 'খেলাফে-সুন্নাত জায়েয' -এর স্তর কল্পনা করতে পারি।

তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, এই স্তর ইবাদতের ক্ষেত্রে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ খেলাফে-সুন্নাত কাজের মধ্যে সাওয়াব বা নৈকট্যের আশা না থাকলে তা কেউ করে না। আর কোনো কারণে 'খেলাফে-সুন্নাত জায়েয' ধরনের ইবাদত শুরু করলে তা এক পর্যায়ে রীতিতে ও বিদ'আতে পরিণত হয়ে যাবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ, কোনো নিয়্যাতে 'বর্জনের-সুন্নাত' পালন করার অনুমতি দেননি। রাসূলুল্লহ ﷺ তাঁর পদ্ধতির বাইরে তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ইবনু উমর (রা.) হাঁচির সময় সালাম পড়তে আপত্তি করেছেন। ইবনু মাসউদ (রা.) সাহাবীদের পদ্ধতির ব্যতিক্রম যিক্‌র করতে নিষেধ করেছেন। যদিও এসকল ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত কর্ম পালনকারীগণ কেউই খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বা বেশি সাওয়াবের বলে দাবি করেননি।

(৪). উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে সুন্নাত : জায়েয, ওয়াজিব, না-জায়েয ও বিদ'আত :

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইবাদত আদায়ের জাগতিক মাধ্যম বা উপকরণ মুআমালাতের সাথে সম্পৃক্ত, আবার ইবাদতের সাথেও সম্পৃক্ত। সাধারণত মুআমালাতের বিষয় হিসাবে এতে তিনটি স্তর রয়েছে – সুন্নাত, খেলাফে-সুন্নাত জায়েয বা না-জায়েয, খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আত। ইবাদাতরে সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এ উপকরণগুলির দু'টি বিশেষ দিক রয়েছে : প্রথমত, ইবাদতের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্টতার জন্য এতে অন্যান্য মুআমালাতের মতো প্রশস্ততা নেই। সাধারণ পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদের মধ্যে যতটুকু প্রশস্ততা, নামাযের জন্য সতর ঢাকতে পোশাক ব্যবহারে বা রোযার জন্য ইফতারের খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে তার চেয়ে কম প্রশস্ততা রয়েছে। এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার জন্য একটি নির্দিষ্ট রঙের পোশাক বা নির্দিষ্ট প্রকারের খাদ্য সর্বদা ব্যবহার করতে পারেন। তিনি কখনোই এই নির্দিষ্ট খাদ্য বা পোশাকের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব বা ইবাদত কল্পনা করবেন না। কিন্তু নামাযের জন্য সুন্নাতের বাইরে একটি নির্দিষ্ট রঙ বা পদ্ধতির পোশাক সর্বদা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ভয় রয়েছে। ইফতারী, সাহরী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। দ্বিতীয়ত, ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে উপকরণের অপরিহার্যতার কারণের অনেক সময় 'খেলাফে-সুন্নাত' উপকরণ ওয়াজিব বা জরুরি হতে পারে। আসুন আমরা উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাতের পর্যায়গুলি সবিস্তারে আলোচনা করি :

প্রথমত, খেলাফে-সুন্নাত না-জায়েয

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে যা বর্জন করেছেন, অর্থাৎ যে উপকরণ ব্যবহার করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল অথচ তিনি করেননি, সেই উপকরণ না-জায়েয হবে। অনুরূপভাবে, কোনো উপকরণ যদি তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করেন তাহলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন, জানাযার নামাযের জন্য আযান দেওয়া, হজ্বের জন্য যানবাহন থাকলেও হেঁটে যাওয়া, নামাযে আহ্বানের জন্য ঘণ্টার ব্যবস্থা করা, নামাযে মনোযোগ আনয়নের জন্য চক্ষু বন্ধ করা, যিক্‌রে মনোযোগ আনয়নের জন্য লাফালাফি করা ইত্যাদি। সুন্নাতের গুরুত্ব, খেলাফের মাত্রা ইত্যদির আলোকে এগুলি অনুচিত, মাকরুহ বা হারাম হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, খেলাফে-সুন্নাত জায়েয

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুস্তাহাব হিসাবে যে উপকরণ ব্যবহার করেছেন তা মাঝেমধ্যে বর্জন করা, তিনি মুস্তাহাব পর্যায়ে যে উপকরণ ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন তা মাঝেমধ্যে ব্যবহার করা জায়েয হবে। তবে সর্বদা রীতি হিসাবে তা গ্রহণ করলে, অথবা এই খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতের চেয়ে ভালো মনে করলে না-জায়েয ও বিদ'আত হয়ে যাবে। যেমন, তিনি ঈদের নামাযে যোগদানের জন্য হেঁটে গিয়েছে, যানবাহন বর্জন করেছেন, ইফতারীর জন্য খেজুর থাকলে পানি বা অন্য কিছু দ্বারা ইফতার করা বর্জন করেছেন। যেসকল উপকরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর যুগে না-থাকার কারণে ব্যবহার করেননি তার বিধান নির্ধারতি হবে তাঁর সার্বিক শিক্ষা ও সুন্নাতের আলোকে। যেমন - মাইক, বিমান, বাস, টেলিফোন, কংক্রিট বিল্ডিং, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহার করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার শরীয়তের বিধান সাপেক্ষ জায়েয অথবা না-জায়েজ হবে।

তৃতীয়ত, খেলাফে-সুন্নাত ওয়াজিব

ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো উপকরণ কখনো কখনো এরূপভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, উক্ত উপকরণ

ব্যতীত ইবাদতটি পালন করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে ইবাদতের গুরুত্বের বিধান অনুযায়ী এই উপকরণটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন, নামাযের মধ্যে ইবাদতের অংশ হলো সতর আবৃত করা। লুঙ্গি, চাদর, পাজামা, পিরহান ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে এই ইবাদতটি আদায় করা যায়। তবে কোনো পরিস্থিতিতে দেখা গেল যে, একব্যক্তির নামায আদায়ের প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর কাছে চাদর ছাড়া আর কোনো কাপড় নেই। চাদর ছাড়া কোনো কাপড়ের অপেক্ষা করলে তাঁর নামায কাযা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে চাদর পরিধান করা তাঁর জন্য ফরয বা অত্যাবশ্যকীয়, কারণ তিনি এক্ষেত্রে এই উপকরণটি ছাড়া নামায আদায় করতে পারছেন না।

এক্ষেত্রে চাদর পরিধান করাকে ফিকহের পরিভাষায় ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয় বলা হবে। কিন্তু তা শুধু উপকরণ হিসাবেই, ইবাদত হিসাবে নয়। অর্থাৎ, তিনি চাদার পরে নামায পড়ার জন্য দুটি ফরয বা ওয়াজিবের সাওয়াব পাবেন না, শুধুমাত্র সতর আবৃত করে নামায আদায়ের সাওয়াব পাবেন। অথবা 'চাদর পরিধান করা' তাঁর জন্য একটি ওয়াজিব বা নফল ইবাদতে পরিণত হবে না। এমনটি নয় যে, তিনি প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে সর্বদা চাদর পরে আছেন বলে সর্বদা ওয়াজিব ইবাদত পালনের সাওয়াব পাবেন, যা তিনি লুঙ্গি পরিধান করলে পাবেন না। অনুরূপভাবে, অন্য ব্যক্তি যিনি চাদর ও লুঙ্গি দুটিই আছে বিধায় লুঙ্গি পরে নামায আদায় করছেন তার চেয়ে এই চাদর পরিধানকারী বেশি সাওয়াব পাবেন না। এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, উপকরণের ক্ষেত্রে যখন তাকে ওয়াজিব বলা হয় সেক্ষেত্রে এই উপকরণ ব্যবহারকে বিশেষ কোনো ইবাদত বলে বুঝানো হয় না। বরং ওয়াজিব ইবাদত আদায়ের জন্য যেহেতু ঐ ব্যক্তির অন্য কোনো উপকরণ নেই, সেহেতু এই উপকরণ ব্যবহার করে উক্ত ইবাদত আদায় করা তাঁর জন্য জরুরি হয়ে যায়।

কোনো ব্যক্তিকে একটি পাগলা মহিষে মারতে আসলে ঐব্যক্তির জন্য দৌড়ে পালান ওয়াজিব বা জরুরি। এর অর্থ এই নয় যে, দৌড়ান একটি ওয়াজিব বা নফল ইবাদত, যে ব্যক্তি যত দৌড়াবেন তত সাওয়াব পাবেন। মূলত আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই ওয়াজিব।

ওয়াজিব উপকরণ বনাম ওয়াজিব ইবাদত

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কারণ ও উপকরণ তাঁর যুগে ছিল-না বলে করেননি এরূপ কোনো কোনো উপকরণও এভাবে ওয়াজিব হতে পারে। বিষয়টি অনেকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। উপকরণের ক্ষেত্রে 'ওয়াজিব' শব্দ ব্যবহার করার ফলে অনেকেই একে 'ওয়াজিব ইবাদত' ভেবেছেন। অনেকে মনে করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি সে কাজও যদি 'ওয়াজিব ইবাদত' হতে পারে তাহলে 'সকল বিদ'আত বা নব-উদ্ভাবিত কর্ম গোমরাহী' -এ কথাটি ঠিক হবে কী-ভাবে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কোনো কোনো উদ্ভাবিত কাজ 'ওয়াজিব', তাহলে তা অবশ্যই ভালো হবে, খারাপ হবে না বা গোমরাহী হবে না। আমরা দেখেছি যে, এভাবে অনেকে বিদ'আতকে ভাগ করেছেন। যেমন, আরবি ব্যাকরণ পাঠ করাকে তাঁরা 'বিদ'আতে ওয়াজিবা' বলেছেন। এ থেকে কেউ কেউ বুঝেছেন যে, আমরা নতুন নতুন ইবাদত বানিয়ে নিতে পারব।

বিষয়টি কখনোই এইরূপ নয়। আসুন আমরা আরবি ব্যাকরণ শিক্ষার বিষয়টিই আলোচনা করি। আমরা জানি যে, বিতির বা ঈদের নামায আদায় করা একটি 'ওয়াজিব ইবাদত'।[১] আবার আমরা আরবি ব্যাকরণ শিক্ষাকেও 'ওয়াজিব' বলছি। দু'টি একই রকম 'ইবাদত' কি-না তা আমরা বিবেচনা করে দেখি।

প্রথমত, ঈদের নামায বা বিতরের নামায সকল মুসলিম মুসল্লীর জন্য ওয়াজিব ইবাদত। কেউ যদি তা আদায় না-করেন তাহলে তিনি ওয়াজিব ইবাদত পরিত্যাগ করার কারণে গোনাহগার হবেন। এই নামাযের পরিবর্তে অন্য অনেক নফল নামায আদায় করলেও তাঁর এই ইবাদত আদায় হবে না। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা কি এইরূপ ইবাদত? কখনো নয়। সকল মুসলমানের জন্য আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা ওয়াজিব নয়। আমরা হয়ত বলব : তাহলে ওয়াজিবে কেফায়া, অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর উপরে ওয়াজিব, কেউ কেউ শিখলেই হবে। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা কারো উপরেই ওয়াজিব নয়। মুসলিম উম্মাহর উপর ফরযে কেফায়াহ যে, উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের যুগের মতো বা মাসনূন মানসম্পন্ন কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞান অর্জন করবে। কোনো মুসলমান যদি এই সুন্নাত মানের জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে দেখেন যে, তিনি আরবি ভাষায় জ্ঞান না-থাকার কারণে তা অর্জন করতে পারছেন না, তখন শুধুমাত্র তার জন্য সে সময়ে আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করার উপকরণ ব্যবহার করে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যেমন উপরের উদাহরণে আলোচিত মুসল্লীর জন্য চাদর পরিধান করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু, ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ ইবাদত পালনের জন্য অন্য কোনো উপকরণ নেই, সেহেতু ঐ ইবাদত পালনের জন্য ঐ উপকরণ ব্যবহার করা শুধুমাত্র তাঁর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই জরুরত একান্তই উপকরণ ব্যবহারের। শত জরুরতেও কোনো উপকরণ ইবাদতে পরিণত হবে না। পার্থক্য বিবেচনা করুন। বিতির নামায একটি 'ওয়াজিব ইবাদত'। কোনো মুসলিম ইবাদতটি আদায় করলে তিনি তার সাওয়াব পাবেন। অন্য কোন ইবাদত পালনের উপর তাঁর এই ইবাদতের সাওয়াব নির্ভর করে না। এমনটি নয় যে, তাহাজ্জুদ আদায় না করলে তিনি বিতির নামায আদায়ের কোন সাওয়াব পাবেন না।

অনুরূপভাবে ঈদের নামায একটি ওয়াজিব ইবাদত। যিনি তা সুন্নাত-মতো আদায় করবেন তিনি সাওয়াব পাবেন। আমরা বলতে পারব-না যে, ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ চাশ্তের নামায আদায় না করবে ততক্ষণ সে ঈদের নামাযের সাওয়াব পাবে না। অনুরূপভাবে, জানাযার নামায একটি 'ফরযে কিফায়া' ইবাদত। কেউ যদি 'সুন্নাত-সম্মতভাবে' জানাযার নামায আদায় করেন তাহলে তিনি সাওয়াব পাবেন। অন্য কোনো ইবাদত পালনের সাথে তার এই ইবাদতের সাওয়াব সংশ্লিষ্ট থাকবে না। আমরা বলতে পারব-না যে, উক্ত মৃতব্যক্তিকে দাফন না করা পর্যন্ত তিনি জানাযার নামাযের সাওয়াব পাবেন না।

অপর পক্ষে, আরবি ব্যাকরণ শিক্ষাকারী যদি শুধুমাত্র ব্যাকরণ শিক্ষা করেন, এর দ্বারা কুরআন বা হাদীসের কোনো জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা না করেন তাহলে তিনি কোনো সাওয়াব পাবেন না। কারণ তিনি একটি জাগতিক কাজ করেছেন মাত্র। আরব দেশে এমন হাজারো মুসলমান রয়েছেন যারা আরবি ব্যাকরণ - নাহু, সরফ, বালাগাত, আদব ইত্যাদি সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এগুলো শিখতে ও শেখাতে যিনি নিজের জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু কখনোই এগুলিকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ বা ইসলামী কোনো জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসাবে শেখেননি। শিক্ষিত, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী হওয়ার জন্যই শিখেছেন এবং হয়েছেন। তাঁরা কখনো কুরআন হাদীস চর্চাও করেন না। নামাযও পড়েন-না বা পড়তে পারেন-না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই আরবি ভাষায় তাদের সকল পাণ্ডিত্য বিভিন্ন ইসলামী আচার আচরণ, ব্যবস্থা বা মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। কেউ কি কখনো মনে করবেন যে, এরা আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা বা শিক্ষাদানে রত থাকার ফলে সর্বদা একটি ওয়াজিব ইবাদতে রত থাকার সাওয়াব পাচ্ছেন?

তৃতীয়ত, আরবি ব্যাকরণ শিখে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করলে দুটি ওয়াজিব পালন করা হয় না, একটি ইবাদতই পালন করা হয়। মনে করুন, একব্যক্তি জন্মগতভাবে পরিপূর্ণভাবে আরবি জানেন, অপরব্যক্তি আরবিভাষা জানেন-না। দুই ব্যক্তিই একত্রে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার ইবাদত পালনের নিয়্যাত করলেন। প্রথম ব্যক্তি সরাসরি ইল্‌ম অর্জন শুরু করলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু আরবি বোঝেন-না, সেহেতু প্রথমে কিছুদিন বা কয়েক বৎসর আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণ করলেন, এরপর তিনি ইল্‌ম অর্জন শুরু করলেন। এক সময় দু'জনেই ইল্‌ম শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। কেউ কি মনে করবেন যে, প্রথম ব্যক্তি একটি মাত্র ইবাদত পালন করলেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দুটি ইবাদত পালন করলেন ? কেউ কি ভাববেন যে, আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করে ইল্‌ম শিক্ষার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে বেশি ফযীলত বা সাওয়াব অর্জন করলেন?

আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, দুজনেই মূলত একটি ইবাদতই আদায় করেছেন। এই ইবাদত কতটুকু সুন্নাত-সম্মতভাবে সুন্নাত মানে আদায় করেছেন তার উপরেই ফযীলত ও সাওয়াব নির্ভর করবে, উপকরণের উপরে নয়। আমরা যদি মনে করি যে, নাহু শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের কারণে আমাদের ইল্‌ম শিক্ষার ফযীলত বেশি তাহলে আমরা মনে করব যে, এই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে আমরা সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও ইমামগণের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছি, বেশি ফযীলত অর্জন করেছি।

সম্মানিত পাঠক, আশা করি আমরা উপকরণ ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছি। কোনো উপকরণকে ওয়াজিব বলার অর্থ তাকে ইবাদত বলে গণ্য করা নয়। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ইবাদত হিসাবে পালন করেননি তা কখনো ইবাদত হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে রেখে গিয়েছেন। তাঁর পরিপূর্ণ দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্য আমরা প্রয়োজনে তাঁর শিক্ষার আলোকে উপকরণ ব্যবহার করতে পারি।

চতুর্থত, উপকরণের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আত

আমরা বুঝতে পারছি যে, কোনো উপকরণকে বিদ'আত বলা মূলত অর্থহীন। কারণ বিদ'আত অর্থ – যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ইবাদত হিসাবে বা সাওয়াবের কারণ হিসাবে পালন করেননি তাকে ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের জন্য পালন করা। এজন্য কোনো উপকরণ যদি উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব বা ইবাদত কল্পনা না-করা হয়, তাহলে তা জায়েয বা না-জায়েয হতে পারে, কিন্তু বিদ'আত হবে না। আর যদি কোনো উপকরণকেই ইবাদত মনে করা হয় তখনই তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

যেমন, উপরের প্রথম উদাহরণে বর্ণিত ব্যক্তিকে যখন বলা হলো যে, চাদর পরে নামায পড়াই আপনার জন্য ওয়াজিব। তিনি বুঝলেন যে, চাদর পরা একটি ইবাদত ও নামায আদায় আরেকটি ইবাদত। তিনি অন্য পোশাক থাকলেও সর্বদা চাদর পরিধান করতে ও চাদর পরিধান করে নামায আদায় করতে লাগলেন। তিনি চাদর পরিধানের মধ্যে অতিরিক্ত সাওয়াব কল্পনা করলেন। এক্ষেত্রে তিনি বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হলেন।

অনুরূপভাবে, একব্যক্তিকে বলা হলো যে, আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা ওয়াজিব। তিনি বুঝলেন যে, বিতর নামায বা ঈদের নামাযের মতো একটি ওয়াজিব ইবাদত। তিনি কুরআন-হাদীস শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নয়, স্বতন্ত্র ইবাদত হিসাবে নাহু চর্চা করতে থাকলেন। তিনি সকল নফল ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন হাদীস চর্চা, ফিকহ, উসুলে ফিকহ পাঠ বাদ দিয়ে রাতদিন এই 'ওয়াজিব ইবাদতে' মশগুল থাকলেন। তিনি কিতাবু সিবওয়াইহে থেকে শুরু করে সকল নাহুর কিতাব মুখস্থ করে নিলেন। কুরআন তিলাওয়াত ও যিক্‌র ওযীফা যেহেতু নফল ইবাদত, সেহেতু তিনি এগুলি বাদ দিয়ে "ওয়াজিব ইবাদত" হিসাবে বেশি সাওয়াবের জন্য সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাতে কাফিয়া, নাহুমীর ইত্যাদি আরবী ব্যাকরণের গ্রন্থ কয়েকপৃষ্ঠা করে ওযীফা হিসাবে সারাজীবন পড়লেন।

এভাবে তিনি ইসলামী জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র ইবাদত হিসাবে এই 'ওয়াজিব' কাজটি করতে লাগলেন। তিনি নিঃসন্দেহে বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। তিনি এমন একটি কাজকে ইবাদত ও সাওয়াবের উৎস মনে করছেন যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ইবাদত বা সাওয়াবের উৎস হিসাবে পালন করেননি।

কুরআন তিলাওয়াত একটি সুন্নাত-সম্মত ইবাদত। কেউ যদি চশমা ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করতে না-পারেন, তাহলে চশমা ব্যাবহার তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু মূলত চশমা ব্যবহার একটি জাগতিক কর্ম, এই কর্মের মধ্যে কোনো বিশেষ সাওয়াব ধারণা করলে তা বিদ'আত হবে। যেমন, যদি কেউ মনে করে যে, সকলের জন্যই চশমা ব্যবহার করে কুরআন তিলাওয়াত করলে সাওয়াব বেশি হবে। অথবা চশমা ব্যবহারকারী চশমা পরিত্যাগকারীর চেয়ে আল্লাহর বেশি প্রিয়। অথবা চশমা পরার মধ্যে দ্বীনের কিছু বৃদ্ধি আছে তাহলে তা বিদ'আত হবে।

মসজিদে জুমার নামায আদায় করতে যাওয়া ফরয। যদি কারো বাড়ি ও মসজিদের মাঝে নদী থাকে তাহলে তাঁকে নদী পার

হওয়ার জন্য নৌকা বা সাঁকো ব্যবহার করতে হবে। এই নৌকা বা সাঁকো ব্যবহার করা যদিও মূলত একটি জাগতিক কাজ, কিন্তু এক্ষেত্রে ফরয পালনের অনতিক্রম্য মাধ্যম হিসাবে ফরয হয়ে যাবে। এ জন্য কেউ বলতে পারবে না যে, সাঁকো পার হওয়া সাধারণভাবে একটি সাওয়াবের কাজ, একটি ইবাদত বা একটি বিদ'আত। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে, সাঁকো পার হওয়াই একটি ইবাদত এবং তিনি ইবাদত হিসাবে তা করেন, বা সাঁকো পার হওয়া ব্যতিরেকে জুম'আ আদায়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি অতিরিক্ত সাওয়াবের আশায় সাঁকো পার হয়েই মসজিদে আসতে থাকেন তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

নামাযের মধ্যে মনোযোগ আনয়ন করা একটি বিশেষ ইবাদত। এর মাধ্যম হিসাবে চক্ষু বন্ধ করা খেলাফে-সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে মনোযোগের ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদর্শ। তিনি এই উপকরণ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। এখন যদি কেউ চক্ষু মেলে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখাকে সুন্নাত ও উত্তম জেনেও ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে কখনো চক্ষু বন্ধ রাখেন তাহলে তা 'খেলাফে-সুন্নাত জায়েয' হতে পারে। কেউ যদি ওজর ছাড়া এই উপকরণ ব্যবহার করেন তাহলে তা 'খেলাফে-সুন্নাত না-জায়েয' হবে। আর যদি কেউ মনে করেন যে, চক্ষু বন্ধ করার কারণে তিনি বেশি সাওয়াব পাচ্ছেন তাহলে তা বিদ'আত হবে। অনুরূপভাবে তিনি যদি মনে করেন যে, সকলের জন্য অথবা বিশেষ কোনো শ্রেণির আবেদের জন্য চক্ষু মেলে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে নামায আদায় করার চেয়ে চক্ষু বন্ধ করে নামায আদায় করা উত্তম ও বেশি ফলদায়ক তাহলে তিনি বিদ'আতে নিপতিত হলেন। তিনি সুন্নাতে নববীকে অপছন্দ করলেন।

সমবেতভাবে, সমস্বরে, দাঁড়িয়ে, লাফালাফি করে যিক্র করা, দরুদ-সালাম পাঠ করা, বিভিন্ন নফল নামায বা দোয়া জামাতে বা একত্রে আদায় করা ইত্যাদির বিধানও আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি। এ সকল ইবাদত পালনে বা ইবাদতে মনোযোগ আনয়নের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এসকল উপকরণ ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর এ সকল উপকরণ বর্জন করেছেন। ইনশা আল্লাহ, পরবর্তী অধ্যায়ে এসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মহান আল্লাহর কাছে সকাতরে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আতের বিধান

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যা করেছেন তা না-করা বা তাঁরা যা করেননি তা করা 'খেলাফে-সুন্নাত'। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কাজ যদি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, ইবাদত হিসাবে বা দ্বীন পালনের অংশ হিসাবে পালন করা হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। আমরা আরো জেনেছি যে, বিদ'আত সর্বদা 'না-জায়েয'। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, তা কোন্ পর্যায়ের না-জায়েজ : মাকরুহ, হারাম না অন্য কোনো পর্যায়ের।

ইতোপূর্বে আমরা হাদীসের আলোকে বিদ'আতের দুটি বিষয় নিশ্চিতরূপে জেনেছি : প্রথমত, বিদ'আত নিষিদ্ধ, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদ'আত থেকে বারংবার নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ কোনো বিদ'আত কবুল করবেন না। এছাড়া অতিরিক্ত আরো অনেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যেমন, তার অন্য ইবাদত কবুল না হওয়া, হাউজে কাউসার থেকে বিতাড়িত হওয়া, শাফায়াত না পাওয়া, তওবা কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

(ক). সকল বিদ'আতই মাকরুহ ও মারদূদ

হাদীসের ভাষা, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণের মতামতের আলোকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, সকল বিদ'আতই মারদূদ ও মাকরুহ। তবে যদি বিদ'আতের সাথে অতিরিক্ত সুন্নাত-বিরোধিতা থাকে, সুন্নাতে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা হয় বা আকীদার ক্ষেত্রে বিদ'আত হয়, অথবা বিদ'আতকারী বিদ'আতের প্রসারকারী ও প্রতিষ্ঠাকারী হন তাহলে হারাম, সুন্নাত অপছন্দ ও কুফরী বা শিরকের কারণে তিনি অতিরিক্ত শাস্তি পাবেন। কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ের সর্বনিু পর্যায় হলো যে তা 'মাকরুহ' হবে। এজন্য সকল বিদ'আতই 'মাকরুহ' পর্যায়ের। তবে অতিরিক্ত কারণাদির জন্য তা হারাম, শিরক বা কুফরী হতে পারে।

(খ). বিদ'আত আংশিক বা পূর্ণ হতে পারে

উদাহরণ হিসেবে ধরি, একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা রাস্তাদিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্র করছেন। তাঁর এই যিক্রটি মূলত মাসনূন ইবাদত। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, হেঁটে সর্বাবস্থায় এই যিক্র করা যায়। তাঁর এই যিক্রের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথমত, পরিপূর্ণ সুন্নাত ইবাদত– তিনি তাঁর দাঁড়ানো বা হাঁটাকে ইবাদতের অংশ মনে করেন না। তিনি বসা, দাঁড়ানো ও হাঁটা সকল অবস্থার যিক্রকে একইরূপ ইবাদত মনে করেন। তিনি জানেন যে, যিক্রই ইবাদত। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থাতেই যিক্র করেন। এই সময়ে তিনি যেহেতু দাঁড়িয়ে আছেন বা হাঁটায় রত আছেন তাই তিনি হাঁটতে হাঁটতেই যিক্র করছেন। এক্ষেত্রে তিনি একটি পরিপূর্ণ মাসনূন ইবাদত করছেন।

দ্বিতীয়ত, বিদ'আত মিশ্রিত ইবাদত– তিনি যদি দাঁড়ানো বা হাঁটাকে ইবাদত বা দ্বীনপালনের অংশ মনে করেন। তিনি মনে করেন যে, দাঁড়িয়ে বা হেঁটে যিক্র করলে সাওয়াব বেশি হয়। যিক্রের ইবাদত পালনের একটি অংশ হলো 'দাঁড়ানো' বা 'হাঁটা'। তিনি বসে থাকলেও যিক্র করতে হলে দাঁড়িয়ে পড়েন বা হাঁটতে থাকেন। বাধ্য হয়ে বসে যিক্র করলেও সুযোগ পেলেই তিনি দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে যিক্র করেন। এভাবে তিনি দাঁড়ানো বা হাঁটাকে ইবাদাতের বা দ্বীন পালনের অংশ মনে করছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিদ'আত মিশ্রিত ইবাদত করছেন। হাঁটাকে ইবাদত মনে করে এর জন্য যতটুকু কষ্ট পরিশ্রম তিনি করছেন তা কিছুই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। বরং তা মাকরুহ হবে ও গোনাহের কারণ হবে। তবে মূল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্র মুখে উচ্চারণের মাসনূন ইবাদতের সাওয়াব তিনি পাবেন বলে আমরা আশা করতে পারি। এছাড়া এ যিক্রের ফলে তাঁর মনে যে মহব্বত বা আল্লাহ-ভীতির উদ্রেক হচ্ছে তাও মাসনূন ইবাদত হিসাবে সাওয়াবের কারণ হবে বলেই আশা করা যায়।

দাঁড়িয়ে বা হেঁটেহেঁটে দরুদ পাঠ, সালাম পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত পালনেরও একই বিধান। জোরে, সশব্দে, সমবেতভাবে, লাফালাফি করে যিক্‌র, সালাম, দরুদ, ইত্যাদি সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে এই পর্যায়গুলি আমরা দেখতে পাব। এগুলি কখনো মাসনূন ইবাদত, কখনো আংশিক বিদ'আত বা বিদ'আত মিশ্রিত মাসনূন ইবাদত। আমাদের সমাজের অধিকাংশ বিদ'আতই এই পর্যায়ের আংশিক বিদ'আত। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল নেককর্মের মধ্যে অতিরিক্ত কর্ম যোগ করে, পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, রাসূলুল্লহ ﷺ যা মাঝেমধ্যে করেছেন তা সর্বদা করে বা জায়েযকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করে আমরা অগণিত বিদ'আতে নিপতিত হয়েছি। এসকল বিদ'আত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাসনূন ইবাদত বিদ'আতের সাথে মিশ্রিত হয়ে 'আংশিক বিদ'আতে' পরিণত হয়েছে।

অন্য এক ব্যক্তি উপরিউক্ত পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে শুধু 'ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ,... ' বলে যিক্‌র করছেন। তিনি মূলত কোনোই ইবাদত করছেন না। কারণ তাঁর যিক্‌রটিই মাসনূন নয়। আমরা বলতে পারব-না যে, 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ এক বার বা এক লক্ষ বার মুখে উচ্চারণ করলে এই পরিমাণ সাওয়াব হবে। কাজেই, তাঁর যিক্‌র ও পদ্ধতি সবই বিদ'আত, মাকরুহ এবং মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

(গ). সুন্নাত বিরোধিতার পর্যায় হিসাবে বিদ'আত হারাম বা কুফরী হতে পারে

অন্য এক ব্যক্তি বাজনার তালে যিক্‌র করছেন বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য গানবাজনা করছেন। এখানে তিনি বিদ'আত ও মাকরূহ ছাড়াও অতিরিক্ত হারামে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ, গানবাজনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা অনুসারে হারাম। কেউ যদি বিনোদন হিসাবে এগুলি করেন তাহলে হারামের গোনাহ হবে। আর যদি এই হারামকে তিনি দ্বীনের অংশ, ইবাদত বা সাওয়াবের মাধ্যম হিসাবে করেন তাহলে অতিরিক্ত বিদ'আতের গোনাহে লিপ্ত হবেন।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা, কারো কাছে অলৌকিক সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি শিরক। এই শিরককে যদি কেউ আল্লাহর নৈকট্যের কারণ হিসাবে পালন করেন অথবা দ্বীনের অংশ মনে করেন তাহলে অতিরিক্ত বিদ'আত হবে। তবে কুফরী বা শিরকের পরে বিদ'আতের আর হিসাবই বা কি? এজন্য আকীদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদ'আত সবচেয়ে ভয়াবহ।

(ঘ). বিদ'আত পালনকারী ও বিদ'আত প্রতিষ্ঠাকারী

বিদ'আতের বিধানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয় হলো বিদ'আতকারী জেনে-বুঝে বিদ'আত করছেন না-কি অজ্ঞাতসারে করছেন। এছাড়া তিনি বিদ'আতের প্রচারক না শুধুমাত্র পালনকারী। প্রথম ব্যক্তি মূলত সুন্নাত মতো চলতে চান এবং নিজের জীবন সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালনা করেন, কিন্তু কোনো একটি কর্মের বিষয়ে তিনি জানতে না পেরে বিদ'আত কাজ করেছেন। যেমন, তিনি সুন্নাত অনুসারে ঈমান, আকীদা, ইবাদত, বন্দেগি, তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, দোয়া, জিহাদ, দাওয়াত ও অন্যান্য সকল কাজ করেন। তবে তিনি তাঁরযুগে আলেম ও ধার্মিক মানুষদের মধ্যে প্রচলিত কিছু বিদ'আত কর্ম করেন, যেমন - সামা হিসাবে গানবাজনা শোনেন বা সামার মজলিসে নাচানাচি করেন। এই ব্যক্তি মূলত বুঝতে পারেন নি যে, এই কর্মটি বিদ'আত। সমাজের প্রচলন, অগণিত বুজুর্গের কর্ম ও এর পক্ষে ইমাম গাযালীর (রাহ.) মত ব্যক্তিদের "অগণিত অকাট্য দলিল" দেখে তিনি ধোঁকায় পড়েছেন। তাঁর বিদ'আত কর্মটি মারদূদ বা প্রত্যাখ্যাত এবং হারাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিষয়ে আমরা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করি। কারণ তিনি তাঁর এই বিদ'আতের জন্য আল্লাহর নিকট 'মা'যূর' হবেন বলেই আশা করা যায়। অথবা তাঁর অগণিত নেককাজের মুকাবিলায় এ ধরনের কাজ আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়।

অন্য ব্যক্তি সাধারণভাবে সুন্নাতের মহব্বত করেন ও সুন্নাত অনুসারে চলতে চান। উপরের ব্যক্তির মতো ২/৪ টি বিষয়ে তিনি বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছেন। কোনোভাবে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর কর্মটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন অজুহাতে বা ওজর আপত্তি করে তাঁর খেলাফে-সুন্নাত বা বিদ'আত কর্ম অব্যাহত রাখেন, তাহলে তিনি এখানে অতিরিক্ত একটি অন্যায় করলেন, তা হলো 'সুন্নাতকে অপছন্দ করা'।

তৃতীয় ব্যক্তি বিদ'আতের প্রবর্তক ও আহ্বায়ক। তিনি বিদ'আতগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি তা জানেন। কিন্তু তিনি মনে করেন নতুন নতুন ইবাদত তৈরি ও প্রচলন করার অধিকার মুসলমানদের আছে। এজন্য তিনি বিদ'আতের প্রচলন, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করেন। এগুলির জন্য "অগণিত অকাট্য (!) দলিল" আবিস্কার করেন। এই ব্যক্তিকে হাদীস ও সাহাবীগণের পরিভাষায় "সাহেবে বিদ'আত" বা বিদ'আতের অধিকারী বলা হয়। তাঁর জন্য ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, তিনি স্পষ্টত সুন্নাত অপছন্দ করেন, সুন্নাতের বিরোধিতা বা খেলাফ করতে ভালবাসেন এবং সে পথে মানুষকে ডাকেন।

(ঙ). সুন্নী মুসলিমের জন্য বিদ'আত বিরোধিতার বিধান

(১). অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার মুসলিমদের উপর ফরয

সমাজের মানুষদেরকে অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, ফাসাদ, গোলযোগ, সন্ত্রাস ও সর্বপ্রকারের ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করা এবং ভালো কাজের নির্দেশ প্রদান ইসলামের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। কুরআন কারীমে এই দায়িত্বকে মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্যতম দাবি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এসকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইহুদি জাতির যেসকল আলেম, দরবেশ ও ধর্মীয় নেতা তাদেরকে অন্যায় কথা, কাজ, জুলুম, অত্যাচার থেকে নিষেধ করতেন-না কুরআন কারীমে তাদের কঠিনভাবে নিন্দা করা হয়েছে। এধরনের মানুষদেরকে অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে অন্যায় দেখে বা জেনেও প্রতিবাদ না-করাকে আল্লাহর লানত ও তাৎক্ষণিক গজবের কারণ বলে জানানো

হয়েছে। অপরদিকে এই দায়িত্ব পালন করাকে অত্যন্ত বড় সাওয়াবের কাজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যারা অন্যায় দেখেছেন বা জেনেছেন তাঁদের উপর সামষ্টিকভাবে ফরয হলো তাঁর প্রতিকার ও প্রতিবাদ করা। তাঁদের মধ্যথেকে কেউ দায়িত্ব পালন করলে তিনি এই ইবাদত পালনের সাওয়াব পাবেন। বাকিরা ফরয ত্যাগ করার গোনহ থেকে মুক্তি পাবেন। আর যদি কেউ আদেশ ও নিষেধ না-করেন তাহলে সকলেই 'ফরয তরক' করার গোনাহে লিপ্ত হবেন। যদি কেউ অনুভব করেন যে, তিনি চেষ্টা করলে অন্যায়টি দূরীভূত হবে তাহলে তাঁর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফরযে আইন হয়ে যায় যে, তিনি অন্যায়টির প্রতিবাদ ও প্রতিকার করবেন।

যারা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষমতায় সমাসীন তাঁদের জন্য "হাত" বা ক্ষমতা ও শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের অন্যায় রোধ করা ফরয। ক্ষমতার বাইরে সকল মুসলিম, বিশেষত আলেম ও সম্মানিত মানুষদের উপর ফরয হলো ভাষা, লেখনী ও অন্যান্য শরীয়ত ও আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে এসকল 'অন্যায়'-এর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা। অন্তর দিয়ে সকল প্রকার অন্যায়, বিদ'আত, জুলুম ইত্যাদির পরিবর্তনের চেষ্টা, চিন্তা ও পরিকল্পনা করা এবং এগুলিকে ঘৃণা করা ঈমানের ন্যূনতম পর্যায়। কোনো অন্যায়কে মন থেকে মেনে নিলে আর ঈমান থাকে না।

(২). বিদ'আতের বিষয়ে সুন্নী মুসলমানের করণীয়

আমাদের সমাজে সংঘঠিত অগণিত বিদ'আতও উপরিউক্ত অন্যায় ও 'মুনকার' সমূহের অর্ন্তভুক্ত, যার পরিবর্তন উপরে উল্লিখিতভাবে আমাদের উপর ফরয। আমাদের প্রথম দায়িত্ব নিজেদেরকে বিদ'আতমুক্তভাবে পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী করে তোলা। দ্বিতীয় দায়িত্ব বিদ'আতে লিপ্ত সমাজের অন্যান্য মুসলিম ভাইদেরকে বিদ'আত থেকে মুক্ত করে পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণের পথে আহ্বান করা, আদেশ ও নিষেধ করা। কিন্তু দুঃখজনক কথা হলো, আমরা সাধারণত এসকল বিদ'আতকে মেনে নিয়েছি। বিদ'আত ও অন্যান্য অন্যায় বা পাপের মধ্যে পার্থক্য হলো যে, বিদ'আত সাধারণত নেককর্ম, যেমন – যিক্র, দরুদ, নামায, রোয, দরবেশী ইত্যাদি। পাপকর্ম সাধারণত বিদ'আত হয় না। আমরা সাধারণত নেক কর্মের বাহ্যিক দিক দেখে থেমে যাই। কখনো চিন্তা করি যাইহোক নেককাজই তো করছে। একেবারে না করার চেয়ে তো ভালো। কিন্তু পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের বিরোধিতা হচ্ছে তা আমরা ভাবি-না। সুন্নাত প্রেমের ন্যূনতম দাবি হলো যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের সামান্যতম ব্যতিক্রমেই বেদনা অনুভব করব। আশা ও চেষ্টা করব যে, তাঁর সুন্নাত অবিকল তাঁর যুগের মতোই জীবিত ও প্রচলিত থাক।

কখনো পাপকর্ম বিদ'আত হলে তা ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে পালিত হয়। যেমন, কবর পূজা, গানবাজনা, গাজা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ইত্যাদি কর্ম অনেক সময় ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হিসাবে পালিত হয়। এসব ক্ষেত্রে আমরা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের চিন্তা করে চুপ করে থাকি। সর্বক্ষেত্রে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হলো সুন্নাতের অবমাননা, ব্যতিক্রম, বর্জন ও বিরোধিতার কারণে ব্যথিত হওয়া, এসকল কর্মকে ঘৃণা করা, নিজে বর্জন করা এবং অন্যকে বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করা।

(৩). বিদ'আতের প্রতিবাদে বিদ'আত ও খেলাফে-সুন্নাত

অপরদিকে বিদ'আতের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্নভাবে খেলাফে-সুন্নাতে নিপতিত হই। কখনো বা শুধুমাত্র বিদ'আতের প্রতিবাদ করি, বিকল্প সুন্নাত ইবাদতের কথা বলি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা অন্যের বিদ'আতের প্রতিবাদ করি, কিন্তু নিজে সুন্নাত পালনে আগ্রহী হই না। তবে সবচেয়ে বেশি ভুল করি বিদ'আতের গুরুত্ব নির্ধারণে। কোনো নেককর্ম বা পাপকর্মের গুরুত্ব নির্ধারিত হবে সুন্নাতের আলোকে। এবং তদানুসারে নেককাজে উৎসাহ ও পাপকর্ম থেকে নিষেধ করতে হবে। যদি কোনো মুস্তাহাব কাজকে আমরা ওয়াজিব পর্যায়ে উৎসাহ প্রদান করি তাহলে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে। অনুরূপভাবে কোনো মাকরূহ পর্যায়ের পাপের জন্য যদি আমরা হারাম পর্যায়ের প্রতিবাদ করি, তাহলে তাও খেলাফে-সুন্নাত হবে।

সমাজের অনেক সুন্নাত প্রেমিক মানুষ যখন বিদ'আতের নিন্দায় বিভিন্ন হাদীস পাঠ করেন এবং আমাদের সমাজের বিভিন্ন কাজকে বিদ'আত হিসাবে জানতে পারেন তখন সকল বিদ'আতকেই একই পর্যায়ের মনে করে প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। ফলে অনেক সময় মাকরূহ পরিবর্তন করতে যেয়ে হারামের মধ্যে নিপতিত হন। সর্বোপরি নিজে গুরুত্বগত বিদ'আতে নিপতিত হন। এক্ষেত্রে আমাদের উপরে আলোচিত বিদ'আতের পর্যায়গুলি : আংশিক বিদ'আত, পূর্ণ বিদ'আত, মাকরূহ বিদ'আত, হারাম বিদ'আত, শিরক বিদ'আত ইত্যাদি লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া বিদ'আত পালনকারীর অবস্থা দেখতে হবে। তিনি শুধু পালনকারী অথবা প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক তা দেখতে হবে। আংশিক বিদ'আতের কতটুক বিদ'আত ও কতটুকু সুন্নাত তা দেখতে হবে। বিদ'আতের নিন্দার পাশাপাশি সুন্নাত পালনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

যেমন, খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে যিক্র, দরুদ, সালাম, মীলাদ, দাওয়াত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সাধারণত আংশিক বিদ'আত। মূল ইবাদতটি মাসনূন, তবে পদ্ধতির মধ্যে বিদ'আত রয়েছে। এই পদ্ধতিতে ইবাদত পালনকারী তাঁর ইবাদতের গভীরতা, মহব্বত, ইখলাস ও পরিমাণ অনুযায়ী সাওয়াব ও বরকত পাবেন, তবে পদ্ধতির জন্য ব্যয়িত শ্রমের কোনো সাওয়াব পাবেন না। এছাড়া সুন্নাতের বিরোধিতার মাত্রা অনুসারে গোনাহ হতে পারে। কিন্তু অনেকে বিদ'আতের বিরোধিতা করলেও উপরিউক্ত ইবাদতগুলি মাসনূন পদ্ধতিতেও পালন করেন না। ফলে ইবাদত ও মহব্বতের ক্ষেত্রে তিনি উপরিউক্ত আংশিক বিদ'আতকারীর চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকেন।[1] হয়তো-বা তিনি বিদ'আত বন্ধ করতে যেয়ে মূল মাসনূন ইবাদতটিই তুলে দেন। অথবা হয়ত তিনি একটি মাকরূহ প্রতিরোধ করতে গিয়ে কথা বা কাজে অন্য একটি মাকরূহ বা হারাম করে বসেন, যা সুন্নাতের

আলোকে নিষিদ্ধ। এছাড়া বিদ'আত-সহ যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো আন্তরিক ভালবাসা, সুন্দর ব্যবহার, সর্বোত্তম আচরণ, বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে প্রতিবাদ, কঠোরতা বর্জন, নম্রতা ইত্যাদি। গালাগালি ও দুর্ব্যবহারের বিনিময়ে ক্ষমা ও সুন্দর ব্যবহার কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশ।

মহান আল্লাহ ইহূদী-খৃস্টানদের সাথে উত্তম ব্যবহার ছাড়া বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে আপনি আপনার নবীর (ﷺ) উম্মাতের সাথে অমার্জিত ভাবে বিতর্ক করবেন কিভাবে? বিদ'আতে লিপ্ত মুমিন আপনার শত্রু নয়, বরং আপনার বিপদগ্রস্ত ভাই। আন্তরিক ভালবাসার সাথে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করুন, অথবা দোয়া করুন। গালাগালি, কঠোরতা, হিংসা, ঘৃণা, গীবত, অহংকার ইত্যাদি হারাম বা খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে বিদ'আত বা অন্যান্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাতে মূলত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হবে, কোনো ইবাদত পালন করা হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

পঞ্চম অধ্যায়
সুন্নাত বনাম খেলাফে সুন্নাত

আমরা দেখেছি যে, সুন্নাতের গুরুত্বের বিষয়ে আমরা সবাই কম-বেশি একমত। আমরা অনেকেই নিজেদেরকে সুন্নাত-প্রেমিক ও বিদ'আত-বিরোধি বলে মনে করি। তা সত্ত্বেও আমরা অগণিত কাজ খেলাফে-সুন্নাতভাবে আদায় করি। আমাদের দেখা দরকার কী-ভাবে আমরা সুন্নাত পালনের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এভাবে খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত হই। সাধারণত আমরা দুইভাবে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করি : (১). রাসূলুল্লাহ ﷺ যা পালন করেছেন তা বর্জন করা, (২). তিনি যা বর্জন করেছেন তা পালন করা।

খেলাফে-সুন্নাত বা বিদ'আতে নিপতিত হওয়ার পদ্ধতি ও কারণসমূহ

কখনো কখনো আমরা সুন্নাতের জ্ঞানের অভাবে বিদ'আতে লিপ্ত হই। অধিকাংশ সময়ে সুন্নাতের জ্ঞান থাক সত্ত্বেও আমরা বিদ'আতে লিপ্ত হই। ইতঃপূর্বে সুন্নাতের অনুসরণ ও জীবনদানের সাথে উদ্ভাবনের তুলনামূলক আলোচনার সময় আমরা তা আলোচনা করেছি। জ্ঞান ও অজ্ঞানতা বিভিন্ন প্রকারে আগ্রহী ও আবেগী মুসলিমকে বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত করে। কয়েকটি কারণ ও পদ্ধতি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়:

(১). কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ বা ফযীলত পালনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে মানদণ্ড হিসাবে সামনে না রাখা। ফলে আমরা সাধারণ ফযীলতের আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে এমন কাজ সর্বদা বা মাঝে মাঝে করি যা তিনি কখনো করেননি।

(২). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেশি ও কম কাজের প্রতি লক্ষ্য না রেখে যা তিনি ২/১ দিন করেছেন তা সর্বদা করে যা তিনি সর্বদা করেছেন তা বর্জন করা। ফলে আমরা এমন কাজ সর্বদা করি যা তিনি ২/১ বার বা মাঝে মাঝে করেছেন এবং এমন কাজ সর্বদা বর্জন করি যা তিনি অধিকাংশ সময় করেছেন।

(৩). সুন্নাতের জ্ঞান না থাকায় খেলাফে-সুন্নাতের প্রতি ভক্তি।

(৪). জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফলে জায়েয কাজকে নিয়মিত পালন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়মিত করেছেন তা বর্জন করা।

(৫). ইবাদত ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন না করা। ফলে উপকরণকে ইবাদত মনে করা হয় এবং এর মধ্যে সাওয়াবের ধারণা করা হয়।

(৬). তাবাররুক ও ভক্তির বিষয়ে অতিরিক্ততা ও বাড়াবাড়ি করা।

(৭). মিথ্যা হাদীস বা ভিত্তিহীন কল্পকাহিনীর উপর নির্ভর করা।

(৮). রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য বা দ্বীনের কল্যাণে বর্জন করা।

(৯). আবেগ বা অজ্ঞতার কারণে সুন্নাত পালনে গুরুত্বগত খেলাফে-সুন্নাতে নিপতিত হওয়া।

এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ্য। **প্রথমত,** অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কারণগুলি খেলাফে-সুন্নাত কাজ বা বিদ'আতের উদ্ভব ঘটায় না। সুন্নাতের জ্ঞানের অভাব, আবেগ, সমাজের প্রচলন, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্ম বা সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি কারণে খেলাফে-সুন্নাত কর্ম, রীতি বা বিদ'আতের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো আলেম এগুলির পক্ষে "দলিল" পেশ করেন, যে দলিলগুলি উপরের পদ্ধতি ও কারণসমূহের মধ্যে পড়ে।

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির জন্য খানা, চেহলাম ইত্যাদির প্রচলনের পিছনে মূল কারণ হলো হিন্দু ধর্মের প্রভাব। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে মৃতব্যক্তির ঠিকমতো শ্রাদ্ধ না করলে সে "স্বর্গ" পায় না। এতে তার আত্মা "ভূত" হয়ে পৃথিবীতে ঘুরতে থাকে। ব্যক্তির কর্ম যাই হোক, তার মৃত্যু পরবর্তী "শ্রাদ্ধ"-র উপরেই তার স্বর্গপ্রাপ্তি নির্ভর করে।

আমরা জানি যে, এগুলি সবই ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুগযুগ ধরে আচরিত কর্মের প্রভাব ইসলাম গ্রহণের পরেও ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে যায়। "খানা" জাতীয় "কিছু" না করলে তাদের "খারাপ লাগে"। এজন্য প্রথাটি চালু থাকে ইসলামী পোশাকে। সমাজের কিছু আলেম কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন "সাধারণ ফযীলত" জ্ঞাপক নির্দেশনা দিয়ে এগুলিকে জায়েয বলতে থাকেন। যদিও সকলেই একমত যে, কারো জানাযা ও দাফনের পরে কোনো প্রকারের দিন নির্ধারণ করে বা না করে কোনো খানা, অনুষ্ঠান, মাহফিল বা মাজলিস কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ করেননি, যা পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে

পাব। এক্ষেত্রে বিদ'আতের উদ্ভাবন হয়েছে দেশজ প্রভাবে। আর তার সমর্থন করা হয়েছে প্রথম পদ্ধতিতে। জন্মদিন পালন, মৃত্যুদিন পালন, নববর্ষ পালন, কবরে পুষ্পার্পণ ইত্যাদিও অনুরূপ।

অপরদিকে, আমরা মীলাদের ইতিহাস আলোচনায় দেখব যে, কিয়াম বা দাঁড়িয়ে সালাম পাঠের উৎপত্তি হয়েছিল একান্তই ব্যক্তিগত আবেগের ফলে। কোনোরূপ সাওয়াব চিন্তা, ইবাদতের ধারণা, না দাঁড়ালে আপত্তি বা দলিল প্রমাণের কথা সেখানে মোটেও ছিল না। পরবর্তী যুগে অনেক আলেম সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীস, জায়েযকে সুন্নাত বানানো ইত্যাদি পদ্ধতিতে এগুলি সমর্থন করেন। অধিকাংশ খেলাফে-সুন্নাত কর্ম, রীতি ও বিদ'আত এইরূপভাবে প্রথমে উদ্ভাবিত ও প্রসারিত হয়েছে এবং পরে সমর্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, উপরের পদ্ধতি বা কারণগুলি মূলত পরস্পরে সম্পৃক্ত। একটির সাথে আরেকটি জড়িত। একই খেলাফে-সুন্নাত কাজের উদ্ভাবনা বা সমর্থনের প্রমাণাদির মধ্যে একাধিক বা সকল পদ্ধতি পাওয়া যায়। তবুও আলোচনার প্রয়োজনে আমরা এখানে কারণগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করব এবং প্রত্যেক কারণের সাথে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করব, যেন আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন কাজে সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি এবং সম্ভব হলে খেলাফে-সুন্নাত অংশটুকু বাদ দিয়ে অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে আমরা ইবাদতগুলি পালন করতে পারি। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

প্রথম পদ্ধতি, কুরআন-হাদীসের নির্দেশ বা ফযীলত পালনে সুন্নাতকে মানদণ্ড না রাখা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনকে, অর্থাৎ তাঁর কর্মপদ্ধতি ও সুন্নাতকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ না করে সাধারণ ফযীলতের আয়াত বা হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি চালু করা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বা পদ্ধতি নয়, এমন কাজ করা যা তিনি করেননি বা এমন কাজ বর্জন করা যা তিনি করেছেন।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ খেলাফে-সুন্নাত বা সুন্নাত-বিরোধী কাজকর্ম ও রীতি-পদ্ধতির মূলে রয়েছে এই কারণ। যেমন, কুরআন ও হাদীসে জিহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আমরা সাধারণভাবে জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদ করেছেন, কাফিরদেরকে হত্যা করেছেন। তিনি কখন কী-ভাবে যুদ্ধ করেছেন, কখন তা বর্জন করেছেন তা বিস্তারিত ও ভালোভাবে না জেনে হয়ত একজন আবেগপ্রবণ মুসলমান একজন অমুসলমান বা ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননাকর বক্তব্য প্রাদানকারীকে বা মদপানকারী বা ব্যভিচারীকে আঘাত করলেন, মারধর করলেন বা হত্যা করলেন। তিনি ভাবলেন যে, তিনি জিহাদের ইবাদত পালন করলেন। অথচ তিনি মূলত তিনি বিনাবিচারে হত্যার মত একটি কঠিন গোনাহের কাজ করলেন।

তাঁর এই বিভ্রান্তির কারণ হলো – তিনি সাধারণ ফযীলতের আয়াত ও হাদীসকে নিজের মনোমত বুঝে নিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের আলোকে গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে জিহাদ ও যুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে তাঁরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যুদ্ধ পর্যায়ের জিহাদ বর্জন করেছেন। বিচারকের বিচার ও বাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ ছাড়া কোনো প্রকারের শাস্তিপ্রদান বর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁরা দাওয়াত, সৎকাজে নির্দেশ, অসৎকাজে বাধা দানের ইবাদত পালন করেছেন। তাঁদের সুন্নাত না-জেনে এই ইবাদতটি পালন করতে গিয়ে আগ্রহী মুসলমান গোনাহের মধ্যে নিপতিত হলেন।

অনুরূপভাবে, একজন মুসলিম কুরআন ও হাদীসের আলোকে যিক্রের ফযীলত, যিক্রের মাজলিসের ফযীলত জেনেছেন। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় যিক্রের উৎসাহ জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীস পাঠ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী-ভাবে এই ফযীলত অর্জন করেছেন তা তিনি বিবেচনা না-করে, অর্থাৎ তাঁদের কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত বিবেচনা না করে ইচ্ছেমত সুর করে দলবেধে লম্ফঝম্প করে বা শরীর দুলিয়ে গা ঘামিয়ে যিক্র করছেন। অথবা সমবেতভাবে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে, কয়েক মিনিট বসে ও কয়েক মিনিট শুয়ে তালে তালে যিক্র করছেন। তিনি ভাবছেন যিক্রের সকল ফযীলত তিনি অর্জন করছেন। অথচ তিনি খেলাফে-সুন্নাত কাজে লিপ্ত আছেন। এভাবে আমাদের অধিকাংশ সুন্নাত-বিরোধী কাজের মূলে রয়েছে সাধারণ ফযীলতের আয়াত বা হাদীস অবলম্বন করে বিভিন্ন খেলাফে-সুন্নাত ইবাদত বা পদ্ধতি তৈরি করা।

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমরা পূর্বে বর্ণিত কয়েকটি হাদীসের আলোকে কিছু আলোচনা করব। এরপর অন্যান্য উদাহরণের মাধ্যমে কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের ভারসাম্য রক্ষা করার গুরুত্ব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের দিকে লক্ষ্য না রেখে ফযীলতের আমল কী-ভাবে খেলাফে-সুন্নাত ও সুন্নাতে রাসূল ﷺ অপছন্দ করার পর্যায়ে বা বিদ'আতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, সে বিষয় আলোচনা করতে চাই।

(১) তাহাজ্জুদ, নফল রোযা ও মুবাহ বর্জন

প্রথম অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি হাদীস আলোচনার সময় দেখেছি যে, কতিপয় সাহাবী সর্বদা সারারাত জেগে নামায আদায় ও সারা বৎসর রোযা পালন করতেন বা করতে সংকল্প করেন। অনুরূপভাবে সংসারে বা স্ত্রীকে সময় প্রদান, বিবাহ, গোশ্‌ত খাওয়া, বিছানায় শোয়া ইত্যাদি বর্জন করতেন বা করতে সংকল্প করেন। তাঁদের কেউ কেউ বৈরাগ্য অবলম্বন করতে চান। রাসূলুল্লহ ﷺ তাদের এই কর্ম ও বর্জনকে কঠিনভাবে নিন্দা করেন ও তাদের এই সিদ্ধান্তকে 'তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা' বলে আখ্যায়িত করেন। সেখানে আমরা কর্মের সুন্নাত, বর্জনের সুন্নাত, অনুমোদনের সুন্নাত ও সুন্নাতের খেলাফের পর্যায় সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আসুন সুন্নাতের শ্রেণিবিভাগের আলোকে বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করি।

(ক). নির্দেশনামূলক ফযীলতের সুন্নাত : বিভিন্ন হাদীসে তাহাজ্জুদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। বেশি বেশি তাহাজ্জুদ আদায়ে উৎসাহ দান করা হয়েছে। নফল রোযার ফযীলত বলা হয়েছে। বেশি বেশি নফল রোযা পালনে উৎসাহ দান করা হয়েছে। আখেরাতের জন্য দুনিয়ার আরাম আয়েশ ত্যাগের ফযীলতে ও উৎসাহ প্রদানে অনেক হাদীস রয়েছে। কুরআন কারীমেও রাত জেগে তাহাজ্জুদ, যিক্র, ইস্তিগফার ও দোয়ার অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(খ). কর্মের সুন্নাত: রাত্রের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করা, মাঝে মাঝে নফল রোযা রাখা, বিবাহ করা, প্রয়োজনে তালাক দেওয়া, হালাল খাদ্য প্রয়োজন ও সুযোগমতো গ্রহণ করা।

(গ). বর্জনের সুন্নাত : রাত্রের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ বর্জন করা ও বিশ্রাম নেওয়া, মাঝে মাঝে নফল রোযা পরিত্যাগ করা।

সারারাত তাহাজ্জুদ, সারা বৎসর রোযা ও মুবাহ বর্জনের পক্ষে অকাট্য (!) প্রমাণাদি:

এক্ষেত্রে একজন আগ্রহী মুসলিম এসকল ফযীলতের আয়াত ও হাদীসের আলোকে আগ্রহভরে সারারাত জেগে ইবাদত করতে পারেন এবং তার কর্মের পক্ষে "অকাট্য প্রমাণ" হিসাবে এসকল আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এসকল কর্মকে সাধারণ বিধানের আলোকে খারাপ অথবা না-জায়েয বলা যায় না। কারণ সহজ প্রশ্ন : ভালো কাজ বেশি করে করলে কি না-জায়েয হয়ে যাবে? ভালো কাজইতো করছে, নিষেধ করতে হবে কেন?

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসকল কাজকে শুধু খারাপ বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং কঠিনভাবে নিন্দা করেছেন এবং 'তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা' বলে গণ্য করেছেন। এসকল হাদীস থেকে আমরা জানছি যে, একটি মাত্র কারণে এ সকল "অকাট্য! দলিল" বাতিল বলে গণ্য হবে, তা হলো "সুন্নাত" বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের রীতি। সাধারণ ফযীলতের 'অকাট্য !!' দলিল বা হাদীসের আলোকে রাসূলে আকরাম ﷺ -এর পদ্ধতির বাইরে কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা বিদ'আত সৃষ্টির কারণ।

এজন্যই অন্য হাদীসে তিনি বলছেন – "আবেদের উদ্দীপনা হয় সুন্নাতের মধ্যে থাকবে অথবা বিদ'আতের দিকে চলে যাবে।" এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো সাধারণ উৎসাহ বা ফযীলতমূলক হাদীস দিয়ে কোনো পদ্ধতি তৈরি করা যাবে না। বরং এ সকল হাদীসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের আলোকে পালন করতে হবে। যে কাজ তিনি যেভাবে, যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে, যে পরিমাণে করেছেন এবং যে কাজ যতটুকু বর্জন করেছে, তা অবিকল সেভাবে, সেই পরিমাণে করা ও বর্জন করাই সুন্নাত।

সাধারণ ফযীলতের হাদীসকে সাধারণ হিসাবেই রাখতে হবে। এগুলো দ্বারা কোনো বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি তৈরি করা যাবে না। হাদীসে বর্ণিত ফযীলতের কর্ম পালনের পদ্ধতি হবে 'সুন্নাত' অনুযায়ী। তাহাজ্জুদের বা নফল রোযার ফযীলত জ্ঞাপক সাধারণ হাদীস ব্যবহার করে যদি কেউ সুন্নাতের বাইরে ইবাদত করে তাহলে তা খেলাফে-সুন্নাত কাজ হবে। আর ইবাদতের উদ্দীপনায় যদি সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি বা পদ্ধতি তৈরি করে বা খেলাফে-সুন্নাত কর্মকে অতিরিক্ত সাওয়াবের কাজ মনে করে তাহলে তা বিদ'আত হবে।

এখানে আমি তাহাজ্জুদ, নফল রোযা ও মোবাহ বর্জন বিষয়ে কিছু সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত আলোচনা করতে চাচ্ছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাত পালন ও খেলাফে সুন্নাত বর্জনের তাওফীক প্রদান করুন।

(ক). "রাতের নামায" বা তাহাজ্জুদ কেন্দ্রিক কিছু খেলাফে সুন্নাত

(১). নিয়মিত জামাতে তাহাজ্জুদ পালন

তাহাজ্জুদের নামায ও অন্যান্য সকল নফল বা মুস্তাহাব নামায, যিক্‌র, তিলাওয়াত, দোয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সাধারণ সুন্নাত হলো একাকী পালন করা। কখনো একান্তই একাকী, কখনো সবার মাঝেও একাকী। কিন্তু কোনো কোনো মুসলিম সমাজে অনেক আগ্রহী দ্বীনদার মুসলিম সাধারণ ফযীলতের হাদীসের উপরে নির্ভর করে এক্ষেত্রে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়ম করে খেলাফে-সুন্নাতে নিপতিত হয়েছেন।

তাঁদের জামাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের "অকাট্য ! দলিলগুলি" নিম্নরূপ :

প্রথমত, তাহাজ্জুদের ফযীলত। **দ্বিতীয়ত**, রমযানে এবং রমযান ছাড়াও রাসূলে আকরাম ﷺ কয়েকবার জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন। তিনি কোনো কাজ দুই একবার করলেই তো কাজটি মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়ে গেল। **তৃতীয়ত**, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ জামাতে আদায় করতে নিষেধ করেননি। **চতুর্থত**, তাহাজ্জুদ জামাতে আদায় করলে বেশি মনোযোগ ও আসর হয়। **পঞ্চমত**, বর্তমানে অবহেলা ও আলসেমীর যুগে তাহাজ্জুদ একা আদায়ের চেয়ে জামাতে আদায় করা ভালো, কারণ এতে পরস্পরে ভালো কাজে সহযোগিতা করা হয়, যেজন্য অতিরিক্ত সাওয়াব রয়েছে। **ষষ্ঠত**, যেকোনো ইবাদত নিয়মিত করলে বেশি সাওয়াব। একা একা তাহাজ্জুদ আদায়ে অনিয়মের সম্ভাবনা বেশি, জামাতে আদায় করলে অতিরিক্ত উদ্দীপনা ও নিয়মানুবর্তীতা পাওয়া যায়। কাজেই, জামাতে আদায়ই উত্তম।

এতসব 'অকাট্য!' ও 'দাঁতভাঙ্গা!!' দলিলের বিপরীতে সুন্নী মুসলিমের একটিই মাত্র দলিল রয়েছে, তা হলো সুন্নাত। এতগুলি অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে তাঁরা যা করেছেন তা সুন্নাতের খেলাফ। এগুলির উপর নির্ভর করে তারা এমন একটি কাজ করলেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বর্জন করেছেন। এর চেয়েও কঠিন পর্যায় হলো যদি কেউ তাঁদেরকে 'জামাতে তাহাজ্জুদ' আদায়ে নিষেধ করেন তাহলে তারা তার নিষেধের অপব্যাখ্যা করে বলবেন – তিনি 'তাহাজ্জুদ' পড়তে নিষেধ করেন।

আরেকটু এগিয়ে হয়ত তাকে আবু জাহলের সাথে তুলনা করবেন। তাঁরা বলবেন, আবু জাহল, আবু লাহাব ও অন্যান্য কাফির যেমন মুসলমানদেরকে নামায পড়তে দিত না, এই লোকটিও অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে নামায পড়তে নিষেধ করছে। তারা বুঝতে চাইবেন না যে, তাদেরকে তাহাজ্জুদ পড়তে মোটেও নিষেধ করা হচ্ছে না, বরং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'সুন্নাত' অনুযায়ী তা আদায়ে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে, সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো ফযীলতের আয়াত ও হাদীসসমূহ পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের দিকে লক্ষ্য না রাখা। তাহাজ্জুদের ফযিলতের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন। সর্বোত্তমভাবে তাহাজ্জুদ আদায়ের আগ্রহ তাঁদের সবচেয়ে বেশি ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনোই রমযান মাস ছাড়া জামাতে তাহাজ্জুদ বা রাতের নামায আদায় করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনে ২/১ টি ঘটনা যা ঘটেছে তা হলো আয়োজনহীনভাবে, কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে কেউ হয়ত তাঁকে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতে দেখে তিনি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি

যে, তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য জামাত বর্জন করাই সুন্নাত। রমযান ছাড়া অন্য সময়ে হাদীসে বর্ণিত বিশেষ অবস্থা ছাড়া জামাতে আদায় করলে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে। এই খেলাফে-সুন্নাতকে নিয়মিত রীতিতে পরিণত করলে অথবা একে সুন্নাতের সমান বা সুন্নাতের চেয়ে বেশি সাওয়াবের ও বরকতের মনে করলে তা বিদ'আত হবে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করা হবে। এজন্য উলামায়ে কিরাম নিয়মিত তাহাজ্জুদের জামাতকে বিদ'আত বলেছেন।

(২). তাহাজ্জুদ বা রাতের নামাযের জন্য কোনো সূরা নির্ধারণ করা

তাহাজ্জুদের নামাযে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিজের সুন্নাত ছিল বড় বড় সূরাগুলি দিয়ে প্রত্যেক রাক'আতে ২/৪ পারা কুরআন তিলাওয়াত করা। এছাড়া একজন সাহাবী তাহাজ্জুদের নামাযে সূরা এখলাস বারংবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা জেনে অনুমোদন করেন।[1] তাহাজ্জুদ বা "রাতের নামায" আদায়ের জন্য অন্য কোনো সূরা বা আয়াতকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া খেলাফে সুন্নাত। যেমন, সূরা ইয়াসীন, সূরা মুলক, সূরা বাকারা, সূরা রাহমান বা আয়াতুল কুরসী-এর ফযীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি কেউ শুধুমাত্র এই সূরা বা আয়াত দিয়ে তাহাজ্জুদ আদায়ের নিয়ম করে নেন, তাহলে তা বিদ'আতে রূপান্তরিত হবে। কারণ, এসকল ফযীলত রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন, কিন্তু কখনই এভাবে কোনো সূরা বা আয়াত নির্দিষ্ট করে নেননি। অর্থাৎ, তিনি এধরনের নির্ধারণ বর্জন করেছেন। তবে যদি কেউ অন্য কোনো সূরা না জানার কারণে একই সূরা দিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা যারা অনেক সূরা জেনেও মোটেও তাহাজ্জুদ আদায় করি না, আমাদের মতো আলেমদের চেয়ে তিনি লাখোগুণ উত্তম।

এখানে উল্লেখ্য যে শবে কদর, শবে বরাত ইত্যাদি বিভিন্ন রাতে যে নামায আদায় করা হয় তা সবই একই প্রকার রাতের নামায বা তাহাজ্জুদ। কোনো বিশেষ রাতের নামাযের জন্য কোনো বিশেষ সূরা নির্ধারণ করা খেলাফে সুন্নাত। এ বিষয়ক যত হাদীস প্রচলিত সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। বৎসরের সকল রাতেই তাহাজ্জুদ বা রাতের নামাযের জন্য সাধারণ সুন্নাত হলো যথা সম্ভব দীর্ঘ তিলাওয়াত ও রুকু-সাজদার মাধ্যমে আদায় করা। এভাবে না পারলে মুমিন নিজের সাধ্যের মধ্যে যে সূরা দিয়ে পারবেন তা আদায় করবেন।

(৩). তাহাজ্জুদ বর্জন করার বিদ'আত

তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে অন্যতম খেলাফে-সুন্নাত কর্ম হলো তাহাজ্জুদ বর্জন করা। বর্তমানে অনেক ধার্মিক ও ইসলাম-প্রেমিক মুমিনও তাহাজ্জুদ আদায়ে অবহেলা করেন। তাহাজ্জুদ আদায় না করাকেই তাঁরা তাঁদের সুন্নাত বা রীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়মিত করেছেন তা নিয়মিত বর্জন করে সুন্নাতের বিরোধিতা করছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা "রাতের নামায" বা তাহাজ্জুদ পালন করতেন এবং পালনে উৎসাহ প্রদান করতেন। উপরন্তু পালনে অবহেলা করতে নিষেধ করতেন। এ বিষয়ে সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবা পর্যালোচনা করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে, সারারাত ঘুমিয়ে ফজরের নামাযের জন্য উঠা, অর্থাৎ রাত্রে একটিবারও ঘুম থেকে উঠে ২/৪ রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় না করা হাদীসের আলোকে নিন্দনীয়। হাদীস শরীফে একদিকে যেমন ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকাকে নিন্দা করা হয়েছে, অপরদিকে রাত্রে উঠে অন্তত ২/৪ রাকআত নামায আদায়ের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এজন্য অতুলনীয় সাওয়াবের সুসংবাদ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে কোনো সুন্নাত বা নফল নামাযের কথা বলা হয়নি, কিন্তু তাহাজ্জুদের কথা বার বার বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদকে মুমিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

আল্লাহর ক্ষমা লাভে, রহমত লাভে, বরকত ও নৈকট্য অর্জনের, দোয়া কবুলের, হাজত পূরণের ও বেলায়াত অর্জনের জন্য রাতের কিছু সময় একান্তে প্রভুর সান্নিধ্যের চেয়ে বড় ওসীলা আর কিছুই নেই। সকল যুগের সকল নেককার মানুষের অন্যমত পুঁজি হলো রাতের নির্জন মুহূর্তগুলি। সারাদিনের দাওয়াত, জিহাদ, কর্ম ইত্যাদি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, নেককার তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করেননি। নিরপেক্ষ বিচারে হাদীসের আলোকে তাহাজ্জুদ আদায় সকল মুসলমানের জন্য 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা' হবে। আমরা যারা দ্বীনকে ভালবাসি, দ্বীন পালন করে সফলতা লাভ করতে চাই, তাদের সকলেরই উচিত এসকল আয়াত ও হাদীস একটু অন্তরের ভালবাসা দিয়ে পাঠ করা ও চিন্তা করা।

(খ). নফল রোযা কেন্দ্রিক কিছু খেলাফে-সুন্নাত

নফল রোযা ইসলামের অন্যতম ইবাদত। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে নফল রোযার প্রভাব খুবই বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসেই কিছু কিছু নফল রোযা রাখতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি নিজে অনিয়মিতভাবে সব মাসেই কম-বেশি রোযা রাখতেন। এছাড়া নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। শা'বান মাসে তিনি সবচেয়ে বেশি নফল রোযা রাখতেন। শাবানের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত, ও কখনো আরো বেশি রোযা পালন করতেন। আশুরার রোযা, শাওয়ালের ছয়টি রোযা, আরাফার দিনের রোযা, প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া সর্বদা একদিন রোযা রাখা ও দুইদিন রোযা বর্জন করা বা একদিন পর একদিন রোযা রাখার অনুমতি তিনি প্রদান করেছেন ; নিয়মিত রোযার ক্ষেত্রে এরচেয়ে বেশি রোযা পালনের অনুমতি তিনি দেননি।

নফল রোযার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের প্রধান খেলাফে-সুন্নাত কাজ হলো নফল রোযা পালনে অবহেলা করা। নিয়মিত নফল রোযা পালন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ সুন্নাত হলেও আমরা অনেকেই তা বর্জন করে চলি। যদিও ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার জন্য পালন করতে না-পারলে গোনাহ হবে না, তবে আমরা বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব। বিশেষত যারা আল্লাহর পথে চলতে চান ও আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে ও প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী তাঁদের জন্য তাহাজ্জুদের পরেই নফল রোযা অন্যতম বড় পাথেয়। তাহাজ্জুদ ও নফল

রোযা বাদ দিয়ে অন্যান্য নফল যিক্‌র, দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে বেলায়াত অর্জনের চেষ্টাও খেলাফে-সুন্নাত।

নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে অন্যান্য খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে হারাম দিনগুলি বাদ দিয়ে বাকি ১২ মাস রোযা পালন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। এছাড়া যেসকল মাসে বা দিনে রোযা রাখার বিশেষ কোনো নির্দেশ নেই সেসকল মাসে বা দিনে বিশেষভাবে রোযা পালন। যেমন রজব মাসে বা রজব মাসের ২৭ তারিখে বিশেষ করে রোযা রাখা। কোনো বুজুর্গের জন্ম বা মৃত্যুদিনে, অথবা ইসলামের ইতিহাসের বিশেষ কোনো ভালো দিনে সুন্নাতের নির্দেশের বাইরে মনগড়াভাবে বিশেষ করে রোযা পালনও সুন্নাতের খেলাফ।

রোযার ইফতারী সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে করা সুন্নাত, দেরি করা খেলাফে-সুন্নাত। অনুরূপভাবে যথাসম্ভব দেরি করে রাতের শেষ প্রহরে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সামান্য পূর্বে সাহরী খাওয়া সুন্নাত। বেশি আগে সাহরী খাওয়া খেলাফে-সুন্নাত। খেলাফে-সুন্নাতকে রীতি বানিয়ে নিলে বা একে বেশি ফযীলতের মনে করলে বিদ‘আত হবে।

শাওয়াল মাসের ছয় রোযা ও পদ্ধতিগত বিদ‘আত

আমরা দেখেছি যে, রমযানের রোযা পালনের পরে শাওয়াল মাসে ছয়টি নফল রোযা পালন করলে সারা বৎসর রোযা পালনের সাওয়াব হবে বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এই রোযাগুলি মাসনূন নফল রোযার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই "সুন্নাত রোযা" পালনের ক্ষেত্রে "খেলাফে সুন্নাত" পদ্ধতি অবলম্বন করলে এই সুন্নাত ইবাদতটিও বিদ‘আতে পরিণত হবে।

নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নাত একটি পদ্ধতি হলো ফরযের মতো গুরুত্ব দিয়ে সমবেতভাবে তা পালন করা। এই জন্য ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক (রাহিমাহুমাল্লাহ) শাওয়ালের ৬টি রোযা পালনকে বিদ‘আত বলেছেন।

প্রথম যুগের ইমাম ও ফকীহগণ সুন্নাতের পর্যায় এবং কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের সামগ্রিক পালনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা অনেক নফল মুস্তাহাব ত্যাগ করতেন এবং করতে বলতেন এই ভয়ে যে, মানুষ একে নিয়মিত পালন করে রীতি বা সুন্নাতে পরিণত করে নেবে। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও ইমাম মালিক (রাহ) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখাকে মাকরূহ বলেছেন। যদিও সহীহ হাদীসে এই ছয়টি রোযার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তবুও তাঁরা তা নিষেধ করেছেন। কারণ তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে, সাধারণ মুসলমান এই ছয় দিনকে রমযানের রোযার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করবে বা রমযানের রোযার কোনো অংশ মনে করবে, অথবা নিয়মিত পালন করবে, অথবা নফলকে ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করবে। এভাবে তারা খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ‘আতের মধ্যে নিপতিত হবে।[১]

অনেকে মনে করেছেন যে, ঈদের দিনসহ শাওয়ালের ছয় দিন রোযা রাখলে তা মাকরূহ হবে। আসলে তা নয়। ঈদের দিনে রোযা রাখা তো হারাম এবং সকল মুসলমান তা জানেন। বিষয় হলো সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ। যে ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যতটুকু গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে করেছেন সেভাবে ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে করাই সুন্নাত। এর বাইরে গেলে খেলাফে-সুন্নাত বা বিদ‘আত। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক হাদীস থেকে ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের কর্ম থেকে জানতে পেরেছেন যে, তাঁরা এই ছয় রোযাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন না। কেউ পালন করলে ব্যক্তিগতভাবে করতেন। একে ঢালাওভাবে মুস্তাহাব বললে বা উৎসাহ দিলে অনেকে রমযানের অভ্যাসের উপরে রমযানের রোযা পালনের মতোই এই ছয়টি রোযাও পালন করবেন। এতে পদ্ধতিগত বিদ‘আতে তাঁরা নিপতিত হবেন।

তাঁদের চিন্তা কতদূর সুদূরপ্রসারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী যুগের বিভিন্ন ঘটনায়। মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিজ আব্দুল আযীম মুসযিরী (৬৫৬ হি.) তাঁর যুগের কোনো কোনো দেশের মানুষের কথা বলেছেন যে, তারা রমযানের সকল রীতিনীতি, সাহরীতে ডাকার আয়োজন সব বহাল রাখেন। ঈদের পরদিন থেকে পরের ছয়দিন তাঁরা রমযানের নিয়মেই পালন করেন। এরপর তারা ঈদের আনন্দ উৎসব পালন করতে থাকেন।[২]

বর্তমান যুগে যদি কেউ এভাবে করেন তাকে কি আমরা বাধা দিতে পারব? তিনি "অকাট্য! দলিল" হিসাবে শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত বর্ণনা করবেন। পরস্পরে ভালো কাজে সহযোগিতার সাওয়াবের কথা বলবেন। শাওয়ালের ছয় রোযা পালন মুস্ত াহাব। নিজে পালন করলে অনেক সাওয়াব। অন্য সাবইকে পালন করতে উৎসাহ দান করলে অতিরিক্ত সাওয়াব হবে। ইফতারী সবাই মিলে মসজিদে করলে তাতে অবশ্যই রোযাদার ইফতার করানোর অতিরিক্ত সাওয়াব পাবে। এছাড়া দেরি করে আদায় করতে গেলে অন্যান্য ঝামেলায় হয়ত পালন করা সম্ভব হবে না। তাহলে সকল যুক্তি ও প্রমাণে দেখা যায় যে, ঈদের পরদিন থেকে সমাজের সবাই মিলে রমযানের উৎসাহ নিয়ে সাহরী ও ইফতারীতের নিয়মিত ডাকাডাকি করে শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করলে তাতে একা একা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পালনের চেয়ে বেশি সাওয়াব হবে।

প্রিয় পাঠক, এতগুলি দলিলের বিপরীতে আপনি কি একটি দলিলও পেশ করতে পারবেন যাতে প্রমাণিত হবে যে, এভাবে শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা মাকরূহ? আপনার হাতে ইমাম আবু হানীফা ও মালিকের (রাহ.) মতো একটি দলিলই আছে, তা হলো "সুন্নাত"। এ সকল ফযীলতের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন। এ সকল ফযীলত পালনে তাঁদের আগ্রহও ছিল সকলের চেয়ে বেশি। এভাবে তা পালন করার সুযোগও তাঁদের ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁরা তা করেননি, অর্থাৎ তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক এই পদ্ধতি বর্জন করেছেন।

যদি কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে ফযীলত অর্জনের সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে মেনে নেন তিনি আপনার এই একটি দলিলেই সন্তুষ্ট হবেন। তিনি স্বীকার করবেন যে, তাঁরা যা বর্জন করেছেন তা করা আমাদের জন্য ইবাদত নয়। আর যিনি এই দলিলে সন্তুষ্ট নন তাঁকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা আপনার নেই।

(গ). মোবাহ ত্যাগ বিষয়ক খেলাফে-সুন্নাত

(১). জায়েযকে মাকরুহ হিসাবে বা দ্বীনের জন্য ত্যাগ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ যা জায়েয বা মোবাহ হিসাবে করেছেন তাকে মোবাহ হিসাবে করা সুন্নাত। কোনো মোবাহকে মাকরুহের ন্যায় বর্জন করা খেলাফে-সুন্নাত। যে মোবাহ কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, তা না-করলে বা বর্জন করলে বেশি তাকওয়া বা বরকত হবে, বা ইবাদতের জন্য উপকার হবে বলে মনে করাও খেলাফে-সুন্নাত ও সুন্নাত অপছন্দ করা।

(২). মুবাহের নামে পার্থিব বিলাসিতা ও ভোগে মত্ত হওয়া

মোবাহের ক্ষেত্রে আমরা অন্যভাবেও খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত হই। মোবাহ ও দুনিয়ার আরাম আয়েশের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত হলো সাধারণত কৃচ্ছ্রতার মধ্যে থাকা ও মাঝে মাঝে মোবাহ খাদ্য, পানীয় বা আরামদায়ক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা। তিনি সাধারণত কখনো পেটপুরে আহার করেননি, ভালো বিছানায় শোননি, তবে মাঝে মাঝে তা ব্যবহার করেছেন। তাঁর সাহাবীগণও এই সুন্নাতের উপরেই চলেছেন। বর্তমান যুগে আমরা এই সুন্নাত ত্যাগ করেছি। আমরা অনেক ধার্মিক ও দ্বীনের খাদেম সর্বদা মোবাহ নামে পার্থিব ভোগবিলাস, আরাম আয়েশ, মাজাদার পানাহার, চকমপ্রদ পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসাস্থান ও যানবাহন উপভোগের জন্য সচেষ্ট। একদিনের জন্যও আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো কৃচ্ছ্রতার জীবনযাপন করতে রাজি নই।

আমরা কৃচ্ছ্রতার নামে বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করি, কিন্তু সুন্নাত পদ্ধতিতে কৃচ্ছ্রতা করতে মোটেও রাজি নই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ একটি মুহূর্তও পার্থিব আরাম আয়েশের চিন্তা করেননি। আখেরাতকে সমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা। কোনো সম্পদ, টাকা-পয়সা তাঁদের হাতে আসলে তা দিয়ে পর্থিব ভোগবিলাস করার চিন্তা তাঁরা করেননি, বরং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে আখেরাতকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। আবার কোনো মোবাহ খাদ্য বা আনন্দ স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কাছে আসলে অতি কৃচ্ছ্রতা দেখিয়ে তাঁরা তা বর্জন করেননি। কৃচ্ছ্রতাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। আর ভোগবিলাস ও পার্থিব আরাম আয়েশের পিছে দৌড়ান আমাদের সুন্নাত। দুঃখজনকভাবে আমাদের দ্বীনদারী, ইল্‌মচর্চা, দ্বীনের খেদমত ইত্যাদিও অনেক সময় পার্থিব সুবিধাদির জন্য করছি। আল্লাহ দয়া করে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়ী আরাম আয়েশের লোভ থেকে আমাদের অন্তরগুলিকে মুক্ত করুন। তাঁর রহমত ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

(২.) দরুদ সালাম বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত

প্রথমত, হাঁচির দোয়ার সাথে সালাম পাঠ: ইবনু উমর (রা.)-এর মত

রাসূলুল্লাহ ﷺ যতটুকু করছেন ততটুকুই করা এবং যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত তা আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের (রা.) হাদীস থেকে জানতে পারি। তিনি হাঁচি প্রদানের সময় 'সালাম' পাঠ অনুমোদন করলেন না। 'আলহামদু লিল্লাহ' বলার সুন্নাত পেশ করলেন। এখানে আমরা সুন্নাতের শ্রেণিগুলি বিবেচনা করি:

কর্মের সুন্নাত : হাঁচির পরে "আল-হামদুলিল্লাহ" বা "আল-হামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল" বলা। **বর্জনের সুন্নাত :** হাঁচির পরে অন্য কোনো যিক্‌র বা দোয়া না বলা বা হাঁচির পরে দরুদ ও সালাম পাঠ না করা।

সাধারণ ফযীলতের সুন্নাত : দরুদ ও সালামের ফযীলতে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস।

কোনো হাদীসে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সালাত ও সালামকে নিষেধ করা হয়নি; বরং বলা হয়েছে : যে যত বেশি সালাত সালাম পাঠ করবে, সে তত বেশি সাওয়াব ও মর্যাদা পাবে এবং সে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তত নৈকট্য পাবে। এ সকল হাদীসের প্রমাণ পেশ করে একজন উৎসাহী আবেদ হাঁচির পরে, খাওয়ার শুরুতে, খাওয়ার শেষে, আযানে দাঁড়ানোর সময়, নামাযে দাঁড়ানোর সময়, নামাযের সালাম ফিরিয়ে বা এ ধরনের বিভিন্ন সময়ে নিয়মিত সালাত ও সালাম পাঠের রীতি তৈরি করতে পারে। তাকে নিষেধ করলে তিনি সহজেই প্রশ্ন করবেন : ভালো কাজ বেশি করলে কি খারাপ হয়ে যাবে ? অথবা, এ সকল সময়ে সালাত সালাম পড়তে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন ?

কিন্তু হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তার এই উৎসাহ তাকে বিদ'আতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ সাধারণ অনুমোদন ও নির্দেশনামূলক হাদীসগুলিকে তিনি 'সুন্নাতের' আলোকে পালন করেননি।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.)-এর হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো সাধারণ নেক আমলের উৎসাহ জ্ঞাপক কোনো আয়াত বা হাদীস শুনলে প্রথমেই একজন মুসলিমকে প্রশ্ন করতে হবে : এই নেক আমলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ কী-ভাবে করেছেন বা সাহাবায়ে কেরাম কী-ভাবে করতেন ? অর্থাৎ, এই নেক আমলটি পালন করার জন্য 'সুন্নাত-পদ্ধতি' কী ?

আমরা এখানে এই প্রশ্নটি করি : প্রথমত, 'সালাত ও সালাম' পাঠে তাঁদের 'সুন্নাত' কী? দ্বিতীয়ত, উল্লেখিত কাজগুলি, যেমন হাঁচি প্রদান, খানা খাওয়া, নামাযে দাঁড়ান, আযানে দাঁড়ান ইত্যাদি কর্মগুলি তাঁদের যুগে ছিল কি-না এবং এগুলি পালনে তাঁদের সুন্নাত কী ছিল? ইবনু উমর (রা) সেই উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন : আমিও সুন্নাত অনুযায়ী সাধারণভাবে ও সুন্নাত নির্ধারিত বিভিন্ন সময়ে হামদ ও সালাম পাঠ করে থাকি। হামদ ও সালাম পাঠ যে নেক আমল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে হাঁচির সুন্নাত শুধু হামদ, সালাম নয়।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, সাধারণভাবে সালাত ও সালম পাঠ একজন মুসলিম সর্বদা করতে পারেন। তবে তিনি 'সুন্নাতের' বাইরে কোনো রীতি তৈরি করতে পারেন-না বা সাধারণ ফযীলতের হাদীস দ্বারা কোনো বিশেষ পদ্ধতি তৈরি করতে পারেন না। আমরা বলতে পারি যে, সুন্নাত হিসাবে নয়, সাধারণ জায়েয পর্যায়ে কেউ দু'এক বার হাঁচির পরে দরুদ-

সালাম পড়েন তাহলে তা দোষণীয় হবে না। যেমন, কেউ হাঁচির আগেই সালাত বা সালাম পাঠের নিয়্যাত করেছেন, হঠাৎ হাঁচি এসেছে, তিনি হাঁচির পরে মাসনূন দোয়া পড়ার পরে আগের নিয়্যাত মতো দরুদ ও সালাম পড়েছেন, অথবা হাঁচির পরে মাসনূন দোয়া পাঠের পরে দরুদ ও সালাম পাঠের ইচ্ছা তার হয়েছে, এবং তিনি তা পাঠ করেছেন। তিনি দরুদ ও সালামের সাধারণ সাওয়াব পাবেন। হাঁচির পরে পাঠের জন্য বিশেষ কোনো সাওয়াব পাবেন না। কিন্তু যদি কেউ সুন্নাতের বাইরে বিশেষ সময়ে বিশেষভাবে সালাত ও সালাম পাঠকে রীতি করে নেন, বা ঐ বিশেষ সময়ে বা বিশেষভাবে সালাত ও সালাম পাঠে বিশেষ সাওয়াব আছে বলে মনে করেন তাহলে তা বিদ'আত ও গোমরাহী হবে।

দ্বিতীয়ত, দরুদ ও সালামের সুন্নাত

(ক). সালাত ও সালামের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা অন্যতম সুন্নাত-সম্মত ইবাদত ও অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে সালাত ও সালামের নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য হাদীসে তাঁর উপর দরুদ ও সালামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সালাত ও সালামের অতুলনীয় পুরস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোনো উম্মত তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহ তাকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, তার গোনাহ ক্ষমা করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ফিরিশতাগণ তার জন্য দোয়া করেন, তার সালাত ও সালাম তার নাম ও পিতার নামসহ ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাওযা মুবারাকায় পৌঁছে দেন, তিনি তার জন্য দোয়া করেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যত বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করবে সে কিয়ামতে তত বেশি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নৈকট্য পাবে। অধিক পরিমাণে সালাত পাঠকারীর সকল সমস্যা আল্লাহ মিটিয়ে দিবেন।[১]

(খ). দরুদ পাঠের সুন্নাত সময়সমূহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে কিভাবে সালাত পাঠ করতে হবে, কখন কী পরিমাণ সালাত পাঠ করতে হবে তা শিখিয়েছেন। । তন্মধ্যে রয়েছে :

(১). প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় এবং ঘুমানর আগে। যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ১০ বার করে দরুদ পাঠ করবে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শাফা'আত লাভ করবে।

(২). আযানের পরে। মুয়াজ্জিনের আযানের পরে আযানের দোয়ার আগে দরুদ শরীফ পাঠ করতে হাদীসে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৩). যেকোনো অবস্থায় তাঁর নাম শুনলে। ইমাম তাহাবী (রাহ) ও অনেক আলেম তাঁর নাম শুনা মাত্র দরুদ পাঠকে ওয়াজিব বলেছেন। অনেকে বলেছেন মুস্তাহাব। যতবার তাঁর পবিত্র নাম মুমিনের কর্ণগোচর হবে ততবারই মুমিনের উচিত অন্তত এক বার তাঁর উপর সালাত পাঠ করা। এমনকি অনেক তাবেয়ী ও ফকীহ বলেছেন, নফল নামাযের কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যেও যদি তাঁর নাম বা উপাধি আসে তাহলে থেমে দরুদ পড়ে নেওয়া উচিত।

(৪). শুক্রবার দিনে বেশি বেশি দরুদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

(৫). সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা অনুযায়ী যে কোনো দোয়ার আগে, পরে ও মাঝে।

(৬). মসজিদে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার সময়। প্রথমে দরুদ-সালাম পাঠ করে এরপর মসজিদে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার দোয়া পড়ার কথা বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে।

(৭). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশনা অনুসারে মুসলমানদের যেকোনো মাজলিসে, মাহফিলে, আসরে, যেখানেই দু'এক জন মুসলমান একত্রিত হবেন, তাদের প্রত্যেকেরই উচিত মাঝে মাঝে কিছু দরুদ পাঠ করা। অন্তত আলোচনা বা মাজলিস ভাঙ্গার আগেই ২/১ বার আল্লাহ যিক্‌র ও দরুদ পাঠ না করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

(৮). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম লিখার সময় পরিপূর্ণভাবে দরুদ ও সালাম লিখতে হবে। তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং অনেক সাওয়াবের আশা করেছেন। যতবারই আমরা তাঁর পবিত্র নাম বা উপাধি লিখব ততবারই সালাত ও সালাম পরিপূর্ণভাবে লিখা উচিত। অনেকে কৃপণতা করে শুধুমাত্র '(দ:)' বা '(স:)' লিখেন। সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীগণ ও পূর্ববর্তী আলেমগণ কখনো সালাত-সালাম সংক্ষেপে ইশারা করে লিখেননি। সবসময় তাঁরা **'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'** পুরো লিখেছেন। এমনকি মুহাদ্দিসগণ হাদীস লিখার সময় প্রতি পৃষ্ঠায় অগণিতবার তাঁর নাম বা উপাধি লিখেছেন এবং প্রতি বারেই **'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'** পুরো লিখেছেন। যদি কেউ সালাত ও সালাম স্পষ্ট করে লিখেন, আশা করা যায় যতক্ষণ তার লিখাটি থাকবে তিনি সালাত ও সালামের সাওয়াব পাবেন। কিন্তু '(দ:)', বা '(স:)' লিখে বা আরবিতে (**/**) লিখে পাঠককে দরুদ পড়তে ইশারা করা হয় মাত্র, লেখকের জন্য সালাত ও সালাম লেখার সাওয়াব প্রাপ্য হয় না। বস্তুত এ সকল ইশারা কৃপণতা ও বেয়াদবী বলেই মনে হয়।[২] ইমাম সাখাবী (রহ.) এদেরকে অলস ও জাহেল বলেছেন।[৩]

এছাড়া নিম্নলিখিত সময়ে দরুদ পাঠের কথা হাদীসে বা সাহাবগণের সুন্নাতে এসেছে : নামাযের মধ্যে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পরে, দোয়া কুনুতের শেষে, জানাযার নামাযে ৩য় তাকবীরের পরে, যেকোনো খুত্বা, বক্তৃতা বা আলোচনার শুরুতে, যেকোনো কথাবার্তা,

আলোচনা, দরস প্রদান বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কথার শুরুতে, হজ্ব ও উমরা পালনকারীদের জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে অবস্থানের সময়, দোয়া করার আগে, হজ্ব ও উমরা পালনকারীদের জন্য তালবীয়ার শেষে, হজ্ব ও উমরা পালনকারীদের জন্য হাজরে আসওয়াদ চুম্বন বা স্পর্শ করার সময়, দু'জন মুসলমানের দেখা হলে মুসাফাহা করার সময়, কোনো দাওয়াতে বা বাজারে বা কোথাও উপস্থিত হলে, রাতে ঘুম থেকে উঠলে, ওযু করে কুরআন তিলাওয়াত বা তাহাজ্জুদের নামায শুরু করার পূর্বে, কুরআন কারীম খতম করার সময়, যে কোনো বিপদে আপদে, কষ্টে মুসিবতে বা কোনো প্রয়োজনে আল্লাহর দরবারে আকুতি জানাবার জন্য, ওযুর পরে শাহাদাতা পাঠের পরে, বাড়িতে প্রবেশের সময়, ওয়াজ নসিহত, যিক্‌র ও আলোচনার মাজলিসে, কোনো কিছু ভুলে গেলে সালাত পাঠের কথা হাদীস অথবা সাহাবীগণের জীবনে পাওয়া যায়। দুই ঈদের নামাযের অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের পরে দরুদ পাঠের কথাও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রা.) হাদীসে বলা হয়েছে। এছাড়া সর্বদা বেশি বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করা হাদীসের নির্দেশ ও সাহাবীগণের সুন্নাত। সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে মনেমনে বা মৃদুস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করাই তাঁদের সুন্নাত।[১]

(গ). দরুদ সালামের সুন্নাত শব্দসমূহ

(১). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো দরুদে ইবরাহীমীই সর্বোত্তম

"দরুদ" ফারসি শব্দ। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় ও আরবিতে এই অর্থে "সালাত" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "সালাত" শব্দের মূল অর্থ দোয়া করা। ইসলামের পরিভাষায় সালাতের দুটি বিশেষ ব্যবহার রয়েছে : নামায ও দরুদ। দরুদ পাঠের সময় মুসলিম বলেন : "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ – হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন।" তার অর্থ হলো : হে আল্লাহ, দুনিয়াতে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাঁর শরীয়তকে হেফাজত করে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন এবং আখেরাতে তাঁর শাফায়াত কবুল করে, তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে মর্যাদাময় করুন।"

মহান আল্লাহ মুমিনগণকে তাঁর প্রিয়তম নবী (ﷺ)-এর উপর সালাত প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু আমরা তো আর তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করতে পারব না, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্যও পুরো বুঝতে পারব না। তাই আমরা এ দায়িত্ব আবার মহান আল্লাহকেই দিলাম, আমরা বললাম : হে আল্লাহ আপনি তাঁর উপর সালাত প্রদান করুন, কারণ তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আপনিই ভালো অবগত আছেন।"[২]

কুরআন কারীমে মহিমাময় আল্লাহ বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম রাসূলের উপর সালাত ও সালাম প্রেরণের জন্য :

"নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর উপর 'সালাত' প্রদান করেন (আল্লাহ তাঁর মহান নবীকে রহমত করেন, সর্বোত্তম মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তাঁর সুপ্রশংসা ও মর্যাদা বিশ্ববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন, আর ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন)[৩]। হে বিশ্বসীগণ, তোমরা তাঁর উপর 'সালাত' ও 'সালাম' প্রেরণ কর।"[৪]

কাউকে সালাম প্রদান করলে তাঁকে সম্মান প্রদান করা হয়। সাহাবীগণ আগে থেকেই রাসূলে আকরাম ﷺ-কে সালাম দিয়ে আসছিলেন। সালাম প্রদানের ইসলামী পদ্ধতি তাদের সুপরিচিত : "আস-সালামু আলাইকুম..."। কিন্তু তাঁকে তাঁরা কিভাবে 'সালাত' জানাবেন? 'সালাত' তো দোয়া করা। তিনিই তো তাঁদের জন্য দোয়া করবেন, তাঁরা কিভাবে সৃষ্টির সেরা, নবীদের নেতা ও মানব জাতির মুক্তির দূতকে দোয়া করবেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম। কী-ভাবে তাঁরা এই আয়াতের নির্দেশ পালন করবেন। অবশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্মরণাপন্ন হলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে : কা'ব ইবনু আজুরা (রা.) বলেন :

( )

যখন "আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর উপর সালাত প্রদান করেন" – আয়াতটি নাযিল হলো, তখন সাহাবীগণ বললেন: "হে আল্লাহর মহান নবী, আমরা কী-ভাবে আপনার উপর সালাত প্রেরণ করব?" তখন তিনি বললেন : "তোমরা বল:

"হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজনের উপর যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত। এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজনের উপর যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত।"[৫]

অন্য হাদীসে কা'ব ইবনু আজুরা (রা.) বলেন:

:] ﷺ

[

.

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল, সালামের বিষয়ে তো আমরা জানি যে, কী-ভাবে সালাম দিতে হবে, কিন্তু আপনার উপর 'সালাত' আমরা কী-ভাবে প্রদান করব? তখন তিনি বললেন: "তোমরা বলবে: 'হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজনের উপর যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত। এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজনের উপর যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত।"

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখি যে, আরো অনেক সাহাবী এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সালাত প্রদানের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করেছেন এবং তিনি তাঁদেরকে দরুদে ইবরাহীমী শিখিয়েছেন।[১]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অনেক সাহাবী বর্ণিত প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের অনেক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে তাঁর উপর দরুদ পাঠের জন্য 'দরুদে ইবরাহীমী' শিক্ষা দিয়েছেন। এই দরুদে ইবরাহীমীর শব্দের মধ্যে বিভিন্ন হাদীসে কিছু বেশি-কম আছে। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, তিনি বিভিন্ন সময়ে দরুদের শব্দ শেখাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন, তবে এগুলির শব্দাবলী খুবই কাছাকাছি। সবগুলির অর্থই হলো: আল্লাহ, মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর বংশধর, পরিজন বা স্ত্রীগণের উপর সালাত, বরকত, রহমত প্রেরণ করুন, যেমন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধর বা পরিজনকে সালাত, বরকত ও রহমত প্রদান করেছেন।

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে দরুদের জন্য যে শব্দ শিখিয়েছেন তা-ই সর্বোত্তম শব্দ। নামাযের মধ্যে ও নামাযের বাইরে সর্বাবস্থায় আমাদের দরুদ পাঠের জন্য এই শব্দ ব্যবহার সর্বোত্তম। সাহাবীগণ নামাযের মধ্যে ও নামাযের বাইরে এই শব্দে দরুদ পাঠ করতেন। কেউ যদি এর চেয়ে কোনো শব্দকে উত্তম মনে করেন তিনি নিঃসন্দেহে খেলাফে- সুন্নাত কাজে বা বিশ্বাসে লিপ্ত হবেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে যাবেন। এর চেয়েও মারাত্মক স্তর হলো, এই দরুদ পাঠকে খারাপ মনে করা।

(২). যে কোনো শব্দে 'সালাত' বললেই দরুদের ইবাদত আদায় হবে

অপরদিকে কোনো কোনো আগ্রহী মুসলিম মনে করেন যে, দরুদে ইবরাহীমী ছাড়া অন্য কোনো দরুদ পাঠ করলে দরুদ পাঠের ইবাদত আদায় হবে না। তাঁদের এই মতও খেলাফে-সুন্নাত। কারণ আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের ব্যাখ্যা ও পালনের ক্ষেত্রে আমরা সাহাবীগণের কর্মের উপর নির্ভর করব। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শব্দে সালাত ও সালাম পাঠ করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দরুদ পাঠের সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসাবে "দরুদে ইবরাহীমী" শিক্ষা দিয়েছেন, তবে তা দরুদ পাঠের একমাত্র শব্দ নয়।

সাহাবীগণের বিভিন্ন দরুদ ও সালামের শব্দের মধ্যে রয়েছে :

(ক). ([ ]): সাল্লাল্লাহু আলা (রাসূলিহী) মুহাম্মাদ

"আল্লাহ {তাঁর রাসূল} মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রদান করুন।[২]

(খ). ( ): সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিহী ওয়া সাল্লামা

"আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন।"[৩]

(গ). ( ) সাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যি মুহাম্মাদ

"আল্লাহ নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রদান করুন।[৪] ।

(ঘ). সাহাবীগণ কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম বা উপাধি উল্লেখ করে নিম্নের সালাত ও সালাম আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে অন্য কোন নবীর নাম উল্লেখ করলেও এভাবে সালাত-সালাম আদায় করেছেন:[৫]

( ): আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম

"তাঁর উপর সালাত ও সালাম"।

(ঙ). কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে কথা বলার সময় কথার শুরুতে এভাবে সালাত ও সালাম প্রদান করেছেন[৬]:

( ) ( )

"হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনার উপর সালাত ও সালাম প্রদান করেন।"

এছাড়া সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ থেকে অনেক শব্দে দরুদ ও সালাম পাঠের বর্ণনা রয়েছে।[১]

এভাবে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের কর্মের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে, দরুদের ক্ষেত্রে অন্য শব্দ ব্যবহার জায়েয। দরুদ এক প্রকার দোয়া। দোয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে শব্দ শিখিয়েছেন সেটাই সর্বোত্তম। যে কোনো মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে যেকোনো ভাষায় যেকোন বাক্য ব্যবহার করে দোয়া করতে পারবেন। তবে সুন্নাতের বাইরে কোনো বিশেষ শব্দকে অধিক সাওয়াবের মাধ্যম মনে করবেন না, বা নিয়মিত রীতি হিসাবে গ্রহণ করবেন না। যখন একজন মুসলিম নিজের শব্দে দোয়া-দরুদ পাঠ করেন তখন তিনি শুধুমাত্র দোয়া-দরুদের সাওয়াব পান। আর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো শব্দে তা আদায় করেন তখন দোয়া-দরুদের সাওয়াব ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো শব্দ ব্যবহারের সাওয়াব পান। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো শব্দ ব্যবহারের মধ্যে অতিরিক্ত ক্বলবী প্রতিক্রিয়া ও মহব্বত অর্জিত হয়।

সর্বোপরি কিভাবে মহান আল্লাহকে ডাকলে বা কিভাবে তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর উপর দরুদ সালাম পাঠ করলে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদব সবচেয়ে বেশি আদায় করা হবে তা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভালো জানেন। আমরা নিজেদের থেকে বানাতে গেলে ভুল, বেয়াদবী বা বাড়াবাড়ির ভয় থাকে। মাসনূন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করলে সে ভয় থাকে না।

(ঘ). দরুদ সালামের সুন্নাত-পদ্ধতিসমূহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত সদা সর্বদা আল্লাহর যিক্র ও দরুদ সালাম আদায় করা। এমনকি নাপাক অবস্থায় বা গোসল ফরয থাকা অবস্থায়ও তাঁরা যিক্র, দোয়া ও দরুদ পাঠ করতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা নিয়ম নির্ধারণ করেননি। বসে থাকলে বসে বসে, দাঁড়িয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে, শুয়ে থাকলে শুয়ে তাঁরা সালাত ও সালামের ইবাদত আদায় করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাতের বিশেষ দিক হলো তাঁরা সর্বদা ব্যক্তিগতভাবে সালাত ও সালাম আদায় করতেন। সকল নফল ইবাদতের মতোই যিক্র, সালাত ও সালামের সুন্নাত-পদ্ধতি হলো জামাতে বা সমবেতভাবে তা আদায় না-করা। তাঁরা মাজলিসে বসা অবস্থায় সালাত ও সালাম পাঠ করতেন, তবে জামাতে অর্থাৎ সমস্বরে নয়, বরং প্রত্যেকে নিজের মতো।

আমরা দেখেছি সালাত পাঠের কিছু সময় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বেশি বেশি সালাত পাঠের সাধারণ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কোনো মুসলিম সাধারণ হাদীসের আলোকে নিজের সুবিধা অসুবিধার আলোকে ওযীফা হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক দরুদ পাঠের নিয়ম করতে পারেন। তবে তিনি কখনোই মনে করবেন না যে, তাঁর নির্দিষ্ট সময় বা সংখ্যার মধ্যে কোনো সাওয়াব আছে। তাঁর সাওয়াব শুধুমাত্র সালাত ও সালাম আদায়ের জন্য। বিশেষ সাওয়াবের জন্য সুন্নাতের প্রয়োজন। যেমন, আমরা বলব যে, ফজরের পরে ১০ বার ও মাগরিবের পরে ১০ বার দরুদ পাঠ করলে দরুদ পাঠের সাধারণ সাওয়াব ছাড়াও বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে, তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শাফাআত। কারণ, এ বিষয়ে সুন্নাত রয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো সময়ে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার মধ্যে কোনো অতিরিক্ত বা বিশেষ সাওয়াব আছে তা আমরা বলতে পারব না।

যেমন কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেশি বেশি দরুদ পাঠের নির্দেশের আলোকে ইশা'র নামাযের পরে ৫০০ বার দরুদ পাঠ করেন। তিনি মনে করবেন-না যে, ৫০০ বার বা ইশা'র পরে পাঠের জন্য তাঁর কোনো বিশেষ সাওয়াব আছে। তিনি যোহরের পরে, আসরের পরে বা অন্য যেকোন সময়ে পাঠ করলেও একই সাওয়াব পাবেন। শুধুমাত্র তাঁর সুবিধার জন্যই তিনি ইশা'র পরে সময় নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভবে, তিনি জানেন যে, তিনি যেকোন সময়ে ৫০০ বার সালাতের জন্য ৫০০ বারেরই সাওয়াব পাবেন। ৪৯৯ বার পাঠ করলে তাঁর ওযীফা নষ্ট হবে, বা তিনি বিশেষ কোনো সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন – এরূপ চিন্তা খেলাফে-সুন্নাত। তিনি শুধুমাত্র একবার দুরুদ পাঠের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

তৃতীয়ত, দরুদ- সালামের ক্ষেত্রে খেলাফে-সুন্নত

(ক). দরুদ ও সালাম আদায়ে অবহেলা

সালাত ও সালামের ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন প্রকারের খেলাফে-সুন্নাত কাজ করে থাকি। সর্বপ্রথম খেলাফে সুন্নাত হলো এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালনে অবহেলা। সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত দরুদ পাঠ ছাড়াও জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত সালাত ও সালাম পাঠ ছিল সাহাবী, তাবেয়ীগণের সুন্নাত, যা আমরা ইতঃপূর্বে দেখলাম। কিন্তু আমরা অনেকে দ্বীনের মহব্বতের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এই ইবাদত পালনে অবহেলা করি। বিশেষত যেসকল সময়ে দরুদ পাঠ না করলে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তখনো আমরা দরুদ পাঠ করি না। যেমন তাঁর নাম শোনা বা লেখার সময়, কোনো মাজলিসে গল্পগুজব বা কথাবার্তার মধ্যে দরুদ পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা অনেকে এদিকে লক্ষ্য রাখি না। অনেকে দরুদ পাঠের ক্ষেত্রে কিছু খেলাফে-সুন্নাত দেখলে তার প্রতিবাদ করি, কিন্তু সুন্নাত অনুসারে সালাত-সালাম পাঠ করে নিজেকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে চাই না।

(খ). সমস্বরে, বানানো শব্দে বা পদ্ধতিতে দরুদ ও সালাম আদায় করা

অপরদিকে যারা সালাত-সালাম পাঠ করেন তাদের মধ্যেও অনেক খেলাফে-সুন্নাত কাজ রয়েছে। যেমন, সমবেতভাবে সমস্বরে দরুদ ও সালাম পাঠ করা, সুন্নাতের বাইরে নির্দিষ্ট শব্দ বা বাক্যকে দরুদ সালামের জন্য রীতি করে নেওয়া বা সালাত বা সালাম আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় বা পদ্ধতি খাস করে নেওয়া। যেমন, মনে করা যে বসা অবস্থায় দরুদ ও সালাম পাঠের চেয়ে দাঁড়িয়ে দরুদ বা সালাম পাঠ উত্তম বা এভাবে সালামের রীতি তৈরি করা। সুন্নাতের অতিরিক্ত বা সুন্নাতের বাইরে কোনো পদ্ধতি, শব্দ, সময় বা নিয়মকে মাসনূন পদ্ধতি, শব্দ বা সময়ের মতো বা তার চেয়ে উত্তম মনে করা অত্যন্ত কঠিন খেলাফে-সুন্নাত কাজ।

(গ). খেলাফে-সুন্নাত সময়ে দরুদ-সালাম পাঠের রীতি

এছাড়া সুন্নাতের বাইরে কোনো সময়ে বিশেষভাবে দরুদ সালাম পাঠ রীতি হিসাবে গ্রহণ করাও খেলাফে-সুন্নাত। বিশেষত যেসকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের নির্দিষ্ট সুন্নাত রয়েছে সেক্ষেত্রে, যেমন খাওয়ার আগে, পরে, আযানের আগে, নামাযের আগে, জায়নামাযে দাঁড়ানোর সময়ে, পশু জবাই করার সময়।

নামায শুরুর আগে ও সালামের পরে সমবেতভাবে দরুদ পাঠের অকাট্য! দলিল:

সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে কিভাবে আমরা বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হই তার একটি উদাহরণ বিবেচনা করুন। মনে করুন একস্থানের মুসলিমগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে ও পরে দরুদ-সালাম পাঠ করেন। তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে বা ইকামতের পূবে তাঁরা সমস্বরে কয়েকবার মসজিদ প্রকম্পিত করে দরুদ ও সালাম পাঠ করেন। অনুরূপভাবে সালামের পরেই সকলে সমস্বরে কয়েকবার দরুদ-সালাম পাঠ করেন। তাঁদের এই রীতির সপক্ষে অনেক অকাট্য !! সহীহ দলিল তাঁরা প্রদান করতে পারবেন।

তাঁরা বলবেন, দোয়ার আগে পরে দরুদ পাঠ করলে দোয়া কবুল হয় বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নামাযও দোয়া। নামাযের মধ্যে আমরা অনেক দোয়া করি। এজন্য নামাযের শুরুতে ও সালাম ফেরানোর পরে আমরা এভাবে দরুদ পাঠ করি। এছাড়া তাঁরা হয়ত দরুদের ফযীলতের বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করবেন, কখনো দরুদ পাঠ নিষিদ্ধ নয় তা বলবেন। হয়তো এই পদ্ধতিতে দরুদ পাঠ নিষেধকারীকে অপবাদ দিয়ে বলবেন যে, সে দরুদ পাঠ পছন্দ করে না, মুসলমানদেরকে দরুদ পাঠ করতে দেয় না।

যাঁদের এলাকায় এই রীতি প্রচলিত হয়নি তাঁরা এই রীতির কঠোর প্রতিবাদ করবেন। একে বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ বলে প্রমাণ করতে চাইবেন। আর পালনকারীগণ একে বিদ'আতে হাসানা বলে দাবি করবেন। বিরোধীগণকে সুন্নাত বিরোধী বা ওহাবী বলবেন।

সুন্নাতই ফযীলত পালনের মানদণ্ড

সুন্নাত প্রেমিক সুন্নী মুসলমানের জন্য এই বিতর্ক অর্থহীন। তার কাছে ইবাদত পালনের সর্বোত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ এসকল ফযীলতের কথা জানতেন, কিন্তু তাঁরা এভাবে নামাযের আগে ও পরে একাকী বা সমবেতভাবে দরুদ পাঠ করেননি বা করতে শেখাননি, যদিও তাঁরা তা করতে পারতেন। তাঁরা যে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান করেননি, সেকাজ আমরা করতে পারি না।

আমাদের দেশে অনেকে আযানের আগে দরুদ পাঠের রীতি তৈরি করেছেন। এই রীতিও একইভাবে বিদ'আত, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সাহাবীগণ আযান দিয়েছেন কিন্তু কেউ আযানের আগে নিয়মিত সালাত পাঠের রীতি পালন করেননি। আযান একটি প্রসিদ্ধ ইবাদত। এর জন্য মাসনুন পদ্ধতি রয়েছে। এর সাথে, আগে বা পরে কিছু যোগ করার অর্থই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপছন্দ করা, যদিও আমরা উপরের পদ্ধতিতে বিভিন্ন 'অকাট্য!' যুক্তি দিয়ে তা করে থাকি।

আযানের পরে দরুদ পাঠ সুন্নাত কিন্তু সমস্বরে পাঠ করলে বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ, সুন্নাত সময়ে খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতিতে সালাত সালাম আদায়ও গর্হিত কাজ। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আযানের পরে দোয়ার আগে দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ সে নির্দেশ ব্যক্তিগতভাবে পালন করেছেন। কখনো তাঁরা আযানের পরে সমস্বরে দরুদ পাঠ করেননি, যদিও তা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই সাধারণ নির্দেশের আলোকে যদি আমরা তাঁদের বর্জিত রীতিকে আমাদের রীতি হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

কেউ যদি আযানের পরে দরুদ পাঠের সময় শব্দ করেন, তাহলে তা দোষণীয় নয়। কিন্তু যদি তিনি মনে করেন যে, তার শব্দ করে দরুদের জন্য মনে মনে দরুদের চেয়ে বেশি সাওয়াব বা বরকত হচ্ছে, বা একে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে তা বিদ'আত হবে। তিনি হয়ত বলবেন, জোরে বললে অন্য মুসল্লীকে স্মরণ করানো হবে, ফেরেশতাগণ শুনবে ইত্যাদি। তবে যত অকাট্য!! যুক্তিই তিনি পেশ করুন, ফলাফল একই, যে কাজকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সাওয়াবের কারণ হিসাবে করেননি তা আমরা করব না। সবাই সমস্বরে জোরে জোরে দরুদ পাঠ করলে আরো কঠিন বিদ'আত হবে। এ সকল বিদ'আতের ফলে আযানের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত মৃত্যুবরণ করবে।

(ঘ). ঈদের নামাযের পরে সমবেত দরুদ সালাম পাঠ করা

জামাতে নামাযের আগে ও পরে জামাতে দরুদ পাঠের অনুরূপ একটি বিদ'আত আমাদের দেশে ক্রমান্বয়ে প্রচলিত হচ্ছে, তা হলো : ঈদের নামাযের শেষে সমবেতভাবে দরুদ সালাম পাঠ করা। আমরা দেখলাম যে, আযানের পরে দরুদ শরীফ পাঠ করার ফযীলতে ও নির্দেশে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। কিন্তু তা সশব্দে সমবেতভাবে পালনের রীতি তৈরি করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

অপরদিকে ঈদের নামাযের শেষে দরুদ সালামের ফযীলতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে একজন মুমিন সর্বদা দরুদ সালাম পাঠ করতে পারেন। কিন্তু এই সাধারণ ফযীলতের উপর নির্ভর করে কোনো রীতি তৈরি করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। বিশেষত তা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পালিত কোনো ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়।

ঈদের নামাযের পরে এভাবে দরুদ-সালাম পাঠকারীগণ বিভিন্নভাবে সুন্নাতের খেলাফ করেন ও বিদ'আতে লিপ্ত হন:

প্রথমত, নফল ইবাদত সমবেতভাবে জামাতবদ্ধভাবে পালন করা। আমরা জানি যে, শুধুমাত্র সে সকল নফল ইবাদত জামাতে আদায়ের জন্য সুন্নাতে স্পষ্ট নির্দেশনা আছে সেগুলি বাদে সকল নফল ইবাদত একাকী পালন করা সুন্নাত।

দ্বিতীয়ত, দরুদ, সালাম সশব্দে ও জোরে জোরে পাঠ করা। আমরা দেখেছি, দরুদ- সালাম সহ সকল যিক্‌র- আযকার ও

দোয়া মনে মনে পালন করা সুন্নাত। সুন্নাত নির্ধারিত স্থান ও সময় ছাড়া অন্য সময়ে সশব্দে এসকল ইবাদত পালন করা খেলাফে-সুন্নাত।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত পরিত্যাগ করা। তিনি জীবনে কখনো যা করেন নি তা করা এবং তিনি আজীবন যা করেছেন তা বর্জন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের শত শত বৎসরের প্রচলিত পদ্ধতি হলো ঈদের নামাযের খুত্‌বার সঙ্গে সঙ্গে নামায শেষ হয়ে যাওয়া। খুত্‌বার পরে সমবেত মুসল্লীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধামতো ঈদগাহ ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরে প্রায় দুইশত বৎসর যাবৎ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ সর্বদা খুতবার মাধ্যমে ঈদের নামায শেষ করেছেন। অপরদিকে তাঁরা সর্বদা ঈদের নামাযের শেষে দরুদ-সালাম পাঠ বর্জন করেছেন। পরবর্তী প্রায় হাজার বৎসর এভাবেই মুসলিম উম্মাহ ঈদের নামায আদায় করেছেন। বর্তমানে এসকল মুসলমান কর্ম ও বর্জন উভয় দিক থেকে সুন্নাতের বিরোধিতা করছেন।

চতুর্থত, রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর সুন্নাত অপছন্দ করা। যে সকল মুসলিম এভাবে দরুদ সালাম পাঠের **রীতি** চালু করেছেন, তাঁরা এখন আর সুন্নাত পদ্ধতির ঈদের নামায পছন্দ করতে পারবেন না। কেউ যদি ঈদের নামাযের শেষে এভাবে দরুদ-সালাম পাঠ না করে তাকে নিন্দা করবেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বেয়াদবীর অভিযোগে অভিযুক্ত করবেন। এভাবে তিনি মূলত সাহাবীগণসহ পূর্ববর্তী মুসলিম উম্মাহকে বেয়াদব বলে অভিযুক্ত করছেন এবং সর্বোপরি নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের চেয়েও বেশি মুত্তাকী বলে দাবি করছেন।

প্রিয় পাঠক, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতির বিরোধিতা বা ব্যতিক্রম করাকে এত সহজভাবে নেওয়া ঠিক নয়। কখনোই সাহাবীগণ ও পূর্বযুগের ইমামগণ সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো কাজ করা অনুমোদন করেননি। একারণেই তাঁরা ঈদের দিনে ঈদের নামাযের আগে কোনো নফল নামায, ইশ্‌রাক বা চাশ্‌তের নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। একমাত্র কারণ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আদায় করেননি। আল্লামা সারাখসী (৪৯০ হি.) ও আল্লামা কাসানী (৫৮৭ হি.) লিখেছেন : ঈদের নামাযের আগে নফল নামায আদায় করা মাকরুহ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের নামাযের আগে নফল নামায আদায় করেননি, যদিও নফল নামায আদায়ের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল খুবই বেশি।[১] হানাফী মযহাবের সকল গ্রন্থেই এ কথা পাবেন।

চিন্তা করুন! নফল নামায ইসলামের অন্যতম ইবাদত। বিশেষত সূর্যোদয়ের পরে ইশরাক ও দোহার নামাযের ফযীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এ সকল নফল নামায নিয়মিত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো হাদীসে বলেননি যে, ঈদের দিনে ঈদের নামাযের আগে নফল নামায পড়বে না। হতে পারে যে, বিশেষ কোন কারণে তিনি ঈদের দিনে এ সময়ে নফল পড়েননি। আমাদের উর্বর মস্তিষ্ক খাটালে আমরা অনেক কারণ বের করতে পারব। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম ও মুবারক যুগের ফকীহগণ এতসব বাজে চিন্তার পিছনে সময় নষ্ট করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ইবাদত করেননি তা আমরা কেন করব। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না, যদিও তা অনেক কল্যাণের কাজ হয়।

(ঙ). পশু জবেহ করার সময় দরুদ পাঠ: ইমাম আবু হানীফার মত

সুন্নাতের বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) সুস্পষ্ট ধারণা ও বিদ'আতের বিষয়ে তাঁর কড়াকড়ি সম্পর্কে আমরা আগে কয়েকটি উদাহরণ দেখেছি। আরেকটি উদাহরণ হলো পশু জবেহ করার সময় দরুদ পাঠ।

পশু জবাইয়ের সময় "আল্লাহর নামের যিক্‌র" করতে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোনোভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলেই আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থে "আল্লাহর নামের যিক্‌র" আদায় হবে। কেউ যদি "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ" বলেন তাহলেও আল্লাহর যিক্‌র করা হবে; কারণ তিনি "আল্লাহুম্মা" বলে আল্লাহকে ডাকছেন ও আল্লার নাম উচ্চারণ করছেন। এছাড়া "সাল্লি" বলে তাঁকেই ডাকছেন ও তাঁর কাছে নবীজী ﷺ-এর জন্য সালাতের দোয়া করছেন। তবে এই সময়ের মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিক্‌র হলো "বিসমিল্লাহ"। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ "বিসমিল্লাহ" বলে জবাইয়ের সময় "আল্লাহর নামের যিক্‌র" আদায় করতেন।[২]

ইমাম শাফেয়ী (রাহ.) এই মাসনূন যিক্‌রের পরে দরুদ পাঠ করা জায়েয বলেছেন ও পছন্দ করেছেন। তাঁর দলিল হলো, জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া বা 'বিসমিল্লাহ' বলা জরুরি। 'বিসমিল্লাহ' বলার পরে যদি কোনো অতিরিক্ত ভালো কথা বলা হয় তাতে দোষ কি? তিনি বলেছেন : "জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। যদি কেউ এরপরে কিছু অতিরিক্ত আল্লাহর যিক্‌রমূলক কিছু বলে তাহলে তা ভালো। বিসমিল্লাহর সাথে জবাইয়ের সময় 'সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিল্লাহ' (আল্লাহর রাসূলের উপর আল্লাহ সালাত পাঠান) বলা আমি অপছন্দ করি-না, বরং পছন্দ করি। আমি ভালবাসি যে, সকল অবস্থায় বেশি বেশি তাঁর উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করা হোক। কারণ সালাতের (দরুদের) মাধ্যমে আল্লাহর যিকর করা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর ইবাদত। এতে ইন্‌শা আল্লাহ, সাওয়াব পাওয়া যাবে।" দরুদ পাঠের জন্য যেসকল হাদীসে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে সেসকল হাদীসকে দলিল হিসাবে তিনি পেশ করেছেন।[৩]

ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) ও অন্যান্য অনেক ইমাম ও ফকীহ ইমাম শাফেয়ীর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা এ সময়ে দরুদ পাঠের বিরোধিতা করেছেন। তার কারণ –

প্রথমত, কোনো সময়ে নিয়মিত সুন্নাত বা নিয়মিত যিক্‌র হিসাবে দরুদ পাঠ করতে হলে হাদীসের প্রমাণের প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অগণিতবার পশু জবাই করেছেন, সাহাবীগণ পশু জবাই করেছেন, কিন্তু তাঁরা কখনো জবাইয়ের সময় দরুদ পাঠ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাঁরা জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেছেন, বা অন্যান্য দু'একটি দোয়া পড়েছেন, কিন্তু তাঁরা

কখনো এ সময়ে দরুদ পাঠ করেননি । জবাই করা একটি ইবাদত, এক্ষেত্রে সুন্নাতের অতিরিক্ত কিছু নিয়ম বা রীতি প্রচলন করা ঠিক নয়, কারণ তা বিদ'আতে পরিণত হবে ।

দ্বিতীয়ত, জবাইয়ের সময় দরুদ পাঠ করলে দরুদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম এসে যাবে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে জবাই করার মতো বিভ্রান্তিকর অনুভূতি এসে যেতে পারে । আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নিয়ে জবাই করলে তা শিরক হবে । দরুদ পাঠ যদিও আল্লাহর যিক্র তবুও যেহেতু দরুদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম রয়েছে তাই জবাইয়ের সময় দরুদ পাঠ ঠিক হবে না ।[১]

(৩). যিক্র আযকার বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত

প্রথমত, দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিক্রঃ ইবনু মাসঊদ (রা)-এর মত

রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করাই সুন্নাত । এ কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) কুফার যাকিররেকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন । এ ক্ষেত্রে উক্ত যাকিরগণ যা করেছেন তা সাধারণ নির্দেশনা ও উৎসাহ জ্ঞাপক হাদীসের আলোকে খুবই ভালো কাজ । কারণ অনেক হাদীসে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদি যিক্র বেশি বেশি আদায় করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । যিক্রের মাজলিসের প্রশংসাও হাদীসে করা হয়েছে । কিন্তু সাধারণ ফযীলতের হাদীস জানার পর সুন্নাত-প্রেমিক সুন্নী মুসলিমের প্রশ্ন হলো : এ সকল যিক্র আযকার ও যিক্রের মাজলিসের ক্ষেত্রে সুন্নাত কি ? অর্থাৎ, এ সকল নেক কাজগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কখন, কতটুকু ও কী-ভাবে পালন করেছেন ।

যিক্র ইসলামের অন্যতম ইবাদত । এ বিষয়ে কুরআন কারীমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । একা একা ও জনসমক্ষে সর্বদা আল্লাহর স্মরণ বা যিক্রে রত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আবার বিভিন্ন হাদীসে যিক্রের বিভিন্ন শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । অন্য অনেক হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোন্ যিক্র কখন কতটুকু করতে হবে বা সাহাবীগণ করেছেন । কোনো কোনো যিক্রের সময় নির্দষ্ট করে দেয়া হয়েছে, আবার কোনো কোনো যিক্র বেশি পরিমাণে করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে ।[২]

কুফার যাকিরগণের পক্ষে আমরা অনেক ‘অকাট্য!!’ দলিল পেশ করতে পারি । বলতে পারি যে, হাদীসে মাজলিসে ও জনসমাবেসে যিক্রের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে । তাহলে এভাবে মাজলিসে যিক্র করতে অসুবিধা কি? ফযীলতের কাজ যত বেশি করা যায় ততই ভালো । কিন্তু সুন্নাত প্রেমিক সাহাবীদের হৃদয় এ কথা মানতে পারেনি । ফযীলতের হাদীস পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে সর্বোত্তম আদর্শ বলে মনে করতেন । তাঁদের পদ্ধতির বাইরে কোনো ফযীলত আছে তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না ।

কুফার যাকিরগণের যিক্রের শব্দগুলি সবই সুন্নাত-সম্মত, কিন্তু পদ্ধতি সুন্নাতের বাইরে । এভাবে সমবেতভাবে গুণে গুণে যিক্রের পদ্ধতি সাহাবীগণের যুগে প্রচলিত ছিল না, তাই ইবনু মাসঊদ (রা.) এ সকল যিক্রকারীকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন । এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, যিক্রের ও যিক্রের মাজলিসের ফযীলত জ্ঞাপক সাধারণ হাদীসগুলিকে দলিল করে কেউ যদি যিক্রের এমন শব্দ, সংখ্যা, নিয়ম, রীতি বা পদ্ধতি চালু করেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল-না, তাহলে নিঃসন্দেহে তা বিদ'আত হবে এবং তাতে ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপছন্দ করা’ হবে, যার শাস্তি ভয়ঙ্কর ।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা দেখুন । প্রখ্যাত তাবেয়ী আবুল বাখতারী সাঈদ ইবনু ফাইরোয (৮৩ হি.) বলেন, মুস'আব যুবাইরী ইমামরূপে নামায শেষ করার পরে জোরে বলেন : (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার) । তখন তাবেয়ী শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবীদাহ ইবনু আমর আস-সালমানী (৭০ হি.)[৩], যিনি মসজিদে ছিলেন, বলেনঃ ! “আল্লাহ একে ধ্বংস করুন! বিদ'আতের জয়ধ্বনি দিচ্ছে ।”[৪]

একটু ভেবে দেখুন! এই ইমাম কিন্তু মাসনূন যিক্র পাঠ করেছেন । তবুও তাবেয়ীগণ সুন্নাতের সামান্য ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারতেন না । আমাদের যুগের বিভিন্ন আলেম হয়ত শতাধিক অকাট্য! দলিল পেশ করবেন যে, এই যিক্রটি মাসনূন এবং জোরে যিক্র জায়েয বা মুস্তাহাব । কাজেই, এভাবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার” – বলতে যে নিষেধ করে সে কাফির !! কিন্তু সাহাবী-তাবেয়ীগণের নিকট এ সকল অকাট্য!! দলিলের কোনো মূল্য ছিল না । তাঁদের নিকট একমাত্র মূল্য হলো সুন্নাতের । রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যখন যেভাবে যিক্র করেছেন তার কোনোরূপ ব্যতিক্রম তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না ।

দ্বিতীয়ত, যিক্রের ক্ষেত্রে কিছু সুন্নাত

উপরের কথাগুলি বুঝলেই হবে না । আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে সর্বদা মাসনূন পদ্ধতিতে যিক্র আদায় করা ও খেলাফে-সুন্নাত যিক্র ও যিক্র পদ্ধতি বর্জন করা । এজন্য আমি এখানে যিক্র বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত আলোচনা করছি । আরো বিষদ আলোচনার জন্য পাঠককে আমার লেখা “রাহে বেলায়াত” বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি । আমি অগণিত গোনাহের বোঝা কাঁধে নিয়ে অনুতাপ ও বিনয়ের সাথে মহান আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য প্রার্থনা করছি । পরম করুণাময় ক্ষমাশীল আল্লাহ দয়া করে আমাকে, আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়, শিক্ষকগণ ও পাঠকগণকে ক্ষমা করুন । পাঠক, দয়া করে ‘আমীন’ বলুন । আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন ।

(ক). সর্বদা যিক্‌র করা

যিক্‌রের ক্ষেত্রে অন্যতম সুন্নাত হলো সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে জিহ্বাকে আর্দ্র রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বাবস্থায়, এমনকি নাপাক অবস্থায়, গোসল ফরয থাকা অবস্থায়ও আল্লাহর যিক্‌র করতেন। শুয়ে, বসে দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌রে জিহ্বাকে আর্দ্র রাখতে হবে। হাদীসে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সর্বদা যিক্‌রে ঠোঁট নাড়াতে ও জিহ্বাকে আর্দ্র রাখতে।

(খ). যিক্‌রের প্রকারভেদ : কর্মের যিক্‌র ও মুখের যিক্‌র

যিক্‌র প্রথমত দু প্রকার: কর্মে ও মুখে। কর্মের মাধ্যমে যিক্‌র হলো – সর্বদা আল্লাহকে মনের মধ্যে রেখে তাঁরই নির্দেশ মতো জীবনের সকল কর্ম পরিচালনা করার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র করা। মুখের যিক্‌র তিন পর্যায়ের:

সর্বোত্তম পর্যায় জিহ্বা ও অন্তরে একত্রে যিক্‌র করা, ২য় পর্যায় শুধু অন্তরে যিক্‌র করা এবং ৩য় পর্যায় অমনোযোগী অন্তর নিয়ে শুধু মুখে যিক্‌র করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অনুযায়ী সর্ব প্রকারের যিক্‌রই প্রয়োজন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে যিক্‌রের কারণে মুখের যিক্‌র কখনো বাদ দেননি। আবার মুখে সর্বদা যিক্‌র করে কর্মে আল্লাহর নির্দেশাবলী অমান্য করেননি। সর্বদা মুখে তাঁর যিক্‌রে রত থাকা ও কর্মে তাঁর অনুগত থাকাই যিক্‌রের সুন্নাত।

(গ). আল্লাহর মর্যাদা জপ করা ও তাঁর বিধিবিধান আলোচনা করা

বিভিন্নভাবে যিক্‌র করা যায়। যিক্‌র অর্থ স্মরণ করা। আল্লাহর গুণ বা প্রশংসা বাচক কোনো বাক্য স্মরণ করা যেমন যিক্‌র, তেমনি আল্লাহর বিধি বিধান, পুরস্কার, শাস্তি, তাঁর নবী, রাসূল, তাঁর কিতাব ইত্যাদি সবকিছুর স্মরণই যিক্‌র। এককথায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ের স্মরণই 'আল্লাহর যিক্‌র' বলে গণ্য।

(ঘ). যিক্‌রের শব্দ

যেকোনোভাবে, যেকোনো ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা, স্তুতি, স্মরণ, প্রার্থনা সবই যিক্‌র হিসাবে গণ্য। তবে বারবার উচ্চারণের মাধ্যমে বা জপ করে যে যিক্‌র করা হয় সে যিক্‌রের জন্য হাদীস শরীফে বিভিন্ন বাক্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সেগুলির মধ্যে সুবহা-নাল্লাহ, আল'হামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, আসতাগফিরুল্লাহ, ইত্যাদি অন্যতম। এসকল যিক্‌রকে সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, অর্থাৎ ফজর, আসর ও মাগরিবের নামাযের পরে নির্দিষ্ট সংখ্যায় এবং সর্বদা অনির্ধারিতভাবে যত বেশি সম্ভব জপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এসকল যিক্‌রের অতুলনীয় সাওয়াব, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাযত ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ). একাকী যিক্‌র বনাম যিক্‌রের মাজলিস

যিক্‌র দুইভাবে পালন করা যায়, একাকী ও সমবেতভাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, যে যিক্‌র একাকী পালন করা যায় তা তাঁরা সাধারণত একাকী ও নীরবে বা মৃদু শব্দে পালন করতেন। তা হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলী জপ করা, ইসতিগফার, দোয়া, দরুদ, সালাম বা কুরআন তিলাওয়াতের যিক্‌র। আর যে যিক্‌র একাকী পালন করা যায় না, বরং একাধিক মানুষের প্রয়োজন হয় সে যিক্‌র তাঁরা সমবেত হতেন। তা হলো কুরআন আলোচনা, আল্লাহর বিধিবিধান, পুরস্কার, শাস্তি, জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহর নেয়ামতের কথা ইত্যাদি যিক্‌র করতে তাঁরা সমবেত হতেন। এজন্য ইসলামের প্রথম যুগগুলিতে 'যিক্‌রের মাজলিস' বলতে 'ওয়াজ, নসীহত ও আলোচনার মজলিস' বোঝান হতো। ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতেও এই অবস্থা ছিল। ইমাম গাযালীর "এহ্‌ইয়াউ উলূমিদ্দীন"-এর 'যিক্‌রের মাজলিস' বিষয়ক আলোচনা পাঠ করলেও বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সাধারণ যিক্‌র গোপনে ও চুপে চুপে করতে সুন্নাতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাহাবীগণ সেভাবেই করেছেন। তবে কোনো কোনো সময়ে মসজিদে বসে যিক্‌রে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যেমন - সকালে ফজরের পরে, বিকালে আসরের পরে এবং ইতিকাফের সময়। বিশেষত ফজরের নামায জামাতে আদায়ের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিক্‌রে রত থাকা ও সূর্যোদয়ের পরে দুই বা চার রাক'আত ইশরাক বা দোহার নামায আদায় করতে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এই ইবাদতের জন্য একটি পরিপূর্ণ হজ্ব ও একটি পরিপূর্ণ ওমরার সাওয়াব হবে বলে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ও সাহাবীগণ এই আমল করতেন। তাঁরা প্রত্যেকে বসে বসে এসময়ে ব্যক্তিগতভাবে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ ইত্যাদি যিক্‌রে রত থাকতেন। পরবর্তী সময়ে সালফে সালেহীন এই সময়ের যিক্‌রের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব প্রদান করতেন। আমাদের সকলেরই উচিত এই সময়ে অন্তত যিক্‌রে রত থাকা। মু'মিনের জীবনের এই যিক্‌রের প্রভাব খুবই বেশি।

আমি "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থে যিক্‌রের মাজলিস বিষয়ক হাদীস ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ সাধারণত আলোচনার জন্যই যিক্‌রের মাজলিস করতেন এক্ষেত্রে তাঁরা পরস্পরে আল্লাহর কথা আলোচনা করতেন, তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করতেন ও করাতেন, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করতেন। এছাড়া সকলে দোয়া ও তাওবা-ইসতিগফারের মাধ্যমে কাঁদাকাটা করতেন। এছাড়া এ সকল যিক্‌র পালনের সাথেসাথে মাসনূন জপমূলক যিক্‌রের বাক্যগুলি জপ করতেন। সহীহ হাদীসের আমরা যিক্‌রের মাজলিসে নিম্নলিখিত যিক্‌রগুলি পালনের নির্দেশনা পাই :

(১) কুরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও আলোচনা, (২) ওয়ায নসীহত, (৩) আল্লাহর নেয়ামত আলোচনা, (৪) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করে দোয়া করা, (৫) জান্নাত প্রার্থনা করা, (৬) জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, (৭) ইসতিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৮) "তাসবীহ" বা (সুবহানাল্লাহ) বলা, (৯) "তাকবীর" বা (আল্লাহু আকবার) বলা, (১০)

তাহলীল বা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা, (১১) "তাহমীদ" বা (আল হামদু লিল্লাহ) বলা (১২) সালাত বা দরুদ পাঠ করা।

সাহাবীগণ এসকল যিক্র আদায়ের জন্য যিক্রের মাজলিস প্রতিষ্ঠা করতেন। তাসবীহ, তাহলীল, দরুদ ইত্যাদি জপমূলক যিক্রের ক্ষেত্রে তাঁরা তা সমস্বরে, সুর করে, ঐক্যতানে বা জামাতবদ্ধভাবে পালন করতেন না। আলোচনা ও ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেকে যার যার মতো যিক্রে রত থাকতেন। এসকল মাজলিস আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি করে ও ঈমানের দৃঢ়তা আনে। এছাড়া সমবেত মু'মিনদের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন হাদীসে এধরনের মাজলিসের প্রসংসা করা হয়েছে।[১]

তৃতীয়ত, যিক্রের ক্ষেত্রে কিছু খেলাফে-সুন্নাত

আমাদের দেশে অনেকেই যিক্রের ইবাদত পালনে আগ্রহী। বিশেষ করে আমাদের দেশে বিভিন্ন তাসাউফের তরীকায় বিভিন্ন প্রকারের যিক্র করা হয়। এসব ক্ষেত্রেও আমরা সাধারণ ফযীলতের হাদীসগুলি পালন করতে যেয়ে বিভিন্ন পদ্ধতি তৈরি করে ইবাদতের অংশ করে নিয়েছি, যেসকল পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনোই যিক্র করেননি। কুফার যাকিরগণ শুধুমাত্র পদ্ধতিগতভাবে সামান্য ব্যতিক্রম করেছিল বলে তাঁদেরকে কী কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন ইবনু মাসঊদ (রা.)। আমরা পদ্ধতি ছাড়া যিক্রের শব্দের ক্ষেত্রেও সুন্নাতের খেলাফ করে থাকি। এখানে সংক্ষেপে কিছু খেলাফে-সুন্নাত বিষয় উল্লেখ করছি :

(ক). 'আল্লাহ, আল্লাহ,... ' যিক্র

গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম বিশ্বের কোনো কোনো তাসাউফের তরীকায় আল্লাহ তা'লার মহান নাম বারবার উচ্চারণের মাধ্যমে বা জপ করে যিক্র করা হয। আমাদের দেশের প্রচলিত কাদেরীয়া তরীকাতে এই যিক্র রযেছে। চিশ্‌তিয়া তরীকায় (নিযামিয়া) এই যিক্র নেই। এতে কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্র রয়েছে। নকশাবন্দীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (৭৯১ হি.) শুধুমাত্র (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) যিক্রের প্রচলন করেন। প্রায় দুই শতাব্দী পরে এই তরীকার অন্যতম সাধক খাজা বাকি বিল্লাহ, রাহিমাহুল্লাহ (১০১২ হি.) এতে 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ, ... ' যিক্র যোগ করেন। তবে এই তরীকার যিক্র মূলত মনের যিক্র, মুখের উচ্চারণ বা শব্দের যিক্র নয়। কাজেই, তা আমাদের আলোচনায় সরাসরি আসে না। কারণ মনের মধ্যে আল্লাহর নাম, মাহাত্ম্য, মর্যাদা, প্রসংসা ইত্যাদি স্মরণ করা 'তাযাক্কুর কলবী' অন্য ইবাদত। আমরা মূলত মুখে জপ করে যিক্র করার মাসনূন পদ্ধতি আলোচনা করছি। এখানে কয়েকটি বিষয় ভাবতে হবে:

প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাঁর নামের যিক্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[২] কুরআনে ও হাদীসে 'আল্লাহর যিক্র' করতে বলা হয়েছে। এ থেকে আমরা সাধারণভাবে মনে করি যে, আল্লাহর যিক্র ও আল্লাহর নামের যিক্র অর্থ 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ,...' শব্দ মুখে জপ করা। কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের দিকে তাকাই তখন দেখি তাঁরা এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা যা বুঝি তা বুঝেননি।

আমরা বুঝলাম যে, আল্লাহর নামের যিক্র অর্থ 'আল্লাহ' শব্দ বারবার বলে যিক্র করা। অথচ তাঁদের জীবনে আমরা কোথাও দেখতে পাই না যে, তাঁরা কখনো কোথাও শুধু 'আল্লাহ' নাম জপ করে যিক্র করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সকাল-সন্ধ্যায় বা অন্য কোনো সময়ে বা সর্বক্ষণ 'আল্লাহ' শব্দ বারবার উচ্চারণ করে যিক্র করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের শিক্ষা ও কর্ম থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহর নামের যিক্র বলতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাঁর নামের প্রশংসা, মর্যাদা বা মহত্ত্ব প্রকাশ করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন : "এবং তাঁর রবের নামের যিক্র করে নামায পড়ল।"[৩] এ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু আল্লাহর নামের যিক্র বা 'আল্লাহ' শব্দ একবার বা বারবার বলে নামাযের তাহরীমার রীতি করলেন না, বরং 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরুর রীতি করলেন। অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহ শুধুমাত্র "আল্লাহু আকবার" যিক্র দ্বারা নামায শুরু করা বাধ্যতামূলক বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেছেন যে, 'আররাহমান আ'যম', 'আররাহীমু আ'জম', আররাহমানু আজাল্ল', 'আর-রাহীমু আজাল্ল' ইত্যাদি যিক্র দ্বারা নামাযের তাহরীমা বাঁধা জায়েয।[৪] কিন্তু এখানে আল্লাহর নামের যিক্র বলতে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ বলে তারা কেউ মনে করেননি।

দ্বিতীয়ত, হাদীসে বিভিন্ন শব্দ বা বাক্য বেশি বেশি জপ করে যিক্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে : বেশি বেশি 'আল্লাহু আকবার' বলবে, বেশি বেশি 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, বা 'সুবহানাল্লাহ' বললে এত সাওয়াব... ইত্যাদি। কিন্তু কোথাও কোনো হাদীসে বলা হয়নি যে, বেশি বেশি 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলবে, বা একবার বা ১০০ বার 'আল্লাহ' উচ্চারণ করলে এত সাওয়াব হবে।

তৃতীয়ত, আরবের কাফিরগণও আল্লাহকে আল্লাহ নামে ডাকত ও স্মরণ করত। এখনো আরবের ইহুদি-খ্রিষ্টানগণ আল্লাহকে 'আল্লাহ' নামে ডাকে ও স্মরণ করে। এজন্য আল্লাহর একত্ব, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ব্যতীত শুধুমাত্র 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কোনো প্রকার ইবাদত বা ফযীলত অর্জন হয় না। বাহ্যত একারণেই শুধুমাত্র 'আল্লাহ' শব্দ জপ করার কোনো ফযীলত কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। হাদীস শরীফে যত প্রকার যিক্রের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সবই আল্লাহর একত্ব, মর্যাদা ও প্রশংসা বোধক বাক্য, শুধুমাত্র শব্দ নয় বা নাম নয়। যিক্রের মাধ্যমে মুমিনের উদ্দেশ্যও তো নিজের হৃদয়কে আল্লাহর একত্ব ও মহত্ত্বের অনুভূতিতে ভরে নেওয়া, যেন সেখানে আর কারো অবস্থান না থাকে।

চতুর্থত, মুমিন যখন আল্লাহর মুবারক নাম উচ্চারণ করেন তখন আল্লাহর মহত্ত্বের ও মহব্বতের কথাই তাঁর মনে হয়। বারবার আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নাম মুবারাক উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি চান যে, তাঁর হৃদয় থেকে আল্লাহ ছাড়া আর সকল কিছুর স্মরণ দূর করে দিবেন। তাঁর মনে শুধু আল্লাহর মহত্ত্ব, মর্যাদা, ভয়, ভালবাসা, তাঁর হুকুম পালনের আগ্রহ ও তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার আকুতি থাকবে। এগুলি সবই ক্বলবী যিক্‌র এবং ইবাদত। কিন্তু এই ইবাদত ও ক্বলবী হালত অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ শুধু 'আল্লাহ' শব্দ বারবার উচ্চারণ করাকে মাধ্যম বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেননি, যদিও তা করা তাঁদের জন্য সম্ভব ছিল। অর্থাৎ, তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক এই যিক্‌র বর্জন করেছেন। তাঁরা এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর নামের সাথে তাঁর একত্ব, প্রশংসা বা মর্যাদা বোধক শব্দ যোগ করে যিক্‌র করেছেন। শুধু সুন্নাতের অনুসরণই নয়, স্বাভাবিকভাবে যুক্তির দিক থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মাধ্যম অধিকতর উপযোগী। কারণ শুধুমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর একত্ব বা মহত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রত করার চেয়ে মুখেও সে কথাটি বলা ও মনে তা স্মরণ করাই তো বেশি উপযোগী।

পঞ্চমত, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম মুবারক বারবার উচ্চারণ করে যিক্‌র করেননি বা এভাবে যিক্‌র করলে কোনো সাওয়াব হবে তা বলেননি, এজন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নাম বারবার মুখে উচ্চারণ করলে উচ্চারণের জন্য কোনো সাওয়াব হবে তা বলতে পারি না। হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, একবার দরুদ পাঠ করলে ১০ টি সাওয়াব পাওয়া যাবে, একবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে মীযান ভরে যাবে, একবার 'সুবহানাল্লাহ' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে এই পরিমাণ সাওয়াব হবে। কিন্তু আমরা বলতে পারছি না যে, একবার 'আল্লাহ' শব্দ জপ করলে এই পরিমাণ সাওয়াব হবে, কারণ হাদীসে তা কোথাও বলা হয়নি। তবে আমরা আশা করি যে, এভাবে (আল্লাহ, আল্লাহ,...) উচ্চারণের ফলে যাকিরের মনে আল্লাহর একত্বের, মহত্ত্বের, তার প্রতি মহব্বতের, ভয়ের, তাঁর কাছে যাওয়ার বা তাঁকে ছাড়া সবকিছুকে ত্যাগ করার যে অনুভূতি প্রসারিত হচ্ছে সেজন্য তিনি সাওয়াব পাবেন। কারণ এগুলি সবই মাসনূন ক্বলবী ইবাদত।

তবে যাকিরের জন্য অবশ্যই উচিত যে, এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মাসনূন জবানী যিক্‌র করা। তাহলে তিনি মনের যিক্‌রের পাশাপাশি মুখে উচ্চারণের জন্যও সাওয়াব পাবেন। সাধারণ আয়াত ও হাদীসকে আমাদের বুদ্ধিমতো ব্যাখ্যা না করে আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের আলোকে আমাদের বুদ্ধি ও ভালোলাগা-মন্দলাগাকে নিয়ন্ত্রিত করা।

ষষ্ঠত, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম উম্মাহর সূফীগণের মধ্যে "আল্লাহ, আল্লাহ,আল্লাহ,..." জপ করার যিক্‌র প্রচলিত। গত কয়েক শতাব্দীতে এবং বর্তমান যুগে অনেক প্রখ্যাত প্রাজ্ঞ আলেম এই যিক্‌র সমর্থন করেছেন এবং এর বরকতময় প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমার জানা মতে তাঁরা কেউই উল্লেখ করেননি বা দাবিও করেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ শুধুমাত্র "আল্লাহ, আল্লাহ,..." জপ করে যিক্‌র করতেন। বরং তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, এই যিক্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ ও প্রথম তিন যুগে প্রচলিত ছিল না। তবে তাঁরা দাবি করেছেন, যে কোনো শব্দে বা বাক্যে "আল্লাহর স্মরণ" বা জপ করলেই "আল্লাহর যিক্‌রের" মূল ইবাদত পালিত হবে। কাজেই "আল্লাহ, আল্লাহ,..." জপ করা জায়েয এবং এতে যিক্‌রের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

তাঁদের এসকল আলোচনা থেকে আমি বুঝেছি যে, "আল্লাহ, আল্লাহ,..." জপ করার যিক্‌র মাসনূন বা সুন্নাত নয়, তবে জায়েয এবং এই যিক্‌রের মাধ্যমে যাকির অনেক ক্বালবী ফায়দা লাভ করেন। আমি প্রথম থেকেই বলেছি যে, আমাদের এই গ্রন্থ সুন্নাতের সন্ধানে ও সুন্নাতকে পালন ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবিত করার মানসে। এজন্য আমাদের উচিত সাধ্যমত সুন্নাত যিক্‌র করা এবং সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু ফায়দা অর্জিত হয় তাতে তুষ্ট থাকা।

(খ). 'ইল্লাল্লাহ', 'ইল্লাল্লাহ' ... যিক্‌র

প্রচলিত সূফী তরীকাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র চিশতিয়া তরীকার একটি ভগ্নাংশ 'চিশতিয়া সাবেরীয়া' তরীকায় এই যিক্‌রটি প্রচলিত। এছাড়া অন্য কোনো তরীকায় এই যিক্‌র নেই। কুরআন কারীমে, হাদীস শরীফে, সাহাবীগণের কর্মে ও পরবর্তী শত শত বৎসরে এই যিক্‌র পাওয়া যায় না। হাদীসের আলোকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই'। সর্বদা বেশি বেশি এই যিক্‌র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমান্য ছোট্ট বাক্যটি উচ্চারণ করতে কষ্ট হবে এবং তাকে ভেঙ্গে অর্ধেক করে নিয়ে শুধু 'ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া' বলে যিক্‌র করতে হবে সে চিন্তা প্রথম যুগে ছিল না।

আগেই বলেছি, এই যিক্‌র কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি বা এর কোনো ফযীলতও কেউ বলেননি। শুধুমাত্র আরবি ব্যাকরণের কায়দায় একে জায়েয বলা হয়। ব্যাকরণের যে নিয়মে একে জায়েয বলা হয় সে নিয়মটি অত্যন্ত দূরবর্তী, সেই নিয়মে একটি বাক্যও কুরআন কারীমে নেই। এর চেয়েও অনেক অতিপ্রচলিত নিয়ম আছে, যে নিয়মের অনেক বাক্য কুরআন কারীমে রয়েছে। আমরা কি এসকল ব্যাকরণের নিয়মে যিক্‌র তৈরি করার অধিকার রাখি? তাহলে আর সুন্নাতের প্রয়োজন কি?

যেমন, বাক্যের উদ্দেশ্যকে উহ্য রেখে শুধুমাত্র বিধেয় উল্লেখ করা ব্যাকরণে সিদ্ধ ও কুরআনে এর অনেক উদাহরণ আছে। এর আলোকে কি আমরা যিক্‌র হিসাবে 'আল্লাহ আকবার'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'আকবার, আকবার, ... ' বলে যিক্‌র করব? ব্যাকরণের নিয়মে বিশেষ্যের পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবহার করা যায়। এ নিয়মে কি আমরা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দ বাদ দিয়ে এখন থেকে কেবল 'ইল্লাহু' শব্দ জপ করে যিক্‌র করতে শুরু করব?

আমরা অনেকে 'ইল্লাল্লাহ' যিক্‌রের পূর্বে কিছু কথা বলি, যার সংক্ষেপ অর্থ হলো : 'হে আল্লাহ আসমান জমিনে আপনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই..." –একথা বলে 'ইল্লাল্লাহ' বা 'আল্লাহ ছাড়া' বারংবার বলে যিক্‌র করতে থাকি। ব্যাকরণের নিয়মে আমাদের এখানে 'ইল্লাল্লাহ' না-বলে 'ইল্লা আনতা' বা 'ইল্লাকা' অর্থাৎ 'আপনি ছাড়া' বলা উচিত।

এভাবে যদি ব্যাকরণের নিয়মে যিক্‌র বানানোর অনুমতি আপনারা দেন তাহলে আমি আপনাদেরকে শত শত যিক্‌র তৈরি করে দিতে পারব। আল্লাহ আমাদের প্রবৃত্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দিয়ে গিয়েছেন তার অনুগত করে দিন। তাঁর সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছু পছন্দ করার ব্যাধি থেকে আমাদের হৃদয়কে মুক্ত করুন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমরা কেন এগুলি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো যিক্‌রগুলিই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? কোনো কারণে কি আমরা বাধ্য হয়েছি এগুলি করতে?

(গ). সুন্নাত ছেড়ে "ফযীলতের দলিল" দিয়ে যিক্‌র বানানোর পরিণতি

ব্যাকরণের নিয়ম তো অনেক দূরের কথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মপদ্ধতি বা সুন্নাত বাদ দিয়ে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত ও স্পষ্ট হাদীস দিয়ে যিক্‌র তৈরি করলেও আমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে যাব। একটি উদাহরণ দেখুন। উপরের আয়াতে দেখেছি – আল্লাহ তাঁর নাম যিক্‌র করে নামায শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমদের মধ্যে হয়ত কেউ এই আয়াত অবলম্বন করে নামাযে দাঁড়িয়ে, নামায শুরুর আগে 'আল্লাহ, আল্লাহ,...' যিক্‌র করা ওয়াজিব বলে প্রমাণ করবেন। অথবা বলতে পারবেন : আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা নামায শুরু করতে হবে। আর (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) শ্রেষ্ঠ যিক্‌র। কাজেই, এই যিক্‌র দ্বারা নামায শুরু করলে বেশি সাওয়াব। এরপরে হয়ত (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) যিক্‌র দ্বারা নামায শুরু করার সুন্নাত জারি করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি বলে অসুবিধা কি? বিদ'আতে হাসানার পথ তো খোলাই আছে। তিনি বলবেন: 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করা সুন্নাত। আর (আল্লাহ, আল্লাহ,...) বলে অথবা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) বলে শুরু করা বিদ'আতে হাসানা। আফযালুয যিক্‌র হিসাবে এতে সাওয়াব বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জন না দেখে শুধু কুরআন ও হাদীস দিয়ে ইবাদত তৈরি করলে এভাবে আমরা অনেক কিছুই তৈরি করতে পারব।

(ঘ). সমবেতভাবে, সমস্বরে, বিশেষ পদ্ধতি বা আঘাত করে যিক্‌র করা

ইতঃপূর্বে একাধিকবার আমরা উল্লেখ করেছি যে, সমবেতভাবে বা সমস্বরে যিক্‌র খেলাফে-সুন্নাত। যে যিক্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ জোরে করেছেন তা জোরে করা সুন্নাত। বাকি সকল যিক্‌র আস্তে আস্তে, মনে মনে বা মৃদুশব্দে করা সুন্নাত। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কোনো কর্ম সুন্নাত না বিদ'আত তা নিশ্চিত না হতে পারলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। এজন্য যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোরে যিক্‌র করেছেন কি করেননি বলে দ্বিধা দেখা দেবে সেখানে জোরে যিক্‌র পরিত্যাগ করতে হবে এবং আস্তে আস্তে বা মৃদুশব্দে যিক্‌র করতে হবে। কারণ যিক্‌রের মূল সুন্নাত হলো গভীর আবেগ, ভক্তি ও ভয়ের সাথে মৃদুশব্দে যিক্‌র করা।

অনুরূপভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে শব্দাঘাত দিয়ে যিক্‌রও খেলাফে-সুন্নাত। এসকল পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো ব্যবহার করেননি। শুধু তাই নয় আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১ হি.), মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (৬৩৩ হি.)- রাহিমাহুমাল্লাহ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সূফী তরীকা-প্রধানদের জীবনে, কর্মে বা তাঁদের লেখা কোনো বইয়ে এসকল যিক্‌র বা যিক্‌র পদ্ধতির কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তাসাউফের মূল হলো ফরয- ওয়াজিব পালনের পরে বেশি বেশি নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা, যেন আমাদের হৃদয় আল্লাহ ভীতি, তাওবা, সবর, শোকর, রেজা, তাকওয়া, ক্রন্দন, সংসার ত্যাগ, লোভ লালসা বর্জন, হিংসা বর্জন ইত্যাদি হৃদয়জ গুণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের হৃদয়ের মতো হয়। সকল নফল ইবাদতের মধ্যে যিক্‌র অন্যতম। পূর্ববর্তী সূফীগণ এ বিষয়ে মাসনূন যিক্‌রের উপর নির্ভর করতেন। আমাদের দেশে প্রচলিত দুই সূফী তরীকার প্রধান আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) ও মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর (রহ.) লেখা বই পুস্তকাদি পাঠ করলেই বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যাবে। তাঁরা বিভিন্ন নফল নামায, রোযা, দান ইত্যাদির পাশাপাশি বহুসংখ্যক মাসনূন যিক্‌র উল্লেখ করেছেন।

বস্তুত, গত কয়েক শতাব্দীতে কোনো কোনো তাসাউফের পথপ্রদর্শক মূরীদের মনোযোগ সৃষ্টি বা একাগ্রতা ও আন্তরিকতা সৃষ্টির প্রয়োজনে প্রথম দিকে সালেককে এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে যিক্‌র করতে নির্দেশ দিতেন। এভাবেই সাময়িকভাবে কিছু সময় 'ইল্লাল্লাহ' বলতে, 'আল্লাহ, আল্লাহ,...' বলতে, বা সমস্বরে যিক্‌র করতে, বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে শব্দাঘাত করে যিক্‌র করতে বলতেন। যেন এসকল মূরীদ কিছুদিনের মধ্যে সুন্নাত-পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও ভয়ভীতির সাথে যিক্‌র করতে সক্ষম হয়। অনুরূপভাবে কেউ কেউ যিক্‌রের পূর্বে বিভিন্ন বাক্য দ্বারা "নিয়েত" পাঠ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলি সবই খেলাফে সুন্নাত কর্ম। কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ ও প্রথম তিন যুগের বুজুর্গগণ এগুলি করেন নি। এমনকি পরবর্তী হাজার বছরেও এগুলি কেউ করেন নি। পরবর্তী কালে যারা করেছেন তাঁরা একান্তই সাময়িক চিকিৎসা হিসাবে করেছেন বা করতে শিখিয়েছেন।

খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতি বা চিকিৎসার মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই, মূল যিক্‌রের মধ্যেই সাওয়াব ও নৈকট্য বা বেলায়াত। পদ্ধতি সুন্নাত মতো হলে পদ্ধতিতেও সাওয়াব। এজন্য সকল তরীকায় একটু অগ্রসর পর্যায়ে এসকল পদ্ধতি বর্জন করা হয়েছে। এই চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা তাঁদের ইজতিহাদ ছিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কারণে তাঁরা এগুলিকে অমনোযোগিতা দূর করা ও পরিপূর্ণ আত্মিক উপস্থিতি আনয়নের জন্য সাময়িক চিকিৎসা হিসাবে মুরীদগণকে শিখিয়েছেন।

পরবর্তী অনুসারীদের অজ্ঞতার কারণে এগুলি ইবাদতের অংশ বা মূল ইবাদতে পরিণত হয়েছে। এমনকি আমরা এখন যিক্‌র বলতে এসকল পদ্ধতিকেই বুঝি। যিক্‌র বলতে আমরা শুধু এগুলিই বুঝি। আমরা শুধু যিক্‌রেই নয়, এসকল পদ্ধতিতেও সাওয়াব, বরকত বা আল্লাহর নৈকট্য কিছু বেশি পাব বলে মনে করছি। এখন যদি কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে যিক্‌র করেন তাহলে আমরা তাকে যাকিরই ভাবব না। এ সকল বিষয়ে আমাদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন। ইবাদতকে ইবাদতের স্থানে ও উপকরণকে উপকরণের স্থানে রাখা প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া উপকরণ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আমাদের সুন্নাতের বাইরে না-যাওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে সর্বদা সুন্নাতের মধ্যে থাকার আগ্রহ ও সামার্থ প্রদান করুন।

(ঙ). যিক্‌রের ইবাদত পালনে অবহেলা

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা অনুসারে ইসলামের অন্যতম, সহজতম অথচ অত্যন্ত বেশি সাওয়াব, বরকত, আত্মিক ও মানসিক স্থিতি, প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি প্রদান কারী এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার সর্বোত্তম মাধ্যম এই ইবাদত পালনে অনেক ইসলাম প্রেমিক মুসলমান অবহেলা করেন। মূলত আমরা ব্যক্তিগত আলস্যের কারণে ও শয়তানের কুমন্ত্রণার অধীনে যেয়ে এই মহা মূল্যবান ইবাদত পালনে অবহেলা করি।

কিন্তু দুঃখজনক হলো, আমরা অনেকে আমাদের এই আলস্য ও অবহেলাকে স্বীকার করার ভয়ে আরেকটু এগিয়ে আমাদের আলস্যকে ও ইবাদত বর্জনকে ভালো বা ইসলামের জন্য কল্যাণকর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করি। হয়তো বলি যে, মুখের যিক্‌রে কী লাভ, অমুক তো যিক্‌র করেও গোনাহের কাজ করছে। শয়তানের কী কুমন্ত্রণা ! কত মানুষ তো নামায পড়েও কত অন্যায় করছে, এজন্য কি আমরা নামায ছেড়ে দেব? অন্য ব্যক্তি তাঁর ভালো বুঝল-না এজন্য আমরাও আমাদের কিসে ভালো হবে তা বুঝব না?

কখনো বলি, কুরআন হাদীসে মুখের যিক্‌রের কথা বলা হয়নি, কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে। এ কথাও অত্যন্ত ভুল কথা। কুরআন ও হাদীসে কর্মের যিক্‌র ও মুখের যিক্‌র উভয়েরই পরিপূর্ণ গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে ঠোঁট নাড়াতে ও জিহ্বাকে ভিজিয়ে রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়া সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায়, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ও শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে বিভিন্ন যিক্‌র ১, ৩, ১০, ১০০, ২০০ বা অগণিতবার বলতে বিশেষভাবে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে অসংখ্য সহীহ হাদীসে। এভাবে যিক্‌র করাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত।

কেউ বলি বিবাহের কালেমা একবার পড়লেই হয়, বারবার তো পড়তে হয় না। একবার কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি, এখন কালেমার আমল ও কালেমার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বারবার কালেমা পড়ে কী হবে। কী ভয়ানক কথা! যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন যে, তোমরা সর্বদা বেশি বেশি করে এবং সকালে বিকালে ও সন্ধ্যায় বিশেষ করে ১০০/২০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্‌র কর, সেখানে আমরা যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে বাতিল করার চেষ্টা করছি।

কেউ বলছেন : আগে ঐক্য প্রতিষ্ঠা বা কালেমার শাসন প্রতিষ্ঠা এরপরে যিক্‌র। দ্বীন প্রতিষ্ঠার ফরয ছেড়ে নফল ইবাদত করে লাভ নেই। হক ও বাতিলের মিশ্রণ রয়েছে এই কথায়। ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদত করলে লাভ হবে না। তবে আমার উপর ফরয কি? নিজের জীবনে পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যের জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। আমি যদি আমার ফরয আদায় করি তাহলে অন্যের জন্য আমি দায়ি নই। লক্ষ লক্ষ নবী রাসূল, মুমিন ও মুজাহিদ দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন বিলিয়ে গিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা না দেখেই চলে গিয়েছেন। তাঁরা যদি অন্য সবার জীবনে পরিপূর্ণ দ্বীন আসার পরে তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, নফল রোযা ইত্যাদি পালন করবেন বলে বসে থাকতেন তাহলে জীবনে এগুলির কোনো সুযোগ পেতেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের সুন্নাত বা আদর্শ কী? তাঁরা কি তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, দোয়া, ক্রন্দন, তাওবা, জিহাদ, সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ, ইসলাম প্রচার ইত্যাদি সকল ইবাদত একত্রে করেননি? তাহলে এই আগে পিছে করার যুক্তি আমরা কোন্ সুন্নাত থেকে গ্রহণ করলাম?

প্রিয় পাঠক, যিক্‌র নফল ইবাদত। কিন্তু মুমিনের জীবনে এ ইবাদতের গুরুত্ব, প্রভাব, সাওয়াব ও আখেরাতের মুক্তির ক্ষেত্রে এর অবদান খুবই বেশি। আমাদের উচিত হবে না, শয়তানের কুমন্ত্রণায় ও প্রবৃত্তির আলসেমীর কারণে এতবড় কল্যাণ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করা। প্রতিটি মুমিনের প্রয়োজন সুন্নাত অনুসারে কিছু কিছু যিক্‌র নিয়মিত ও সর্বদা করা। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও নফসের বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করুন।

(চ). শুধু মুখের যিক্‌রের উপর নির্ভর করা

অপরপক্ষে অনেকে যিক্‌রের ফযীলতকে শুধু মুখের বারবার উচ্চারণের যিক্‌রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। তাঁরা কর্মের যিক্‌র, কুরআন তিলাওয়াতের যিক্‌র ইত্যাদি পালনে অবহেলা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

.

"যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনেরই দুই রাক'আত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবে, আল্লাহর দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যাকিরীন বা সর্বাধিক যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"[1]

তাহলে দেখুন তাহাজ্জুদের নামায সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। দুই রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায়কারী কী-ভাবে আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ যাকির হওয়ার মর্যাদা পেলেন।

তাবেয়ীগণ মুখের যিক্‌রের গুরুত্ব দিতেন। তাসবীহ, তাহলীল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিকে তাঁরা মুখের যিক্‌র হিসাবে পালন করতেন। তবে এগুলি নফল যিক্‌র। যদি কেউ কর্মে আল্লাহর বিধিবিধান মেনে না চলে তাহলে তার এসকল যিক্‌রের মূল্য নেই বলে তাঁরা মনে করতেন। সাঈদ ইবনু জুবাঈর (৯৫ হি.) বলেন :

.

"আল্লাহর আনুগত্যই আল্লাহর যিক্‌র। যে তাঁর আনুগত্য করল সে তাঁর যিক্‌র করল। আর যে আল্লাহর আনুগত্য করল-না বা তাঁর বিধিনিষেধ পালন করল-না, যে যত বেশিই তাসবীহ পাঠ করুক আর কুরআন তিলাওয়াত করুক সে 'যাকির' হিসাবে গণ্য

হবে না।[১]

(৪.) কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত

আবেগ বা অজ্ঞতার কারণে সাধারণ ফযীলতের উপর নির্ভর করে বিদ'আত তৈরির আরেকটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো কুরআন তিলাওয়াত বিষয়ক ইবাদতসমূহ। আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। প্রথমেই এ বিষয়ে প্রথম যুগের ইমামগণের কিছু মতামত আলোচনা করব। এরপর বিস্তারিত আলোচনা করব। আল্লাহর তাওফীকই একমাত্র ভরসা।

একই সূরা বারবার পাঠ করা : ফকীহ ইমামগণের মতামত

দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ইমাম ও ফকীহ সুফিয়ান সাওরী, রাহিমাহুল্লাহ- (১৬০ হি.)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে, সে সূরা ইখলাস বেশি বেশি পাঠ করে, অন্যান্য সূরা সে অতবেশি পাঠ করে-না। তিনি তার এই কাজকে মাকরুহ বললেন। তিনি বলেন : "তোমাদের কাজ হলো অনুসরণ করা, কাজেই তোমরা পূর্ববর্তীগণের, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের, অনুসরণ করে চলবে। আমরা তাঁদের থেকে এমন কোনো ঘটনা জানতে পারিনি যে, তাঁরা এভাবে একটি সূরা বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন। কুরআন কারীমকে আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন তা পূর্ণভাবে পাঠ করার জন্য, কোনো অংশকে বিশেষভাবে অন্য অংশ থেকে বেশি পাঠ করার জন্য তা নাযিল করা হয়নি।[২] ইমাম মালিকও অনুরূপভাবে বারবার সূরা ইখলাস পাঠকে বিদ'আত বলেছেন এবং নিষেধ করেছেন।[৩] সে যুগের অন্যন্য ফকীহও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। কেউই এভাবে পড়া অনুমোদন করেন নি।

দেখুন, সুন্নাত সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের ধারণা বনাম আমাদের ধারণা। আমরা এক্ষেত্রে বলতাম : সূরা ইখলাসের ফযীলত সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। কাজেই, এই সূরা সর্বদা বেশি পড়লে তা সাওয়াবের কাজ হবে। কেউ নিষেধ করলে তাকে আমরা সহজে ছেড়ে দেব-না। কিন্তু তাঁরা সুন্নাতকে সার্বিকভাবে বুঝতেন। কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের আলোকে তাঁরা ফযীলতের হাদীস পালন করতেন। একটি ফযীলতের হাদীস পালন করতে গিয়ে সুন্নাতের খেলাফ করতে তাঁরা নিষেধ করতেন। সূরা ইখলাসের ফযীলতের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন, কিন্তু তাঁরা এই ফযীলত কী-ভাবে পালন করেছেন? তাঁরা এভাবে একটি সূরা বেশি বেশি পাঠ করা বর্জন করেছেন। তাঁরা যা যেভাবে যতটুকু করেছেন তা সেভাবে ততটুকু করা এবং তারা যা করেননি তা না-করাই তাঁদের অনুসরণ করা। আর আমাদের কাজ তো তাঁদের অনুসরণ করা।

প্রথমত, কুরআন তিলাওয়াতের সুন্নাত

প্রিয় পাঠক, কুরআন কারীম আল্লাহর অনন্ত অফুরন্ত নেয়ামত। সকল কল্যাণ ও রহমতের উৎস। মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন:

"হে মানবজাতি, নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ, তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা (ব্যাধি) রয়েছে তার প্রতিকার, সঠিক পথের পথনির্দেশ এবং মুমিনদের জন্য রহমত।"[৪]

"আমি এ কিতাব নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে হয়ত তোমরা রহমত পেতে পারবে।"[৫]

এ মহাগ্রন্থ যুগে যুগে অগণিত মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

"আমি এই কিতাব তোমার উপর নাযিল করেছি যেন তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোতে বের কর, মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথে।"[৬]

কুরআন তিলওয়াতের সুন্নাত সম্পর্কে 'রাহে বেলায়াত' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করছি:

(ক). নিয়মিত তিলাওয়াত করা

কুরআন কারীম আল্লাহর বাণী। এর তিলাওয়াত ও উচ্চারণই ইবাদত। প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের জন্য ১০টি সাওয়াব ও অতিরিক্ত অগণিত পুরস্কার রয়েছে। হাদীস শরীফে নিয়মিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বিশুদ্ধভাবে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহাবীগণ কুরআন তিলাওয়াতে এত বেশি আগ্রহী ছিলেন যে,

প্রতিদিন একবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত ও খতম করতে চাইতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝে ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে তিলাওয়াত করার জন্য ৩ দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ সুন্নাত হলো ৭ দিনে বা একমাসে পূর্ণ কুরআন একবার পড়ে শেষ করা। এক বৎসরের মধ্যে কুরআন একবার পড়ে শেষ করতে না পারা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

(খ). যথাসম্ভব মুখস্থ করা

কুরআন কারীম নিয়মিত তিলাওয়াতের সাথে সাথে যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ বা পুর্ণ কুরআন মুখস্থ করতে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কুরআন মুখস্থ করা ও কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা ও মহান পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে।

(গ). রাত্রের নামাযে বা তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করা

কুরআন কারীমে বারংবার রাত জেগে নামাযে কুরআনে আয়াত পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম দিক ছিল রাত্রে নামাযে তিলাওয়াত। তাঁরা প্রতিরাত্রে "কিয়ামুল্লাইল", বা তাহাজ্জুদে শত শত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। প্রতিরাত্রে তাহাজ্জুদে অন্তত ১০/২০ আয়াত তিলাওয়াত না করা সুন্নাতের আলোকে দুর্ভাগ্য ও গাফলতীর আলামত।

(ঘ) অর্থ অনুধাবন করা

আল্লাহ কুরআন প্রেরণ করেছেন অনুধাবন করার জন্য, না বুঝে শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়। কুরআনের তিলাওয়াত যেমন একটি ইবাদত, কুরআন অনুধাবন করা, বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই তা অনুধাবন করা। আল্লাহ বলেন:

"এক বরকতময় কল্যাণময় গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করে।"[১]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে :

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি , কে আছে উপদেশ গ্রহণ করার ?"[২]

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য যে, সে কুরআনের "হক্ক তিলাওয়াত" অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে তিলাওয়াত করে[৩]। যারা কুরআন অনুধাবন করতে, বুঝতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করে-না, তাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

"তারা কি কুরআনকে অনুধাবণ করে-না ? না-কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"[৪]

হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অনুধাবন করতে ও চিন্তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে-না তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে। সাহাবীগণ ১০টি আয়াত শিখে এর ব্যাখ্যা ও অর্থ ভালোভাবে না-বুঝা পর্যন্ত অন্য ১০টি আয়াত শুরু করতেন না।[৫]

(ঙ) কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা

কুরআন কারীম মানব জাতির মুক্তির একমাত্র দিশারী। কুরআনের নির্দেশ পালন ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই শুধু সেই মুক্তি আমরা পেতে পারি। কুরআনের তিলাওয়াত ও অনুধাবন ইবাদত, তাতে সাওয়াব রয়েছে। কিন্তু এই দুই পর্যায়ের ইবাদত মূলত নফল পর্যায়ের। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা ফরয। শুধুমাত্র ফরয পালনের পরেই নফল ইবাদত আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

(চ) কুরআন শিক্ষা প্রদান

এভাবে কুরআনের তিলাওয়াত, হিফজ, অনুধাবন ও পালনের পাশাপাশি কুরআন কেন্দ্রিক এ সকল ইবাদত পালন শিক্ষা দানও মাসনূন ইবাদত।

দ্বিতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াতের খেলাফে-সুন্নাত

(ক). কুরআনের প্রতি অবহেলা ও কুরআন তিলাওয়াত না করা

যে কুরআন কোটি কোটি মানবাত্মাকে আলোর পথ দেখিয়েছে আমরা মুসলমানগণ বর্তমান যুগে এর আলো গ্রহণ করছি-না।

আজ মুসলিম সমাজের কেউ কেউ কুরআন কারীমকে একেবারেই অবহেলা করে তাকে তুলে রেখেছেন। আমরা অনেক বই, পুস্তক বা সংবাদ পত্র পড়ি, কিন্তু আমাদের পাঠ্য তালিকায় আল্লাহর কেতাব নেই! কী অদ্ভুত মুসলমান আমরা ! সবচেয়ে আশ্চার্য বিষয় হলো অনেক ধার্মিক মুসলমানও কুরআন পাঠ করতে পারেন না, করেন না এবং এজন্য কোনো বেদনাও অনুভব করেন-না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

আমরা জানি যে, কোনো খেলাফে সুন্নাত বিদ'আতে পরিণত হওয়ার একটি কারণ হলো খেলাফে-সুন্নাতকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করা বা খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতের চেয়ে ভালো বলে মনে করা। এধরনের দুইট বিদ'আত আমাদের মধ্যে রয়েছে : (১) কুরআন তিলাওয়াত বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অন্যান্য যিক্‌রকে ওযীফা করে নেওয়া ও (২) কুরআন কারীম পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র অন্যান্য কেতাবাদি থেকে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করা।

(খ). আংশিক তিলাওয়াত করা

সাধারণ ফযীলতের উপর নির্ভর করে বানোয়াট পদ্ধতিতে ফযীলত অর্জনের চেষ্টার ফলে যে সকল খেলাফে-সুন্নাত সমাজে প্রচলিত হয়েছে তার একটি হলো : কুরআন কারীমের ২/৪টি সূরা নিয়মিত ওযীফা হিসাবে তিলাওয়াত করা, বাকি কুরআন তিলাওয়াত না-করা।

আমরা বিভিন্ন সূরার ফযীলতের কথা শুনে এ সকল সূরা সর্বদা তিলাওয়াত করি। অন্যান্য সূরা না জানার কারণে বা অন্য কোনো অসুবিধার জন্য এগুলি বারবার পাঠে অসুবিধা নেই। তবে এ পদ্ধতি খেলাফে সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ এভাবে ফযীলতের সূরা বেছে নিয়ে ওযীফা তৈরী করেন নি।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, আমাদের সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ ওযীফা যাতে সূরা ইয়াসিন, সূরা ইখলাস বা অন্য কোনো সূরা সকালে সন্ধ্যায় বেশি বেশি পাঠ করা হয়, এ সকল ওযীফার অধিকাংশই বানোয়াট ও মিথ্যা হাদীসের উপর নির্ভর করে তৈরি করা। কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই বানোয়াট কথা। কিছু আয়াত বা সূরার ফযীলত সহীহভাবে প্রমাণিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আমরা সুন্নাতের বাইরে এগুলিকে বেশি বেশি করে পড়ব। বিশেষ করে যদি আমরা সহীহ সুন্নাতের নির্দেশনার বাইরে সর্বদা সকালে সন্ধ্যায় এসকল সূরা নিয়মিত ওযীফা হিসাবে পাঠ করি এবং পরিপূর্ণ কুরআন তিলাওয়াতকে অবহেলা করি তাহলে খুবই অন্যায় হবে। সকালে সন্ধ্যায় সূরা ইয়াসীন, সুরা রহমান ইত্যাদি নিয়মিত পড়া এই পর্যায়ের। সাধারণভাবে সূরার ফযীলতের অর্থ হলো আমরা যখন কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতে করতে এই সূরা তিলাওয়াত করব তখন এই পরিমাণ সাওয়াব পাব।

সাধারণ ফযীলতের উপর নির্ভর করে ওযীফা হিসাবে কোনো সূরা বারবার পাঠ করলে কী-ভাবে বিদ'আতের উৎপত্তি হয় তা আমরা সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম মালিকের (রহ.) মতামতের মধ্যে দেখেছি। তবে যদি হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে কোনো সূরা বা আয়াত নির্দিষ্ট কোনো সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে তিলাওয়াতের নির্দেশ থাকে তাহলে তা পালন করা উচিত। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে ও ঘুমাতে যাওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা কাফিরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ, শুক্রবার রাত্রে ও দিনে সূরা কাহাফ পাঠ ইত্যাদি।[১]

(গ). বুঝার চেষ্টা না করে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা

ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীম তিলাওয়াতের সাথে তা বুঝাও অন্যতম ইবাদত। ভালোভাবে বুঝতে অসুবিধা হবে বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিনের কমে খতম করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"যে তিন দিনের কমে পূর্ণ কুরআন কারীম তিলাওয়াত করল সে কুরআন বুঝলো না।"[২]

অথচ আমরা সারা জীবনই না-বুঝে পড়ার রীতি তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষত যেখানে মাতৃভাষায় বিভিন্ন তরজমা ও তাফসীর সহজপ্রাপ্য সেখানে এই অবহেলা কুরআন কারীমের সাথে বেয়াদবী ও আল্লাহর কালামের প্রতি অবহেলা। এছাড়া এই অবহেলা ও সুন্নাত বর্জনকে রীতিতে পরিণত করে আমরা বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হয়েছি।

অনেক মুসলমান এই বিদ'আত রীতিকে কুরআন বুঝার মাসনূন ইবাদতের চেয়ে উত্তম ও নিরাপদ মনে করেন। অনেকে ভাবেন যে, কুরআনের তরজমা বা তফসীর করতে গিয়ে হয়ত আলেমের ভুল হতে পারে, কাজেই তরজমা ও তাফসীর পাঠের চেয়ে মানুষের লেখা অন্যান্য বই ও বইয়ের তরজমা পড়ে ইসলাম শেখা উত্তম।

কী অপূর্ব বিচার! কুরআনের ব্যাখ্যায় ভুল হতে পারে অথচ কুরআন, হাদীস ও ফিকহের আলোকে বই লিখলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই! কুরআনের তরজমার ক্ষেত্রে সবই আল্লাহর বাণীর তরজমা, হয়ত বা দুই একটি স্থানে বুঝার ভুল হতে পারে। আর অন্যান্য ইসলামী বই পুস্তক যারা লিখেছেন তাঁরা ভুলেভরা মানুষ, অন্যান্য ভুলেভরা মানুষের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃতি বুঝতেও ভুল হতে পারে। অন্য একজন তার তরজমা করেছেন। তরজমাতেও ভুল হতে পারে। অগণিত ভুলের সম্ভাবনা। তা সত্ত্বেও মুসলমান কুরআনের তাফসীর ও তরজমা পাঠের চেয়ে মানুষের লেখা বইয়ের তরজমা পড়তে ভালবাসেন!

অপরদিকে অনেক ভণ্ড, ধোঁকাবাজ বা অজ্ঞ মানুষ প্রচার করেন যে, কুরআন বুঝা ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সরাসরি "জ্ঞান" ছাড়া তা বুঝা যায় না। কী কঠিন কুফরী কথা! মহান আল্লাহ মক্কার কাফির- মুশরিকসহ বিশ্বের সকল মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠালেন যে গ্রন্থ তা নাকি দুর্বোধ্য! মহিমাময় আল্লাহ বারবার ঘোষণা দিলেন যে, তিনি এই

গ্রন্থকে অতি সহজবোধ্য করে দিয়েছেন, যেন সকল আগ্রহী মানুষ তা বুঝতে পারে ও তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তাঁর এই সুস্পষ্ট ও বারংবার প্রদত্ত বাণী ও ঘোষণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে মানুষদেরকে কুরআন ও ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট এই ধোঁকাবাজরা। কুরআন থেকে সরিয়ে নিতে পারলেই তো মানুষদেরকে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও কুসংস্কার ইসলামের নামে গেলানো যাবে।

(ঘ). রাতারাতি খতম, সবীনা খতম ইত্যাদি

কুরআনের সাথে বেআদবীমূলক আরেকটি বিদ'আত হলো মাইক ইত্যাদি ব্যবহার করে সবীনা খতম। কুরআন তিলাওয়াত, খতম ও শ্রবণের সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক আয়াত ও হাদীসের অপব্যবহার করে বানোয়াটভাবে এই রীতি চালু করা হয়েছে। এতে বিভিন্নভাবে সুন্নাতের বিরোধিতা ও গোনাহ হয়:

প্রথমত, সুন্নাতের নির্দেশনা অনুযায়ী একরাতে কুরআন খতম করা উচিত নয়। তিন দিনের কমে কুরআন কারীম খতম করা সুন্নাতের খেলাফ।

দ্বিতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত ও শোনা ইবাদত। পরিপূর্ণ মহব্বত, আন্তরিকতা, ভয় ও ভক্তিসহ তিলাওয়াতে যেমন সাওয়াব, শুনলেও তেমনি সাওয়াব। কেউ যদি এভাবে তিলাওয়াত করেন এবং তাঁর কাছে বসে অন্য কিছু মানুষ তা শুনেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ। কিন্তু অমনোযোগিতার সাথে, খেলাধুলা, গল্পগুজবের মধ্যে তিলাওয়াত করা বা শোনা অত্যন্ত বেয়াদবী। বেশি উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াতও বেয়াদবী।

তৃতীয়ত, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্র, দোয়া ইত্যাদি নফল ইবাদতের জন্য কাউকে বিরক্ত করা, কারো ঘুম, নামায বা অন্যান্য কাজ নষ্ট করা একেবারেই না-জায়েয। এতে 'হক্কুল ইবাদ' বা মানুষের অধিকার নষ্ট করার জন্য কঠিন হারাম ও কবীরা গোনাহ হবে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মাইকে তিলাওয়াত করাতে বেয়াদবী ও গোনাহ ছাড়া কিছুই হবে না। কেউ যদি কুরআন খতম, শোনা ও শোনানোর ইবাদত করতে চান তার উচিত হবে যে, কোনো ভালো মুত্তাকী হাফেজকে ডেকে আদবের সাথে বসিয়ে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা। সেখানে তিনি নিজে ও অন্যান্য আগ্রহী মানুষ বসবেন। যতক্ষণ হৃদয়ের আগ্রহ ও ভক্তি থাকবে ততক্ষণ তিলাওয়াত ও শ্রবণ অব্যাহত থাকবে। ক্লান্তি আসলে কিছুক্ষণ তা বন্ধ রেখে পরে আবার শুরু করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে তিন দিনে কুরআন খতম করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, আনুষ্ঠানিকতা ইবাদত নয়, ভক্তি, ভালবাসা, আন্তরিকতাই ইবাদত। পরিপূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে অল্প তিলাওয়াত ও শ্রবণ প্রাণহীন অগণিত খতমের চেয়ে অগণিতবার উত্তম।

প্রিয় পাঠক, কুরআনই আবে হায়াত, কুরআনই জীবনের আলো। কুরআন আল্লাহর দস্তরখান। "আল্লাহ তা'আলা কুরআনের কারণে অনেক জাতিকে উন্নত করবেন। আবার কুরআনের কারণেই অনেক জাতিকে অবনত করবেন।"[১] কুরআনই মানদণ্ড। আসুন আমরা জীবন দিয়ে সামগ্রিকভাবে কুরআনকে গ্রহণ করি।

আনাস (ﷺ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আল্লাহর পরিবার পরিজন।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, এরা কারা? তিনি বলেন: "এরা আহলে কুরআন, কুরআনই যাদের সার্বক্ষণিক সাথী। এরা আল্লাহর পরিজন এবং তাঁর একান্ত আপন জন।" [২]

আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে আহলে-কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং কুরআনের ওসীলায় আমাদেরকে উন্নতী, কল্যাণ ও নাজাত দান করুন।

(ঙ). মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠের জন্য ইমামের চুপ করে থাকা

কুরআন কারীম মুসলিম জীবনের সকল কর্মের কেন্দ্রস্থল। মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত নামায আদায় কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। সালাত বা নামায আদায়কারীকে সক্ষম হলে অবশ্যই নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে, বিশেষত সূরা ফাতিহা। তবে জামাতে নামায আদায় করলে মুক্তাদিগণকে পৃথকভাবে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হবে, না ইমামের তিলাওয়াতই তাঁদের জন্য যথেষ্ট হবে সে বিষয়ে একাধিক বিপরীতমখী নির্দেশনা রয়েছে হাদীসে। কোনো কোনো হাদীসে ইমামের কিরা'আতের সময় চুপ করে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের কেউ পড়তেন কেউ পড়তেন না। কাজেই, পড়া ও না-পড়া দু'টিই সুন্নাত-সম্মত।

উভয় প্রকার হাদীসকে একত্রে মান্য করার আগ্রহে অন্য আরেকটি হাদীসের উপর নির্ভর করে অনেক দেশে মুক্তাদিগণের সূরা ফাতেহা পাঠের সুযোগ প্রদানের জন্য ইমামের চুপ করে থাকার রীতি প্রচলিত আছে। ইমাম প্রথমে সূরা ফাতেহা পাঠ করেন। এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, যেন মুক্তাদিগণ সূরাটি পাঠ করতে পারেন। এরপর তিনি অন্য সূরা পাঠ করেন।

এই রীতিটি খেলাফে-সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রায় দীর্ঘ জীবনের হাজার হাজার ওয়াক্ত জামাতে নামাযের কোনো নামাযে তিনি মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দানের জন্য চুপ করে থাকতেন বলে দেখতে পাই-না। অথচ অনেক দেশে একজন ইমাম তাঁর

জীবনের সকল নামাযেই, বিশেষত যে সকল নামাযে সশব্দে কুরআন পাঠ করা হয় সেসকল নামাযের সবগুলিতেই সুরা ফাতিহা পাঠের পরে মুক্তাদিদের সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দানের জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। নিঃসন্দেহে দুটি চিত্র এক নয়।

তাঁদের দাবি, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে দুইবার সামান্য থামতেন বলে কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির সনদগত দুর্বলতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও হাদীসে বর্ণিত দুটি ‘সাকতা’ বা চুপকরে থাকার একটি হলো তাকবীরে তাহরীমার পরেই, অপরটি কিরাআত শেষে রুকুতে যাওয়ার আগে। একটি আরো দুর্বল বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা পাঠের পরে অন্য সূরা পাঠের আগে তিনি একটু থামতেন।[1] সর্বাবস্থায় তা ছিল সামান্য সময়ের শ্বাসগ্রহণের জন্য অবসর। একটি সাকতাকে বিলম্বিত করে সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ প্রদান করতে যেয়ে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি তাকে সুন্নাত বা রীতি করে নিয়েছি।

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিয়মিত ও মাশহুর সুন্নাত হলো তাকবীরে তাহরীমার পরে মনে মনে ‘সানা’ পাঠ করা। এরপর স্বাভাবিকভাবে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা বা আয়াত পাঠ করা। মুক্তাদীদের তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ থেমে না-থাকা। যে সকল মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন তাঁরা তাঁদের সুযোগ মতো পড়ে নেবেন। অন্য একটি দুর্বল বর্ণনা অনুসারে তাঁর সুন্নাত হলো কিরাআত শেষে রুকুতে যাওয়ার আগে সামান্য একটু ‘সাকতা’ বা চুপ-থাকা। দুর্বলতম বর্ণনা হলো সূরা ফাতিহার পরেও সামান্য একটু থামা। অপরদিকে আমাদের নামায হচ্ছে সূরা ফাতিহা পাঠের শেষে ইমাম দীর্ঘক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। মুক্তাদীগণ সবাই ফাতিহা পাঠ করছেন। এই চিত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ কোন সুন্নাতেরই মিল পাওয়া যায় না।

মুক্তাদিদের সুযোগ দানের জন্য ফাতিহার পরে এই সময় নির্ধারণকে জরুরি মনে করা হচ্ছে। যদি কোনো ইমাম ফাতিহার পরে সামান্য থামার হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে তা পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল হাদীস অনুসারে রুকুতে যাওয়ার আগের ‘সাকতা’ বা ‘সামান্য থামা’-কে মুক্তাদিদেরকে সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দানের জন্য প্রলম্বিত করেন, তাহলে এ সকল সমাজের মুসলিমগণ আপত্তি করবেন। এভাবে একটি একেবারেই যয়ীফ হাদীসের উপর নির্ভর করে আমরা একটি রীতি তৈরি করেছি, এরপর এই রীতিকে জরুরি মনে করেছি।

(৫). দোয়া-মুনাজাত বিষয়ক কিছু সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত

সাধারণ ফযীলতের আয়াত বা হাদীসের উপর নির্ভর করে খেলাফে সুন্নাত বা বিদ‘আতে নিপতিত হওয়ার আরেকটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো “দোয়া”। দোয়া বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বুঝি। এই অর্থে আরবিতে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: (১) অর্থাৎ চাওয়া, (২) অর্থাৎ ডাকা বা প্রার্থনা করা ও (৩) ‘মুনাজাত’ বা চুপেচুপে কথা বলা। “মুনাজাত” শব্দটির অর্থ বেশি ব্যপক। আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিক্‌র ও প্রার্থনাকেই ‘মুনাজাত’ বলা হয়। হাদীসে নামাযকে মুনাজাত বলা হয়েছে।[2]

দোয়া ইসলামের অন্যতম ইবাদত। তবে তা পালনে অবশ্যই সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা আমাদের সকল আলোচনা হাদীস ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের মতামত আলোচনার মাধ্যমে শুরু করছি। এখানেও আমরা সাহাবী-তাবেয়ীগণ কিভাবে এই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের গুরুত্ব প্রদান করতেন তার উদাহরণ উল্লেখ করব। এরপর এ বিষয়ে সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত ও কিভাবে “সাধারণ ফযীলত” জ্ঞাপক আয়াত বা হাদীসের অপব্যবহার করে আমরা সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে চলে যাই সে বিষয়ে আলোচনা করব।

খুতবার মধ্যে হাত তুলে দোয়া করার বিষয়ে গুদাইফ (রা.)-এর মত

গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী (রা.)-এর হাদীসে আমরা খুত্‌বার মধ্যে হাত তুলে মুনাজাত করার বিষয়ে আপত্তি দেখতে পাই। কারণ এই পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের সামান্য ব্যতিক্রম। এখানে সাধারণ ফযীলতের হাদীসগুলির উপর নির্ভর করে খলীফা আব্দুল মালেকের পক্ষে অনেক “অকাট্য!! দলিল” পেশ করা যায়:

(১) খুত্‌বার মধ্যে দোয়া করা সুন্নাত।

(২) দোয়ার সময় হাত তোলা ফযিলতের কাজ।

(৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো খুত্‌বার মধ্যে মুনাজাত করতে হাত উঠিয়ে এ সময়ে হাত উঠানোর বৈধতা শিখিয়ে গিয়েছেন। আর তিনি একবার করলেই মুস্তাহাব প্রমাণিত হলো।

(৪) ফযীলতের কাজ বা মুস্তাহাব কাজ সর্বদা করতে কোনো বাধা নেই। খুত্‌বায় দোয়া করা ও দোয়ার সময় হাত উঠানো ফযিলতের কাজ, তা যত বেশি করা হবে তত বেশি ফযীলত আমরা লাভ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা করেননি বলে কি সর্বদা করা নিষেধ হয়ে গেল। একবার দু’বার করলেই তো মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়ে গেল। কাজেই, আমরা এ সময়ে নিয়মিত ও সমবেতভাবে হাত তুলে দোয়া করব। এতে আমরা খুত্‌বার মধ্যে দোয়ার ফযীলত ও দোয়ার সময় হাত উঠানর ফযীলত লাভ করব। মুখে দোয়া সব ইমামই করেন। এভাবে দোয়া করলে শুধুমাত্র দোয়ার সাওয়াব হবে। আর হাত উঠালে অতিরিক্ত মুস্তাহাবের সাওয়াব। সাথে সাথে সমবেত মুসল্লীগণ হাত উঠালে তাঁরাও সাওয়াবে শরীক হবেন, আমীন বলুন অথবা নাই বলুন।

এ সকল অকাট্য!! দলিল কাটানোর জন্য সাহাবীর পক্ষে শুধুমাত্র “সুন্নাত” ছাড়া একটি দলিলও আমরা পাব না। একজন সুন্নী মুসলমান উপরের সকল “দলিল” মেনে নেওয়ার পরেও প্রশ্ন করবেন: এ বিষয়ে সুন্নাত কী? দোয়ার সময় হাত উঠানোর ফযীলতের হাদীস তো রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন। তিনি এই ফযীলতের উপর কী-ভাবে আমল করেছেন?

যেহেতু তাঁর সুন্নাত খুত্‌বার মধ্যে দোয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হাত না-উঠানো, সেহেতু সাধারণ ফযীলতের হাদীস

অবলম্বন করে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি বা পদ্ধতি প্রচলন করতে বা প্রচলনে অংশ নিতে তিনি সম্মত হবেন-না। কারণ ফযীলতের উপর আমলও তাঁর পদ্ধতিতেই করতে হবে। তাঁর পদ্ধতির বাইরে কাজ করলে ফযীলত বেশি হবে – এই চিন্তা দ্বারা তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা হয়। কর্মে ও বর্জনে, পদ্ধতিতে ও রীতিতে সকল ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত অবিকল পালন করাই উত্তম। এই মানসিকতাই গুদাইফ (রা)-কে খলীফার প্রস্তাব অস্বীকার করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। নিয়মিত দিন নির্ধারণ করে গল্পের মাধ্যমে ওয়াজ করতে অস্বীকৃতিও একই কারণে। একই কারণে ইবনু উমর (রা) আযানের পরে মুসল্লীদের ডাকার রীতিকে ঘোরতর ভাবে প্রতিবাদ করেছেন।

হজ্বের দিনের দোয়া : তাবেয়ীগণের মতামত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো শুধুমাত্র দোয়া করার জন্য কোথাও সমবেত হননি। আলোচনা, যিক্‌র, কুরআন তিলাওয়াত বা অন্য কোনো কারণে সমবেত হলে তাঁরা সমবেত অবস্থায় হয়ত মাঝে মাঝে দোয়া করেছেন। তাবেয়ীদের যুগে কিছু মানুষ, যারা হজ্বে যেতে পারতেন না, হজ্বের দিনে বিকালে আরাফার মাঠের হাজীদের অনুকরণে মসজিদে বসে দোয়া করতে শুরু করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমরের খাদেম ও বিশেষ ছাত্র আবু আব্দিল্লাহ নাফে', ইব্রাহীম নাখয়ী, সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্য অনেক তাবেয়ী ইমাম ও আলেম (রাহিমাহুমুল্লাহু) তা কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। একদিন নাফে' (রাহিমাহুল্লাহ) মসজিদে নববীতে এভাবে হজ্বের দিন বিকালে কিছু মানুষকে সমবেত হয়ে দোয়া রত দেখে বলেন :

"হে মানুষেরা, তোমরা যা করছ তা সুন্নাত নয়, তোমরা বিদ'আতে লিপ্ত রয়েছ। আমরা সাহাবীগণকে দেখেছি তাঁরা এই কাজ করতেন না।"[১]

এখানে আমরা এই কাজের পক্ষে অনেক 'অকাট্য!' ও 'দাঁতভাঙ্গা!!' যুক্তিপ্রমাণ পেশ করতে পারব। আরাফার দিনের ফযীলত খুবই বেশি। এইদিনে ও জিলহজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিনে সকল প্রকার ইবাদত, যিক্‌র, দোয়া ইত্যাদি বেশি বেশি করার জন্য বিভিন্ন হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাহলে এভাবে দোয়া করলে তা এসকল হাদীসের আওতায় বেশি সাওয়াবের কাজ বলে গণ্য হবে। এছাড়া এই দিনে হাজীগণ আরাফার মাঠে দোয়া করছেন। আমরা যারা আরাফায় যেতে পারিনি, তারা অন্তত আল্লাহর পবিত্র ভূমির মহব্বত হৃদয়ে নিয়ে হাজীদের সাথে সুর মিলিয়ে দোয়া করলে নিশ্চয় তা আমাদের দোয়া কবুলের কারণ হবে, আমাদের মনে আল্লাহর ও তাঁর ঘরের মহব্বত বৃদ্ধি করবে। হয়ত এই কাজের ওসীলায় আল্লাহ একদিন আমাদেরকে আরাফার মাঠে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক প্রদান করবেন।

এভাবে অনেক যুক্তি ও দলিল প্রমাণ আমরা পেশ করতে পারব। আমরা খুব সহজেই বলতে পারব : "আমরা এই দশটি অকাট্য!! দলিল দিয়ে আরাফার দিনের দোয়া জায়েয প্রমাণিত করলাম, কারো সাধ্য থাকলে একে হারাম প্রমাণিত করার একটি দলিল পেশ করুক।"

কিন্তু তাবেয়ীগণের নিকট এগুলোর কোনো মূল্যই ছিল না। তাঁদের কাছে একটিই দলিল, তা হলো সুন্নাত। ইবাদত বন্দেগি, আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যা করেননি তা-ই নিষিদ্ধ, তা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁদের কাছে আর কোনো দলিলের প্রয়োজন ছিল না। সাধারণ ফযীলতের হাদীস সাধারণভাবেই থাকবে, তা দিয়ে কোনো বিশেষ সময়, পদ্ধতি বা কর্ম তৈরি করা যাবে না। যে কোনো বিশেষ কর্ম বা পদ্ধতির জন্য তাঁদের একমাত্র দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম। তাঁরা যা করেননি তা না-করাই তাঁদের দৃষ্টিতে সুন্নাত। এই একটিমাত্র দলিল দিয়েই নাফে' (রাহিমাহুল্লাহ) সমবেত মুসলমানদের কর্মকে বিদ'আত বলে প্রমাণিত করলেন। কারণ এ সকল ফযীলতের কথা তাঁদের জানা ছিল। কিন্তু তাঁরা এভাবে তা পালন করেননি। তাঁদের সুন্নাতের বাইরে সবই বিদ'আত, সবই বাতিল।

প্রথমত, দোয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় সুন্নাত

(ক). দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দোয়া যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, সেহেতু এ বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত জানা ও যথাসম্ভব সুন্নাত অনুসারে এই ইবাদত পালন করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এখানে সংক্ষেপে এবিষয়ে কিছু আলোচনা করছি। আরো বিস্তারিত দলিল, সনদ ও বিধানাবলী জানার জন্য পাঠককে "রাহে বেলায়াত" পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। দোয়া আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে সেতু ও বাঁধন। বেশি বেশি দোয়া করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। বেশি দোয়া করলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ দোয়াকারীর সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে প্রার্থনারত থাকে ততক্ষণ সে তার প্রভুর সঙ্গে থাকে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন :

"আমার বান্দা আমাকে যেভাবে ধারণা করবে সেভাবে পাবে। আমার বান্দা যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার সাথে থাকি।"[২]

দোয়া না করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কুরআনে আল্লাহর কাছে দোয়া না করাকে অহংকার করা বলা হয়েছে এবং যারা অহংকার করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে না তাদের কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

"তোমাদের প্রভু বলেছেন : তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব । নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত করল না (আমার কাছে দোয়া করল না) তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।"[১]

এই আয়াত উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

: "দোয়াই ইবাদত ।"[২]

তাহলে আমরা দেখছি যে, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব, আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন । উপরন্তু দোয়ার জন্য আমরা নামায আদায়ের মতো ইবাদত পালনের সাওয়াব পাব । আল্লাহর কত দয়া! তাঁর বান্দা নিজের প্রয়োজনে প্রার্থনা করবে, আর তিনি তাতে ইবাদতের সাওয়াব দিবেন ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাহ বলেছেন :

"আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে সম্মানিত আর কিছুই নেই ।"[৩]

জাগতিক ও ধর্মীয় সকল কাজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে তিনি উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন । এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন । তিনি বলেছেন:

"তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও চাইবে ।"[৪]

সাধারণ বিপদ আপদ কষ্ট দুঃখ বা সমস্যার কথা আমরা অনেক সময় অন্য কোনো মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা অন্তত মনকে হাল্কা করি । কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অভ্যাস হলো কোনো বান্দার কাছে কোনো ব্যথার কথা না বলে তার সকল ব্যথা, বেদনা, কষ্ট ও যাতনার কথা তাঁর মালিকের কাছে পেশ করা । একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন । আর তিনি না করলে তো কারো কিছু করার নেই । শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তাঁর দরজাই মুমিনের গন্তব্যস্থল । আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"যদি কোনো ব্যক্তি বিপদ বা অভাবে পতিত হয়ে তার বিপদের কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তাহলে তার অভাব মিটবে না । আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবতী রিযিক প্রদান করবেন ।"[৫]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"দোয়া হচ্ছে মু'মিনের অস্ত্র, দ্বীনের স্তম্ভ ও আসমান ও জমিনের নূর ।"[৬]

"দোয়া ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারে না । মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায় । অনেক সময় মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় ।"[৭]

হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেনই । তবে ফলাফল বিভিন্ন রকম হতে পারে : (১) আল্লাহ প্রার্থিত বস্তু প্রার্থনাকারীকে প্রদান করবেন, অথবা (২) বিনিময়ে কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন, অথবা (৩) পরবর্তীতে তাকে প্রার্থনার ফল দান করবেন, অথবা (৪) প্রার্থনার বিনিময়ে তাকে আখেরাতে নেয়ামত প্রদান করবেন ।[৮]

(খ). দোয়ার কিছু সুন্নাত

১) দোয়ার আগে কিছু নেক আমল করা, বিশেষত কিছু যিক্‌র, তাসবীহ, আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর সালাত পাঠ করা ।

২) গভীর মনোযোগের সাথে দোয়া করা । হৃদয় থেকে সকল অবলম্বন দূর করে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে মনকে রুজু করা । অসহায় ও কাতর হৃদয়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন ।

৩) দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করা। কখনোই একথা মনে না করা যে, আমি অনেক দোয়া করেছি, বোধহয় কবুল হলো না, বা বোধহয় কবুল হবে না। এরূপ চিন্তা করা গোনাহের কাজ এবং এতে দোয়া কবুলের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

৪) ছোট বড় সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

৫) দোয়া কবুলের সময়ের ও স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা। হাদীসের আলোকে শেষ রাতে, ফরয নামাযের পরে, কুরআন খতমের সময়, বৃষ্টির সময়, জিহাদের ময়দানে কাতারবদ্ধ হওয়ার সময় ও সফরের সময় দোয়া কবুল হয়। অনুরূপভাবে কাবাঘরের পাশে, সাফা মারওয়ার উপরে ও আরাফার মাঠের দোয়া কবুল করেন।

দ্বিতীয়ত, দোয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন খেলাফে-সুন্নাত

(ক) দোয়া না করার বিদ'আত

অনেকে অবহেলা করে দোয়া করেন না। অনেকে মনে করেন – আমি গোনাহগার মানুষ, আমার দোয়া কি আল্লাহ কবুল করবেন! এ চিন্তা করে তিনি দোয়া করেন না। এগুলি ইসলামের শিক্ষা বিরোধী চিন্তা ও অন্যায়। প্রত্যেক মুসলিমকে দোয়া করতে হবে। পাপীর দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ তাঁর মনে বেদনা, আবেগ ও কাতরতা রয়েছে।

অনেক ধার্মিক মানুষ এর চেয়েও বেশি ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন দোয়া করার চেয়ে দোয়া না-করা ভালো। এ বিষয়ে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট গল্প ও হাদীস তাঁদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। এধরনের একটি বানোয়াট গল্প ইবরাহীম (আ.)-কে কেন্দ্র করে কথিত। বলা হয়, যখন তাঁকে আগুনে ফেলে দেওয়া হয় তখন তিনি প্রার্থনা করেননি, বরং আল্লাহ যেহেতু তাঁর অবস্থা জানেন, সেহেতু তাঁর কাছে প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। কাহিনীটি বানোয়াট।[১] তার চেয়েও বড় কথা হলো আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত হলো প্রার্থনা করা। কখনই তিনি কোনো অবস্থাতে প্রার্থনা না করে তাওয়াক্কুল করেননি। কখনই নয়। সর্বদা সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা তাঁর সুন্নাত ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। দোয়া করতে হবে। দোয়া করাটাই ইবাদত ও সাওয়াবের মাধ্যম। দোয়া করাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। দোয়া সকল কল্যাণের উৎস।

(খ). দোয়ার সময় হাত উঠানো বা না-উঠানো

দোয়ার সময় হাত উঠানোর ফযিলতে দুই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে সালমান ফারিসী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

"নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় (দোয়া করতে), তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"[২]

এ ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করা। দোয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো হাত উঠাতেন। আয়েশা (রা) বলেন :

ﷺ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুবারক হাত দু'খানা উঠিয়ে দোয়া করতেন, এমনকি আমি তাঁর (বেশি বেশি) হাত উঠিয়ে দোয়া করাতে ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে পড়তাম ; তিনি এভাবে দোয়ায় বলতেন : হে আল্লাহ, আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি কোনো মানুষকে গালি দিয়ে ফেললে বা কষ্ট দিলে আপনি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।"[৩]

অনুরূপ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়ার সময়, আরাফাতের মাঠে দোয়ার সময়, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো বিশেষ আবেগের সময়ে দোয়ার জন্য তিনি হাত তুলতেন।[৪] এরূপ যে সকল সময়ে তিনি হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত বলে গণ্য হবে।

অপরদিকে অধিকাংশ সময় হাত না-উঠিয়ে শুধু মুখে দোয়া করতেন। যেখানে ও যে সময়ে তিনি হাত উঠাননি বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত না-উঠানো সুন্নাত। অধিকাংশ মাসনূন দোয়া এই প্রকারের। ইস্তিঞ্জার আগে ও পরে, কাপড় পরিধান বা খোলার সময়, ওযুর পরে, মসজিদে গমনের পথে, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, আযানের পরে দোয়া পাঠের সময়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরের দোয়া পাঠের সময়, নতুন চাঁদ দেখে, ইফতারের সময় ইত্যাদি অসংখ্য মাসনূন দোয়া মুনাজাত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ দুই হাত তুলে দোয়া-মুনাজাত করতেন না। তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় হাত না উঠিয়ে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে মুনাজাত আদায় করতেন। এ সকল ক্ষেত্রে এভাবে দোয়া করাই সুন্নাত।

বাকি সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো বা না-উঠানোর কোন সুন্নাত নির্ধারিত নেই। এ সকল সাধারণ ক্ষেত্রে সাধারণ ফযীলতের

হাদীসের আলোকে আমরা হাত উঠাতে পারি। কিন্তু এ সকল হাদীস দিয়ে বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি তৈরি করতে পারি না। বিশেষত সাধারণ ফযীলতের হাদীস দিয়ে সুন্নাত বিরোধী রীতি তৈরি করার অর্থ "সুন্নাত" অপছন্দ করা।

যেমন, অনেকে আযানের দোয়ার সময় হাত উঠানোকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এই দোয়া করার জন্য হাত উঠাতেন না। সাধারণ ফযীলতের হাদীসের আলোকে আমরা হয়ত বলতে পারি যে, এ সময়ে হাত উঠানো জায়েয। কেউ যদি বিশেষ আবেগে কোনো সময় হাত উঠান তাহলে দোষ হবে না। কিন্তু এই জায়েয কাজটিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম মনে করলে বা একে সুন্নাতের বিপরীতে রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে অপছন্দ করা হবে এবং এই রীতির প্রচলনের ফলে সুন্নাত বিতাড়িত ও দূরীভূত হয়ে যাবে।

(গ). দোয়ার পরে দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা

দোয়া-মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর বিষয়ে যেরূপ কয়েকটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, দোয়া শেষে হস্তদ্বয় দিয়ে মুখমণ্ডল মুছার বিষয়ে তদ্রূপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দু-একটি যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

"দোয়া শেষ হলে তোমরা হাত দু'টি দিয়ে তোমদের মুখ মুছবে।" হাদীসটি আবু দাউদ সংকলিত করে হাদীসটি খুবই দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

অন্য হাদীসে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

ﷺ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দোয়া করতে হাত তুলতেন তখন হাত দু'টি দ্বারা মুখ না মুছে তা নামাতেন না।"[২]

এই হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল সনদের। প্রথম যুগের অনেক মুহাদ্দিস একে মাওযূ বা ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন। অপরদিকে পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেম ও মুহাদ্দিস একে যয়ীফ বা দুর্বল হলেও "আমল করার উপযুক্ত" বলে গণ্য করেছেন।[৩]

সর্বাবস্থায়, আমরা বুঝতে পারি যে, মুনাজাত বা দোয়া শেষে হাত দুটি দিয়ে মুখমণ্ডল মুছা প্রমাণিত বিষয় নয়। এ বিষয়ে দু'একটি দুর্বল হাদীস আছে, যার সম্মিলিত রূপ থেকে কোনো কোনো আলেমের মতে এভাবে মুখ মুছা জায়েয বা মুস্তাহাব। অন্য অনেকেই এভাবে মুখ মুছাকে, বিশেষ করে একে রীতিতে পরিণত করাকে বিদ'আত বলেছেন।

(ঘ). দোয়ার জন্য সমবেত হওয়া

হাবীব ইবনু মাসলামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"কিছু মানুষ একত্রিত হলে যদি তাদের কেউ দোয়া করে এবং অন্যরা 'আমীন' বলে তবে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন।"[৪]

এ হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সমবেত মানুষদের মধ্যে কেউ যদি দোয়া করেন এবং অন্যরা 'আমীন' বলেন তবে তা দোয়া কবুলের একটি ওসীলা। তবে এরূপ ফযীলতের উপর নির্ভর করে সকল ক্ষেত্রে শুধু দোয়ার উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া সঠিক নয়। সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বা সালাতুল ইসতিকার জন্য সমবেত হয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে সমবেত মুজাহিদগণ অনেক সময় যুদ্ধের আগে দোয়া করেছেন। এক্ষেত্রে একজন দোয়া করেছেন এবং উপস্থিত অন্যরা 'আমীন' বলেছেন। বিপদে আপদে শুধু দোয়া করতে তারা জমায়েত হন নি। বরং এক্ষেত্রে ফরয নামাযের শেষ রাক'আতের রুকুর পরে 'কুনুতে নাযিলা' পাঠের ক্ষেত্রে ইমাম সশব্দে দোয়া পাঠ করেছেন এবং মুক্তাদিগণ 'আমীন' বলেছেন। বিতরের কুনুতেও অনেকে এরূপ করেছেন। কেউ মারা গেলে তার জন্য দোয়া করতে জানাযার নামায আদায় করেছেন। এছাড়া শুধু দোয়া করতে কখনো সমবেত হন নি। আযানের পরে, নামাযের পরে, খাওয়ার পরে, মসজিদে গমনের সময়ে বা অন্যান্য নিয়মিত দোয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ার সাথে বা অন্য কারো দোয়ার সাথে 'আমীন' বলেন নি, বরং প্রত্যেকে নিজের মত দোয়া করতেন।

(ঙ) গাইরে মাসনূন শব্দকে দোয়ার জন্য ওযীফা হিসাবে গ্রহণ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিভিন্ন দোয়া বর্ণিত হয়েছে। দোয়ার সময় এসকল শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা উত্তম। যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো শব্দে দোয়া করলেই দোয়ার ইবাদত পালন হবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শখানো শব্দ ব্যবহার করলে দোয়ার ইবাদত ছাড়াও তাঁর অনুসরণের ইবাদত পালন করা হবে। এছাড়া এতে কবুলিয়তের সম্ভাবনা বাড়ে ও মহব্বত বৃদ্ধি পায়। কোনো আলেম বা বুজুর্গ লিখিত "গাইর মাসনূন" দোয়াকে সর্বদা পাঠ করা বা রীতি করে নেওয়া খেলাফে-সুন্নাত।

এছাড়া আমাদের সমাজে অনেক মিথ্যা ও বানোয়াট দোয়া হাদীসের নামে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে অন্যতম: 'হাফত হাইকাল', 'দোয়া গঞ্জল আরশ', 'দোয়া আহাদ নামা', 'দোয়া হাবীবী', 'হিযবুল বাহার', 'দোয়া কাদাহ', 'দোয়া জামীলা', 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুবারাক নামসমূহের ওযীফা', 'দরুদে আকবার', 'দরুদে লাখী', 'দরুদে হাজারী', 'দরুদে তাজ', 'দরুদে তুনাজ্জিনা', 'দরুদে রুহী', 'দরুদে শেফা', 'দরুদে নারীয়া', 'দরুদে গাওসিয়া', 'দরুদে মুহাম্মাদী'। এধরণের অনেক বানোয়াট বা মানব রচিত দোয়া বানোয়াট চটকদার ফলাফলের কাহিনী সহ বিভিন্ন "আমল", "ওযীফা", "যিক্র" বা "নামায শিক্ষা" গ্রন্থে প্রচারিত হচ্ছে। এগুলির কিছু পুরোটাই বানোয়াট এবং কিছু মাসনূন দোয়ার

সাথে খেলাফে সুন্নাত দোয়ার সংমিশ্রণ। সর্বাবস্থায় এগুলির মধ্যে কোনো নবুয়তের নূর নেই। এছাড়া এ জাতীয় অনেক দোয়ার মধ্যে আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শেখানো বা পালিত শব্দ বাদ দিয়ে এগুলির নিয়মিত আমল নিঃসন্দেহে সুন্নাতের প্রতি অবহেলা।

(চ). জীবিত কারো কাছে দোয়া চাওয়া

কারো কাছে দোয়া চাওয়া বলতে দুটি বিষয় বুঝানো যায়: (১) কাউকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন বা কিছু বিষয় চেয়ে দিন, (২) কারো কাছে কোন বিষয় চাওয় বা বলা যে, আপনি আমাকে অমুক বিষয় প্রদান করুন। এখানে আমরা প্রথম অর্থ বুঝাচ্ছি। দ্বিতীয় বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

অনেক সাধারণ মুসলিম সাধারণত নিজের জন্য নিজে আল্লাহর দরবারে দোয়া চাওয়ার চেয়ে অন্য কোনো বুজুর্গের কাছে দোয়া চাওয়াকেই বেশি উপকারী বলে মনে করি। পিতামাতা, উস্তাদ, আলেম নেককার কোনো জীবিত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া জায়েয, যা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। তার আগে আমাদের বুঝতে হবে যে, নিজের দোয়া নিজে করাই সর্বোত্তম। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দোয়া কি আল্লাহ শুনবেন? আসলে গোনাহগারের দোয়াই তো তিনি শুনেন। আমার মনের বেদনা, আকুতি আমি নিজে আমার প্রেমময় প্রভুর নিকট যেভাবে জানাতে পারব সেভাবে কি অন্য কেউ তা পারবেন। এছাড়া এই দোয়া আমার জন্য সাওয়াব বয়ে আনবে এবং আমাকে আল্লাহর প্রেম ও করুণার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আয়েশা (রা.) বলেন: আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম দোয়া কি?" তিনি উত্তরে বলেন:

"মানুষের নিজের জন্য নিজে দোয়া করা"।"[১]

কোনো জীবিত নেককার মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া (অর্থাৎ তাঁকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন) সাধারণভাবে সুন্নাত-সম্মত। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দোয়া চাইতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দোয়া চাইতেন। তাঁরা একে অপরের কাছেও দোয় চেয়েছেন কখনো কখনো। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: উমর (রা.) উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লহ ﷺ অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন: আমাদেরকেও তোমার দোয়ার মধ্যে মনে রেখ, ভুলে যেও না।[২]

তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দোয়া চাইলে তাঁরা দোয়া করতেন। এক ব্যক্তি আনাস (রা.) -এর কাছে এসে দোয়া চায়। তিনি বলেন: "আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।" (হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) ঐ ব্যক্তি বার বার দোয়া চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন।[৩]

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবী দোয়া চাইলে করতেন না, কারণ এতে মানুষ দোয়া চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমরের (রা.) কাছে চিঠি লিখে দোয়া চায়। তিনি উত্তরে লিখেন:

"আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দোয়া করব বা আমার দোয়া কবুল হবেই), বরং যখন নামায কায়েম করা হবে (বা নামাযের ইকামত দেওয়া হবে), তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।"[৪]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে দোয়া প্রার্থনা করে বলেন: আপনি দোয়া করেন, যেন আল্লাহ আমার গোনাহ ক্ষমা করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দোয়া চান। তখন তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের ঐ ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী? (যে সবার জন্য দোয়া করব বা আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবেনই)।[৫]

এভাবে বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, যেখানেই তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে, মানুষ এগুলিকে রীতিতে পরিণত করবে, অথবা কোনো রকম খেলাফে-সুন্নাত ধারণা বা কাজে লিপ্ত হবে সেখানেই তাঁরা এর বিরোধিতা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো সকল অবস্থায় সদা সর্বদা নিজের জন্য নিজে মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া চাওয়া, সাহাবী বা তাবেয়ীগণের মধ্যে পরস্পরের দোয়া চাওয়া, বা তাবেয়ীগণ কর্তৃক সাহাবীগণের নিকট দোয়া চাওয়ার ঘটনা খুবই কম। এজন্যই এক্ষেত্রে উপরিউক্ত সাহাবীগণ কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।[৬]

অন্যের কাছে দোয়া চাওয়া পরিত্যাগ করলে কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু যদি কেউ চিন্তা করে যে, অমুক ব্যক্তি দোয়া করলেই আল্লাহ কবুল করবেন বা অমুক ব্যক্তির দোয়াই বিপদ উদ্ধারের কারণ তাহলে সে অতিভক্তি বা শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়ে যাবে। অথবা বুজর্গগণের নিকট দোয়া চাওয়ার জন্য যদি কেউ নিজের জন্য নিজে দোয়া করার মাসনূন রীতি পরিত্যাগ করে, কোনো বিপদ, পাপ বা সমস্যায় পতিত হলেই দৌড়ে নেককার মানুষদের কাছে চলে যায় তাহলে সে শুধু বিদ'আতেই লিপ্ত হবে না, উপরন্তু অফুরন্ত সাওয়াব ও মহান প্রভুকে আবেগভরে ডাকার বা প্রার্থনা করার অশেষ নেয়ামত ও আত্মিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

দোয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। দোয়ায় রত ব্যক্তি নামায, রোযা বা যিক্‌রে রত ব্যক্তির মতোই যতক্ষণ দোয়ায় রত থাকবেন ততক্ষণ অগণিত ও অফুরন্ত সাওয়াব পেতে থাকবেন। সর্বোপরি দোয়া মহান প্রভুর সাথে বান্দার যোগাযোগ। যে কোনো দোয়া বান্দার হৃদয়ে এনে দেয় মহান প্রভুর রহমতের অপার্থিব ছোঁয়া ও অনাবিল আনন্দ। এসকল নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হন ঐ ব্যক্তি যিনি নিজের দোয়া নিজে করার

চেয়ে বেশি সময় ও আবেগ ব্যয় করেন অন্যের কাছে দোয়া চাওয়ায়। আজকাল অধিকাংশ মুসলিম এই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত।

আমাদের সর্বদা নিজের জন্য নিজে প্রভুর দরবারে দোয়া করতে হবে। যত গোনাহগার হই-না কেন, আমি তাঁরই বান্দা। তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। দোয়া কবুল হোক বা না-হোক, কবুলের আশা, আবেগ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিয়ে সর্বদা দোয়া করতে হবে। এর পাশাপাশি কোনো নেককার মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া যেতে পারে।

(ছ). কোন মৃত ব্যক্তির কাছে দোয়া চাওয়া

আমাদের দেশে অনেক মুসলিমের মধ্যে প্রচলিত একটি রীতি হলো কোনো মৃত বুজুর্গ, ওলী বা আলেমের কাছে দোয়া চাওয়া বা তাঁকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করুন। এ কর্মটি সম্পূর্ণ সুন্নাত-বিরোধী ও জঘন্য বিদ'আত। কিছু সাধারণ হাদীস ও ভিত্তিহীন কল্পনার মাধ্যমে কিছু আলেম বা এ সকল মাজারের সাথে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এরূপ কর্ম সমর্থন করেন। তাদের অগণিত অকাট্য (!) দলিলের সার সংক্ষেপ হলো:

(১). জীবিত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া বিষয়ক উপরের হাদীসগুলি। প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসগুলি মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল ; কারণ যখন মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়ার দলিল হিসাবে "জীবিত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়ার" হাদীসগুলি পেশ করতে হয়, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, "মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়ার" ফযীলতে বা নির্দেশনায় একটিও হাদীস নেই।

(২). মানুষ মৃত্যুর পরেও কবরে থেকে দুনিয়ার মানুষদের সালাম বা পদশব্দ শুনতে পান বলে কোনো কোনো বর্ণনা। তাঁরা কল্পনা করেন যে, সালাম যেহেতু শুনতে পান, সেহেতু দোয়া চাইলেও শুনবেন। আর শুনবেন যখন তখন অবশ্যই দোয়া করবেনও। যদিও শোনা আর কথা বলা এক নয়। মৃত ব্যক্তি কথা বা সালাম শুনতে পান বলে কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হলেও মৃতব্যক্তি দোয়া করতে পারেন বলে একটি হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। উপরন্তু যে সকল হাদীসে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি কথা শুনতে পায়, সেখানেই বলা হয়েছে যে, তারা সাড়া দিতে পারে না। বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। সে আর কোনো কর্মই করতে পারে না।

(৩). একটি বানোয়াট জঘন্য মিথ্যা কথা হাদীস নামে প্রচলিত। এতে বলা হয়েছে : "ওলীরা মরেন না, বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চলে যান।" অস্তি-ত্বহীন এই জঘন্য মিথ্যা কথাটি নিষ্কম্প চিত্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামে হাদীস হিসাবে বলা হয়। এরপর কল্পনা করা হয় যে, যেহেতু তাঁরা মরেন না, সেহেতু জীবিত অবস্থার ন্যায় মৃত্যুর পরেও তাঁদের কাছে দোয়া চাইতে হবে এবং তাঁরা দোয়া করবেন।

(৪). অগণিত মিথ্যা জনশ্রুতি ও কল্প কাহিনীর মাধ্যমে প্রচারিত হয় যে, অমুক ব্যক্তি অমুকের কবরে যেয়ে দোয়া চাওয়াতে তার বিপদ কেটে গিয়েছে। এগুলিকে এই বিদ'আতের পক্ষে দলিল হিসাবে পেশ করা হয়।

এ সকল দলিল মূলত সাহাবীগণের অনুসারী সুন্নাত প্রেমিক সুন্নী মুসলিমের কাছে একেবারেই মূল্যহীন। এ সকল দলিল যদি সহীহ ও সঠিকও হয়, তাহলেও সবকিছুর পরে তাঁর একটিই প্রশ্ন: এ ক্ষেত্রে সুন্নাত কী? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কি কখনো কোনো নবী, ওলী বা বুজুর্গের কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাইতেন? চাইলে কী-ভাবে চাইতেন? কারণ এ সকল দলিল যদি সহীহ হয় তাহলে অবশ্যই তাঁরা জানতেন এবং তা পালনেও তাঁদেরই আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ছিল। আমরা দ্বীনের সকল বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও তাঁদের সুন্নাতের পূর্ণ ও হুবহু অনুসরণ করতে চাই।

সুন্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই কোন মৃত নবী বা ওলীর কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চান নি। সাহাবীগণ কখনোই কোন নবী, ওলী বা বুজুর্গের কবরে যেয়ে তাঁদের কাছে দোয়া চান নি। এমনকি সকল ওলীর সরদার, আল্লাহর হাবীব, সাহাবীগণের চোখের মনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযা মুবারাকায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাওয়ার রীতিও সাহাবীগণের মধ্যে ছিল না। পরিপূর্ণ ভক্তি ও মহব্বতের সাথে যিয়ারত ও সালামের রীতি ছিল তাঁদের মধ্যে। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুল্লাহর ﷺ রওযা মুবারাকে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি।

আবু বকর (রা.) খিলাফত গ্রহণের পরেই কঠিনতম বিপদে নিপতিত হয় মুসলিম উম্মাহ। একদিকে বাইরের শত্রু, অপরদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রায় আধা ডজন ভণ্ড নবী। মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের সংকট। কিন্তু একটি দিনের জন্যও আবু বকর (রা.) সাহাবীগণকে নিয়ে বা নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি। এমনকি আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্যও রওযা শরীফে সমবেত হয়ে কোনো অনুষ্ঠান করেননি। কী কঠিন বিপদ ও যুদ্ধের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন আলী (রা.)। অথচ তাঁর সবচেয়ে আপনজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি।

অনুরূপভাবে পরবর্তীতে যুগগুলিতে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ কখনো পূর্ববতী কোনো মৃত নবী, ওলী, সাহাবী বা তাবেয়ীর কবরে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চান নি। সিহাহ সিত্তা ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ খুঁজে দেখুন। এ জাতীয় কোনো ঘটনা পাবেন না।

একটি ব্যতিক্রম বর্ণনা

একটি সনদহীন কাহিনীতে তৃতীয় হিজরী শতকের একজন আলেম আবু আব্দুর রাহমান মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আতবী (মৃত্যু ২৩৫হি:) বলেছেন, আমি মসজিদে নববীতে রাওযা মুবারাকা কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুঈন রওযা মুবারাকায় যেয়ে সালাম দেয়। এরপর বলে: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ বলেছেন :

"যদি তারা পাপে লিপ্ত হওয়ার পরে তোমার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে তারা আল্লাহকে তাওবা কবূলকারী করুণাময় হিসাবে পেত।"[1] আমি পাপ করেছি এবং আপনার দরবারে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনিও আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। একথা বলে সে চলে যায়। এই সময় আমি অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলছেন, বেদুঈনকে সুসংবাদ দাও, তার গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে।[2]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় :

(১). এই ঘটনাটির কোনো সনদ কেউ উল্লেখ করেননি। ঘটনাটি সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগের পরে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে ঘটেছিল বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আমার জানা মতে ষষ্ঠ হিজরী শতকের আগে কোনো গ্রন্থে এই ঘটনাটি পাওয়া যায় না। এই তিনশত বৎসর পরে কিভাবে এই ঘটনাটি জানা গেল তার কোনো সূত্র নেই।

(২). ঘটনাটি যদি বিশুদ্ধ সনদেও জানা যায় তাহলেও এথেকে সুন্নাত বা শরীয়ত প্রমাণ করা যায় না। কারণ ঘটনাটি স্বপ্ন কেন্দ্রিক। আর স্বপ্ন সুন্নাত জানার উৎস নয়।

(৩). ঘটনাটি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হলে লক্ষ লক্ষ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর কর্মের বিপরীত একটি ঘটনা। এই প্রকারের শত ঘটনাও সুন্নাত প্রেমিক মুসলিমের মনে প্রভাব ফেলে না। কারণ তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণই পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁদের রীতিই সর্বোত্তম। তাঁদের পরের ঘটনা সবই নিম্নমানের।

(৪). এইরূপ কাজ যদি সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনে ঘটত তা-হলে তা অস্বাভাবিক কিছু হতো না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ইস্তিগফার বা গোনাহের ক্ষমার দোয়া চাওয়া মহান আল্লাহর নির্দেশ। তাঁর ইন্তেকালের পরেও উম্মতের কেউ তাঁর মুবারক কবরের কাছে যেয়ে এভাবে ইস্তিগফারের দোয়া চাইলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু যেহেতু সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবেয়ীগণ তা বর্জন করেছেন এজন্য তা বর্জন করা সুন্নাত।

একজন সুন্নাত প্রেমিক মুসলিম এজন্য এই ঘটনাকে কোনোই গুরুত্ব প্রদান করবেন না। তিনি লক্ষ লক্ষ সাহাবীর সুন্নাতের বিপরীতে এই সনদহীন কথাকে একেবারেই বাতিল বলে গণ্য করবেন। আবার অনেকে সুন্নাতের মহব্বত থাকা সত্ত্বেও সনদহীন ও স্বপ্ন ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে পছন্দ করেন। এধরনের কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, এই বিষয়টি একান্তই রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্য খাস। অন্য কাউকে আল্লাহ এই মর্তবা দেননি। কখনোই কাউকে তাঁর পর্যায়ে কল্পনা করাও অনুচিত। এই অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যদি কেউ বিশেষ ক্বলবী হালে এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাওযায় যেয়ে তাঁর কাছে ইস্তিগফারের আবেদন করেন তাহলে তা জায়েজ হবে। তবে তা উত্তম আদর্শের বাইরে। উত্তম হালত হলো খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের হালত। তাঁদের সুন্নাতের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বিশেষ হালে এই আমল করলে না-জায়েজ হবে না।

যদি কেউ এধরনের সনদহীন একটি ঘটনা কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ ﷺ, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের আজীবনের সর্বদা পালিত সুন্নাত পরিত্যাগ করে নতুন সুন্নাত তৈরি করেন এবং বলেন যে, প্রতিটি মুসলমানের উচিত রাওয়া মুবারাক যিয়ারতের সময় এভাবে ইসতিগফারের দোয়া চাওয়া, তাহলে তিনি "রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আজীবনের আচরিত সুন্নাত" অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে যাবেন। তিনি এমন একটি রীতি প্রচলিত করতে চান যে রীতির দ্বারা সুন্নাত অপসারিত, দূরীভূত ও পরিত্যক্ত হয়ে যাবে।

এর চেয়েও বড় বিদ'আত ও কঠিন বেয়াদবী হলো অন্য কোনো মানুষকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তুলনা করা। যদি কেউ বলেন যে, শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাওযাতেই নয়, সকল আলেম উলামা, সাহাবী, তাবেয়ী ও বুজুর্গের কবর যিয়ারতের সময় এভাবে তাদের কাছে ইস্তিগফারের আবেদন করতে হবে বা দোয়া চাইতে হবে তাহলে আপনি কি তাঁর সাথে একমত হতে পারবেন? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমমর্যাদায় অন্যকে বসিয়েছেন এবং তাঁর, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের আজীবনের সুন্নাত পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা আজীবন যা বর্জন করেছেন, কখনই করেননি তিনি আমাদেরকে সেই কাজ করতে বলছেন। আর তাঁরা সারাজীবন যে পদ্ধতিতে দোয়া ও কবর যিয়ারত এই দুটি পৃথক ইবাদত পালন করেছেন তা বর্জন করতে আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। সুন্নাত প্রেমিক মুসলিম কি তাঁর সাথে একমত হতে পারেন?

(জ). আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়ার জন্য কারো মাজারে যাওয়া

অনেকে কবরস্থ মৃতব্যক্তির কাছে দোয়া চান না, তবে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে কোনো কবরে চলে যান। ওলী ওলীগণের কবরে, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে, তাঁদের জন্ম, মৃত্যু বা অন্য কোনো স্মৃতি বিজড়িত সময়ে দোয়া করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী। এভাবে দোয়া করলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করবেন বলে তাঁরা মনে করেন। বিশেষত অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা, ওলী বুজুর্গগণের মাযারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। তাঁদের এই চিন্তা ও কর্ম খেলাফে সুন্নাত, জঘন্য বিদ'আত ও শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার অন্যতম পথ। এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে মাযারগুলি আজ মুসলিমের ঈমান হরণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মাযারগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভণ্ড ও মুসলিম নামধারী মুশরিক ব্যবসায়ীদের জমজমাট ব্যবসা। যেখানে অগণিত সরল মুসলিম টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদির সাথে নিজের ঈমানও রেখে চলে আসেন। আমাদেরকে নিম্নের বিষয়গুলি অনুধাবন করতে হবে:

প্রথমত, আল্লাহর কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন চাওয়ার জন্য মাজারে যাওয়া সুন্নাত বিরোধী বিদ'আত রীতি। বিভিন্ন হাদীসে দোয়া কবুলের সময় ও স্থানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কখনো কোথাও বলা হয়নি যে, ওলী আল্লাহগণের কবরে দোয়া করলে

আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করবেন। কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ কোনো মাজারে বা কবরে দোয়া করতে যাননি। সুন্নাতের শিক্ষার বাইরে কোনো স্থানে বা সময়ে দোয়া করাকে কবুলের মাধ্যম মনে করা, বা সুন্নাতের শিক্ষার বাইরে কোনো স্থানে বা সময়ে দোয়া করার রীতি গ্রহণ করা খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ'আত।

দ্বিতীয়ত, কবর যিয়ারতের সুন্নাত উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর স্মরণ ও মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করা। অন্য কোন উদ্দেশ্যে কবরে যাওয়া খেলাফে সুন্নাত।

তৃতীয়ত, বুজুর্গগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান যিয়ারত করলে সেখানে বরকত হাসিলের জন্য দোয়া ইত্যাদি করা খেলাফে সুন্নাত। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতিবিজড়িত স্থানে যেয়ে তাঁর হুবহু অনুকরণে আমল করতেন, কখনোই বরকতের জন্য দোয়া, মাটি গ্রহণ ইত্যাদি করতেন না।

চতুর্থত, এভাবে আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য কারো কবরে যাওয়া মূলত আল্লাহর ওয়াদায় অবিশ্বাস করার নামান্তর। কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেছেন:

"এবং যদি আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে (তুমি তাদের জানিয়ে দাও যে) আমি তাদের নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে (আমাকে ডাকে) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দি।"[1]

আল্লাহ বললেন তিনি কাছে আছেন। ডাকলেই সাড়া দেবেন। আর আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কেন দৌড়াচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনো কোথাও বলেছেন যে, কোনো ওলী বা বুজুর্গের কবরে বা মাযারে যেয়ে দোয়া করলে তা কবুল হবে? কোথাও বলেননি। কাজেই আপনার অস্থিরতা মূলত মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) ওয়াদা ও শিক্ষার প্রতি আপনার অবিশ্বাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে দোয়ার সকল নিয়ম ও আদব শিখিয়ে গেলেন, অথচ এ কথাটি শিখালেন না! সাহাবীগণ প্রশ্ন করেছেন, কিভাবে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেন। তিনি বিভিন্ন সময়, পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, ওলী আওলিয়ার মাযারে বা কবরে যেয়ে দোয়া করলে কবুল হবে। বরং তিনি বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র যিয়ারত অর্থাৎ কবরস্থ ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দোয়া করা ছাড়া কবরের কাছে অন্য কোনো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন।

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মধ্যে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন প্রার্থনার রীতি ক্রমান্বয়ে দেখা যেতে থাকে। ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ইত্যাদি ছিল এর কারণ। জনশ্রুতি আছে – অমুক বুজুর্গের কবরের কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়। ওমনি কিছু মানুষ ছুটলেন সেখানে দোয়া করতে। পরবর্তী যুগের অনেক জীবনী গ্রন্থে এমন অনেক জনশ্রুতির কথা পাবেন। সরলমনা অনেক আলেম ও নেককার মানুষও এসকল বিষয়ে জড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার প্রেমময় প্রভুর কাছে দোয়া করছেন। যিনি তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মাধ্যমে দোয়ার সময় ও নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে অবিশ্বাস করে ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষায় অনাস্থা এনে মনগড়া ধারণার উপর ভিত্তি করে কোথাও দৌড়ে বেড়াবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করুন। আর কোনো কিছুরই আপনার প্রয়োজন নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, দোয়া সম্পর্কিত সকল হাদীস পাঠ করলে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। তা হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মতকে দোয়ার সকল আদব, নিয়ম, পদ্ধতি, শব্দ ইত্যাদি সব শিক্ষা দিয়েছেন। কখন কী-ভাবে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেন তা বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন তিনি। দোয়া কবুলের সময় সম্পর্কে আমরা অনেক হাদীস দেখতে পাই। কিন্তু দোয়া কবুলের স্থান সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা আমরা পাই না বললেই চলে। অর্থাৎ, আমরা অনেক হাদীসে দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শেষ রাত্র, নামাযের পরে, আযানের পরে ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কিন্তু "অমুক স্থানে গিয়ে দোয়া কর" এরূপ কোনো নির্দেশনা আমরা কোনো হাদীসে পাই না। শুধুমাত্র হজ্ব ও আল্লাহর ঘর কেন্দ্রিক কয়েকটি হাদীসে পাওয়া যায়, যেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যয়ীফ বা দুর্বল। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, বাইতুল্লাহর দরজার কাছে মুলতাযামে, সাফা ও মারওয়ার উপরে, তাওয়াফের সময়, আরাফাতের মাঠে দোয়া করা উচিত। এ সকল স্থানের দোয় আল্লাহ কবুল করবেন। এছাড়া দোয়ার স্থান নির্দেশ করে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ হলো ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনিত বিধান। সকল যুগের সকল স্থানের মানুষই ইচ্ছা করলে সহজেই দোয়ার জন্য মুবারক সময়গুলির সুযোগ নিতে পারবেন। কিন্তু দোয়া কবুলের কোনো বিশেষ স্থান থাকলে হয়ত সেখানে যাওয়া অনেকের জন্য সম্ভব হতো না। এজন্য আল্লাহর তাঁর সকল বান্দার জন্য দোয়ার দরজা খুলে দিয়েছেন।

(ঝ). আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা খেলাফে-সুন্নাত ও শিরক

ইতোপূর্বে আমরা বলেছি যে, কারো "দোয়া চাওয়া"-র দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে: "কাউকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমাকে অমুক দ্রব্য প্রদান করুন।" একে সাধারণত প্রার্থনা করা বা চাওয়া বলা হয়। দোয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুঃখজনক খেলাফে-সুন্নাত, বিদ'আত ও শিরক হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা।

আমরা দেখেছি যে, দোয়া ইবাদত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত শিরক। শিরক মানব জীবনের ভয়ানকতম পাপ। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, অনেক নামধারী মুসলিম বিপদে আপদে আল্লাহকে না ডেকে বা আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে বিভিন্ন ওলী-

আওলিয়াকে ডাকতে থাকেন ও তাঁদের কাছে প্রার্থনা করেন। একজন হিন্দু বিপদে আপদে বিভিন্ন দেবদেবীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। একজন খ্রিষ্টান বিভিন্ন 'সেন্ট', 'সান্তা', 'ফাদার' বা 'বাবা'র কাছে দোয়া করেন। অনুরূপভাবে, মুসলিম নামধারী মুশরিক ব্যক্তি বিভিন্ন 'ওলী', 'খাজা' বা 'বাবা'র কাছে প্রার্থনা করেন। হিন্দু ও খ্রিষ্টান যখন দেবদেবী বা 'সেন্ট' -কে ডাকেন ও তার কাছে দোয়া করেন তখন তারা ঘুণাক্ষরেও মনে করেন না যে, এ সকল দেবদেবী বা সেন্ট আল্লাহ বা স্রষ্টা, অথবা তারা ভালমন্দের মালিক। তারা শুধু মনে করেন যে, এ সকল দেবদেবী বা 'সান্তা'গণকে আল্লাহ বিভিন্ন দায়িত্ব ও ক্ষমতা দিয়েছেন তাই এদের সাহায্য চাইতে হয়। অথবা এরা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব, এদের কাছে সাহায্য চাইলে এরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন।[১]

মক্কার কাফিরগণও ঠিক এই ধারনার কারণে দেব-দেবীর পূজা করতো এবং তাদের কাছে দোয়া চাইতো। কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহই বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা,পরিচালক, হায়াত, রিযিক, দৌলত ও সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক। সবকিছুই তাঁর হাতে ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো ক্ষমতাই কারো নেই। তিনি না চাইলে কেউ কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তিনি কারো উপকার বা ক্ষতি করতে চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না।[২] তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করতো, তাঁর কাছে দোয়া করতো, তাঁর নামে কুরবানি করতো।[৩] তবে পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন দেব-দেবী, নবী ও ফিরিশতার পূজা করতো ও তাদের কাছে প্রার্থনা করতো। তাদের যুক্তি ছিল যে, সবকিছুর মালিক আল্লাহই, তবে এসকল দেব-দেবী বা ফিরিশতা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর একান্ত আপনজন। এদের কাছে চাইলে এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন। উপরন্তু আল্লাহ তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্বদের পূজা উপাসনা করলে আমাদের উপর খুশি হবেন।[৪] মহিমাময় আল্লাহ বলেছেন :

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করে যারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে : এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করে। আপনি বলুন : তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে ? সুবহানাল্লাহ ! তিনি সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে উর্ধ্বে।"[৫]

এখানে সুপারিশ বলতে তারা বুঝাচ্ছে যে, দুনিয়ায় বিভিন্ন বিপদে আপদে, প্রয়োজনে হাজতে আল্লাহর কাছে আমাদের যে সকল চাওয়া আছে তা এদের কাছে চাইলে এরা আল্লাহর কাছ থেকে সুপারিশ করে এনে দেবে। অথবা আল্লাহর কাছে চাওয়ার পাশাপাশি এদের উপাসনা করলে ও এদের কাছে বিষয়গুলি জানালে এরা আল্লাহর কাছে দেন দরবার করে আমাদের অভাব মিটিয়ে দেবে। আখিরাতের সুপারিশ বা শাফাআতের বিষয়ে অধিকাংশ কাফিরেরই সুস্পষ্ট বিশ্বাস ছিল না। **'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা'** পুস্তকে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার :-

(১). প্রার্থনা বা দোয়াই হলো মূল ইবাদত। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করাই সকল যুগের সকল শিরকের মূল। শিরকের উৎপত্তি হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ফিরিশতা, ওলী বা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে অপার্থিব ও অলৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলের ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বা তাদের সাথে আল্লাহর সরাসরি বিশেষ সম্পর্ক ও সুপারিশের বিশেষ অধিকার আছে মনে করে এদের কাছে প্রার্থনা করা। দোয়া বা প্রার্থনাই মূলত সকল শিরকের মূল। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), নযর, মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দোয়ার জন্যই। যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম। অপরদিকে এদের কাছে প্রার্থনা মূলত জাগতিক। ফসল, রোগব্যধি, বিপদাপদ, সন্তান, বিবাহ, ইত্যাদি জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। সাধারণত জান্নাত বা স্বর্গ লাভ, ক্ষমা, স্রষ্টার প্রেম, আখেরাতের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে এদের কাছে চাওয়া হয় না।

এজন্য আমরা কুরআনের বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে, মুশরিকরা ফিরিশতা, নবী, প্রতিমা ইত্যাদির ইবাদত করত মূলত দোয়ার মাধ্যমে। সাধারণভাবে মুশরিকদের শিরকই ছিল যে, তারা আল্লাহকেও ডাকত বা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইত, আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য নবী, ফিরিশতা, বুজুর্গ, পাথর, প্রতিমা ইত্যাদির কাছেও দোয়া চাইত। এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে 'দোয়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে 'দোয়া' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(২). আমাদের সমাজেও অসংখ্য মুসলিম বিপদে আপদ, রোগব্যাধি, ফসল, সন্তান, বিবাহ ইত্যাদি জাগতিক সমস্যাদির জন্য দেশের অগণিত মাযারে গিয়ে মাযারে শায়িত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের নিকট সমস্যা মেটনোর আব্দার করেন। তারা যেন খুশি হয়ে সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করেন এই আশায় প্রার্থনার পূর্বে নযর, মানত, উৎসর্গ, ভেট, টাকা-পয়সা, সাজদা, ক্রন্দন ইত্যাদি পেশ করা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে কাফির মুশরিক ও পৌত্তলিক সমাজের মতোই মুসলিম সমাজের এ সকল কবর পূজারীগণও সাধারণত কোনো পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মর্যাদার জন্য এ সকল কবর, মাযার বা দরবারে যান না।

আপনার সমাজের আনাচে কানাচে ছড়ানো অগণিত মাযারে গিয়ে দেখবেন সকলেই পার্থিব বিপদ আপদ, সন্তান, রোগব্যধি, মামলা ইত্যাদি জাগতিক সমস্যার দ্রুত নিস্পত্তি ও হাজত পূরণের জন্য এ সকল স্থানে নযর, মানত ইত্যাদি নিয়ে হাজিরা দেন। দু'চার জন মানুষ যারা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যিয়ারত করেন, তাঁরা নযর, মানত ইত্যাদির ধার ধারেন না। নীরবে যিয়ারত করে চলে যান।

(৩). সমাজে অনেক কথা প্রচলিত আছে। অমুক ব্যক্তি বিপদে পড়ে অমুক বুজুর্গকে ডেকেছিল, তিনি তাকে উদ্ধার করে দিয়েছেন। অমুক ব্যক্তি অমুকের মাযারে গিয়ে দোয়া করে বিপদ কেটে গিয়েছে। হিন্দু, খ্রিষ্টান ও সকল মুশরিক সমাজেই এই ধরনের কথা প্রচলিত। কবরের টাউটরা টাকাপয়সা ও জগাতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসকল বানোয়াট কথা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে। ভাবতে বড় অবাক লাগে, এই সকল লোকমুখের কথা আমাদের অনেক মুসলমান ভাই কত সহজে বিশ্বাস করেন! অথচ কুরআন ও হাদীসের কথায় আমাদের আস্থা আসে না। আল্লাহর রাব্বুল আলামীন ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ অনেক ঘটনায় বলেছেন যে,– অমুক, অমুক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বিপদ মুক্ত হয়েছে। ইউনূস (আ.) মাছের পেটের গভীরতম অন্ধকারে কঠিনতম বিপদে আল্লাহকে ডেকে বিপদ মুক্ত হলেন। এই কথায় আস্থা রেখে এরা আল্লাহকে ডাকতে চান না। অস্থির হয়ে শিরকের মধ্যে নিপতিত হন।

প্রিয় পাঠক, কুরআন ও হাদীসের বিবরণে আস্থা রাখুন। শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকুন। তাঁর রহমত থেকে আস্থা হারাবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক থেকে রক্ষা করুন।

(৪). কেউ কেউ মনে করেন যে, পৃথীবিতে রাজা, শাসক ও মন্ত্রীদের কাছে কোনো আবেদন পেশ করতে হলে তাদের একান্ত আপনজনদের মাধ্যমে তা পেশ করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার চেয়ে এদের মাধ্যমে চাওয়া হলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই চিন্তা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার জন্য অবমাননাকর। পৃথিবীর বাদশা আমাকে চেনেন না, আমার সততা ও আন্তরিকতার কথা তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর আপনজন আমাকে চেনেন। তার সুপারিশ পেলে বাদশাহর মনে নিশ্চয়তা আসবে যে, আমি তাঁর দয়া পাওয়ার উপযুক্ত মানুষ। আল্লাহ তা'আলার বিষয় কি তদ্রূপ? তিনি কি আমাকে চেনেন-না? আল্লাহর কোনো ওলী, কোনো প্রিয় বান্দা কি আমাকে আল্লাহর চেয়ে বেশি চেনেন? না বেশি ভালবাসেন? অথবা বেশি করুণা করতে চান? এছাড়া পৃথিবীর বাদশাহ বা বিচারকের মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভয় আছে, সুপারিশের মাধ্যমে যা দূরীভুত হয়। আল্লাহর ক্ষেত্রে কি এমন কোনো ভয় আছে?

(৫). ইসলামের শিক্ষা অনুসারে দুনিয়াতে একজন মানুষ অন্যজনের জন্য দোয়া করতে পারেন। অনুরূপভাবে আখেরাতে আল্লাহর নবীগণ ও প্রিয় নেককার বান্দাগণ গোনাহগার বান্দাদের জন্য শুপারিশ বা শাফায়াত করতে পারবেন।

শাফায়াতের দুই প্রকারের ধারণা বা বিশ্বাস আছে। এক প্রকার ধারণা কাফিরদের ধারণা। তাঁরা মনে করতো তাঁরা যাদেরকে আল্লাহর প্রিয় মনে করে ইবাদত করত সে সকল ফিরিশতা, নবী বা মানুষেরা তাদের ভক্তি ও অর্চনায় খুশি হলেই তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য শুপারিশ করবেন। আর শুপারিশ করলে আল্লাহ শুনবেন। এই ধারনা আল্লাহ কুরআন কারীমে বারবার অস্বীকার করেছেন। অনেক আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ ছাড়া কোনো শাফায়াতকারী নেই। কারো কোনো শাফায়াতের ক্ষমতা নেই। যেমন, ইরশাদ করা হয়েছে :

"আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো শাফাআতকারী নেই এবং তাদের কোনো ওলী বা অভিভাবকও নেই।"[১] আরো ইরশাদ করা হয়েছে :

"বল: সকল শাফায়াত একমাত্র আল্লাহর।"[২]

দ্বিতীয় বিশ্বাস ইসলামী বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অনুসারে শাফায়াতের মূল মালিক একমাত্র আল্লাহ। তবে তিনি কোনো বান্দার উপর খুশি হলে ও তাঁকে ক্ষমা করার বা মর্যাদা প্রদানের ইচ্ছা করলে অন্য কোনো বান্দাকে তার জন্য শুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন। শুপারিশকারীর জন্য তা হবে কারামাত ও সম্মান। আর শুপারিশকৃত বান্দা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে ক্ষমা বা মর্যাদা লাভ করবেন। এই শাফায়াত শাফায়াতকারীর ইচ্ছাধীন নয়। বরং আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর অনুমতিতে হবে। এখানে চারিটি শর্ত : যিনি শুপারিশ করবেন তাঁর উপর আল্লাহ খুশি থাকবেন এবং শুপারিশ করার অনুমতি দান করবেন। কার জন্য শুপারিশ করবেন সে বিষয়েও অনুমতি প্রদান করবেন। যার জন্য শুপারিশ করবেন তার প্রতি আল্লাহ খুশি ও সন্তুষ্ট থাকবেন।[৩]

(৬). কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের স্পষ্ট শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিশ্ব পরিচালনা করা বা কল্যাণ-অকল্যাণ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি কাউকে এই ক্ষমতা প্রদান করেননি। জীবিত বা মৃত কোনো ওলীকে আল্লাহ কোনো ক্ষমতা প্রদান করেছেন, সেই ব্যক্তি কারো দোয়া কবুল করতে পারেন বা কারো প্রয়োজন মিটাতে পারেন এধরনের সকল চিন্তা মিথ্যা, বানোয়াট, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা বিরোধী ও শিরক। কেউ বলতে পারবেন না যে, আল্লাহ কুরআন কারীমে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস শরীফে বলেছেন যে, কোনো মানুষ এই নির্দিষ্ট কর্ম করলে বা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌছালে তাকে এই নির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রদান করা হবে। কোথাও বলা হয়নি যে, যুগে যুগে আল্লাহ ওলীগণকে মৃত্যুর আগে বা পরে বিভিন্ন ক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং সকল যুগে নবীদের উম্মতেরা এদের কবরে যেয়ে তাঁদের কাছে দোয়া করত। বরং সর্বত্র স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ কাউকে

কোনো ক্ষমতা প্রদান করেননি।

(৭). আল্লাহ কাউকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করলেও তাঁর কাছে দোয়া করা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেছেন (ক্ষমতা নয়)। কিন্তু কখনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা কোনো মুসলমান কি মালাকুল মাউতের কাছে আয়ু প্রার্থনা করেছেন? অথবা, মিকাঈলের কাছে রিযিক প্রার্থনা করেছেন? – এখানেই মুশরিক ও মুমিনগণের পার্থক্য। প্রাচীন পারসিক ও বৈদিক ধর্মে ফিরিশতাদের বিশ্বাসকে বিকৃত করে তাদেরকে দেবদেবী বলে কল্পনা করা হয়। এরপর এদের কাছে প্রার্থনা করা শুরু হয়। যেমন, একজন হিন্দু 'যম' -এর কাছে আয়ু প্রার্থনা করেন, যদিও বিশ্বাস করেন যে, 'যম' স্রষ্টা নয় বা ঈশ্বর নয়। কিন্তু একজন মুসলমান কখনোই মালাকুল মউতের কাছে আয়ু প্রার্থনা করেন না। কারণ তাঁর বিশ্বাসে মালাকুল মউত মহাসম্মানিত ফিরিশতা ও আত্মা সংহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও মুসলমান তাঁর কাছে চাইতে পারে না, বরং তার মালিক আল্লাহর কাছেই চাইবে।

মজার কথা হলো যে, মুসলিম নামধারী শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি কখনোই কোনো ফিরিশতার কাছে প্রার্থনা করেন না, যদিও কুরআন কারীমে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, অমুক ফিরিশতাকে অমুক দায়িত্ব প্রদান করা হলো। কিন্তু তিনি বিভিন্ন ওলীর কাছে প্রার্থনা করেন, যদিও তাকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, অথবা তিনি আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা – একথা কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে কোথাও বলা হয়নি।

প্রথমত, এরা মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এরপর মনের আন্দাযে ধারণা করেন যে, আল্লাহ তাকে হয়ত কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন। এরপর মনগড়াভাবে এদের কাছে চাইতে থাকেন। এমনকি আল্লাহর কাছে আর প্রার্থনা করতে চান-না। হয়ত মনে করেন যে, ক্ষমতা দেওয়ার পরে আল্লাহর কাছে আর কোনো ক্ষমতা নেই। অথবা ভাবেন যে, আল্লাহ যখন ক্ষমতা দিয়েই দিয়েছেন, তখন আর ছোটখাট বিষয়ে তাঁকে বিরক্ত করার দরকার কি? কী অদ্ভুত চিন্তা। আল্লাহ বারবার তাঁর কাছে দোয়া চাইতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর কাছে দোয়া না চাওয়াকে কঠিন শাস্তির বিষয় বলে জানালেন। কোথাও বললেন-না যে, ছোটখাট বিষয় হলে আর আমার কাছে চাওয়া লাগবে না, অমুকের কাছে চাইবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার ছোটবড় সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ দিলেন। মানুষের কাছে কষ্টের বা বিপদের কথা জানাতেও নিষেধ করলেন। কোথাও একটি বারও বললেন না যে, ছোটখাট কোনো বিষয় হলে তোমরা তাঁকে ছেড়ে অন্য কারো কাছে চাইবে। অথচ আমরা নিজেদের মনোমত নিজেদের শিরকী কর্মগুলি হালাল বানাতে শুরু করেছি। ঠিক যেভাবে মক্কার কাফিরগণ আল্লাহর বিভিন্ন শিক্ষাকে ভুল ব্যাখ্যা করে তাদের কুফর ও শিরক সঠিক বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করত।[১]

(৮). সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা, বিপদে কাউকে ডাকা খেলাফে-সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ কখনো কোনো অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, সাহাবী, তাবেয়ী বা অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করেননি। কখনোই কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রওযায় যেয়ে বলেননি যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার হায়াত বাড়িয়ে দিন, সন্তান দিন, বিপদ কাটিয়ে দিন,... ইত্যাদি। কখনো তাঁরা কোনো বিপদে, যুদ্ধে, কষ্টে, দুঃখে বলেননি যে, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে বা আমাদেরকে বাঁচান'। আমরা কেন এসক করব? তাঁদের পদ্ধতির মধ্যে থাকাই কি নিরাপদ নয়?

(ঞ). পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে দোয়া- মুনাজাত : সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত

(১) ফরয নামাযের পরে যিক্‌র ও মুনাজাতের গুরুত্ব

নামায মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। নামাযের শেষে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি ও আবেগ আসে। আমরা নামাযে মনোযোগ দিতে পারি না বলে এ প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব মনোযোগ সহকারে নামাযের সূরা-কিরাআত, তাসবীহ ও দোয়ার অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নামায শেষ করলে মুসাল্লী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি অনুভব করবেন।

এ সময়ে তাড়াহুড়ো করে উঠে চলে যাওয়া মুমিনের উচিত নয়। নামাযের পরে যতক্ষণ সম্ভব নামাযের স্থানে বসে দোয়া মুনাজাত ও যিক্‌রে রত থাকা উচিত। মুমিন যদি কিছু না করে শুধুমাত্র বসে থাকেন তাও তাঁর জন্য কল্যাণকর। নামাযের পরে যতক্ষণ মুসল্লী নামাযের স্থানে বসে থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

:

"যদি কোনো মুসলিম সালাত আদায় করে, এরপর সে তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকে, তাহলে ফিরিশতাগণ অনবরত তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকেন : হে আল্লাহ একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, একে রহমত করুন। যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে বা তাঁর স্থান থেকে উঠে যায় ততক্ষণ ফিরিশতাগণ এভাবে তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকেন।"[২]

সাহাবী-তাবেয়ীগণ ফরয নামাযের পরে সাধ্যমতো বেশি সময় কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে যত বেশি সম্ভব তাসবীহ, তাহলীল ও দোয়ায় রত থাকতে পছন্দ করতেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরে বিভিন্ন যিক্‌র ও মুনাজাত পাঠ করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে কিছু সময় বসে যিক্র ও দোয়া করা মাসনূন বা সুন্নাত সম্মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক কর্ম। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরের দোয়া কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। আবু উমামা (রা.) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো : "কোন্ দোয়া সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয় ?" তিনি উত্তওে বলেন : "রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয নামাযের পরে (দোয়া বেশি কবুল হয়)।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তবে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

(২). ফরয নামাযের পরে যিক্র ও মুনাজাতের সুন্নাত পদ্ধতি:

আমরা দেখেছি যে, ফযীলত ও সাওয়াবের কর্ম আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ। নেক আমল বা ফযীলত পালনে আমাদের দায়িত্ব হলো হুবহু তাঁর অনুসরণ করা। আমরা ফরয নামাযের পরের যিক্র ও মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝতে পেরেছি। ইতঃপূর্বে সাধারণভাবে দোয়া-মুনাজাতের ফযীলতও আমরা জেনেছি। এখন আমাদের জানতে হবে, ফরয নামাযের পরে দোয়ার ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত কী?

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে কর্মের সুন্নাত

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সালামের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো নির্ধারিত নিয়ম বা রীতি ছিল না। তিনি সাধারণভাবে এই সময়ে বিভিন্ন যিক্র ও মুনাজাত পাঠ করতেন। আমি "রাহে বেলায়াত" গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীস থেকে ২৯ প্রকারের যিক্র ও মুনাজাত উল্লেখ করেছি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ ফরয নামাযের পরে আদায় করতেন।

এ সকল হাদীস থেকে আমর দেখতে পাই যে, সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের সালামের পরে ৩ বার "আসতাগফিরুল্লাহ" ও ১ বার "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলতেন। সালামের পরেই কয়েকবার তাকবীর তাসবীহ জোরে জোরে বলতেন বলেও কোনো কোনো হাদীসে জানা যায়। এরপর ডানে বা বামে ঘুরে বসতেন বা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন। কখনো বসে কিছুক্ষণ একা একা মুখে মুখে বিভিন্ন দোয়া ও যিক্র পড়তেন। অথবা উঠে নিজের ঘরে চলে যেতেন। তিনি ফরয নামাযের পরের সুন্নাত ঘরে গিয়ে আদায় করতেন।

কখনো কখনো তিনি নামাযের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে নসীহত শুরু করতেন। ফজরের, যোহরের, আসরের ও ইশা'র নামাযের জামাতের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা ও ওয়াজ নসীহত করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে দেখেছি। মাগরিবের জামাতের পরেই উঠে ওয়াজ নসীহত করেছেন কি-না আমি দেখিনি।[২]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে বর্জনের সুন্নাত

ফরয নামাযের পরে দোয়া বা মুনাজাত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলতেন না। এছাড়া তিনি কখনোই এ সকল মুনাজাত সমবেত মুসল্লীগণের সাথে একত্রে বা জামাতবদ্ধভাবে করেননি। স্বাভাবিকভাবে হাত না তুলে বসে বসে একাকী তিনি সেগুলি পাঠ করতেন। তাঁর কখনো তাঁর ঠোঁট নাড়ানো দেখে সাহাবীগণ প্রশ্ন করে মুনাজাতের বাক্য জেনে নিয়েছেন। কখনো প্রথম কাতারে তাঁর কাছে বসা সাহাবীগণ তাঁর মুনাজাতের শব্দ শুনেছেন। তবে কখনোই তাঁরা তাঁর সাথে মুনাজাতে শরীক হননি।

জামাতে বা সমবেতভাবে দোয়া করার বিশেষ কোনো ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। তবে দুর্বল সনদে বর্ণিত এটি হাদীস থেকে আমরা দেখেছি যে, সমবেত মানুষদের মধ্যে কেউ দোয়া করলে এবং অন্যরা 'আমীন' বললে তাদের দোয়া কবুল করা হয়। এ ফযীলতের উপর নির্ভর করে সাহাবীগণ কখনো নামাযের পরে অনুরূপ নিয়মিত দোয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'আমীন' বলতেন বলে জানা যায় না। হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, কুনুত, বৃষ্টির দোয়া ইত্যাদি দোয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের, আমরা ইত্যাদি বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করতেন এবং সাহাবীগণ 'আমিন' বলতেন। পক্ষান্তরে নামাযের পরের মুনাজাতগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা আমি, আমার, আমকে ইত্যাদি ১ বচনের শব্দ ব্যবহার করতেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সাথে আমিন বলেন নি।

দোয়ার সময় দুই হাত উঠানোর ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ফযীলতের কাজটি এ ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। তিনি আজীবন সর্বদা এ সময়ে সমবেতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা বর্জন করেছেন।

তাঁর পরের যুগগুলিতে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও কেউ কখনো ফরয নামাযের পরে সমবেতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেননি। তাঁরা সুযোগ পেলে এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে যিক্র ও মুনাজাত করতেন।

উপরের বিষয়গুলি সবই সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। এ সকল তথ্যের বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে জানি না। নামাযের পরে সামষ্টিক মুনাজাতের পক্ষের কোনো আলেমও কোথাও উল্লেখ করেন নি বা দাবী করেন নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ কখনো ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে উপস্থিত মুসাল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে দোয়া করেছেন।

তবে নামাযের পরে দুই একবার তিনি নিজে হাত তুলে দোয়া করেছেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। গত শতাব্দীর কোনো কোনো আলেম উল্লেখ করেছেন যে, একদিন ফজরের নামাযের পরে ঘুরে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে দোয়া করেছিলেন। তাঁরা বলেন, ইবনু আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) বলেন:

ﷺ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলান। তিনি সালামের পরে ঘুরে বসলেন এবং দুই হাত উঠালেন ও

দোয়া করলেন।”

এ হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তবে এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ: আসওয়াদ বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলান। তিনি সালাম ফেরানোর পরে ঘুরে বসলেন।” কোন গ্রন্থেই “এবং দুই হাত উঠালেন ও দোয়া করলেন” এই অতিরিক্ত কথাটুকু নেই।[১] এজন্য মুফতী আমীমুল ইহসান বলেছেন, হাদীসটি নাযীর হুসাইন মুঙ্গীরী এভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কোনো গ্রন্থে তা খুঁজে পান নি এবং এর সনদ জানতে পারেন নি।[২]

অন্য হাদীসে ফাদল ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

সালাত দুই রাক‘আত, দুই রাক‘আত করে, প্রত্যেক দুই রাক‘আতে তাশাহ্হুদ পাঠ করবে, বিনিত হবে, কাতর হবে, অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে, বেশি করে সাহায্যা প্রার্থনা করবে এবং তোমার দুই হাত প্রভুর দিকে উঠিয়ে দুই হাতের পেট তোমার মুখের দিকে করবে এবং বলবে: হে প্রভু, হে প্রভু। যে এইরূপ না করলো তার সালাত অসম্পূর্ণ।[৩]

এই হাদীসে নামাযের পরে হাত তুলে দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। তবে স্পষ্টতই হাদীসটি নফল নামাযের বিষয়ে, যা দুই রাক‘আত করে পড়তে হয়। সর্বোপরি হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বুখারী, উকাইলী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন।[৪]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে সালাত শেষ করার পূর্বে তার দুই হাত উত্থিত করে রেখেছে। ঐ ব্যক্তি সালাত শেষ করলে তিনি বলেন:

ﷺ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দুই হাত উঠাতেন না। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৫]

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযের পরে হাত তুলে দোয়া করতেন। এখানে ফরয বা নফল সালাতের কথা উল্লেখ করা নেই। তবে যে ব্যক্তিকে ইবনু যুবাইর কথাটি বলেছিলেন সেই ব্যক্তি বাহ্যত নফল সালাত আদায় করছিল এবং এজন্যই একাকী সালাতের মধ্যে দুই হাত তুলে দোয়া করছিল।

আমরা সাধারণভাবে এই হাদীস থেকে ধারণা করতে পারি যে, তিনি নফল বা ফরয উভয় সালাতের পরেই হাত তুলে দোয়া করতেন। তবে অন্যান্য অনেক সহীহ হাদীস, যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ফরয সালাতের পরের দোয়া, যিক্র, বক্তৃতা ও অন্যান্য কর্মের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সেগুলি থেকে জানা যায় যে, তিনি ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের দোয়া-মুনাজাত করার সময় হাত তুলতেন না। এ সকল হাদীস ও এই হাদীসটির সমন্বয়ে আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি সম্ভবত মাঝে মাঝে সালাত শেষে দোয়া-মুনাজাতের জন্য হাত তুলতেন বা নফল সালাতে দোয়া করলে সালাত শেষে হাত তুলে দোয়া করতেন।

এ হলো একা একা হাত তুলে দোয়া করার কথা। ফরয নামাযের পরে মুক্তাদীদেরকে নিয়ে সমবেতভাবে হাত তুলে বা হাত না তুলে দোয়া তিনি কখনো করেননি। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

(৩). ফরয নামাযের পরে মুনাজাতের ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি :

আমাদের সমাজের একটি প্রচলিত রীতি হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে সমবেত সকল মুসল্লীকে নিয়ে ইমাম দোয়া করেন। এখানে আমরা নিম্নলিখিত কাজগুলি করছি: (১) নামাযের পরে দোয়া, (২) হাত উঠানো, (৩) সবাই মিলে একত্রে, (৪) সর্বদা, (৫) দোয়ার বিভিন্ন শব্দ, (৬) দোয়ার শেষে হাত দু'টি দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা।

আমাদের কর্মগুলিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও সুন্নাতের সাথে তুলনা করলে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারছি যে, আমাদের রীতি ও তাঁদের সুন্নাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমরা দোয়ার ফযীলতে, নামাযের পরে দোয়ার ফযীলতে, দোয়ার সময় হাত উঠানো ও মুখ মোছার ফযীলতে বর্ণিত সাধারণ হাদীসসমূহের উপর নির্ভর করে এমন একটি বিশেষ রীতি পালন করে চলেছি, যা তাঁদের যুগে একেবারেই ছিল না। এখন আমরা উপরের সুন্নাতগুলির আলোকে আমাদের খেলাফে সুন্নাত চিন্তা করি:

(ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ কখানো যা করেন নি আমরা সর্বদা তা করি :

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে হিজরতের আগেই। আমরা হিজরতের পরের ১০ বৎসরের কথা চিন্তা করি। দশ বছরের মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় ১৮,০০০ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাতে আদায় করেছেন। তন্মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযেও তিনি উপস্থিত মুসাল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করেন নি। পক্ষান্তরে আমাদের যে কোনো মুসলমানের নামাযের কথা চিন্তা করি। আমাদের জীবনের দশ বৎসরের ১৮,০০০ ওয়াক্ত নামাযের সকল নামাযেই আমরা সমবেতভাবে দোয়া করি।

(খ) এ খেলাফে সুন্নাত কর্মটিকে আমরা জরুরি ও নামাযের অংশ মনে করি:

এভাবে নামাযের পরে জামাতবদ্ধ মুনাজাত গত কয়েকশত বৎসর যাবৎ চালু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা সহ চার ইমাম, অন্যান্য ইমাম, ফকীহ ও ইসলামের প্রথম “সহস্রাব্দের” ফকীহগণ- রাহিমাহুমুল্লাহু আজমাঈন- নামাযের সালামের পরে কোনো কর্ম নির্ধারণ

করেননি। তাঁরা বারংবার জানিয়েছেন যে, সালামের সাথে সাথে নামায শেষ হয়ে যায়। সালামের সাথে সাথে নামায ও নামায সংক্রান্ত যাবতীয় আহকামের শেষ। নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, আদাব কোন কিছুর মধ্যেই তাঁরা নামাযের পরের মুনাজাতের কথা উল্লেখ করেন নি। তাঁরা সালামের পরে কিভাবে মুসল্লী মসজিদ ত্যাগ করবে বা পরবর্তী সুন্নাত-নফল নামায আদায় করবে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[১]

পরবর্তী কালে এর উদ্ভাবন ও বহুল প্রচলনের পরে সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক হাদীসের আলোকে অনেক আলেম একে সমর্থন করেছেন। তাঁরা এই "জামাতবদ্ধ মুনাজাত"-কে "মুস্তাহাব" বলেছেন। পূর্ববর্তী ইমামদের মতামতের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁরা বলেছেন যে, এই মুনাজাত নামাযের কোনো অংশ নয়। নামাযের পরে অতিরিক্ত একটি মুস্তাহাব কাজ। নামায সালামের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়, তবে কেউ যদি এর পরে অন্য কোনো মুস্তাহাব কাজ করে তাহলে দোষ নেই।

তবে কার্যত এই দোয়া বা মুনাজাত আমরা জরুরী ও নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি। এত জরুরি মনে করি যে, নামাযের পরে অন্তত দু'হাত তুলে ক্ষুদ্রতম বাক্য বলে মুখে হাত না লাগান পর্যন্ত আমাদের নামায সমাপ্ত হয়েছে বলে চিন্তা করতে পারি-না। মুক্তাদীগণকে যদি ইমাম সাহেব কোনো কুরআন, হাদীস বা নসীহত শোনাতে চান তাহলে মুনাজাতের আগে শোনাতে হবে। মুনাজাত না-হওয়া পর্যন্ত সবাই বসে থাকবেন। নামাযের অন্য অনেক সুন্নাত-মুস্তাহাব বাদ দিলেও এই 'মুস্তাহাব' বাদ দেওয়ার চিন্তা করবেন না। আর মুনাজাতের পরে কেউই বসতে চাইবেন না। মুনাজাতের পরের কুরআন, হাদীস বা নসীহত যত বড় মুস্তাহাবই হোক, সে বিষয়ে অধিকাংশেরই আগ্রহ থাকে না। অর্থাৎ, মুনাজাতকে আমরা নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি, যা ত্যাগ করা যায় না। আর পরের কুরআন, হাদীস ও নসীহত মুস্তাহাব বা খুবই উপকারী হলেও নামাযের অংশ নয় বলে জানি, তাই তাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করি না।

আমাদের দেশের অতি প্রসিদ্ধ মাসআলা হলো, ফরয নামাযের সময় 'জানাযা' উপস্থিত হলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদার আগে 'ফরযে কিফায়া' জানাযার নামায আদায় করতে হবে। কারণ, সুন্নাতের জন্য 'ফরযে কিফায়া'-কে দেরি করানো যাবে না। কিন্তু 'মুস্তাহাব' মুনাজাতের জন্য জানাযার নামায দেরি করানোয় আমরা কোনো দোষ দেখি না। এর কারণ হলো আমরা মুনাজাতকে নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিশ্বাস করি।

(গ) সুন্নাতকে অপছন্দ করা ও আমাদের রীতিকে উত্তম বলা:

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, আমাদের নামাযের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাযের অমিল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সালামের সাথে সাথে শেষ হয়ে যেত, আর আমাদের নামায সালমের পরে মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের সালামের পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ করতেন। সাধারণত কয়েকটি নির্দিষ্ট দোয়া পড়তেন, ঘুরে বসতেন, একা একা দোয়া পড়তেন অথবা অন্য কিছু করতেন। আমরা নামাযের পরে সেগুলি কিছুই করি-না, অন্যকিছু করি, যা তিনি করেননি।

আমরা একটি নতুন সুন্নাত প্রচলন করেছি যা তাঁর যুগে ছিল না। আমরা এমন কাজ করছি যা তিনি করেননি। আমরা সাধারণ কিছু ফযীলতমূলক হাদীসকে অবলম্বন করে একটি খেলাফে-সুন্নাত রীতি সমর্থন করছি। আমরা দেখেছি যে, সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক হাদীসকে কর্ম ও বর্জনের হাদীসের আলোকে আমল না-করলেই বিদ'আতের সৃষ্টি হয়।

সর্বোপরি আমরা আমাদের রীতিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতির চেয়ে উত্তম মনে করছি। এখন যদি কেউ নামাযের পরে অবিকল তাঁর মতো একাকী হাত তুলে বা না-তুলে দোয়া মুনাজাত করেন বা মাঝে মাঝে দোয়া মুনাজাত ছাড়া উঠে চলে যান এবং মাঝে মাঝে দোয়া করেন তাহলে তাঁকে আমরা কিছুটা হলেও খারাপ ও অপূর্ণ বলব। বিভিন্নভাবে তাঁর কাজের নিন্দা করব। এভাবে আমরা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতেরই নিন্দা ও সমালোচনা করি।

(৪) নামাযের পরে মুনাজাতের গুরুত্ব ও পর্যায় :

কেউ যদি নামাযের পরে সমবেত দোয়া সম্পর্কে আপত্তি করে আমরা তাকে বলব: নামাযের পরে কি দোয়া করা না-জায়েয? কঠিন প্রশ্ন। একজন মুমিন দোয়া করবে, তাকে আমরা নিষেধ করব কী করে? কোনো সময়েই তো দোয়া করা নিষেধ নয়। কোনো সময়েই দোয়ার জন্য হাত উঠানো নিষেধ নয়। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হলো জায়েয ও সুন্নাত বা রীতির মধ্যে পার্থক্য বুঝার ক্ষেত্রে। নামাযের পরে দোয়া বা মুনাজাত নিঃসন্দেহে জায়েয। কিন্তু তা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে পালন করলে তবেই তা সর্বোত্তম পর্যায়ে গণ্য হবে।

এখানে আমরা কয়েকটি পর্যায় দেখতে পাই :-

প্রথমত, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে দোয়া-মুনাজাত করা সুন্নাত অনুসারে একটি ফযীলতের কাজ।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ও তাঁর সাহাবাগণ এই ফযীলতের কাজটির কথা জানতেন। তাঁরা যেহেতু তাকওয়া, সাওয়াব অর্জন ও নেককাজ পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদর্শ; সেহেতু, আমাদের দেখা দরকার তাঁরা এই ফযীলতের কাজটি কী-ভাবে পালন করেছেন। আমরা কয়েকটা বিষয় দেখতে পাই : (১) ফরয নামাযের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো সালামের পরে উঠে অন্য ইবাদত বা অন্য কাজে লিপ্ত হয়েছেন, কখনো যিক্‌রে লিপ্ত হয়েছেন, কখনো দোয়া করেছেন। (২) তাঁরা যখন দোয়া করেছেন তখন সর্বদা একা একা দোয়া করেছেন, কখনো সমবেতভাবে করেননি। (৩) তাঁরা নামাযের পরে মোনাজাত করলে সাধারণত হাত উঠাননি।

তৃতীয়ত, ফরয নামাযের পরে মুনাজাতের সুন্নাত হলো মনের আকুতি ও সুযোগ অনুসারে যতক্ষণ সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে যিক্‌র ও মুনাজাত করা, এক্ষেত্রে মাসনূন মুনাজাতগুলি ব্যবহার করা এবং সাধারণত হাত না-তুলে শুধু মুখে মুনাজাত করা। আবেগ ও আকুলতা অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে হাত উঠানো।

চতুর্থত, কেউ যদি সর্বদা 'সমবেতভাবে' কোনো রকম অবকাশ প্রদান ব্যতীত নিয়মিতভাবে এই ফযীলতের ইবাদত আদায় করেন তাহলে তাঁর অবস্থা হবে নিয়মিতভাবে জামাতের সাথে সারারাত তাহাজ্জুদ আদায়কারীর ন্যায়। জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় ও জামাতে মুনাজাত আদায়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ কখনো কখনো জামাতে আদায় করেছেন, তবে মুনাজাত কখনো জামাতে আদায় করেছেন বলে জানা যায় না।

পঞ্চমত, যিনি এভাবে 'সমবেতভাবে সর্বদা মুনাজাত' পরিত্যাগ করাকে অপছন্দ করেন তাঁর অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির মতো যিনি তাহাজ্জুদের ফযীলতের হাদীসের উপর নির্ভর করে নিয়মিত জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় করেন। উপরন্তু যে ব্যক্তি মাসনূন বা সুন্নাত সম্মত পদ্ধতিতে একা একা, রাত্রের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করে তাকে তিনি খারাপ চোখে দেখেন। মনে করেন সর্বদা জামাতে তাহাজ্জুদ পড়লেই লোকটি ভালো করত।

(৫) ফরয নামাযের পরে যিক্র ও মুনাজাত পরিত্যাগের বিদ'আত

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ফরয নামাযের পরে যিক্র ও মুনাজাত সুন্নাত-সম্মত একটি গুরুত্ব পূর্ণ ইবাদত। তবে আমরা এই ইবাদত পালনে পদ্ধতিগত কিছু খেলাফে-সুন্নাতে মধ্যে নিপতিত। এখানে আমাদের দ্বিমুখী সমস্যা রয়েছে। অনেকে মাসনূন মুনাজাত সমর্থন করার নামে খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতির সমর্থন করছেন। অনেকে খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতির সমালোচনা করতে যেয়ে মূল মাসনূন মুনাজাত উঠিয়ে দিচ্ছেন। এছাড়া এই আংশিক খেলাফে-সুন্নাতের প্রতিবাদে এমন ভাষা ও আচরণ করছেন যা সুন্নাত-সম্মত নয়। আমরা এই দুই ধারার বাইরে থাকতে চাই। আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য হলো মূল ইবাদতকে বজায় রাখা ও যথাসম্ভব সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করে সকল ইবাদত পালন করা।

অনেক সুন্নাত প্রেমিক মানুষ যখন জানতে পারেন যে, এই "মুনাজাত" সুন্নাত-সম্মত নয়, তখন তিনি নামাযের পরের দোয়া-মুনাজাত সব পরিত্যাগ করেন। এভাবে তিনি একটি মাসনূন ইবাদত পালন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছেন। আমরা দেখেছি, ফরয নামাযের পরে কিছু সময় আল্লাহর দিকে মনকে রুজু রেখে বসে যিক্র ও মুনাজাত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলদায়ক ইবাদত। তবে আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে মনের আবেগ ও ভক্তি সহকারে একাকী যতক্ষণ ভালো লাগে ও সুযোগ থাকে এই ইবাদতে রত থাকা। আবেগহীনভাবে, তাড়াহুড়ো করে বা না শুনে না বুঝে ইমামের সাথে শুধুমাত্র হাত উঠানো ও মুখ মুছার মাধ্যমে এই ফল পাওয়া যায় না। আবার নামাযের পরে মুনাজাত না করে উঠে গেলেও এই ফল থেকে বঞ্চিত হব। সর্বোপরি মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিক্র ও মুনাজাত পরিত্যাগ করাকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করলে বা পালন করার চেয়ে বর্জন করাকে উত্তম মনে করলে নিঃসন্দেহে আমরা বিদ'আতে লিপ্ত হব। আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসরণের তাওফীক দান করুন।

(ট). জানাযার নামাযের পরে মুনাজাত

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে নিয়মিত মুনাজাতের ন্যায় অনেক স্থানে জানাযার নামাযের পরে মুনাজাতের নিয়ম প্রচলন করা হয়েছে, যদিও এই রীতিটি অত ব্যাপক নয়। এটি একটি খেলাফে-সুন্নাত রীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো একবারও জানাযার নামাযের শেষে সালামের পরে সবাই মিলে মুনাজাত করেননি। মূলত জানাযার নামাযই দোয়া। জানাযার নামাযের ৩য় তাকবীরের পরে মৃত ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি নিজে বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী বাক্যে এ সময় দোয়া করতেন। ৪র্থ তাকবীরের পরে সালামের আগেও মাঝেমধ্যে দোয়া করেছেন বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু জানাযার নামাযের সালামের পরে কখনো তিনি মুনাজাত করেননি। সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ ও পরবর্তী যুগেও ইমামগণ কেউই তা করেননি বা করতে বলেননি। এমনকি জানাযার নামাযের সালামের পরে দোয়া কবুল হয়, বা দোয়ার বিশেষ কোনো ফযীলত আছে তাও কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

বস্তুত অনারব দেশের অধিকাংশ মানুষ মাসনূন আরবী দোয়া মুখস্থ করতে ও অর্থ বুঝে দোয়া করতে পারেন না। অনেকে বুঝতে চান না যে, সুন্নাতের অনুসরণই কুবলিয়্যাতের শর্ত, সুন্নাত অনুসারে যে দোয়া করেছি তা কবুল হলেই যথেষ্ট। এজন্য সুন্নাত পদ্ধতিতে জানাযার নামাযের দোয়া আদায় করে অনেকের তৃপ্তি হয় না। তারা মনের আবেগ দিয়ে মাতৃভাষায় আরো কিছু দোয়া করতে চান। এ জন্য কোথাও কোথাও এ মুনাজাতের শুরু হয়। ফকীহগণ এর প্রতিবাদ করতে থাকেন। হানাফী মযহাবের বিভিন্ন গ্রন্থে এই মুনাজাতকে নিষিদ্ধ, মাকরূহ, বিদ'আত, মূল্যহীন ইত্যাদি বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি) আল-বাহরুর রাইক গ্রন্থে, মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) মিরকাতে ও অন্যান্য অনেক ফকীহ এই কাজটি বর্জনীয় ও মাকরূহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

কিন্তু সমাজে কোনো কাজ প্রচলিত হয়ে গেলে কোনো কোনো আলেম এর পক্ষে দলিল খুঁজতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা অজুহাত দিয়ে তা জায়েয বলতে চান। ফকীহদের নিষেধও তারা ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন। যদিও ফকীহগণ সর্বাবস্থায় এরূপ দোয়া মাকরূহ বলেছেন, তবুও এরা বলেন, জানাযার পরে কাতার ঠিক রেখে দোয়া করা মাকরুহ, কাতার ভেঙ্গে করলে দোষ নেই। সর্বোপরি কেউই দাবি করতে পারছেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানাযার নামাযের সালাম ফেরানোর পরে কখনো সবাইকে নিয়ে একত্রে মুনাজাত করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর যে কাজ তাঁরা করেননি তা বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক, সম্ভাবনা বা অযুহাত বের করে করার প্রয়োজনীয়তা কী?

(৬). ফযীলতের দলিল দিয়ে বিদ'আত সৃষ্টির কয়েকটি নমুনা

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাধারণ ফযীলতের হাদীস যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের সুন্নাতের আলোকে পালন করা না হয় তাহলে আমরা অনেক কাজ তৈরি করতে পারব যা তিনি বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো করেননি। যাঁরা সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকার চেয়ে "অকাট্য! দলিলের" ভিত্তিতে নতুন নতুন ইবাদত বা ইবাদত পদ্ধতি তৈরি করতে ভালবাসেন তাঁদের জন্য আরো কিছু নতুন নমুনা পেশ করছি।

(ক). নামাযের পরে মাসনূন যিক্র সমবেতভাবে আদায় করা

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদির ফযীলতে অনেক হাদীস রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামগণ তা তাঁদের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁরা তা একাকী ও চুপেচুপে বা মৃদু স্বরে আদায় করেছেন। আমাদের জানা মতে এখনো সর্বত্র এভাবেই আদায় করা হয়। তবে যে পদ্ধতিতে আমরা যিক্র, দোয়া, মুনাজাত, দরুদ সালাম ইত্যাদি ইবাদতের সাধারণ ফযীলতের হাদীস দ্বারা "জামাতে" ও "বিশেষ পদ্ধতিতে" আদায়ের ফযীলত ও আবশ্যকতা প্রমাণ করি, সেভাবে এগুলিকে জামাতে আদায়ের ফযীলত প্রমাণ করা যায়।

এখন যদি আমরা কোনো মসজিদে নামায আদায়ের পরে দেখি, সালামের পরেই ইমাম সাহেব ও মুক্তাদীগণ সমবেতভাবে সমস্বরে বুকে ধাক্কা মেরে মেরে উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করছেন : 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার পর্যন্ত, এরপর একইভাবে ৩৩ বার 'আল-হামদুলিল্লাহ' এরপর একইভাবে ৩৩/৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার'। তাঁদের যিক্রের শব্দে মসজিদ আলোড়িত হচ্ছে। আবেগ ও মহব্বতে হৃদয় আপ্লুত হচ্ছে। আপনি কি বলবেন? নিশ্চয় আপনি মানতে চাইবেন না, কারণ এগুলি আপনার এলাকায় প্রচলিত নয়। কিন্তু যারা এভাবে যিক্র করবেন তাঁরা ঠিক আমরা যেভাবে নামাযের পরে সমবেত মুনাজাতের, সমবেতভাবে যিক্র, দরুদ, সালাম ইত্যাদির পক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করে থাকি, সেভাবেই তাদের কাজের পক্ষে অকাট্য!! দলিল প্রমাণ পেশ করবেন। সমস্যা একটিই; সাধারণ ফযীলতের হাদীস দ্বারা বিশেষ পদ্ধতি তৈরি করে নেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের কর্মের আলোকে ফযীলতের হাদীস পালন না করে নিজেদের মনগড়াভাবে তা পালন করা।

(খ). সমবেতভাবে আযানের জওয়াব দেওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ আযানের জবাব দিতে এবং এরপর তিনটি কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন : (১) দরুদ শরীফ পাঠ করা, (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ওসীলা প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, ও (৩) এরপর নিজের জন্য দোয়া করা। হাদীসের আলোকে এগুলি নেক আমল ও আমাদের তা পালন করা উচিত। এখন প্রশ্ন হলো, কী-ভাবে আমরা তা আদায় করব? আমাদের মনগড়াভাবে না রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাত অনুযায়ী?

এক্ষেত্রে সুন্নাত হলো প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে চুপেচুপে বা মৃদু স্বরে এগুলি পালন করা। সম্ভবত এভাবেই সবত্র এগুলি পালিত হয়। তবে "অগণিত অকাট্য!! দলিল" দিয়ে এগুলি সমবেতভাবে পালন করার ফযীলত ও আবশ্যকতা প্রমাণ করা যায়। যেমন:

(ক). এগুলির ফযীলতে বর্ণিত সাধারণ হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ আযানের জওয়াব দিতে, আযানের পরে দরুদ পড়তে ও দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সকল কাজের অফুরন্ত সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

(খ). যে কাজ একা করা যায় তা সমবেতভাবে করলে দোষ হবে কেন। বিশেষত আযানের জওয়াব দেওয়াকে ফকীহগণ ওয়াজিব বলেছেন। আর ফরয-ওয়াজিব কাজ তো জামাতে পালন করাই উত্তম। এছাড়া একজন দোয়া করে অন্যরা 'আমীন' বললে দোয়া কবুল হয়, কাজেই এভাবেই এ দোয়া করতে হবে।

(গ). রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে ও চুপেচুপে পালন করলে কিছু আসে যায় না। তাঁরা তো সমবেতভাবে ও জোরে পালন করতে নিষেধ করেননি। জোরে জোরে সমস্বরে জওয়াব দেওয়া ও দরুদ পাঠ বিদ'আতে হাসানা, এতে অনেক ফযীলত ও বরকত আছে, মনের আগ্রহ জন্মে, ক্বলবের হালত উচ্চতর হয়, মহব্বত বেশি হয়, অন্যেরা শিখতে পারে ইত্যাদি অনেক ফায়দা, যা সুন্নাত পদ্ধতিতে করলে অর্জন করা যায় না। কাজেই সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে বিদ'আতে হাসানা পদ্ধতি বেশি সাওয়াবের এবং আল্লাহর নৈকট্যের জন্য বেশি সহায়ক। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে জোরে ও সমস্বরে বলার প্রয়োজন ছিল না ; কারণ তাদের মহব্বত এমনিই বেশি ছিল। বর্তমান যুগে সুন্নাত পদ্ধতিকে ব্যক্তিগতভাবে আযানের জাওয়াব ও দরুদ পাঠ করলে তা চলবে না, বরং বিদ'আতে হাসানা পদ্ধতি পালন করতে হবে।

এখন যদি আমরা কোনো মসজিদে গিয়ে দেখি যে, সেখানে সমবেত মুসল্লীগণ মুয়াজ্জিনের আযানের সাথে সাথে সম্মিলিতভাবে জোরে জোরে নিজেরাও আযানের শব্দগুলি বলছেন। সারা মসজিদ তাদের আওয়াজে ও সমবেত কণ্ঠস্বরে গমগম করছে। আযানের শেষে সবাই মিলে সুর করে সমস্বরে দুরুদ পাঠ করছেন এবং ইমাম বা মুয়াজ্জিনের সাথে সমবেতভাবে ওসীলার দোয়া পড়ছেন, তাহলে আমরা আশ্চার্য হব ও এই কাজকে মেনে নেব না বা প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদের কারণ দুটির একটি হতে পারে : (১) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ হওয়া বা (২) আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতির খেলাফ হওয়া। আমরা মূলত দ্বিতীয় কারণেই প্রতিবাদ করব, কারণ প্রথম বিষয়টি আমাদের কাছে গৌণ। প্রথম কারণে প্রতিবাদ করলে তো আমাদেরকে আরো অনেক কাজেরই প্রতিবাদ করতে হবে, যেগুলি আমরা নিজেরা করি। আর দ্বিতীয় কারণে প্রতিবাদ করা অর্থহীন ও অযৌক্তিক ; কারণ আমরা যে সকল দলিল দিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচলিত অগণিত ব্যক্তিগত নফল ইবাদতকে সমবেতভাবে পালন করা "জায়েয" করেছি, সেগুলির চেয়ে এই দলিলগুলি কোনোভাবেই দুর্বল নয়।

আর এ সকল দলিল ও যুক্তির সার সংক্ষেপ এক: তা হলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে অপবাদ দেওয়া। এ সকল "দলিলের" মাধ্যমে এরা বলতে চান যে, তিনি বিশ্বনবী, সকল যুগের সকল মানুষের নবী হয়েও এমন পদ্ধতি শিখিয়ে গেলেন যাতে সকল যুগের সকল উম্মতের কাজ হবে না! বর্তমান যুগে আল্লাহ পাওয়ার জন্য তাঁর দ্বীন যথেষ্ট নয়, নতুন দ্বীন ও নতুন নবীর প্রয়োজন! নাউজু বিল্লাহ!!

(গ). আযানের পরে বা ইকামতের আগে সমবেতভাবে মুনাজাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "আযান ও ইকামতের মাঝের দোয়া আল্লাহ ফেরত দেন না, কবুল করেন, এসময় তোমরা দোয়া করবে, তোমাদের হাজত আল্লাহর কাছে চাইবে।"[১]

এ ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো একাকী, আবেগ ও সুযোগ মতো দোয়া-মুনাজাতের সুন্নাত নিয়মানুসারে এই সময়ে মুনাজাত করা। তবে উপরের পদ্ধতিতে "সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক" হাদীসের অপব্যবহার করে সমবেতভাবে এই মুনাজাত পালনের রীতি করা যায়। আমরা বলতে পারি যে, এই সময়ে দোয়া কবুল হয় বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে। একা একা দোয়া করার চেয়ে সমবেতভাবে দোয়া করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে ব্যক্তি এই সময়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করতে নিষেধ করে সে ওহাবী ও বিদ'আতী ; কারণ সে মুসলমানদেরকে একটি নিশ্চিত কবুলের সময়ে মুনাজাত করতে নিষেধ করছে। দোয়া হলো ইবাদতের মূল, আর এই ব্যক্তি মুসলমানকে দোয়া করতে নিষেধ করছে! এর ঈমান ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে!

এ সকল অকাট্য!! দলিলসমূহের ভিত্তিতে যদি কোনো এলাকায় প্রতি মসজিদে নিয়মিতভাবে প্রতি ওয়াক্তে আযানের পরে জামাতের আগে মুসল্লীগণ সমবেত হয়ে ইমামের সাথে একত্রে মুনাজাত করেন এবং মুনাজাত শেষে মুয়াজ্জিন ইকামত দেন, তাহলে অনেকে হয়ত আপত্তি করবেন। তবে আপত্তির কারণ হবে আমাদের দেশে এর প্রচলন না থাকা। তাঁরা হয়ত এসকল অকাট্য দলিল অগ্রাহ্য করে বলবেন, এ হাদীস কি আমাদের সমাজের আলেমগণ জানেন না? শত শত বৎসর ধরে আলেমগণ বুজুর্গগণ কেউই জানলেন না, করলেন না, এরাই কি বেশি জানল।

পক্ষান্তরে সুন্নাতে নববীর প্রেমিক সুন্নী মুসলিম চিন্তা করবেন : এ হাদীস কি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ জানতেন-না? তাঁরা এভাবে মুনাজাত করলেন না, এরা করছে, এরা কি তাঁদের চেয়ে বেশি জানে, এরা কি তাঁদের চেয়েও বেশি আল্লাহ ওয়ালা।

(৭). আমাদের দলিল, আমাদের সুন্নাত বনাম সুন্নাতে নববী

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষই সুন্নাত বা দলিল অনুসরণ করেন না। সমাজের প্রচলন বা নিজেদের পছন্দ অপছন্দের অনুসরণ করেন। যে ব্যক্তি নামাযের পরে সমবেত মুনাজাত, সমস্বরে যিক্‌র, সমবেত দরুদ সালাম ইত্যাদি কর্ম বিভিন্ন "অকাট্য দলিল" দিয়ে সমর্থন করছেন, তিনিই সমবেতভাবে আযানের জওয়াব দেওয়া, ফরয নামাযের পরে সমবেতভাবে তাসবীহ আদায় করা, সমবেতভাবে আযানের জওয়াব ও মুনাজাত, জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা ইত্যাদির বিরোধিতা করছেন। অথচ এসকল কর্মের জন্যও একই পর্যায়ের "অগণিত অকাট্য দলিল" রয়েছে।

কোনোরূপ সুবিধা করতে না পারলে তাঁরা আলেম ও বুজুর্গগণের দোহাই দেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সুন্নাতের উপর নির্ভর করতে চান না বা সুন্নাতের দোহাই দেন না। নিজেরা অসংখ্য খেলাফে-সুন্নাতে নিমজ্জিত থেকে কী-ভাবে সুন্নাতের কথা বলা যায় ? অথচ আমাদের উচিত ছিল সর্বদা সুন্নাতের উপর নির্ভর করা, সুন্নাতের দোহাই দেওয়া ও সুন্নাতের ভিত্তিতে আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করা। নিজেরা খেলাফে-সুন্নাতে রত থাকলেও আমাদের উচিত কোনো কাজের প্রতিবাদ করলে সুন্নাতের আলোকে করা। আমি ওজরবশত একটি খেলাফে-সুন্নাত কর্মে রত থাকার জন্য দুঃখিত। তবে এজন্য আমি অন্য একটি খেলাফে-সুন্নাত কাজের প্রতিবাদ করতে পারব-না কেন? আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেশি ও কম কর্মের মধ্যে সামাঞ্জস্য না-রাখা :

সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে উত্তরণের অন্য কারণ বা পদ্ধতি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেশি ও কম আমলের মধ্যে সামাঞ্জস্য না রাখা বা তাঁর অধিকাংশ কর্ম ও দু'এক দিনের কর্মের মধ্যে পার্থক্য না-করা।

পূর্ববর্তী উদাহরণগুলিতে আমরা দেখেছি যে, সাধারণ ফযীলতের উপর মনগড়াভাবে আমল করতে যেয়ে আবেদ এমন কাজ উদ্ভাবন করেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো করেননি। দ্বিতীয় কারণে আমরা নতুন কাজ উদ্ভাবন করি-না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ যা করেছেন তা করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা খেলাফে-সুন্নাত বা বিদ'আত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সুন্নাতের খেলাফ করি আমরা দুই দিক থেকে – **প্রথমত,** তিনি যা মাঝেমধ্যে করেছেন তা আমরা সবসময় করে তিনি যা অধিকাংশ সময়ে করেছেন তা বর্জন করি। **দ্বিতীয়ত,** তিনি যা মুস্তাহাব হিসাবে করেছেন আমর তা সুন্নাত বা ওয়াজিব হিসাবে করে সুন্নাতের খেলাফ করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনকে অবিকল তাঁরই মতো অনুসরণ করাই সুন্নাত। এজন্য সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও মুজতাহিদ ইমামগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অধিকাংশ সময় করেছেন তাও সর্বদা করতে নিষেধ করতেন, কারণ এতে একদিকে সুন্নাতের পদ্ধতিগত খেলাফ হয়, অপরদিকে তিনি কোনো কোনো সময় যে কাজটি করতেন তা একেবারে বর্জন করা হয়। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ আমরা আলোচনা করব।

(১). চাশ্‌তের নামায নিয়মিত আদায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মাঝে মাঝে দোহা বা চাশ্‌তের নামায পড়েছেন, তবে নিয়মিত সবসময় পড়েননি। এ জন্য কোনো কোনো সাহাবী তা জানতেন না। অন্যদিকে তিনি বিভিন্ন হাদীসে নিয়মিত চাশ্‌তের নামায আদায়ের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে মসজিদে গিয়ে তা আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। অথবা ফজরের নামায আদায় করার পরে মসজিদেই চাশ্‌তের নামায আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কোনো কোনো সাহাবীকে নিয়মিত চাশ্‌তের নামায পড়তে নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁরা সাধারণভাবে নিয়মিত পড়েছেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত ও তাঁর নির্দেশনা সর্বোত্তমভাবে বুঝেছেন তাঁর সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরই নির্দেশের আলোকে তাঁদের অনেকে তা নিয়মিত আদায় করেছেন। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবী, নিয়মিত

চাশ্‌তের নামায আদায় করাকে অনুমোদন করেননি। তাঁরা মাঝে মাঝে পড়তেন ও মাঝে মাঝে বাদ দিতেন। অনেক তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীও এভাবেই আমল করতেন।[১]

(২). বিতিরের নামাযের কিরাআত ও ইমাম আবু হানীফা

উবাই ইবনু কা'ব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন :

ﷺ

.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক'আত বিতির নামায আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।"[২]

এ হাদীস ও এই অর্থের অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিতর নামাযের কিরাআতের ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে তিন রাক'আতে উপরিউক্ত তিনটি সূরা পাঠ করা। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলছেন যে. মাঝে মাঝে এই তিনটি সূরা বাদ দিয়ে অন্য সূরা পাঠ করা উচিত।[৩] বাহ্যত আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে, তিনি সুন্নাত বিরোধী মতামত প্রকাশ করেছেন। তিনি মাঝে মাঝে সুন্নাত ত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই মত থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রথম যুগের ইমামগণ সুন্নাতকে কত গভীরভাবে ও পরিষ্কারভাবে বুঝেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ মাঝে মাঝে করলে তা মাঝে মাঝে করাই সুন্নাত, সর্বদা করা সুন্নাতের খেলাফ। কোনো কাজ যদি তিনি দুই-এক বার করেন তাহলে তা দুই-এক বার করা সুন্নাত হবে বা জায়েয হবে, সর্বদা করলে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে। অনুরূপভাবে, তিনি যদি কোনো কাজ মুস্তাহাব হিসাবে করেন তাহলে তা মুস্তাহাব হিসাবে করাই সুন্নাত, ওয়াজিব বা মুবাহ হিসাবে করা খেলাফে-সুন্নাত হবে। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বিতর নামাযে এই তিনটি সূরা পাঠে উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অন্য সূরা পাঠ করতে বলেছেন। কারণ:

প্রথমত, সর্বদা এই সূরাগুলি পাঠ করলে মুসল্লীর নিজের এবং সমাজের সাধারণ মুসলমানগণের মনে হবে – বিতর নামাযে এই তিনটি সূরা পাঠ না-করলে বুঝি নামায পূর্ণ হচ্ছে না, যেমন নামাযের পরে মুনাজাত না-করলে নামাযের কিছুটা অপূর্ণতা থাকল বলে আমাদের কাছে মনে হয়। হয়তবা এগুলি তিলাওয়াত করা ওয়াজিব মনে হবে, অথচ কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা নিশ্চিত জানি যে, তিনি এই সূরাগুলি মুস্তাহাব হিসাবে পাঠ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি মাঝে মাঝে বিতর নামাযে অন্য সূরাও পাঠ করতেন।[৪] এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি এই তিনটি সূরা অধিকাংশ সময় পাঠ করতেন, কাজেই অধিকাংশ সময় এগুলি পাঠ করা এবং মাঝে মাঝে অন্য সূরা পাঠ করাই প্রকৃত সুন্নাত। আর সর্বদা এগুলি পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ।

(৩). ফজরের নামাযের কিরাআত ও ইমাম আবু হানীফার মতামত

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত শুক্রবার দিনে ফজরের নামাযে প্রথম রাকআতে কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা "সূর সাজদা" ও দ্বিতীয় রাকআতে ৭৬ নং সূরা "সূরা দাহর" পাঠ করতেন।[৫] কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সকল শুক্রবারেই এই দুটি সূরা পাঠ করতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি কখনো কখনো অন্য সূরাও পাঠ করেছেন বলে দেখা যায়।[৬]

তাহলে জুমুআর দিনের ফজরের নামাযে এই দুই সূরা তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত। তা সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) মাঝে মাঝে এই দুই সূরা বাদে অন্য সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে এই দুই সূরা তিলাওয়াত করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ, এতে ইমাম, মুক্তাদী ও সাধারণ সকল মুসল্লীর মধ্যেই এই ধারণ বদ্ধমূল হবে যে জুমুআর দিনের ফজরের নামাযে এই দুটি সূরা পাঠ না-করলে নামাযটি বোধহয় পূর্ণতা পেল-না, মনে হয় সামান্য কিছু কমতি রয়ে গেল। এভাবে মুস্তাহাবকে ওয়াজিবের গুরুত্ব প্রদানের ফলে মুস্তাহাব বিদ'আতে পরিণত হবে।[৭]

ইমাম আবু হানীফার (রাহ.) চিন্তার সঠিকতা দেখতে পাই আমরা আল্লামা আবু ইসহাক শাতেবীর (৭৯০ হি.) বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন : মিশরের ইমামগণ শুক্রবার ফজরের নামাযে সর্বদা এই দুটি সূরা তিলাওয়াত করেন। প্রথম সূরার মধ্যে তিলাওয়াতের সাজদা থাকার কারণে প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াতের সাজদা করতে হয়। এজন্য মিশরের সাধারণ জনগণ মনে করেন ফজরের নামায দুই রাক'আত, তবে জুমুআর দিনে ফজরের নামায তিন রাক'আত।[৮]

আমি (লেখক) সৌদি আরবে অবস্থানকালে কিছুদিন এক বন্ধুর পরিবর্তে এক মসজিদে ইমামতি করি। আমি ১/২ জুমু'আ এই দুই সূরা পাঠ না করতেই মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে কেউ কেউ বলতে লাগলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি সুন্নাত। তিনি জুমুআর দিন ফজরে এই দুটি সূরা পাঠ করতেন বলে সহীহ হাদীসে এসেছে। আপনি ত্যাগ করছেন কেন? আমি তাদের বুঝানোর চেষ্টা করলাম যে, এই দুটি সূরা তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব, একে ওয়াজিবের গুরুত্ব দিলে বিদ'আতে পরিণত হবে। এজন্য মাঝে মাঝে তা

বাদ দেওয়া উচিত। তাঁরা তা বুঝতে রাজি নন। তাঁদের কথা হলো আমরা তো মুস্তাহাব মনে করেই করছি। তাহলে আর বাদ দেব কেন? কিন্তু এটা কি মুস্তাহাব মনে করা হলো? মুস্তাহাব ত্যাগ করলে তো কোনো আপত্তি উঠে-না। যে কাজ ত্যাগ করলে আপত্তি বা প্রশ্ন উঠে তা আর মুস্তাহাব থাকে-না। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) মাঝেমধ্যে ত্যাগ করার মাধ্যমে মুস্তাহাব পর্যায় ঠিক রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আমাদের দেশে এর উল্টা হয়। আমরা ফজর ও বিতির নামাযের কিরাআতের এই সুন্নাতটি কখনোই পালন করি না বললেই চলে। এজন্য ইবনুল হুমাম (৬৮১ হিজরী) আফসোস করে লিখেছেন : ইমাম আবু হানীফার নির্দেশনা হচ্ছে মাঝেমধ্যে বর্জন করা, সর্বদা পরিত্যাগ করা নয়। অথচ আমাদের ইমামগণ উল্টো বুঝে সর্বদা এই সুন্নাতটি পরিত্যাগ করছেন।[১]

(৪). দোয়া কুনুত : হানাফী মযহাবের মত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের নামাযের শেষে রুকুতে যাওয়ার আগে কিছু দোয়া করতেন বলে হাদীস থেকে জানতে পারি। আমরা সাধারণত এই সময়ের দোয়াকে 'দোয়া কুনুত' বলি। কুনুত অর্থই দোয়া। এসময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে একাধিক দোয়া বর্ণিত হয়েছে। আজকাল আমরা সাধারণত এসকল দোয়ার মধ্য থেকে একটি দোয়া (...) -কে 'দোয়া কুনুত' বলে জানি। বিতরের শেষে যদি কেউ অন্য কোনো দোয়া পাঠ করে তাহলে আমরা বলি যে, সে দোয়া কুনুত পড়েনি। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, অনেক আলেম এ ধরনের কথা বলেন বলে দেখেতে পাওয়া যায়। তাঁর মনে করেন যে, বিতরের শেষে এই দোয়াটি ছাড়া অন্য কোনো দোয়া পাঠ করা যায় না, বা করা উচিত নয়। এভাবে আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ যা মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করছি। অনেকে একে "হানাফী মাযহাবের" নির্ধারিত কুনুত বলে বিশ্বাস ও প্রচার করেন।

অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী আলেমগণের মতামত সম্পূর্ণ উল্টো। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দুই প্রধান সহচর: ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ- রাহিমাহুমুল্লাহ- স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুনুতের জন্য কোনো নির্ধারিত দোয়া নেই, কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ.) লিখেছেন :

( ) ( )

"আমি বললাম : তাহলে কুনুতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন: বলা হতো যে, সূরা 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' ও সূরা 'ওয়াস সামাই যাতিল বুরুজ' পরিমাণ। আমি বললাম: কুনুতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দোয়া আছে? বা কোনো দোয়া নির্দিষ্ট করা যাবে? তিনি বললেন: না।"[২]

ইমাম মুহাম্মাদের (রাহ) অন্য গ্রন্থ "আল-হুজ্জাত"-এ তিনি লিখেছেন:

ﷺ

"আমি বললাম : তাহলে কুনুতের জন্য কি কোনো নির্ধারিত বাক্য বলতে হবে বা কোনো বাক্য নির্ধারিত করা যাবে ? তিন বললেন : না। বরং তুমি আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করবে এবং তোমার সুবিধা ও ইচ্ছামতো যে কোনো দোয়া করবে।"[৩]

৬ষ্ঠ হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী ইমাম, আল্লামা আলাউদ্দীন সামাককান্দী (৫৩৯ হি.) লিখেছেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দুটি কুনুতের দোয়া বর্ণিত হয়েছে : ( ) ও ( )। কুনুতের সময় সর্বদা শুধু এ দুটি মা'সূর দোয়া পাঠ করা উচিত নয়। বরং কখনো কখনো এ দুটি কুনুত থেকে একটি পাঠ করবে, কখনো কখনো অন্য দোয়া পাঠ করবে। এইভাবে অদল বদল করে কুনুত পাঠ করাই ভালো।"[৪]

একথার ব্যাখ্যায় তাঁর ছাত্র আল্লামা আবু বকর কাসানী (৫৮৭ হি.) লিখেছেন : (হানাফী মজহাবের ইমাম, উবাইদুল্লাহ ইবনু হুসাইন) আল-কারখী (৩৪০ হি.) লিখেছেন যে, কুনুতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দোয়া নেই। কারণ **প্রথমত,** সাহাবীগণ থেকে কুনুতের সময় পাঠের জন্য বিভিন্ন দোয়া বর্ণিত হয়েছে, এজন্য কোনো একটি দোয়া নির্দিষ্ট করে নেওয়া যাবে না। **দ্বিতীয়ত,** সবসময়ের জন্য একটি দোয়া নির্দিষ্ট করে নিলে ঐ দোয়াটি অতি সহজেই মুসল্লীর জবানে উচ্চারিত হতে থাকে, মনথেকে চিন্তাভাবনা, বেছে নেওয়া ও মনোযোগ দানের প্রয়োজন হয় না। **তৃতীয়ত,** নামাযের মধ্যে কোনো কিরাআত নির্দিষ্ট করে নেওয়া ঠিক নয়, সেক্ষেত্রে কুনুতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দোয়া নির্ধারণ করে নেওয়া আরো অনুচিত হবে। **চতুর্থত,** মাজহাবের তিন ইমামের এক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : দোয়া নির্দিষ্ট করে নেওয়াতে অন্তরের নম্রতা, বিনয় ও আকুতি নষ্ট হয়ে যায়।[৫]

এরপর কাসানী অন্য কোনো কোনো আলেমের মতামত বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন : (.) নিয়মিত রেখে, সাথে অন্যকোনো দোয়া পাঠ করা ভালো, তবে শুধু অন্যকোন দোয়া পড়লে অসুবিধা নেই। কেউ বলেছেন যে, কুনুতের বিষয়ে প্রসিদ্ধ যে দুটি দোয়া সেই দুটিকে মিলিয়ে পড়া ভালো ; ইত্যাদি।[৬]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ববর্তী ইমামগণ কী-ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ও বর্জনের মাত্রা হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করতেন। যে কাজ তাঁরা অধিকাংশ সময় করেছেন, সর্বদা করেননি তা তাঁরা সর্বদা করতে ইচ্ছুক ছিলেন-না, কারণ তাতে তাঁদের বর্জনের-সুন্নাত পালিত হয় না, উপরন্তু কর্মের-সুন্নাত পালনে প্রকারগত ব্যতিক্রম বা খেলাফ হয়।

(৫). শোকরানা সাজ্দা : আবু হানীফা ও মালিকের (রহ.) মত

একাধিক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দীর্ঘ জীবনের ২/৪ টি ঘটনায় কোনো বিশেষ সুসংবাদ পেলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া পেশের জন্য একটি সাজদা করেছেন।[১] কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক- রাহিমাহুমাল্লাহু- শুকরানা সাজদাকে বিদ'আত বলেছেন এবং নিষেধ করেছেন।[২] তাঁদের যুক্তি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দীর্ঘ জীবনে অনেকবার তিনি সুসংবাদ পেয়েছেন। শুকুরানা বা কৃতজ্ঞতার সাজদা যদি তার সুন্নাত ও রীতি হতো, তাহলে অসংখ্য সাহাবী তা বর্ণনা করতেন। দুই একটি ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনায় তিনি সাজদা করেননি। এ জন্য সামান্য কয়েকটি ঘটনার উপর নির্ভর করে কোনো কর্মকে সুন্নাত বানিয়ে নেওয়া ঠিক নয়, এতে তাঁর সুন্নাত মূলত বিনষ্ট হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'একটি ঘটনায় সাজদা করেছেন। বাকি অসংখ্য সুসংবাদের ঘটনায় সাজদা করেননি, অর্থাৎ সাজদা করা বর্জন করেছেন। এখন আমরা যদি আমাদের জীবনের সকল সুসংবাদের ঘটনায় সাজদা করি তাহলে কি আমাদের জীবনের চিত্রের সাথে তাঁর জীবনচিত্র মিলে যাবে?

আমরা যারা ইমাম আবু হানীফার অনুসরণের দাবি করি, অথচ সহীহ হাদীস নয়, বরং দু'একটি অত্যন্ত দুর্বল বা বানোয়াট হাদীসের উপর নির্ভর করে ফযীলতের বিষয় বলে 'মুস্তাহাব' প্রমাণ করি। এরপর মুস্তাহাব কাজটিকে সর্বদা নিয়মিত ও প্রকাশ্যভাবে পালন করে তাকে ওয়াজিব বা সুন্নাতের পর্যায়ে নিয়ে যাই, তাদের উচিত এখানে একটু থেমে চিন্তা করা।

(৬). গায়েবানা জানাযা

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বেশি আমল ও কম আমলের মধ্যে সামাঞ্জস্য না-রাখার ফলে খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত হওয়ার আরেকটি উদাহরণ গায়েবানা জানাযার রীতি প্রচলন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর অগণিত সাহাবী, আত্মীয়স্বজন ও আপনজন মৃত্যু বরণ করেছেন। অনেকেই তাঁর থেকে দূরে জিহাদের ময়দানে, বন্দি অবস্থায় বা দূরের কোনো শহরে বা গ্রামে অবস্থানকালে ইন্তেকাল করেছেন। কেউ তাঁর কাছে থেকে ইন্তেকাল করলে তিনি সাধারণত তাঁর জানাযা পড়তেন। তিনি কখনো কারো মৃতদেহের অনুপস্থিতিতে তার জানাযা পড়াননি। শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম ছিল আবিসিনিয়ার শাসক নাজাশীর ইন্তেকাল। সাহাবীগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করলে তাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর দেশে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। যেদিন নাজাশী ইন্তেকাল করেন সেই দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে তাঁর ইনতেকালের সংবাদ প্রদান করেন এবং গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন।[৩]

জীবনে সর্বদা যা বর্জন করেছেন এই একটি ঘটনায় তিনি তা করলেন। তাহলে আমরা কী বলব ও কী করব? আমরা বলতে পারি যে, বিষয়টি তাঁর জন্য খাস ছিল। আল্লাহ তা'আলা নাজাসীকে মর্যাদা প্রদান করে তাঁর মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাক্ষুস করে দেন এবং তিনি জানাযা আদায় করেন। অথবা বলতে পারি যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি কোনো মুসলমান এমন কোনো দেশে ইন্তে কাল করেন যেখানে কোনোভাবে তাঁর জানাযা আদায় করা হবে না, সেক্ষেত্রে মুসলিম দেশের প্রধান বিশেষভাবে তাঁর জন্য জানাযা আদায় করবেন।

কিন্তু কোনো অবস্থায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একদিনের কাজকে আমাদের রীতি বানিয়ে নিতে পারি-না। তাহলে তাঁর সবসময়ের রীতি আমরা বর্জন করব। এভাবেই আমরা বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হব।

একটি হাদীস দিয়ে সুন্নাত (!!) তৈরির বিষয়ে আরো কিছু কথা আমরা দেখব জায়েয ও সুন্নাতের পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে, ইনশা আল্লাহ।

তৃতীয় পদ্ধতি, সুন্নাতের জ্ঞানের অভাবে খেলাফে-সুন্নাতের প্রতি ভক্তি

সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে চলে যাওয়া ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কারণ হলো সুন্নাতের জ্ঞানের অভাবে খেলাফে-সুন্নাত কোনো রীতি, অবস্থা বা কর্মকে আগ্রহী ও আবেগী মুসলিম ভক্তি করে গ্রহণ করে নেন। এভাবে তিনি প্রথমে একটি খেলাফে-সুন্নাত কাজকে গ্রহণ করেন। এরপর তাকে সুন্নাতের চেয়েও বেশি ভক্তি করেন, ভালবাসেন এবং উত্তম মনে করেন। সমাজের অনেক বিদ'আতই এইভাবে প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীতে জ্ঞানের অধিকারী মানুষেরা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলি সমর্থন করেছেন এবং এগুলির পক্ষে "অকাট্য !! দলিল" পেশ করেছেন।

(১). যিক্‌রে বেহুঁশ হওয়া ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের মতামত

আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা.) পুত্রের ঘটনায় এর নমুনা পেয়েছি। আমরা দেখেছি যে, তিনি তাঁর ছেলেকে 'যিক্‌রের সময় আল্লাহর ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান যে সকল ভক্ত যাকির' তাদের সাথে মিশতে নিষেধ করেছেন। কারণ শুধু ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে নয়, ইবাদত পালনের ফলে ক্বলবের যে হালত বা অবস্থা হবে সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন পূর্ণাঙ্গ ও একমাত্র আদর্শ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইবাদত আমরা দেখতে পাই। ক্বলব বা হৃদয়ের ইবাদত, যেমন মহব্বত, ভক্তি, ভয়, আশা ইত্যাদি আমরা দেখতে পাই-না। তবে আমরা নিঃসন্দেহে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করি যে, কোনো মুসলমানই এসকল ক্ষেত্রে তঁদের ঊর্ধ্বে উঠতে বা

সমকক্ষ হতে পারবে-না। ক্বলবের হালতের প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁরাই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ। কাজেই, এমন কোনো মানুষ বা গোষ্ঠীর সাথে আমাদের মেলামেশা উচিত নয় যাদের অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা থেকে ভিন্ন বা অতিরিক্ত, অথচ তাদের এই অবস্থাকে প্রশংসনীয় বা ভালো মনে করা হচ্ছে। সুন্নাতের বাইরে সবই নিম্নমানের ও অনুকরণ বা প্রশংসার অযোগ্য।

(২). বুজুর্গদের দরবেশী বনাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবেশী

যুগে যুগে মুসলিম সমাজে এই কারণে অনেক খেলাফে-সুন্নাত রীতি পদ্ধতি প্রসার লাভ করেছে। একারণেই ৪র্থ/ ৫ম হিজরী শতাব্দী থেকে মুসলিম সাধক ও সুফীয়ায়ে কেরামের মধ্যে অংসখ্য খেলাফে-সুন্নাত কাজকর্ম ও রীতিনীতি প্রসার লাভ করে। সামা, গানবাজনা, নর্তন কুর্দন, সমবেতভাবে যিক্র করা, বানোয়াট যিক্র ওযীফা পালন করা, পীরের সাজদা, পায়ে চুমুখাওয়া, মাটিতে চুমু খাওয়া, সংসার বর্জন, উপার্জন বর্জন করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা, অপরের দানের উপর নির্ভর করে মুসাফির খানায় আজীবন পড়ে থাকা, ইল্ম শিক্ষা বর্জন করা, নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদতকে শরীয়ত বলে ত্যাগ করে শুধু মা'রিফাতের দাবি করা, নফস দমনের নামে নানা রকম সাধনা করা, নিজেকে ছোট করার জন্য প্রকাশ্যে পাপ ও অন্যায় কাজ করা, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, কারামত অর্জনের জন্য সাধনা, কারামতকে বুজুর্গী মনে করা ইত্যাদি অগণিত খেলাফে-সুন্নাত কাজ ও রীতি তাঁদের মধ্যে প্রসার লাভ করে।

সুন্নাত-পন্থী উলামায়ে কেরাম ও সূফীয়ায়ে কেরামের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও এসকল বিষয় প্রসারতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। কারণ, একদিকে ছিল আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়েত ও কামালাতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর জন্য সুন্নাত পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। অপরদিকে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন খেলাফে-সুন্নাত কাজে লিপ্ত মানুষের বাহ্যিক অবস্থা, সততা, কারামত, সংসারত্যাগ ইত্যাদি দেখে সরলমনা মুসলমানদের মনে তাদের প্রতি ভক্তির সৃষ্টি। ফলে অনেকেই এদের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন।

আল্লামা যাহাবীর "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা" , খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর "আনিসুল আরওয়াহ" , খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কা'কীর "দলীলুল আরেফীন" , খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকরের "ফাওয়ায়েদুস সালেকীন" , খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার "রাহাতিল কুলূব" , "রাহাতুল মুহিব্বীন", আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর "আখবারুল আখইয়ার" ও সূফীগণের জীবনীমূলক অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করলে আমরা এসকল বিষয়ে হাজারো উদাহরণ দেখতে পাই।

(৩) সুন্নাত যিক্র বনাম খেলাফে-সুন্নাত যিক্রের প্রতি ভক্তি

এখানে আমরা আরেকটি উদাহরণ পেশ করতে পারি। মনে করুন একজন ধার্মিক মুসলিম ফজরের নামায জামাতে আদায় করে মসজিদে বসে সুন্নাত নির্দেশিত যিক্র আযকার সুন্নাত নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাহাবীদের মতো একা একা চুপে চুপে বা মৃদু শব্দে আদায় করলেন। সূর্যোদয়ের কিছু পরে তিনি ইশরাকের নামায আদায় করে নীরবে মসজিদ ত্যাগ করলেন। হয়ত তিনি যিক্রের সময় চোখের পানিতে নিরবে কাঁদছেন যা আমরা বুঝতেও পারছি না।

পাশের মসজিদে একদল মানুষ ফজরের নামাযের পরে সমবেতভাবে যিক্রে বসলেন। তাঁরা সমবেতভাবে সশব্দে ঐকতানে কিছুক্ষণ যিক্র করলেন। তাঁরা হয়ত অনেক কাঁদাকাটাও করলেন, বা কেউ কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁরা মসজিদ ত্যাগ করলেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম ব্যক্তির চেয়ে দ্বিতীয় দলের মানুষদেরকেই উত্তম ও আল্লাহর পথে বেশি অগ্রসর বলে মনে করবেন এবং সত্যিকারের আশেক ও যাকির বলে স্বীকার করবেন। এমনকি অনেকে প্রথম ব্যক্তিকে ভালো বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করবেন। অথচ তিনি পরিপূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল করেছেন, আর দ্বিতীয় দলের মানুষেরা খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতিতে যিক্র করেছেন, তাদের যিক্রের অনেক শব্দও হয়ত খেলাফে-সুন্নাত। তাহলে আমরা কোথায় গেলাম। আমরা কোনো প্রয়োজন বা অসুবিধার জন্য খেলাফে-সুন্নাত কর্ম করছি-না, বরং সুন্নাতের চেয়ে খেলাফে-সুন্নাতকে উত্তম মনে করছি এবং সুন্নাতকে নিম্নমানের বা খারাপ মনে করছি। আমরা কি ভেবে দেখেছি, কী-ভাবে আমরা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে' অপছন্দ করছি!

এরূপ অগণিত উদাহরণ রয়েছে। যিক্র, ওযীফা, দরুদ, সালাম, তাহাজ্জুদ, রোযা, ওয়াজ, নসীহত, তাবলীগ, জিহাদ, ইল্ম শেখা বা শেখানো, আমর বিল মা'রুফ, নাহইয়ু আনিল মুনকার, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই অবস্থা বিরাজমান। অনেক সময় সুন্নাতের মাপকাঠিতে বিচার না-করে আমরা কোনো কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজের বাহ্যিক ফলাফল, চমক, গরম কথা, আড়ম্বর ও অবস্থা দেখে আবেগে তাকে সমর্থন প্রদান করি এবং তাঁকেই অনুসরণ করি। এতে অনেক খেলাফে-সুন্নাত রীতি পদ্ধতি আমাদের মধ্যে ছড়াতে থাকে। এ সকল ইবাদত পালনের 'সুন্নাত' পদ্ধতি কী তা আমরা জানতে চেষ্টা করিনি। পরিস্থিতি এরূপ হয়েছে যে, এসকল ইবাদতের ক্ষেত্রে 'সুন্নাত' পদ্ধতিকে আমরা ঘৃণা করতে শুরু করেছি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

(৪). বিখ্যাত ওলীর খেলাফে-সুন্নাত কর্ম ও বায়েযীদ বুস্তামীর মতামত

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ সূফী তাইফূর ইবনু ঈসা, আবু এযিদ (বায়েযিদ) বুসতামী (২৬১ হি.) বলেন : "একজন দরবেশ আল্লাহর অন্যতম ওলী ও সংসারত্যাগী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ তাঁর কাছে আসত। তাঁর সুনাম ও প্রসিদ্ধি দেখে একদিন আমি তাঁর যিয়ারতে বের হলাম। যে মসজিদে ঐ দরবেশ বসতেন সেই মসজিদে গিয়ে দেখলাম যে, তাঁর সামনে মসজিদের কেবলার দিকে থুতু ফেলা রয়েছে। তখন আমি তাঁকে সালাম না-দিয়েই ফিরে চলে এলাম। আমি বললাম : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই ছোট্ট আদবটুকু মেনে চলতে পারে-না, সে কী-ভাবে বেলায়াতের অধিকারী হবে, কী-ভাবেই বা তাকে তার বেলায়াতের দাবিতে সত্য বলে

মনে করা যাবে?”[১]

এখন আমাদের অবস্থার সাথে বায়েযীদ বুসতামীর অবস্থা একটু তুলনা করে দেখি। যদি আমরা কেউ কোনো প্রসিদ্ধ পীর, ফকীর, ওলী, দরবেশ বা বুজুর্গের দরবারে গিয়ে দেখি যে, তাঁর চাল চলনে এধরনের আদব তো দূরের কথা অতি প্রয়োজনীয় সুন্নাতও নেই, তিনি জামাতে নামায আদায় করছেন না, তিনি সুন্নাত-মতো নামায আদায় করছেন-না বা তিনি খেলাফে-সুন্নাত কিছু কাজ করছেন তাহলে কি আমরা বায়েযীদ বুস্তামীর মতো চলে আসব?

কক্ষণো নয়। আমাদের ভক্তি-ভালবাসা কম হলে আমরা এগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে তাঁর বেলায়াতকে নিশ্চিত করব। আর পরিপূর্ণ ভক্তি-ভালবাসার অধিকারী হলে আমরা বলব: ওসব সুন্নাত মানা তো শুকনো আলেমদের কাজ।

অর্থাৎ, মারেফতের রসে একবার ভিজতে পারলে ঐসব সুন্নাত পালনের দরকার হয়-না। আমাদের মতে যে পীর বা ফকীর যত বেশি খেলাফে-সুন্নাত কাজ করবেন, তিনি তত বেশি মারেফতের রসে ভিজেছেন বলে প্রমাণিত হবে। এরা মুখে না বললেও কার্যত বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমামগণ ও বায়েযীদ বুসতামীসহ প্রথম যুগের সূফীগণ এই মারেফাতের রসে ভিজতে পারেননি বলেই আমরণ সুন্নাত পালন করেছেন। এজন্যই তাঁরা সুন্নাত পালন ও বিদ‘আত বর্জনকে বেলায়াতের একমাত্র পথ মনে করতেন।

সুন্নী মুসলমান, যার একমাত্র অবলম্বন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসরণ করা, তাঁর পক্ষে কি কখনো এভাবে মারেফতে ভিজে আর্দ্র হওয়া সম্ভব হবে। তাঁকে- তো আজীবন শুকনোই থাকতে হবে। সে চায়-না ভিজতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যতটুকু মা'রিফাত অর্জন করেছিলেন তাঁদেরকে অনুসরণ করে সে সেই মা'রিফাতের কিঞ্চিত পেতে চায়। তাঁদের সুন্নাতের বাইরে যত আর্দ্রতা সবই নাপাকীর আর্দ্রতা। মহান আল্লাহ সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে ভালবাসা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন; আমীন।

চতুর্থ পদ্ধতি, জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা না-করা

সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে চলে যাওয়ার অন্য কারণ হলো জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না-করা। জায়েযকে সুন্নাতে পরিণত করা। জায়েযের মধ্যে সুন্নাতের চেয়ে বেশি বরকত বা সমান বরকত আছে বলে ধারণা করা। অথবা জায়েযকে নিয়মিত রীতিতে পরিণত করা।

মুহতারাম পাঠক, আমরা এই গ্রন্থে মূলত জায়েয না-জায়েয নিয়ে আলোচনা করছি না। আমরা সুন্নাত নিয়ে আলোচনা করছি। কোনো কাজ খেলাফে-সুন্নাত হলেও তা জায়েয হতে পারে। কিন্তু আমরা তা পালনের সুন্নাত পদ্ধতি জানতে চাই এবং সাধ্যমতো সুন্নাত অনুযায়ী চলতে চাই। বাধ্য হয়ে যদি কখনো খেলাফে-সুন্নাত করি তাহলে মনে বেদনা নিয়ে, সুন্নাত পালনের আকুতি নিয়েই তা করব। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতকে ভালবাসার এবং শুধুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ ও সুন্নাতের মধ্যে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

(১). জায়েয বনাম সুন্নাত : দুটি উদাহরণ

(ক). নামাযের আগে নড়াচড়া

জায়েয, সুন্নাত ও বিদ‘আতের দুটি উদাহরণ আমরা প্রথমে আলোচনা করি। একজন মুসল্লী নামায আদায়ের আগে হঠাৎ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাশলেন, বিশেষ ভঙ্গিতে হাত পা নাড়ালেন, গলাখাকরি দিলেন, চোখমুখ মুছলেন বা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেন বা এধরনের কোনো কাজ তিনি করলেন। যদি কোনো আলেমকে প্রশ্ন করা হয় – এগুলি জায়েয হবে কি না, তাহলে তিনি অবশ্যই বলবেন যে, তা জায়েয। এ সকল কাজ কোনটিই না-জায়েয নয়।

কিন্তু তিনি যদি এ সকল কাজ বা যে কোন একটি কাজ সর্বদা নামাযের পূর্বে করতে থাকেন তাহলে অনেকেই আপত্তি করতে থাকবেন। এরপর যদি তিনি এধরনের কাজকে নামাযের পূর্ণতার জন্য উপকারী ও বেশি সাওয়াবের বা রুহানী ফায়দার কাজ মনে করেন তাহলে নিঃসন্দেহে সকলেই তার বিরোধিতা করবেন। এরপরে যদি উক্ত মসজিদের সকলেই সমবেতভাবে নামাযের পূর্বে উল্লেখিত কর্ম নিয়মিতভাবে করতে থাকেন তাহলে বিরোধিতা আরো প্রবল হবে। সর্বশেষ যদি তারা মনে করেন যে, নামাযের পূর্বে এ সকল কর্ম যারা করেন না, বরং অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো নামায আদায় করেন তাহলে তাঁদের নামায বর্তমান যুগে অসম্পূর্ণ থাকবে, তার সাওয়াব কম হবে বা তিনি গোনাহগার হবেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা সকলেই তাদের এই কর্মের প্রতিবাদ করব এবং হয়তবা অনেক কঠিন মন্তব্য করব।

যদি তারা তাদের কর্মের পক্ষে শত শত যুক্তি প্রমাণ পেশ করে বলেন যে, নামাযের পূর্বে এ সকল কাজ সকল মযহাবে সকল মতে জায়েয, এগুলিকে যারা না-জায়েয বলছে তারা মুসলমানদের এজমা বিরোধী, তারা স্পষ্ট হালালকে হারাম বলছে, তাহলে আপনি কী বলবেন?

(খ). অনারব ভাষায় নামাযের তিলাওয়াত, তাকবীর, যিক্‌র ইত্যাদি

যদি কেউ আরবিতে ভালোভাবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও ফারসি বা কোনো অনারবীয় ভাষায় নামাযের মধ্যে কুরআনের তরজমা তিলাওয়াত করে তাহলে ইমাম আবু হানীফার (রাহ.) মতে তা ‘জায়েয’ হবে। তাঁর দুই ছাত্র, হানাফী মযহাবের অন্য দুই ইমাম : ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের (রাহ.) মতে, যে ভালোভাবে আরবিতে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে তার জন্য নামাযের মধ্যে তরজমা পাঠ ‘জায়েয’ নয়। তবে যে আরবিতে সুন্দর করে পড়তে না-পারবে তাঁর জন্য আরবী ছাড়া অন্য

ভাষায় নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ তাঁদের সকলের মতেই 'জায়েয' হবে। অনুরূপভাবে, নামাযের তাকবীরে তাহরীমা, দোয়া, যিক্‌র, তাসবীহ এবং নামাযের বাইরে জুম'আ ও ঈদের খত্‌বা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তাঁরা একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। পশু জবেহ করার সময় আরবিতে 'বিসমিল্লাহ' বা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতে পারলেও ইচ্ছা করে অন্য যে কোনো ভাষায় 'আল্লাহ', 'প্রভু', 'দয়ালু' ইত্যাদি বললেই জবাই হয়ে যাবে এবং জবাইকারীর কাজটি জায়েয হবে বলে তাঁরা সকলেই মতপ্রকাশ করেছেন।[১]

তাকবীরে তাহরীমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) আল্লাহু আ'যম', 'আল্লাহ মহান' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহরীমা বাঁধা জায়েয বলেছেন।

এখানে আমরা জায়েয বলতে কী বুঝলাম? আমরা কি বুঝলাম যে এসকল ক্ষেত্রে আমাদেরকে সর্বদা নিয়মিতভাবে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু বা ফার্সি ভাষা ব্যবহার করতে হবে বা করা উচিত? অথবা এই মতের দ্বারা কি আমরা বুঝব যে, যে ব্যক্তি আরবি জানেন না বা পড়তে পারেন না তাঁর জন্য যেহেতু বাংলায় নামাযের সূরা কিরাআত ইত্যাদি পড়া হানাফী মাযহাবের সকল ইমামের নিকট জায়েয, সেহেতু তাঁর জন্য আর আরবি শেখার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি সর্বদা বাংলাতেই নামায আদায় করবেন?

তাঁরা এই অর্থে 'জায়েয' বলেননি। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো যদি কেউ এভাবে করে তবে তার কাজটি গোনাহের হবে না। কোনো অবস্থায় একে আমরা নিয়মিত রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। বাধ্য না-হলে এভাবে করতে আগ্রহী হতে পারি না। আমাদের মনের স্বাভাবিক আগ্রহ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতোই এসকল কাজ পালন করা। তবে যদি কেউ কোনো কারণে এধরনের ব্যতিক্রম করে তাহলে তা 'জায়েয' হবে।

এ হলো জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতামতের আলোকে জায়েযকে সুন্নাত বানালে কিভাবে খেলাফে-সুন্নাত হয়ে যায় তা উপরে আলোচিত বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, হাঁচির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর সালাম প্রেরণ জায়েয। শুধু জায়েযই নয় কেউ এ সময়ে দরুদ ও সালাম পাঠ করলে দরুদ ও সালামের যে সাধারণ ফযীলত ও সাওয়াবের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে তা তিনি পাবেন বলে আশা করা যায়। কিন্তু এই সাধারণ জায়েযকে সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত করলে তা খেলাফে-সুন্নাত হয়ে যাবে, কারণ তার ফলে হাঁচির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অবহেলিত ও বিনষ্ট হবে। অনুরূপভাবে যিক্‌রের বাক্য গণনা করা জায়েয। কিন্তু তা জামতবদ্ধ রীতিতে পরিণত করলে খেলাফে-সুন্নাত হয়ে যাবে। এখানে আরো কিছু উদাহরণ আলোচনা করছি।

(২). মসজিদে নববী থেকে হজ্বের ইহ্‌রাম করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্ব ও উমরার জন্য এহরামের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মদীনাবাসী বা মদীনার পথে আগত হাজীদের জন্য এহরামের স্থান হলো যুল হুলাইফা বা আবারে আলী, যা মদীনার শহর থেকে মক্কার দিকে মাত্র কয়েক মাইলের পথ। তিনি বিদায় হজ্বের সময় সাহাবীগণের সাথে এখান থেকেই এহরাম করেছিলেন।

এহরামের স্থান বা মীকাত নির্ধারণের অর্থ হলো কোনো হাজী বিনা এহরামে এই স্থান অতিক্রম করতে পারবেন না। এই স্থান থেকে তাকে হজ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধতে হবে। এর পরে এহরাম বাঁধলে অন্যায় হবে এবং তাকে কাফফারা দিতে হবে। তবে কেউ যদি মীকাতের আগেই এহরাম করে তাহলে তার কোনো অন্যায় হবে-না বা তাকে কোনো কাফফারা দিতে হবে-না।

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর ইবনু আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রপৌত্র মদীনার প্রখ্যাত আলেম ও কাজী আল্লামা যুবাইর ইবনু বাক্কার (২৫৬ হি.) -এর নিকট এসে প্রশ্ন করে : জনাব, কোথা থেকে এহরাম করলে ভালো হয়? তিনি উত্তরে বলেন : যুলহুলাইফা থেকে এহরাম করবে, যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এহরাম করেছিলেন। প্রশ্নকারী বলেন: আমি মসজিদে নববী থেকে এহরাম করে যাত্রা শুরু করতে চাই। যুবাইর (রাহ) বলেন: না, তা করো-না। ঐ ব্যক্তি বলে : আমি মসজিদে নববী থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাওজা মুবারকের নিকট থেকে এহরাম শুরু করতে চাই। যুবাইর (রাহ) বলেন : না, এ কাজ কর না ; কারণ আমি ভয় পাচ্ছি যে, তুমি এ করলে ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবে। প্রশ্নকারী বলেন : এতে আবার কি ফিতনা হলো? আমিতো শুধু কয়েক মাইল আগে থেকে এহরাম করছি? যুবাইর বলেন : ফিতনা হলো এই যে, তুমি মনে করছ যে, তুমি এমন একটি ভালো কাজ ও সাওয়াবের কর্ম করছ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করতে পারেননি, তুমি তাঁদের থেকেও একটু এগিয়ে গেলে! এর থেকে বড় ফিতনা আর কী হতে পারে? আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন[২]:

"যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) নির্দেশ বা কাজের খেলাফ (ব্যতিক্রম) করছে তাদের সাবধান হওয়া উচিত যে, তারা ফিতনায় নিপতিত হবে বা কঠিন কষ্টদায়ক আজাবের মধ্যে তারা নিপতিত হবে।"[৩]

এখানে লক্ষণীয় যে, কেহ যদি প্রশ্ন করেন যে, মীকাতের পূর্বে এহরাম করা কি না-জায়েয? তাহলে সবাই উত্তর দিবেন যে, তা জায়েয। আপাত দৃষ্টিতে এর মধ্যে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই বা কোনো ক্ষতিকর দিকও নেই। আরো লক্ষণীয় যে, প্রশ্নকারী দুনিয়ার পবিত্রতম ও সর্বোচ্চ মর্যাদাময় জমিন, মসজিদে নববী সংলগ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাওযা মুবারাক থেকে এহরাম করতে চেয়েছে, আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি শুধু জায়েযই নয়, বরং ভালো হওয়া উচিত। যে কেউ বলতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি বলে তো না-জায়েয হবে না, বড়জোর বিদ'আতে হাসানা হবে। বিদ'আতে হাসানা হলে মুস্তাহাব হতে অসুবিধা

নেই। অনেক যুক্তি দিয়ে আমরা বলতে পারব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মীকাত থেকে এহরাম করেছেন। সাহাবীগণ বিভিন্ন কারণে রওযা শরীফ থেকে এহরাম করেননি। অনেক কথাই আমরা বলতে পারব।

কিন্তু প্রথম যুগের আলেমগণের নিকট এসকল যুক্তির কোনো মূল্য নেই। তাঁদের কাছে মূল্য হলো সুন্নাতের। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা তাঁর মতোই করতে হবে। আর যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করতে হবে। জায়েয জায়েযের পর্যায়ে থাকবে। কেউ ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা বা প্রয়োজনে মীকাতের আগে থেকে এহরাম করতে পারেন। একে বিদ'আতে হাসানা রীতি বানালে 'মীকাত থেকে এহরাম করার' সুন্নাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের সুন্নাত উঠে যাবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীকাতের আগে এহরাম করেননি, এজন্য মীকাতের আগে এহরাম করাকে তারা 'সুন্নাতের' খেলাপ বা বিপরীত মনে করেছেন, অর্থাৎ মীকাতের আগে এহরাম না-করা "পরিত্যাগ" বা "বর্জনের সুন্নাত", মীকাতের আগে ইহরাম করলে এই সুন্নত নষ্ট হবে। আর যদি মীকাতের আগে এহরাম করায় সামান্য বেশি সাওয়াব হবে বলে মনে করা হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করা হবে। এজন্যই যুবাইর ইবনু বাক্কার তাকে নিষেধ করছেন এবং তার জন্য ফিতনা ও শাস্তির ভয় পাচ্ছেন।

(৩). বসে পেশাব করা বনাম দাঁড়িয়ে পেশাব করা

এখানে আমি জায়েযকে সুন্নাত বানানোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মূল সুন্নাত বর্জন সম্পর্কে একটি সাম্ভাব্য উদাহরণ উল্লেখ করছি, যা এখনো ঘটেছে বলে আমরা জানি না। মনে হয় উদাহরণটি আমাদেরকে জায়েয থেকে বিদ'আতে উত্তরণের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত বসে পেশাব করতেন। শুধুমাত্র একটি ঘটনায় তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণিত হাদীসে হুযাইফা (রা.) বলেছেন:

ﷺ : . ﷺ

.

"একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হাঁটছিলাম। এক সময়ে তিনি একটি বাগানের পিছনে ময়লার স্থানে গিয়ে তোমরা যেরূপ দাঁড়াও সেভাবে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি সরে যেতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে ইশারা করলেন দাঁড়াতে, তখন আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। পেশাব শেষে আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম, তিনি ওজু করলেন।"[১]

সাহাবীগণের সাধারণ রীতি ছিল বসে পেশাব করা। কোনো কোনো সাহাবী দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন বলে জানা যায়।[২]

এই ধরনের ব্যতিক্রম ঘটনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, কোনো ওজর বা অসুবিধা থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয। আরেকটু এগিয়ে বলতে পারি যে, অসুবিধা থাক বা না-থাক ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয, তবে বসে পেশাব করাই হলো সুন্নাত পদ্ধতি।[৩] কেউ আরেকটু এগিয়ে হয়ত বলতে পারেন যে, সারাজীবন বসে পেশাব করা ও জীবনে একবার দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুন্নাত।

কিন্তু কেউ যদি আরেকটু এগিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেননি,[৪] বরং তিনি স্বয়ং যেহেতু দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন সেহেতু দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুন্নাত। বসে পেশাব করার চেয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করা বেশি সাওয়াবের কাজ এবং সকল মুসলমানের উচিত সর্বদা বা প্রতিদিন কয়েকবার দাঁড়িয়ে পেশাব করা, তাহলে কি আপনারা এই পণ্ডিতের সাথে একমত হবেন? অসম্ভব নয় যে, যেসকল দেশের মানুষ দাঁড়িয়ে পেশাব করেন, তাঁরা যদি কখনো দলবেধে মুসলমান হয়ে যান, তাহলে হয়ত তাদের মধ্যে এরূপ আলেম বের হবেন যিনি দেশীয় ও সামাজিক প্রচলিত নিয়ম উঠিয়ে মূল সুন্নাতকে প্রচলিত করার চেয়ে দেশীয় রীতিকে চালু রাখার জন্য এভাবে দলিল প্রমাণ পেশ করবেন।

বিভিন্ন মুসলিম সমাজে আমরা যেভাবে দু'একটি ঘটনা বা জায়েযের বিধানকে সম্বল করে অগণিত নতুন 'সুন্নাত' প্রচলন করে 'সুন্নাতে নববীকে' দুর্বল করে ফেলেছি বা দাফন করে দিয়েছি, তার সাথে কি এই উদাহরণটির কোনো পার্থক্য আছে? পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, এরূপ অনেক কাজকে আমরা এভাবে সুন্নাত ও উত্তম বানিয়ে ফেলেছি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেকবার নিষেধ করেছেন এবং কখনোই করেননি। শুধুমাত্র কোনো কোনো সাহাবীর ব্যতিক্রম কর্ম বা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আমরা প্রথমে তা জায়েয করেছি, এরপর তাকে সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের সুন্নাত বা রীতিকে আমাদের সমাজ থেকে উঠিয়ে দিয়েছি।

(৪). শবে বারাত উদ্‌যাপন: সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভীর মতামত

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহ.) আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও সূফী বলে সুপরিচিত। আমাদের দেশের অনেক সূফী-তরীকা তাঁর মাধ্যমে ও তাঁরই নামে প্রচারিত। তাসাউফের বিষয়ে তাঁর মালফুযাত বা বাণী ও শিক্ষা সংকলিত করেছেন তাঁর ছাত্র ও সহচর শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) "সেরাতে মুস্তাকীম" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি সুন্নাত থেকে জায়েযে এবং জায়েয থেকে বিদ'আতে উত্তরণের বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন। খেলাফে-সুন্নাত কিভাবে বিদ'আত ও সুন্নাতের অবমূল্যায়নের জন্ম দেয় তা ব্যাখ্যা করেছেন।

একটি উদাহরণ হলো লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান বা শবে বরাতের আমল। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, কয়েকটি যয়ীফ

বা দুর্বল হাদীসের আলোকে এ রাতের 'সুন্নাত' একাকী মুসলমানদের গোরাস্থান যিয়ারত করা, একাকী নামায পড়া ও দোয়া করা। কেউ হয়ত একা একা ঘুম এসে যাবে ভেবে কয়েকজন একত্রে ঘরে বা মসজিদে কিছু সময় নামায পড়লেন। তাদের এই কর্মটি খেলাফে- সুন্নাত, কিন্তু তাঁরা বিশেষ প্রয়োজনে তা করেছেন, একে সুন্নাতের চেয়ে ভালো বা বেশি সাওয়াবের মনে করেননি। কিন্তু কিছুদিন পরে সমাজে এই রাতে সবাই মিলে নামায, দোয়া ও যিয়ারতের প্রচলন হয়ে গেল এবং তা সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত হলো।

এ সময়ে কেউ যদি একাকী দোয়া, যিয়ারত ও ইবাদত করে তাহলে অনেকে তার কাজকে অপূর্ণ মনে করবে। অনেকে বলবে: দেখ, এমন একটি রাতে যখন সবাই মিলে আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটি করছে, সকলের দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তখন সে এক একা বসে আছে, ইত্যাদি। এভাবে আমরা পরিপূর্ণ সুন্নাতকে খারাপ ভাবব এবং খেলাফে-সুন্নাতকে সুন্নাতের চেয়ে উন্নত মনে করব। এই পর্যায়ে আমরা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে অপছন্দ করব। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিকা! [১]

(৫). নামাযের মধ্যে দেখে কুরআন তিলাওয়াতের রীতি

নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের রীতি বা 'সুন্নাত' ছিল মুখস্থ তিলাওয়াত করা। ফরয, নফল, তারাবীহ সকল নামাযে তাঁরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন। দুই একটি ব্যতিক্রম ঘটনায় দেখা যায় যে কোনো কোনো সাহাবী কিয়ামুল লাইল বা তারাবীহের নামাযে কুরআন কারীমে দেখে দেখে তিলাওয়াত করেছেন। তাঁদের এই কর্মকে বড়জোর প্রয়োজনের জন্য 'জায়েয' পর্যায়ে মনে করা যায়। কোনো কোনো ইমাম এজন্য নামাযের মধ্যে, বিশেষত তারাবীহ নামাযের মধ্যে কুরআন কারীম দেখে দেখে তিলাওয়াত করা জায়েয বলেছেন। এই 'জায়েয' মাসআলার সুযোগে অনেক মুসলিম দেশে তারাবীহ নামাযে কুরআন কারীম 'দেখে দেখে' তিলাতওয়াত করা সাধারণ 'রীতি' বা সুন্নাতে পরিণত হয়েছে। অনেক এলাকায় সকল মসজিদে সকল ইমাম দেখে দেখে তিলাওয়াত করছেন। এমনকি অনেক হাফিজ ইমামও দেখে দেখে তিলাওয়াত করছেন। এটি নিঃসন্দেহে মূল সুন্নাতের পরিত্যাগের কারণ হবে।

(৬). কদমবুসীর রীতি

একজন মুসলমানের সাথে অন্যের দেখা হলে সালাম দেওয়া বা 'আস-সালামু আলাইকুম' বলা ও উত্তর প্রদান করা ইসলামী 'সুন্নাত'। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে তাঁর ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে তাঁর লক্ষাধিক সাহাবীর কেউ কেউ দুই একবার এসেছেন। কেউ কেউ সহস্রাধিকবার এসেছেন। এসকল ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত ছিল সালাম প্রদান। কখনো কখনো দেখা হলে তাঁরা সালামের পরে হাত মিলিয়েছেন, বা মুসাফাহা করেছেন। দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁরা একজন আরেক জনের হাতে বা কপালে চুমু খেয়েছেন বা কোলাকুলি করেছেন।

যয়ীফ বা অনির্ভরযোগ্য কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনায় দেখা যায় কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পায়ে চুমু খেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে লক্ষ মানুষের অগণিতবার আগমনেরে ঘটনার মধ্যে মাত্র ৪/৫টি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনাগুলি প্রায় সবই যয়ীফ বা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। এ সকল ঘটনায় কোনো সুপরিচিত সাহাবী তাঁর পদচুম্বন করেননি, করেছেন নতুন ইসলাম গ্রহণ করতে আসা কয়েকজন বেদুঈন বা ইহুদি, যারা দরবারে থাকেনি বা দরবারের আদব ও সুন্নাত জানত-না। [২]

আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ফাতেমা, বেলাল (রা) ও তাঁদের মতো অগণিত প্রথম কাতারের শত শত সাহাবী প্রত্যেকে ২৩ বৎসরে কমপক্ষে ১০ হাজার বার তাঁর দরবারে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু কেউ কখনো একবারও তাঁর কদম মুবারকে চুমু খাননি বা সেখানে হাত রেখে সেই হাতে চুমু খাননি।

কাজেই উপরোক্ত ৩/৪টি ব্যতিক্রম ঘটনার আলোকে বড়জোর পায়ে চুমু খাওয়া 'জায়েয' বলা যেতে পারে। আমরা বলতে পারি বিশেষ ক্ষেত্রে আবেগের ফলে বা ক্ষমা চাওয়ার জন্য যদি কেউ কারো পা জড়িয়ে ধরে বা পায়ে চুমু খায় তা না-জায়েয হবে না।

কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ ঘটনার মধ্যে ব্যতিক্রম ৩/৪ টি ঘটনাকে যদি আমরা সুন্নাত মনে করি তাহলে নিঃসন্দেহে তা মূল সুন্নাতকে নষ্ট করবে। যা আমাদের সমাজে ঘটছে। অনেককেই মুখে সালাম দেওয়ার চেয়ে কদমবুছির গুরুত্ব বেশি প্রদান করি। অনেকে কদমবুছিকেই সালাম করা বলি। অনেকে মুখে সালাম প্রদান করি-না শুধু কদমবুছি করি।

একবার চিন্তা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ২৩ বৎসরের নবুয়তী জীবনের প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অগণিত ভক্ত সাহাবী তাঁর দরবারে আসছেন। দরবারে বসে আছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ , আল্লাহর মহত্তম শ্রেষ্ঠতম খলীল ও হাবীব, যার ভক্তি ও ভালবাসা আল্লাহর কাছে নাজাতের অন্যতম ওসীলা। তাঁর দরবারে আসছেন মানব ইতিহাসের অতুলনীয় ভক্তবৃন্দ, যারা জীবনের ঊর্ধ্বে ভালবেসেছেন , ভক্তি করেছেন ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে। এই দরবারের এসব আগন্তকের কেউই কদমবুসী বা কমদমুছি করছেন না। সবাই এসে 'সালাম' দিয়ে দরবারে বসছেন। সালাম দিয়ে দরবার ত্যাগ করছেন। কখনো হয়ত মোসাফাহা হচ্ছে। এই হলো দরবারে নববী। ২৩ বৎসরের দরবারে শুধুমাত্র তিন চার জন্য নবাগত, দরবারের সুন্নাতের সাথে অপরিচিত মানুষ পায়ে চুমু খেয়েছেন বলে কোনো কোনো হাদীসে জানা যায়।

এবার আমাদের একটি দরবার বা মাজলিস চিন্তা করি। দরবারে বসে আসেন একজন ধর্মীয় নেতা, দরবারে প্রতিদিন আসছেন অগণিত ভক্ত। প্রতিটি আগন্তুক আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সালাম করছেন, মুসাফাহা করছেন, এরপর হাতে বা পায়ে চুমুখাচ্ছেন। প্রতিটি আগন্তুক বা অধিকাংশ আগন্তুক ভক্তির প্রাবল্যে ও মুক্তির আকুতিতে নেতার পদযুগর স্পর্শ করে নিজেকে ধন্য

করছেন। দুটি দরবারের চিত্র কি এক হলো? একজন সুন্নাত প্রেমিক সুন্নী মুসলিমের মনে কি কষ্ট লাগবে-না যে রাসূলে আকরামের ﷺ দরবারের সুন্নাত নষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করছে দেখে।

আমাদের কেউ হয়ত বলবেন : অসুবিধা কি? সালাম তো প্রচলিত আছেই। আমরা শুধু অতিরিক্ত একটি 'জায়েয' কাজ প্রচলন করেছি। সুন্নাত প্রেমিকের কাছে অনেক অসুবিধা আছে। 'জায়েয' কাজকে সুন্নাত বা রীতিতে পরিণত করার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারের সুন্নাতটি মৃত্যুবরণ করেছে। তাঁর দরবারের পরিপূর্ণ সুন্নাতটি এখন 'অর্ধেক সুন্নাতে' পরিণত হয়েছে। তাঁর ১৬ আনা আমাদের কাছে ৮ আনা হয়ে গেল! আমরা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছি যে, এ সকল দরবারে বা সমাজের কোথাও যদি কেউ যদি নবীজির ﷺ দরবারের পরিপূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল করে, অর্থাৎ সাহাবীদের মতো শুধু সালাম করে দরবারে বসে পড়ে বা মাঝে মাঝে 'মুসাফাহা' করে, তাহলে তাকে শুধু অপূর্ণ নয় বরং খারাপ মনে করা হবে। এখন চিন্তা করুন আমরা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত' অপছন্দ করার ক্ষেত্রে কোথায় চলে গেছি!

হয়ত আমাদের কারো একথাও মনে হতে পারে : কী আশ্চর্য, শ্রেষ্ঠ নবী, শ্রেষ্ঠ হাদী, শ্রেষ্ঠ মুরশিদ আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, যার ভক্তি ও ভালবাস ঈমান ও নাজাত তাঁকে কদমবুছি বা কদমমুছি করছেন-না আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, আবু হুরাইরা, সালমান, আবু দারদা, বিলাল ও অগণিত মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম), এমনকি তাঁর আহলে বাইত, তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানগণ, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন কেউই তাঁর কদমবুছি বা কদম মুছি করছেন না। তাঁরা আবার কেমন ভক্ত, কেমন মুহেব্বীন? লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

প্রথম যুগের মহান অনুসারীরা সুন্নাত ও জায়েযের পার্থক্য বুঝতেন। সুন্নাতের স্তর বুঝতেন। সাহাবীদের দরবার দেখুন। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, হাসান, হুসাইন (রাদিআল্লাহু আনহুম) প্রমুখ হাজার হাজার সাহাবীর দরবার দেখুন। সালামই পরিপূর্ণ সুন্নাত। উপরের দুই চারিটি ঘটনার উপর নির্ভর করে কোথাও তাঁরা পায়ে চুমু খাওয়ার প্রচলন করেননি। প্রথম যুগের তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের অবস্থাও তা-ই ছিল।

(৭). ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ও ব্রেলভীর (রহ.) মত

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সফলতা, মুক্তি, শান্তি ও নেয়ামত লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা সকল ধর্মের অনুসারিগণই করেন। এই জাতীয় সকল কর্ম একান্তই ধর্মীয় ও বিশ্বাসভিত্তিক। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মহীনতা ও অজ্ঞানতার প্রসারের ফলে এ বিষয়ে অনেক কুসংস্কার ও উদ্ভট ধারণা বিরাজমান। যেমন, অনেক সমাজে মনে করা হয়, মৃতের জীবত আত্মীয়স্বজনের দান, খাদ্য প্রদান বা কিছু অনুষ্ঠান পালনের উপরে মৃতব্যক্তির পারলৌকিক মুক্তি নির্ভরশীল।

ইসলামে এ সকল কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে মানুষের পারলৌকিক মুক্তি, শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে তার নিজের কর্মের উপরে। সৎকর্মশীল মানুষের মৃত্যুর পরে বিশ্বের কোথাও কিছু না করা হলে, এমনকি তাঁর দেহের সৎকার করা না হলেও তাঁর কিছুই আসে যায় না। অপরদিকে জীবদ্দশায় যিনি শিরক, কুফর, ইসলাম বিরোধিতা, ইসলামের বিধিনিষেধের ও ইসলামী কর্ম ও আচরণের প্রতি অবজ্ঞা, জুলুম, অত্যাচার, অবৈধ উপার্জন, ফাঁকি, ধোঁকা ইত্যাদিতে লিপ্ত থেকেছেন তার জন্য তার মৃত্যুর পরে বিশ্বের সকল মানুষ একযোগে সকল প্রকার 'শ্রাদ্ধ', অনুষ্ঠান, 'প্রার্থনা' ইত্যাদি করলেও তার কোনো লাভ হবে না।

তবে যদি কোনো ব্যক্তি বিশুদ্ধ ঈমানসহ ইসলামের ছায়াতলে থেকে সৎকর্ম করে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে জীবিত ব্যক্তিগণ তাঁর জন্য প্রার্থনা করলে প্রার্থনার কারণে দয়াময় আল্লাহ তাঁর সাধারণ অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন বা তাকে সাওয়াব ও করুনা দান করতে পারেন। এছাড়া এই ধরনের মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো জীবিত মানুষ দান বা জনকল্যাণমূলক কর্ম করলে সেই কর্মের সাওয়াব করুনাময় আল্লাহ উক্ত মৃতব্যক্তিকে প্রদান করতে পারেন। এই ধরনের কর্মকে সাধারণত আরবিতে "ঈসালে সাওয়াব" ও ফারসিতে "সাওয়াব রেসানী" বলা হয় যার অর্থ: সাওয়াব পৌঁছানো।

তাহলে আমরা দেখছি যে, মানুষের মুক্তি নির্ভর করে মূলত নিজের কর্মের উপর। তবে বিশুদ্ধ ঈমানদার সৎ মানুষদের জন্য দোয়া ও দান করা যায়। কুরআন কারীমে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। হাদীস শরীফে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, দোয়া ও দান-সদকা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্যে জীবিত ব্যক্তির এ সকল কর্মের সাওয়াব তাঁরা লাভ করবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মৃতের দায়িত্বে হজ্জপালন বাকি থাকলে তা তাঁর পক্ষ থেকে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এগুলি সাধারণ নির্দেশনা ও ফযীলতমূলক হাদীস। এখন আমাদের দেখতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এই ফযীলতের কর্মটি কী-ভাবে পালন করেছেন। অর্থাৎ এই কর্মটির ক্ষেত্রে 'সুন্নাত' কী তা জানতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, দোয়া বা দান-সদকার জন্য কোনো প্রকার সমাবেশ, অনুষ্ঠান বা দিন তারিখের কোনো প্রকারের ফযীলত বা গুরুত্ব আছে – সে কথা কোনো হাদীসে কখনো বলা হয়নি। এছাড়া কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি ইবাদত পালন করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য সাওয়াব দান করলে তাঁরা এ সকল ইবাদতের সাওয়াব পাবেন বলে কোনো হাদীসে কোনো প্রকারে বলা হয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের যুগে কারো ইন্তেকালের পরে তার জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী সময়ে কখনো কোনোভাবে তাঁরা জমায়েত হননি। কারো মৃত্যু হলে নিকটাত্মীয়গণের জন্য তিনি দিন শোক প্রকাশের বিধান রয়েছে ইসলামের। এই তিন দিনে সমাজের মানুষেরা মৃতের আত্মীয়গণকে সমবেদনা জানাতে ও শোক প্রকাশ করতে তাঁদের বাড়িতে আসতেন। এছাড়া মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের ও দাফনের পরে আর কখনো তাঁকে কেন্দ্র করে ৩ দিনে, ৭ দিনে, ৪০ দিনে বা মৃত্যুদিনে বা অন্য কোনো সময়ে মাসিক, বাৎসরিক বা কোনোভাবে তাঁর কবরের কাছে, অথবা বাড়িতে বা অনুষ্ঠানকারীর বাড়িতে বা অন্য কোথাও

কোনোভাবে তাঁরা কোনো অনুষ্ঠান করেননি বা কোনো জমায়েতও করেননি।

মৃত ওলী, প্রিয়জন বা বুজুর্গের জন্য দোয়া ও ঈসালে সাওয়াবের ক্ষেত্রে তাঁদের সুন্নাত ছিল ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করা এবং সুযোগ সুবিধা ও আগ্রহ অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের জন্য দান-সাদকা ও হজ্ব ওমরা বা কুরবানি করা। সুযোগমত কোন প্রকারের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া তাঁদের কবর যিয়ারত করে তাঁদেরকে সালাম দেওয়া ও তাঁদের জন্য দোয়া করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ একটিবারও তাঁর কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরস ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তাঁর ওফাত দিনে বা অন্য কোনো দিনে, কোনো রকম দিন নির্ধারণ করে বা না-করে, মদীনায় বা অন্য কোথাও কখনোই কোনো অনুষ্ঠান, সমাবেশ, মাহফিল, খানাপিনা কিছুই করেননি।

মৃত বুজুর্গ বা প্রিয়জনদের জন্য দোয়া করার ও সাওয়াব প্রেরণের আগ্রহ ও প্রয়োজনীয়তা তাঁদের ছিল। এবিষয়ের হাদীসগুলি তাঁরা জানতেন। এজন্য জমায়েত হওয়া, বিভিন্ন দিনে, নিয়মিত বা অনিয়মিত মৃতের কবরে, বাড়িতে বা অন্য কোথাও কোনো অনুষ্ঠান করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু কখনই তাঁরা তা করেননি। তাঁরা সকল প্রকারের জমায়েত, আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছেন। কোনো প্রকারের দিন তারিখ মাস বার পালন-করা বর্জন করেছেন। সকল প্রকারের কুলখানী, ওরস, জমায়েত বা অনুষ্ঠান তাঁরা বর্জন করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত ও অনানুষ্ঠানিক দোয়া ও দানকেই এ সকল ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি বলে মনে করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মৃত বুজুর্গ বা প্রিয়জনের জন্য সদা সর্বদা সুযোগ ও আবেগ অনুসারে দোয়া করাই ছিল তাঁদের স্থায়ী ও নিয়মিত সুন্নাত। এছাড়া কোনো কিছুই তাঁরা নিয়মিত করেননি। কারো পিতামাতা বা কোনো আপনজন ইন্তিকাল করলে হয়ত ইন্তিকালের পরেই তাঁদের জন্য কিছু দান করেছেন, জমি ওয়াকফ করেছেন বা অনুরূপ জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করেছেন। কেউ বা তাঁদের হজ্ব বাকি থাকলে হজ্ব আদায় করে দিয়েছেন। কখনো মৃত ব্যক্তির বন্ধুদেরকে হাদিয়া প্রদান করেছেন বা ছাগল জবেহ করে তার গোশত তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে 'ইকরাম' করেছেন মৃত ব্যক্তির 'ইকরামের' অংশ হিসেবে। ঈসালে সাওয়াব বা মৃতের জন্য সাওয়াব প্রেরণের জন্য সর্বদা দোয়া করাই ছিল তাঁদের নিয়মিত সুন্নাত।

এখন আমাদের সমাজে মৃতব্যক্তিদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে অথবা তাদের জন্য দান-সদকার সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা জমায়েত হই ও অনুষ্ঠান করি। এ সকল অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে খেলাফে-সুন্নাত বা সুন্নাত বিরোধী। বিভিন্ন ওজর ও অজুহাতের এগুলি জায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, কেউ যদি পূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিকভাবে দান-সাদকা ও দোয়া করেন তাহলে অনেক মুসলমান তাঁর কর্মকে খুবই অপছন্দ করবেন। এভাবে তাঁরা 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে' অপছন্দ করছেন।

আমাদের সমাজের মুসলিমগণ কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সুন্নাত অপছন্দ ও অবহেলা করেন তার কিছু নমুনা এখানে আলোচনা করছি :

(ক). দোয়াকে অবহেলা করা ও আনুষ্ঠানিকতাকে উত্তম মনে করা

আমরা দেখলাম যে, মৃত বুজর্গ বা আপনজনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সর্বদা দোয়া করাই ছিল তাঁদের একমাত্র নিয়মিত সুন্নাত। অপরদিকে আমরা অনেক সময় "দোয়া" করাকে তত গুরুত্ব প্রদান করি না। চিন্তা করি দোয়াতে আর কি হবে, নিজে কিছু নেক কাজ করে সেই কাজের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদান করতে হবে। চিন্তাটি সঠিক নয়। মৃত মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের দোয়াই সবচেয়ে বড় দান। দোয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁদেরকে অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত প্রদান করেন।

এক্ষেত্রে দোয়ার জন্য তাঁরা কখনো কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করেননি। আমরা অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তিগত দোয়ার কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। অন্তত ব্যক্তিগত দোয়ার চেয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু আলেম ও বুজুর্গকে ডেকে মৃতের জন্য দোয়া করাকে উত্তম মনে করি। অথচ সাহাবীগণকে দেখুন। সাইয়েদুল মুরসালীন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন। অথচ ২৩ বৎসরের নবুয়তী জিন্দেগিতে একদিন একজন সাহাবীও এসে বললেন না, হুজুর আমার পিতামাতা বা কোনো বুজুর্গের জন্য দোয়ার মাজলিস করেছি, আপনি যেয়ে একটু দোয়া করে দেবেন। অথবা মসজিদে নববীতেই আজ নামাযের পরে সবাইকে নিয়ে আপনি একটু দোয়া করে দেবেন। এরূপ একটি ঘটনাও দেখতে পাবেন না। অনুরূপভাবে পরবর্ত প্রায় ২ শত বৎসরে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও এই ধরনের কোনো ঘটনা দেখা যায় না।

(খ) কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান ও উত্তম ভাবা

কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদিকে আমরা দান ও দোয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো মৃতের জন্য কোরান খতম, কালেমা খতম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেননি। এগুলির সাওয়াব মৃতব্যক্তি পাবেন বলে কোনো হাদীসে বলা হয়নি। তবে, অনেক আলেম বলেছেন যে, যেহেতু দান, দোয়া, হজ্ব ইত্যাদির সাওয়াব মৃতব্যক্তি পাবেন বলে হাদীসে বলা হয়েছে, সেহেতু আমরা আশা করতে পারি যে, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র তাসবীহ ইত্যাদি ইবাদতের সাওয়াবও তাঁরা পাবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে কুরআন কারীম পূর্ণ পাঠ করা বা খতম করা একটি মাসনূন ইবাদত হলেও "কালেমা খতম" কোনো মাসনূন ইবাদত নয়। "কালেমা খতম", "দোয়া ইউনূস খতম", "খতমে খাজেগান" ইত্যাদি সবই বানোয়াট "খতম"। কালেমা বা "লাইলাহা ইল্লল্লাহ" একটি মাসনূন যিক্‌র এবং শ্রেষ্ঠ যিক্‌র। এই যিক্‌র যতবার করা হবে তত বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে।[১] এক লক্ষ বা সোয়া লক্ষ বার পাঠ করলে বিশেষ কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করা খেলাফে-সুন্নাত।

অন্য অনেক আলেম বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দান, দোয়া ইত্যাদির কথা বললেন, অথচ কুরআন খতম বা যিক্‌র-তাসবীহ ইত্যাদির সাওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌছাবে বলে জানাননি বা উম্মতকে এগুলি পালন করে মৃতদের জন্য সাওয়াব রেসানী করতে

শেখাননি। এখন আন্দাজে এরূপ আশা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শিক্ষাকে অপূর্ণ বলে দাবি করা হবে।

সর্বাবস্থায়, আমরা বুঝতে পারছি যে, আমরা যদি মৃত বুজুর্গ বা আপনজনের জন্য দান করি বা দোয়া করি তাহলে তাঁরা তার সাওয়াব পাবেন বলে নিশ্চিত ; কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা বলেছেন। আর কুরআন খতম, কালেমা খতম ইত্যাদির সাওয়াব পাবেন বলে বড়জোর আশা করা যায়।

যে সকল আলেম কুরআন খতম বা তাসবীহ-তাহলীলের সাওয়াব মৃতব্যক্তি পেতে পারেন বলে আশা করেছেন তাঁরা বলেছেন যে, যদি কেউ শরীয়ত-সম্মতভাবে ইখলাসের সাথে এগুলি পাঠ করে তাহলেই সাওয়াবের আশা করা যায়। আর সে যদি নিজেই এমনভাবে পাঠ করে যাতে তারই কোনো সাওয়াব হবে না, তাহলে সে আর কী পাঠাবে! এজন্য কোনো মুসলিম যদি তাঁর মৃত পিতামাতা, স্বজন বা উস্তাদ-বুজুর্গের জন্য মনের ইখলাস ও আবেগ নিয়ে কুরআন পাঠ করে তিলাওয়াতের সাওয়াব তাঁদেরকে প্রদানের নিয়্যাত করে, তাহলে হয়ত তাঁরা পেতেও পারেন। কিন্তু কেউ যদি টাকার বিনিময়ে, খাদ্যের আশায় বা লোক দেখানোভাবে এসকল ইবাদত করে তাহলে তার তো কোনো সাওয়াবই হবে না, উপরন্তু সে গোনাহগার হবে। এক্ষেত্রে সাওয়াব পাঠানোর চিন্তা বাতুলতা।

এখন আমাদের সমাজের মুসলিমগণের অবস্থা চিন্তা করুন। সকলেই দান ও দোয়ার চেয়ে এ সকল খতমকে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছেন। প্রয়োজনে অনেক টাকাপয়সা খরচ করে এ সকল খতমের আয়োজন করছেন। কিন্তু তিনি খতম ছাড়া নিঃশর্তভাবে এই টাকাগুলি হাফেজ বা খতম পাঠকারীদেরকে দিতে রাজি নন। তিনি সকল দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কেউ যদি মৃতের "ঈসালে সাওয়াব" বা সাওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে কোনো হাফেজ, আলেম, এতিম, বিধবা, দরিদ্র বা অন্য কাউকে হাদিয়া, সাহায্য বা দান হিসাবে কিছু টাকা দেন, তাহলে হয়ত তা দান হিসাবে আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে ও মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পেতে পারেন। কিন্তু তিনি এদেরকে দিয়ে "খতমের কাজ" আদায় করে এদেরকে পারিশ্রমিক দান করেন। এভাবে তিনি **প্রথমত,** একটি খেলাফে-সুন্নাত কাজ করছেন। **দ্বিতীয়ত,** দোয়া ও দানের সুন্নাত পরিত্যাগ করে বা অপছন্দ করে গোনাহগার হচ্ছেন। **তৃতীয়ত,** টাকা বা খাদ্যের আশায় যারা খতম পড়ছেন তাঁরা যেহেতু কোনো সাওয়াবই পাচ্ছেন না, সেহেতু মৃতের জন্য কিছু লাভের ক্ষীণতম আশাও নেই। **চতুর্থত,** এভাবে যাদেরকে দিয়ে খতম পড়ালেন তাঁরাও গোনাহগার হলেন। এভাবে সুন্নাত ছেড়ে সকল দিক থেকেই তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। অথচ তিনি যদি এতকিছু না করে নিজে দোয়া করতেন এবং খরচের টাকাগুলি দান করতেন তাহলে সুন্নাত অনুসারে কর্মের জন্য নিজেও সাওয়াব পেতেন, আর দোয়া ও দানের সাওয়াব মৃতব্যক্তি পেতেন।

আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, আমরা কুরআন পাঠ করতে পারি না বলে কি পিতামাতাকে কিছু দিতে পারব না? আমি বলেছি, দান করুন তাহলেই তো হলো। কিন্তু তাঁদের তৃপ্তি হয় না। মনে হয় তারা চিন্তা করেন, হাফেজদেরকে দিয়ে কিছু কুরআন না পড়িয়ে শুধু শুধু এতগুলি টাকা তাদেরকে দিয়ে কী হবে?

(গ). দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে আনুষ্ঠানিকতাকে গুরুত্ব প্রদান

দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো অনানুষ্ঠানিক দান। জমি ওয়াকফ, কূপ খনন ইত্যাদি। কিন্তু আমরা কখনোই এই প্রকার দানে তৃপ্ত হতে পারি না। আপনি যতই বুঝান-না কেন, যত সুন্নাতের কথাই বলুন-না কেন, মনের চিন্তা একটিই – কিছু একটু না-করলে কিভাবে হয়! শ্রাদ্ধ জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করাই দরকার। সমাজের মানুষেরও একই কথা: বাপটা মরে গেল, কিছুই করল না! কিছু অর্থ "শ্রাদ্ধ"।

অনেক মানুষকে বুঝিয়েছি, আপনারা খানাপিনা করানোর টাকা দিয়ে পিতামাতার বা বুজুর্গের জন্য একটি মসজিদ, মাদ্রাসা, দাতব্য হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র বা এতিমখানা তৈরি করুন বা শরীক হোন। খাবার পানি বা সেচের জন্য গভীর বা অগভীর নলকূপ স্থাপন করে জনগণ বা চাষীদের জন্য ওয়াকফ করুন। না হলে টাকাগুলি কোনো দরিদ্র, বিধবা, এতিম, কন্যাদায়গ্রস্ত, অসুস্থ বা অনুরূপ কাউকে দান করুন। এভাবে আপনি সুন্নাতের মধ্যে থাকবেন, আপনি ও আপনার মৃত আপনজন বা ওলী-বুজুর্গ অফুরন্ত সাওয়াব ও রহমত লাভ করবেন।

কেউ বুঝতে চান না। কেউ এসকল খাতে কিছু ব্যয় করলেও "কিছু একটা" না করে পারেন না। অথচ এই "কিছু" বা খানাপিনা শুধু সুন্নাত বিরোধীই নয়, এতে নিয়্যাত, পরিবেশনা, সামাজিকতা ইত্যাদি কারণে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহই বেশি হয়। সামাজিক আচার কিভাবে আমাদের মনমগজকে কব্জা করেছে এবং এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতে মেরে ফেলেছে তা চিন্তা করুন।

(ঘ). এ সকল কাজের জন্য কোনো দিন বা মৃত্যু দিনকে নির্ধারণ করা

মৃত স্বজন বা বুজুর্গের জন্য দোয়া ও সাওয়াব প্রেরণ অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানীর জন্য হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের অনুকরণে আরেকটি বিষয় আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা হলো এসকল কাজের জন্য দিন নির্ধারণ। মৃত্যুর পরে প্রথমত ৩য়, ৭ম, ৪০তম বা এই জাতীয় দিনে অনুষ্ঠান করা। পরে মৃত্যু দিনে অনুষ্ঠান করা।

আগেই বলেছি, নেককার বা বদকার, স্বজন বা বুজুর্গ কারো জানাযা ও দাফনের পরে দোয়া বা খানাপিনার জন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করাই সুন্নাত বিরোধী কাজ। আর এ সকল অনুষ্ঠানের জন্য এভাবে দিন নির্ধারণ অতিরিক্ত একধাপ সুন্নাত বিরোধিতা। কুলখানী, দোয়ার মাহফিল, খতম, ঈসালে সাওয়াব, সাওয়াব রেসানী, ওরস ইত্যাদি যে নামেই তা করা হোক সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম। এগুলি করার অর্থ হলো এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতকে অপছন্দ করা।

(ঙ). সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর নসীহত

সমাজের অপ্রতিরোধ্য চাপের কাছে নতি স্বীকার করে উপরের সকল খেলাফে-সুন্নাত কর্মকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বিভিন্ন ওজরখাহি করে, পূর্বে আলোচিত বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাসঙ্গিক আয়াত ও হাদীসকে "অকাট্য দলিল" হিসাবে পেশ করে "জায়েয" বলেছেন অনেকে। তবে কেউ বলেননি যে, এগুলি সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এগুলি করেছেন।

অপরদিকে অনেক আলেম সমাজের কাছে নতি স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা চেষ্টা করেছেন যেন আমাদের সমাজ অন্য সকল বিষয়ের মতো এবিষয়েও অবিকল সুন্নাত অনুযায়ী চলেন। যাতে সুন্নাত জীবিত হয় এবং মুসলমানগণ নিশ্চিতরূপে সাওয়াব ও বরকত লাভ করেন।

এ সকল আলেম ও বুজুর্গগণের একজন সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রহ.)। তিনি এ বিষয়ে আলোচনা কালে বলেন: এখন কেউ যদি প্রচলিত রুসূম অনুযায়ী এ সকল ফাতেহা, ইসালে সাওয়াব, কুলখানী, ওরস ইত্যাদি পালন না-করেন তাহলে সুন্নাত বিষয়ে অজ্ঞ মানুষেরা বলবে যে, তিনি আল্লাহর ওলী ও বুজুর্গগণের ভক্তি করেন না, তাঁদের হক্ক আদায় করেন না বা তাঁদের প্রতি আদব রক্ষা করেন না। তার এই চিন্তার মাধ্যমে তিনি বলতে চান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আহলে বাইত, সাহাবীগণ, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য নেককার বুজুর্গগণ, যাঁরা এসকল রেওয়াজ সমাজে প্রচলিত হওয়ার আগে চলে গিয়েছেন তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী বুজুর্গ ও আউলিয়াগণের প্রতি বেয়াদবী করেছেন। উপরন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পূর্বপুরুষ ও আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতিও একই রকম বেআদবী করেছেন বলে দাবি করা হবে। নাঊযু বিল্লাহ!! নাঊযু বিল্লাহ!!!

এ বিষয়ে তিনি কিছু মূল্যবান নসীহত করেছেন :

প্রথমত, সকল মৃত বুজুর্গ ও আপনজনের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু পালন করা ও প্রতিষ্ঠা করাই সর্বোত্তম। এজন্য কাফন, দাফন, জানাযা ও মাসনূন তিন দিনের শোক প্রকাশের বাইরে কোনো প্রকারের রুসূম না-মানা প্রয়োজন। বিবাহের ওলীমা ছাড়া সকল প্রকার খানাপিনার আয়োজন ও রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেই পেশওয়া, মুরব্বী ও আদর্শ মানতে হবে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে পারসিক, রোমীয়, মধ্য এশিয়, ভারতীয় ইত্যাদি সকল রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এগুলি সবই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের প্রচলিত রীতি ও তাঁদের তরীকার অতিরিক্ত কর্ম। এগুলি বর্জন করতে হবে এবং এগুলির প্রতি নিজের ঘৃণা ও না-রাজি প্রকাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এ সকল রুসূমাতের মধ্যে নিয়্যাতগত ও কর্মগত অনেক গোনাহের কাজ রয়েছে, যার ফলে কেয়ামতের দিন এ সকল রুসূমাত পালনকারীকে কঠিন বিপদে পড়তে হবে। কেউ যদি একান্তই খালেস নিয়্যাতে, খালেসভাবে কোনোরকম দিনতারিখ স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ না-করে কিছু খাওয়া দাওয়া করান তাহলে হয়ত তিনি সাওয়াব পাবেন। তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে, মৃতকে সাওয়াব পাঠনো খানাপিনা করানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দোয়া ও দানই মৃতের সাওয়াব পাঠানোর সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি। খানাপিনা করানো দানের একটি প্রকরণ মাত্র। সাহাবীগণ এক্ষেত্রে এই প্রকরণ ব্যবহার করেননি, বরং কূপ খনন, জমি বা বাগান ওয়াকফ করা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দানের সাওয়াব প্রেরণ করেছেন। আমাদেরও এসকল পদ্ধতিতে দান করা উচিত।

তৃতীয়ত, যদি আমরা এ সকল খেলাফে-সুন্নাত ও বিদ'আত রুসূম রেওয়াজ পরিত্যাগ করতে না-পারি, তাহলে অন্তত সুন্নাতকে পূর্ণাঙ্গ মনে করতে হবে। কেউ যদি অবিকল সুন্নাত পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো দোয়া ও দানে রত থাকেন এবং সকল প্রকার কুলখানী, ইসালে সাওয়াব, ওরশ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁকে উত্তম ও পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী বলে মহব্বত করতে হবে। এভাবে সকল বিষয়ে সুন্নাতকে পরিপূর্ণ ও আমাদের রুসূমকে খেলাফে সুন্নাত ও বিশেষ প্রয়োজনে বা বাধ্য হয়ে করছি বলে মনে করতে হবে।[১]

(৮). কবর যিয়ারতে খতম, শিরনী, খানাপিনা, ওরস ইত্যাদি

(ক). কবর যিয়ারতের সুন্নাত উদ্দেশ্য ও সুন্নাত নিয়ম

মৃতব্যক্তির জন্য দোয়ার অন্যতম মাসনূন পদ্ধতি হলো কবর যিয়ারত করা। কবর যিয়ারত করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে নিষেধ করেন, পরে তিনি যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন যে, কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা ও আখেরাতের কথা মনে হয়। এছাড়া যিয়ারতের মাধ্যমে কবরবাসীর জন্য সালাম ও দোয়া করা হয়। সুন্নাতের আলোকে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য দুটি : (১) আখেরাতের স্মরণ ও (২) মৃতব্যক্তিকে সালাম প্রদান ও তাঁর জন্য দোয়া করা। প্রথম উদ্দেশ্যে মুসলমান ও অমুসলমান সকলের কবর যিয়ারত করা যায়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে শুধু মুসলমানের কবর যিয়ারত করা হয়। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুরাইদ আসলামী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

.[ ] [ ]

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদকে ﷺ তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অতএব, তোমরা কবর যিয়ারত কর, কারণ তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করায়।"[২]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন:

ﷺ

নবীয়ে আকরাম ﷺ তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করে কাঁদতে থাকেন। ফলে তাঁর সাথীগণও কাঁদতে থাকেন। তিনি বলেন : আমি আমার রব্বের কাছে আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চেয়েছিলাম, আমাকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা কবর যিয়ারত কর, কারণ তা তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করাবে।"[1]

মুমিনদের কবর যিয়ারতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সালাম প্রদান করতেন এবং সালামের সাথেই সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে দোয়া করতেন। এজন্য সাধারণত হাত তুলতেন না। একটি ঘটনায় দেখা যায় তিনি কবর যিয়ারতের সময় হাত তুলেও দোয়া করেছেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ

ﷺ ﷺ :

.

(রাসূলুল্লাহ ﷺ পালা করে তাঁর স্ত্রীদের ঘরে রাত কাটাতেন।) যখনই আয়েশার (রা.) পালা আসতো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে রাত্রি যাপন করতেন, তিনি শেষ রাত্রে বাকী' গোরস্থানে চলে যেতেন এবং বলতেন : হে বাড়ির মু'মিন বাসিন্দাগণ, আপনাদের উপর সালাম। আপনাদেরকে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা আপনাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আগামীদিনের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। হে আল্লাহ বাকী' গারকাদ-বাসীদেরকে ক্ষমা করে দিন।"[2]

এ হাদীসের অন্য বর্ণনায় আয়েশা (রা) বলেনঃ যেদিন আমার রাত ছিল সে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট শয়ন করলেন। যখন তিনি ধারণা করলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখনই তিনি উঠে আস্তে আস্তে চাদর ও পাদুকা পরিধান করে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েন এবং আস্তে করে দরজা বন্ধ করেন। তখন আমি আমার কামিস ও ওড়না পরিধান করে আমার ইযার দিয়ে মাথা মুখ আবৃত করে তাঁর পিছে পিছে গেলাম। তিনি বাকী গোরস্থানে গমন করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিন বার তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। এরপর ঘুরলেন। তখন আমিও ঘুরলাম। তিনি দ্রুত আসতে লাগলেন এবং আমিও দ্রুত তাঁর আগে আগে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, আয়েশা, হাঁফাচ্ছ কেন? আমি বললাম, কিছুই না। তিনি বললেন, তুমি আমাকে বল, নইলে আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দেবেন। আমি তখন ঘটনা বললাম ...। জিবরাঈল এসে আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন বাকী গোরস্থানে গমন করে তথাকার বাসিন্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। আয়েশা (রা) বলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবর যিয়ারতে গেলে আমি কী বলব? তিনি বলেন, তুমি বলবে :

"মুসলমান ও মুমিন অধিবাসীদের উপর সালাম। আমাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রবর্তী (আগে চলে গিয়েছেন) এবং যারা পরবর্তী (যারা এখনো জীবিত রয়েছেন, পরে মৃত্যুবরণ করবেন) সবাইকে আল্লাহ রহমত করেন। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব।"[3]

এ একটি ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো ঘটনায় কবর যিয়ারতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন বলে আমি জানতে পারি নি। মহান আল্লাহই ভাল জানেন। অন্যান্য সকল হাদীসে কবর যিয়ারতের জন্য এ দোয়াই উল্লেখ করা হয়েছে, সামান্য দু-একটি শব্দের কম-বেশি আছে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কবর যিয়ারতের সুন্নাত হলো সালাম দেওয়া ও এই সকল মাসনূন দোয়া করা। সাহাবায়ে কেরামও এই সুন্নাত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত করেছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকালের আগে উহদের শহীদদের যিয়ারত করেন এবং সালাতুল জানাযার মত সালাত আদায় করেন।

(খ). কবর যিয়ারতের খেলাফে-সুন্নাত উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ

আমাদের দেশের অগণিত মুসলিম কবর বা মাজারে গমন করেন। আমাদের মুসলিম সমাজের প্রচলিত যিয়ারত পদ্ধতির সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতের কোনো মিল পাওয়া যায় না। প্রচলিত অগণিত খেলাফে-সুন্নাত বিদ'আত, হারাম বা শিরক বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে, আল্লাহর কাছে নিজের দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো বিষয় চাওয়ার জন্য কবর যিয়ারত করা, কোনো কবরস্থ ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়ার জন্য কবর যিয়ারত করা। এই দুটি বিষয়ে ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। এছাড়া এসকল নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুদিন, জন্মদিন বা যে কোনো দিন নির্ধারণ করে যিয়ারত করা, সমবেতভাবে যিয়ারতের জন্য যাওয়া ও কবর বা মাজারের কাছে "ঈসালে সাওয়াব" করা। অর্থাৎ মৃতকে সাওয়াব প্রদানের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত, টাকাপয়সা দান, খানাপিনা ইত্যাদি কর্মগুলি কবরের কাছে পালন করা।

এগুলির সম্মিলিত একটি রূপ হলো "ওরস"। "ওরস" শব্দের অর্থ বিবাহ বা মিলন। ধারণা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি ওলী। আর মৃত্যুর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাঁর মিলন হয়েছে। তাই তাঁর মিলন দিনে বা "বিবাহ বার্ষিকী"-তে তাঁর কবর যিয়ারত ও কবরের কাছে এসকল কাজ করে তাঁকে সাওয়াব দেওয়া ও আনন্দ করা খুবই বড় "সাওয়াবের ও বরকতের কাজ"।

উপরের কাজগুলি সবই খেলাফে-সুন্নাত। প্রথমত, "ঈসালে সাওয়াব" বা মৃতের সাওয়াবের জন্য দান-সাদকাহ করার সাধারণ

ফযীলত জ্ঞাপক হাদীসগুলিকে অপব্যবহার করে এগুলিকে "জায়েয" বলা হয়েছে। এরপর জায়েযকে সুন্নাত বানানো হয়েছে। সর্বশেষে সুন্নাতকে ঘৃণিত ও অবহেলিত অবস্থায় সমাজ থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্না লিল্লাহ!

মৃতব্যক্তির জন্য দানের অর্থ মুমিন যেখানে থাকবে সেখানেই মৃতের সাওয়াব প্রদানের উদ্দেশ্যে দান করবে। একটি হাদীসেও নেই যে, মৃতব্যক্তির কবরের কাছে যেয়ে দান করলে ভালো হবে। শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে দুই একটি অত্যন্ত যয়ীফ ও কিছু বানোয়াট মিথ্যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কবর যিয়ারতের সময় অমুক অমুক সূরা পাঠ করলে ভালো হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এ ধরনের কোনো পদ্ধতিতে যিয়ারত করেছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এ সকল যয়ীফ হাদীসের উপর যদি কেউ কোনো সময় ব্যক্তিগতভাবে আমল করেন এবং কবর যিয়ারতের সময় দুই একটি সূরা পাঠ করেন, তাহলে তা জায়েয হতেও পারে। যদিও কোনো কোনো আলেম ও ফকীহ বলেছেন যে, যেসকল যয়ীফ হাদীস সাহাবীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি তা পালন করা উচিত নয়। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবু বকর সারাখসী (৪৯০ হি.) তাঁর "উসূলে ফিকহ" গ্রন্থে লিখেছেন : "অপরিচিত অপ্রসিদ্ধ দুর্বল হাদীসের উপর যিনি আমল করেন তাঁর গোনাহের মধ্যে নিপতিত হওয়ার ভয় রয়েছে।"[১]

এ হলো দুই একটি সূরা পাঠের বিধান। আর কবরের কাছে "ঈসালে সাওয়াবের" নামে দান, শিরনী, খানাপিনা, ওরস ইত্যাদি সবই জঘন্য বানোয়াট ও খেলাফে-সুন্নাত কর্ম।

সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মুসলিমগণের জীবন দেখুন। তাঁরা কখনো মৃত্যু দিবস, জন্মদিবস হিসাব করে যিয়ারত করতে যাননি। যিয়ারত উপলক্ষে কবরে কোনো অনুষ্ঠান, আয়োজন, মানত বিতরণ, শিরণী বিতরণ করেননি। গরু, ছাগল, উট, হাঁস, মুরগী, ফল, ফসল, শিরণী, মিঠাই, ফুল, ফুলের তোড়া ইত্যাদি সাথে নিয়ে যিয়ারতে যাননি। যিয়ারতের সময় দোয়ার পূর্বে তাঁরা কোনো কুরআন খানী, নির্দিষ্ট সূরা পাঠ, দরুদ সালাম পাঠ, দোয়া কালেমা পাঠ ইত্যাদি কোনো কিছুই করেননি। একটি সহীহ সনদের ঘটনাও নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের তাঁর ইন্তেকালের পরে খিলাফতের রাশেদার ৩০ বৎসরে অথবা তার পরেও সাহাবীগণের প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে একবারও তাঁর রওযা মুবারক যিয়ারতের জন্য বা বাকী' গোরস্থানে "ওলীকুল শিরোমনি" উম্মুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রী, সন্তান ও বংশধরগণ বা সাহাবীগণের কবর যিয়ারতের জন্য এ সকল অনুষ্ঠান করেছেন বা এ সব কিছু নিয়ে যিয়ারত করতে গিয়েছেন, বা কোনো প্রকারে ওরস ইত্যাদি পালন করেছেন।

আমরা একজন সাহাবীকেও দেখছি-না ফুল ফল, শিরনী, উট, ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে রওয়া মুবারাকে যেতে। আমরা একজনকেও পাচ্ছি-না যিনি যিয়ারতে গিয়ে কুরআনখানী, কলেমাখানী, বিভিন্ন সূরা পাঠ করছেন। কোনো বাৎসরিক, মাসিক বা দৈনিক ওরুস নেই, কোনো নাচগান কাওয়ালী সাজদা নেই। আশ্চার্যের বিষয় নয় কি? আমরা কত তথাকথিত ওলীর মাজারে গিয়ে এসকল পদ্ধতি ও রীতিতে কতকিছু করি, আর সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের সমসাময়িক তাবেয়ীগণ তাঁরা কেউ সকল ওলীর শ্রেষ্ঠ ওলী, সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবীর মর্যাদা বুঝলেন না? নবীদের পরে সকল ওলীর সেরা ওলী সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বুঝলেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কলিজার টুকরা ফাতিমা (রা), হাসান (রা) এঁদের কারো মর্যাদা তাঁরা বুঝলেন না? অথচ আমরা কত বেশি ভালো বুঝি, কত বেশি ওলীদের ভক্তি করতে জানি। কত সুন্দরভাবে যিয়ারত করতে শিখেছি!

কেন আমরা এসব করছি? তাঁদের পদ্ধতিতে যিয়ারত, দোয়া, মহব্বত ও তা'যীম করলে কি দ্বীন পালন হবে না? আল্লাহর নৈকট্য ও পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে না?

কবর যিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করাও একটি নেক কর্ম। এ সকল কর্মের ক্ষেত্রে পূর্ণতা অর্জনের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি ছিল তাঁদের। যিয়ারতে ক্ষেত্রে এ সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনোরূপ কল্যাণ থাকলে তাঁরা অবশ্যই এগুলিকে রীতি হিসাবে তৈরি করে নিতেন। তাঁরা এসকল বর্জন করেছেন। কাজেই, এগুলি বর্জন করে সুন্নাত পদ্ধতিতে যিয়ারত করাই সর্বোত্তম।

প্রিয় পাঠক, আমাদের আলোচনা জায়েয নিয়ে নয়। আমরা সুন্নাতের আলোচনা করছি। সুন্নাতের বাইরে যা কিছু সবই অসার, অবান্তর, তা যত জায়েযই হোক। সুন্নাতের বাইরে যত পদ্ধতি ও যত কর্ম তা অন্য কারো চোখে প্রাতঃকালের মতো উজ্জ্বল দেখালেও সুন্নাত-প্রেমিক সুন্নীর চোখে তাতে কোনো নূর নেই, কারণ তাঁর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নূর নেই। কেউ হয়ত বলবেন যে, আমরা অন্ধ বলেই এ সকল রীতি পদ্ধতির নূর দেখতে পাচ্ছি-না। কিন্তু আমরা তো অন্ধই হতে চাই। আপনি দোয়া করুন, সুন্নাতের নূরই যেন আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়। সুন্নাতের বাইরে যত আলো তা থেকে যেন আমাদেরকে আল্লাহ অন্ধ করে রাখেন।

কবরে দান করার মূল কারণ

মূলত, কবরের টাউট ও ভণ্ডরা নিজেদের স্বার্থে কবরের নিকট দান, ঈসালে সাওয়াব বা উরসের রীতির প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট। নিম্নে বিষয় দুটি লক্ষণীয় :

(ক). মৃতের জন্য দানের অর্থ হলো দরিদ্র, বিধবা, এতিম বা সমাজের সাহায্যের মুখাপেক্ষী জীবিত মানুষদেরকে টাকা, পয়সা, খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা এবং এই সাহায্যের জন্য সে সাওয়াব বা পুণ্য অর্জিত হবে তা মৃতকে প্রদানের জন্য করুণাময় আল্লাহর দরবারে আকুতি জানানো। মৃতের কবরে টাকা দিলে বা কবরের কাছে যেয়ে টাকা দিলে কোনো প্রকার লাভ হবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। যদিও কবর পূজারী ও কবরের টাউটগণ বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি দিয়ে এগুলির সমর্থন করতে চেষ্টা করেন। আগেই বলেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনোই দান-সাদকা করার জন্য কোনো কবরের কাছে গমন করেননি।

(খ). এ সকল কবরে যারা টাকা পয়সা দান করেন তাঁরা মূলত কবর পূজার জন্যই তা প্রদান করেন। এরা কখনোই মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয়, এতিম, বিধবা, অসুস্থ, অসহায় কাউকে টাকা দিতে চাইবেন না। কিন্তু কবরে এসে আগ্রহের সাথে টাকা দিবেন। মাদ্রাসা, মসজিদ বা অসহায় মানুষদেরকে দিলে সাওয়াব হয় এবং আল্লাহ খুশি হন – তা তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য কবরস্থ ব্যক্তিকে খুশি করা। কবরপূজারী টাউটদের অপপ্রচারে ও ভিত্তিহীন জনশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা মনে করেন যে, কবরে শায়িত "ওলী" ব্যক্তির সাথে মহান আল্লাহর একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। দান-সাদকা করে আল্লাহকে খুশি করার চেয়ে কবরের এই ব্যক্তিকে খুশি করতে পারলে বেশি লাভ হবে। আর কবরের উপরে বাক্সে বা টাউটদের হাতে টাকা দিলে উক্ত কবরস্থ ব্যক্তি খুশি হবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা করবস্থ ব্যক্তিকে ঘুষ প্রদান করেন।

এই মুসলিম নামধারী ব্যক্তি আর যে ব্যক্তি গনেশ, কালি বা অন্যান্য দেবতার কাছে ভেট প্রদান করেন উভয়েই একই প্রকারের শিরক-এ লিপ্ত। এই ধারণাতেই সকল যুগে শিরক লিপ্ত হয়েছে মানুষেরা।

(৯). কবরে খেজুরের ডাল পোঁতা বা ফুল দেওয়া

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত সুন্নাত বা রীতি হলো কারো মৃত্যুর পরে তাঁর কবরে খেজুরের ডাল পোঁতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দীর্ঘ নবুয়তী জীবনে অসংখ্য সাহাবীকে দাফন করেছেন। তাঁদের কারো কারো কবরে আজাবের কথাও বলেছেন। কারো কবরেই খেজুরের ডাল পোঁতেননি। শুধুমাত্র একটি ঘটনায় তিনি একটি খেজুরের ডাল মাঝখান থেকে ফেড়ে দুইভাগ করে দুটি কবরের উপর পুতে দেন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন :

ﷺ

.

"একদিন নবীজী ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বললেন : এই দুই কবরবাসী শাস্তিভোগ করছে। কোনো খুব কঠিন বিষয়ে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। একজন পেশাব থেকে আড়াল করত না। অপরজন কুটনামী করত, একজনের কথা আরেকজনকে বলে সম্প্রীতি নষ্ট করত। এরপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে তাকে দুইভাগে ফেড়ে ফেলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একভাগ পুঁতে দেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন এই কাজ করলেন? তিনি বললেন : সম্ভবত (আশা করা যায়) যতক্ষণ না ডাল দু'টি শুকিয়ে যাবে ততক্ষণ তাদের আজাব কম থাকবে।"[১]

সুদীর্ঘ নবী জীবনের একটি ঘটনা। একদিকে তাঁর জীবনের অগণিত ঘটনা, অপরদিকে একটি ঘটনা। দাঁড়িয়ে পেশাবের নিয়মের ক্ষেত্রে যা বলেছি এখানেও তাই বলতে হয় :

(ক). কেউ বলবেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ কারণে এটি করেছিলেন, কাজেই এ কাজটি তাঁর বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এদের আজাব কমানোর ক্ষেত্রে এই কাজটি ফলদান করবে। এ জন্যই তিনি অন্য কোন সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। উম্মতের জন্য এই কাজ সুন্নাত নয়। বরং তাঁর নিয়মিত কাজই সুন্নাত, তা-হলো দাফন করে কবরের উপরে কিছু না পোঁতা।

বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কাজটি তাঁর নিয়মিত রীতির বিপরীত এবং ব্যাখ্যাতীত। কেন তিনি খেজুরের ডাল পুঁতলেন তা আমরা জানি না। কেউ বলেন যে, খেজুরের ডাল যতক্ষণ না শুকাবে ততক্ষণ আল্লাহ তাসবীহ করবে, এতে কবরের ব্যক্তির আজাব কমবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভব। **প্রথমত,** সুবুজ বা কাঁচা ডাল তাসবীহ করে আর শুকনো ডাল করে-না, এমন ধারণাই ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। কুরআন কারীমে বারবার বলা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের সকল কিছুই আল্লাহর তাসবীহ করে।[২] -এখানে কাঁচা বা শুকনো, প্রাণী বা জড়বস্তের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত, যদি তাসবীহ উদ্দেশ্য হতো তাহলে তিনি ডালটিকে দুই ভাগে করে ফেড়ে নিলেন কেন? আস্ত রাখলে তো আরো কিছু বেশি সময় তাজা থাকতো! **তৃতীয়ত,** যদি ডালের জীবনই উদ্দেশ্য হতো তাহলে তো তিনি একটি ছোট্ট খেজুরের চারা বা অন্য কোনো গাছের চারা আশপাশ থেকে তুলে এনে লাগিয়ে দিতে পারতেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, বিষয়টি একেবারেই তাঁর খাস বিষয়। সম্ভবত মহিমাময় আল্লাহ তাঁর শাফাআতের জবাবে এই পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাই তিনি এভাবে কাজ করেন।

(খ). দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বলতে পারি যে, উম্মতের কেউ যদি কাশফ, ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে কারো আজাবের বিষয় জানতে পারেন তাহলে তাঁর জন্যও হয়তবা এ কাজটি সুন্নাত-সম্মত বলে গণ্য হতে পারে।

(গ). আরো এগিয়ে বলতে পারি যে, এই একটি ঘটনা থেকে আমরা প্রমাণ পাই যে, কারো কবরে এভাবে ডাল পুঁতে দেওয়া জায়েয। কেউ যদি পোঁতার ওসীয়ত করেন তাহলে পুততে হবে। বা মাঝেমধ্যে হয়ত পোঁতা যেতে পারে। তবে সুন্নাত হলো কিছু না-পোঁতা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত কিছু পোঁতেননি, কেবল এ ঘটনায় পুঁতেছেন।

কিন্তু কেউ যদি উপরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আজীবনের সুন্নাত পরিত্যাগ করে একদিনের ঘটনাকে নিয়মিত রীতি বা সুন্নাত বানিয়ে নেন তাহলে কি তা উচিত হবে? কেউ যদি মনে করে যে, সর্বদা ডাল পুঁতে দেওয়া উত্তম ও বেশি সাওয়াবের মাধ্যম, তাহলে কি একথা বলা হবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন কম সাওয়াবের ও অপূর্ণ কাজ করেছেন এবং মাত্র একদিন বেশি সাওয়াবের ও পূর্ণাঙ্গ কাজ করেছেন? এভাবে কি আমরা তাঁর সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে চলে যাব না?

খেজুরের ডাল বনাম ফুল : যাযাবরত্ব বনাম সভ্যতা ও প্রগতি

কিন্তু আমরা এখানেই থেমে থাকতে রাজি নই। খেজুরের ডাল তো কেমন সেকেলে বিষয়, এতে কেমন মরুভূমির শুষ্কতা অনুভূত হয়। এর চেয়েও বেশি কাব্যিক, বেশি সুন্দর ও বেশি উপকারী হচ্ছে ফুল, যার সুগন্ধে বিমোহিত হয় মন। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে আসে। আমরা খেজুর পাতার বদলে ফুল দেব না কেন? বিশেষত বিশ্বের উন্নত দেশের উন্নত মানুষেরা ফুলকেই পছন্দ করেন, ফুল ভালবাসা প্রগতি ও মানবতার প্রকাশ। আমরা কেন ফুল-প্রেম থেকে দূরে থাকব?

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সুগন্ধ পছন্দ করতেন। ফেরেশতাগণ দুর্গন্ধ অপছন্দ করেন বলে তিনি জানিয়েছেন। কাজেই, এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, গন্ধহীন খেজুর ডালের চেয়ে সুগন্ধময় ফুল কবরে দেওয়াই উত্তম।

আর আমরা শুধু দাফনের সময়েই ফুল দেব কেন? আমরা প্রতি বৎসর দাফনের তারিখে, বা অন্য তারিখে দেব। ভালো কাজ যত বেশি করা যায় ততই সাওয়াব। ফুল যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ কবরবাসীর আজাব কম হবে। খেজুর পাতার চেয়ে ফুল যেহেতু উন্নত সেহেতু ফুলের কারণে হয়ত আজাব পুরোপুরি মাফও হয়ে যেতে পারে!

হায়রে আমাদের নবী-প্রেম! আমাদের সুন্নাত প্রেমের দাবি! যদি কেউ প্রশ্ন করেঃ ফুলতো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগেও ছিল, কিন্তু তিনি কখনো কোনো কবরে ফুল দিলেন-না কেন? তাঁর একান্ত আপন প্রিয়তম সাহাবীগণ যাদের মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলেছেন, সেই উসমান ইবনু মাযঊন, সা'দ ইবনু মুয়াজ, মুসআব ইবনু উমাইর, হামযা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব, বদর, ওহুদ, খাইবার ইত্যাদি যুদ্ধের শহীদগণ কারো কবরেই তো তিনি ফুল দিলেন না? কল্যাণের, উপকারের ও সাওয়াবের এই মাধ্যমটি তিনি জানলেন না? অথবা জেনেও পালন করলেন না? প্রতি বৎসর মৃত্যু দিবসে বা অন্য কোনো সময়ে যিয়ারতের সময়ও মনে পড়ল না?

তাঁর সাহাবীগণ, তাঁরাও বুঝলেন না? একটি বারও তাঁর রাওযা মুবারাকে ফুল নিয়ে গেলেন না। ভালো-মন্দ কত মানুষকে তাঁরা দাফন করলেন, একটি বারও তাঁদের মনে হলো না যে, কিছু ফুল দিয়ে মৃতের কিছু উপকার করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবেন!

আপনি হয়ত বলবেন তিনি তো নিষেধ করেননি। তিনি কিইবা নিষেধ করেছেন? তিনি কি নামাযে প্রতি রাকাতে ২/৩/৪ বার রুকু করতে এবং ৩/৪/৫ বার সাজদা করতে নিষেধ করেছেন? তিনি কি কখনো ফারসি, বাংলা বা ইংরেজিতে সূরা ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন? তিনি কি প্রথম রা'কাতে ছোট সূরা ও পরের রাকাতে বড় সূরা পড়তে নিষেধ করেছেন? তিনি কি কাউকে সম্মানের সাজদা করতে নিষেধ করেছেন? নববর্ষে ঈদের নামায পড়তে নিষেধ করেছেন?

আর তিনি নিষেধ করলেই বা কি? আমরা প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করে নেব। বলব : তিনি এই কারণে নিষেধ করেছেন, এই কারণ না-থাকলে জায়েয হবে। আমরা ভুলে যাই, আল্লাহর সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে, দ্বীনের ক্ষেত্রে বা সাওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর বর্জনই নিষেধ। দ্বীন হিসাবে, ইবাদত হিসাবে, আল্লাহর ক্ষমা, নৈকট্য বা সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম হিসাবে তিনি যা করেননি তা সবই নিষিদ্ধ। তিনি যা করেননি সে কর্ম করে আল্লাহর ক্ষমা বা সাওয়াব পাওয়ার চেষ্টা করার অর্থই হলো তাঁকে অপূর্ণ মনে করা ও তাঁর রীতি পদ্ধতিকে অপছন্দ করা।

আপনারা হয়ত বলবেন যে, অমুক গ্রন্থে আছে যে, কেউ কেউ জায়েয বলেছেন। নিঃসন্দেহে বলেছেন বা করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি বা বলেননি। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ যা কোনোদিন করেননি, কারণ ও উপকরণ, মৃত প্রিয়জন, মৃত বুজুর্গগণ, নেতাগণ এবং ফুল তাদের হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও তারা সর্বদা যা বর্জন করেছেন তা আমাদের ধর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেল! আপনার সুন্নী হৃদয়ে কি ব্যথা লাগে না? আমাদের জন্য কোনোটি উত্তম হবে? আমাদের প্রচলিত রীতিগুলি জায়েয করার চেষ্টা করা? না আমাদের রীতিগুলিকে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতির মতো করে নেওয়া?

সম্মানিত পাঠক, আমরা জায়েয বা না-জায়েয নিয়ে বিতর্ক করছি-না। আমরা সুন্নাত নিয়ে আলোচনা করছি। খেলাফে-সুন্নাত জায়েয হলেও তা ত্যাগ করে সুন্নাত পালনের চিন্তা করছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, দাফন-কবর কেন্দ্রিক অন্যান্য খেলাফে সুন্নাত কাজের মধ্যে রয়েছে কবরের পাশে আযান দেওয়া, তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এগুলি সব ভিত্তিহীন সুন্নাত বিরোধী বানোয়াট বিদ'আত। মৃতব্যক্তির উপকারের ইচ্ছা, ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও কিছু কাল্পনিক কাহিনী এ সকল বিদ'আত প্রসারের কারণ। মৃত ব্যক্তিকে ঘিরে উদ্ভাবিত এ ধরণের আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা কিছু মানুষ লাভবান হন। এগুলি অপসারিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে তারা ভয় পান। এজন্য কোনো কোনো আলেম বিভিন্ন অপ্রাসংঙ্গিক যুক্তি, অনির্ভরযোগ্য বা মিথ্যা কাহিনী ইত্যাদি দিয়ে এগুলিকে জায়েয বলার চেষ্টা করেন। তবে কেউই দাবি করতে পারেন না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহবীগণের যুগে দাফনের পরে মৃতের কবরে আযান দেওয়ার রীতি বা কবরের পাশে কয়েকদিন কুরআন তিলাওয়াত করানোর রীতি প্রচলিত ছিল। আর যে রীতি তাঁদের মধ্যে ছিল-না সে রীতি আমরা চালু করব কোন্ প্রয়োজনে? তাঁদের রীতিতে চললে কি মৃতের মুক্তি, শান্তি ও সফলতা আসবে না? কেন আমরা তাঁদের সুন্নাত পরিত্যাগ করব?

(১০). কবর বাঁধানো, পাঁকা করা, গম্বুজ করা ইত্যাদি

না-জায়েযকে জায়েয এবং জায়েযকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করে সুন্নাতে নববী পরিত্যাগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো কবর পাকা করা ও কবরের উপরে গম্বুজাদি তৈরি করা। বর্তমানে অনেক মুসলিম কবর পাকা করেন। বিশেষত আলেম উলামা ও বুজুর্গগণের কবর পাকা করাকে বিশেষ সাওয়াবের কাজ মনে করেন। আসুন এসকল বিষয়ে আমরা সুন্নাতের স্তরগুলি পর্যালোচনা করি :

প্রথমত, কওলী হাদীসঃ কবর পাকা করা, চুনকাম, কবরে লেখা নিষিদ্ধ

কারো কবর পাকা করলে বা বাঁধালে কোনোরূপ ফযীলত হবে, বা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হবে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে তাঁর কবরকে হেফাযত করা হবে এই মর্মে একটি কথাও হাদীসে বলা হয়নি। উপরন্তু হাদীসে কবর পাকা করতে নিষেধ করা হয়েছে : যাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন :

ﷺ

"রাসুলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ইমারত বা ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।[১]

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন :

ﷺ

নবী করীম ﷺ কবরের উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।"[২]

একই অর্থে উম্মে সালামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩]

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় মোট ৫টি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন: কবর চুনকাম করা, কবরের উপরে বসা, কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা, কবরের উপরে লেখা এবং অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করা।[৪]

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত

(১). রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কখনো কোনো কবর পাকা করেননি

এ সকল হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, কবর পাকা করা, কবরের উপর ইমারত তৈরি করা, চুনকাম করা, লেখা ইত্যাদি পূর্ব থেকেই আরব দেশে ও অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা বর্জন করেছেন এবং নিষেধ করেছেন। তিনি কখনো কারো কবর পাঁকা করেননি, চুনকাম করেননি বা কবরের উপরে গেলাফ বা আবরণী লাগাননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ২৩ বৎসরের নবুয়তী জীবনে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাফন করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর প্রিয়তম সন্তানগণ, আত্মীয়গণ, উম্মতের শ্রেষ্ঠ ওলী তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরামের অনেকে। তিনি কারো কবরে কখনো কোনো গম্বুজ তৈরি করেননি, পাকা করেননি, কোনো প্রকারের চুনকাম বা সযত্ন সংরক্ষণ করেননি। সর্বদা তাঁদেরকে গোরস্থানে দাফন করতেন। কখনো কখনো বিশেষ আপনজন ও বিশেষ মহব্বতের মানুষের জন্য গোরস্থানের অগণিত কবরের মধ্য থেকে তাঁদের কবর চিনতে পারার জন্য তার পাশে পাথর রেখে দিতেন।

এধরনের একজন মানুষ ছিলেন উসমান ইবনু মাযঊন (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধ ভাই ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই ধার্মিক জীবনযাপন করতেন এবং মদপান করতেন না। সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাঁর মৃতদেহের গালে চুমু খেতে থাকেন। তাঁর চোখের অশ্রুতে মৃতদেহের মুখমণ্ডল ভিজে যেতে থাকে। বাকী' গোরস্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দাফন করেন। তাবিয়ী মুত্তালিব ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন:

ﷺ

ﷺ ﷺ

ﷺ

."

যখন উসমান ইবনু মাযঊন (রা) ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর লাশ গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দাফন করা হলো। নবীয়ে আকরাম ﷺ এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনতে বললেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি পাথরটি বহন করতে সক্ষম হলো-না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং পাথরটির কাছে গেলেন এবং নিজের জামার হাতা গুটিয়ে পাথরটি বহন করে নিয়ে তাঁর (উসমানের) মাথার কাছে রাখলেন এবং বললেন : এই পাথরটি দিয়ে আমার ভাইয়ের কবর আমি চিনতে পারব এবং আমার পরিবার পরিজনের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে তার পাশে দাফন করব।"[৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছা করলে তাঁর প্রিয়তম ভাই, এতবড় বুজুর্গ সাহাবী ও আল্লাহর অন্যতম ওলীর কবরটি বাঁধাতে বা কবরের উপরে একটি বড় ঘর, একটি গেলাফ ও পাশে যিয়ারতের সুবিধার জন্য একটি যিয়ারত ছাউনি তৈরি করতে পারতেন। তিনি তা করলে সাহাবীগণ সর্বান্তকরণে তাঁকে সাহায্য করতেন এবং নিজেরাও তাঁর এই সুন্নাত অনুসরণ করতেন। হাদীস শরীফে আমরা একটি বিশেষ অধ্যায় পেতাম : কিভাবে পাথর দিয়ে কবরের উপরে ঘর, ইমারাত বা টিপি তৈরি করতে হয়। কিভাবে যিয়ারতের ছাউনি তৈরি করতে হয়।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে বুজুর্গগণের সম্মানের এসকল পথের কোনো পথই শেখালেন না। তিনি শুধুমাত্র একটি পাথর দিয়ে চিহ্ন রেখেই শেষ করলেন। পাথর রাখার উদ্দেশ্যও তিনি বলে দিলেন : যেন তাঁর ভাইয়ের কবরটি চিনতে পারেন, পরিবারের অন্য কেউ ইন্তেকাল করলে তাঁর পাশে দাফন করতে পারেন।

ইমাম বুখারী (রাহ.) উল্লেখ করেছেন, তাবেয়ী খারিজা ইবনু যাইদ ইবনু সাবেত বলেছেন: উসমানের (রা.) যামানায় আমরা যুবক ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো লাফ দিতে পারত সেই একলাফে উসমান ইবনু মাযঊনের (রা) কবর পার হয়ে যেতে পারত।[৬]

এথেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরেও সাহাবাগণ তাঁর প্রিয়তম ভাই ও সাহাবী উসমান ইবনু

মাযঊনের (রা.) কবরের উপর কোনো ঘর, গম্বুজ বা ইমারত তৈরি করেননি। তখনো কবরটি স্বাভাবিক প্রশস্ততার ও উচ্চতার ছিল, যার ফলে একজন যুবক একলাফে তা পার হতে পারত। সম্ভবত ৩/৪ হাত চওড়া ও আধা হাত বা একহাত উঁচু ও চার বা পাঁচ হাত লম্বা। সকল সাহাবীর কবরই এইরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।

(২). রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ পাকা বা উঁচু কবর ভেঙ্গে দিয়েছেন

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। আজীবন তিনি কবর পাকা করা বর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কর্মের সুন্নাতের আরেকটি দিক হলো – শুধু পাকা কবরই নয়, স্বাভাবিক কবরের পরিচয় প্রদানের জন্য কবরের মাটি দিয়ে যেটুকু ঢিবি করা হয় তার চেয়ে উঁচু সকল কবর ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছেন। আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন

ﷺ ...

: رضي الله عنه ﷺ

ﷺ

ﷺ."

আলী (রা.) আমাকে বলেন : আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছিলেন : যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি) কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সব সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে সব মুছে ফেলবে।"[1] । অন্য বর্ণনায় আলী (রা.) বলেন, – একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযায় (মদীনার বাইরে) বের হলেন। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কে আছ মদীনার অভ্যন্তরে গিয়ে যত মূর্তি পাবে সব বিচূর্ণ করবে, যত কবর দেখবে সব সমান করে দেবে, এবং যত ছবি পাবে সব মুছে বা নষ্ট করে দেবে। তখন একজন সাহাবী বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। কিন্তু তিনি মদীনাবাসীকে ভয় পেয়ে ফিরে আসলেন। তখন আলী (রা.) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাও। তখন আলী চলে গেলেন। পরে ফিরে এসে বললেন: আমি সকল মূর্তি ভেঙ্গে দিয়েছি, সকল কবর ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছি এবং সকল ছবি মুছে নষ্ট করে দিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি কেউ পুনরায় এসকল কাজের কোনো একটি করে তাহলে সে মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ ধর্মের সাথে কুফরী করল।"[2]

এ হাদীস থেকে আমরা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরকেও মূর্তি ও ছবির ন্যায় শিরক প্রসারের মাধ্যম হিসাবে দেখেছেন এবং এগুলো তৈরি করাই শুধু নিষেধ করেননি, উপরন্তু কেউ কোনো কবর উঁচু বা পাকা করলে তা ভেঙ্গে সমান করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে মূর্তি ভাঙ্গতে ও ছবি নষ্ট করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ ধরনের কাজকে, মূর্তি তৈরি করা, ছবি তৈরি করা বা কবর উঁচু করাকে তিনি কুফরী বলে গণ্য করেছেন। কারণ, তা কুফর ও শিরকের প্রসারের কারণ। পূর্ববর্তী উম্মতের মানুষেরা কবরকে তাযীম করতে যেয়ে তাকে ইবাদতের স্থান বানিয়ে নিয়েছে এবং এভাবে শিরকে নিপতিত হয়েছে। তাঁর পরে সাহাবীগণও এই দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের ২৫/৩০ বৎসর পরেও আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে এ সকল শিরকের ওসীলা থাকলে তা ভাঙ্গতে তাঁর পুলিশ বাহিনী প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

(৩) তাবেয়ী- তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলা হতো

ইমাম শাফেয়ী (রাহ) তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ১৫০হিজরীতে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় মক্কা, মদীনা ও ইরাকে কাটিয়ে শেষে ২০৪ হিজরীতে মিশরে ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন :

...

"আমি কোনো মুহাজির বা আনসার সাহাবীর কবর চুনকাম করা বা পাকা করা দেখতে পাইনি। আমি দেখেছি যে, মক্কার অনেক প্রশাসক কবর পাকা করা হলে বা কবরের উপরে ঘর বানানো হলে তা ভেঙ্গে দিতেন। কোনো আলেম বা ফকীহকে এই কাজ নিন্দা করতে দেখিনি।"[3]

ইমাম শাফেয়ী যে সকল শাসকের কথা বলছেন তারা তাবেয়ী পর্যায়ের মানুষ। তিনি যে সকল ফকীহের কথা বলছেন তাঁরা তৎকালীন যুগের অন্যতম তাবেয়ীশ্রেষ্ঠ আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ। সাহাবীগণ থেকেই তাঁরা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের মতোই চলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুগের এই বর্ণনায় আমরা তিনটি বিষয় জানতে পারি : **প্রথমত,** রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে চলে আসা রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী কবর পাকা করার প্রবণতা সাধারণ মানুষদের মধ্যে তাবেয়ীদের যুগ থেকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। **দ্বিতীয়ত,** আলেমগণ এই প্রবণতা সমর্থন করতেন-না। এজন্য শাসকগণ পাকা কবর বা কবরের উপরে তৈরি ঘর ভেঙ্গে দিলে তাঁরা কোনো আপত্তি করেননি। তাঁরা কখনোই এতে মৃতব্যক্তিদের অবমাননা করা হবে বলে মনে করেননি। **তৃতীয়ত,** ওলীগণের কবর পাকা করার নামে সাহাবীগণের কবর পাকা করার ধারা তখনো সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীগণ

বা মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের কোনো কবর পাকা করা, কবরের উপরে ঘর বানানো, গম্বুজ বানানো বা যিয়ারত ছাওনি তৈরি করে তাঁদের তা'যীমের চেষ্টা তারা কেউ করেননি।

(৪). পরবর্তী যুগেও অনেকে পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলা সমর্থন করেছেন

পরবর্তী যুগেও কোনো কোনো আলেম এভাবে কবরের উপরে তৈরি ঘর বা ইমারত ভেঙ্গে ফেলাকে সমর্থন করেছেন। ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, কবর যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় হয়, তাহলে কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা মাকরুহ হবে। আর যদি গোরস্থানে হয় তাহলে তা হারাম হবে। এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, আলীর (রা) হাদীসে যে বাক্য রয়েছে : "সকল উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে দেব" – এ কথা পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলা সমর্থন করে।[১]

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা নজদের বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুর রাহমান মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারাসহ পুরো হেজাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁর নজদী বাহিনী হেজাজের সকল মাজার ও কবরের উপর তৈরি ইমারাত, গম্বুজ ইত্যাদি ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ওহাবী বাহিনীর এই কাজ বিশ্বের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান খুবই ন্যক্কারজনক, নিন্দনীয় ও ওলীগণের অসম্মান এমনকি কুফরী পর্যায়ের বলে গণ্য করেন।

অপরদিকে অনেকে তা হাদীসের অনুসরণ হিসাবে মেনে নেন বা সমর্থন করেন। যারা কবর, গম্বুজ ইত্যাদি ভাঙ্গাতে বুজুর্গগণের কোনো অবমাননা বা গোনাহ হয়েছে বলে মনে করেননি, বরং হাদীসের অনুসরণ হিসাবে তা মেনে নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারতের সুবিখ্যাত সংস্কারক ও বুজুর্গ ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী, রাহিমাহুল্লাহ (১৮৪৬-১৯৩৯ খ্রি.)।

তিনি বাদশাহ আব্দুল আযীযকে লিখেন, স্মৃতিচিহ্ন, মাজারের গম্বুজ ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলা একদিক থেকে ঠিক হয়েছে, কারণ এতে হাদীসের অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, হাদীস শরীফে উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, কোনো মুসলমানের কবরই উঁচু করা যাবে না, আর কোনো কবর উঁচু করা হলে বা পাকা করা হলে তা ভেঙ্গে ফেলা যাবে। একে অন্যায়, নাহক্ক বা গোনাহের কাজ বলা যায়-না। তাঁর ভাষায়:

.

"...

"আমরা শুনে আসছি যে, আপনার রাজত্বে হেজাজের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ ও পবিত্র মাযারসমূহের গম্বুজ আপনার নির্দেশে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং সেসব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নিঃসন্দেহে হাদীসের অনুসরণ হিসাবে এই কাজ এক দিক থেকে অন্যায় নয়। তবে আশ্চার্য হই যে, আপনার দেশের অধিকাংশ অধিবাসী দাড়ি কাটেন অথবা খেলাফে সুন্নাত-ভাবে ছাটেন। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের মানুষেরাও ক্রমান্বয়ে এই কঠিন অন্যায় কাজটি করতে শুরু করেছে। আপনার উজ্জ্বল চরিত্র ও অনাবিল স্বভাবের উপর নির্ভর করে এ অধম আশা করছে যে, আপনি আপনার দেশে যেসকল ঘৃণিত বিদ'আত ও শরীয়ত বিরোধী কাজ সংঘঠিত হয় তা রোধ করবেন।"[২]

(৫). কবর কেন্দ্রিক মসজিদ তৈরি নিষিদ্ধ

আমরা প্রাচীন মুমিন ও কাফির বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই যে, তাদের মধ্যকার কোনো নবী, ওলী বা 'বীর' মৃত্যুবরণ করলে তারা তার মধ্যে বিশেষ 'ঐশ্বরিক' শক্তির কল্পনা করত। তারা মনে করতো যে, মৃত্যুর পরে তিনি বিশেষ 'ঐশ্বরিক' ক্ষমতা অর্জন করেছেন। এজন্য কখনো বা তাদেরকে বিশেষভাবে পূজা করত, তাদের নামে মানত করত, তাদের কবরে নতুন ফল, ফসল উৎসর্গ করত বা তাদের কাছে বিশেষভাবে অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করত, পথেঘাটে, সমুদ্রে, বনে জঙ্গলে, বিপদে আপদে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করত। কখনো বা তাদের কবরকে কেন্দ্র করে বিশেষ যিয়ারত, অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করত।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মুসলিম উম্মতগণও এই শিরকী বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হতেন। তাঁরা সমাধিস্থ ব্যক্তির পূজা-উপাসনা না করলেও তাঁদের কবরের নিকট আল্লাহর ইবাদত-উপাসনা করতে ভালবাসতেন। তাঁরা ভাবতেন, আল্লাহর প্রিয় নবী-ওলীদের কবর বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে নামায, দোয়া ইত্যাদি ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হবেন এবং তাড়াতাড়ি কবুল করবেন। এজন্য তাঁরা তাঁদের কবরগুলিকে উপাসনালয় বানিয়ে নিতেন।

প্রাচীন গ্রিক, মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এগুলি দেখতে পাই। কুরআন কারীমে সূরা কাহাফে এবিষয়ে উল্লেখ দেখতে পাই। আমরা দেখি যে, তৎকালীন মানুষের আসহাবে কাহাফের দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকার স্থানের সন্ধান পাওয়ার পর সে সমাজের কাফির বা মুসলিমগণ প্রাচীন যুগের উপরোল্লেখিত রীতি অনুসারে সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করতে চান।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে এসকল কাজ থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। বিশেষত তিনি তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে বারাবর উম্মতকে নবী-ওলীদের কবরকে মসাজিদ বা ইবাদতের স্থান বানিয়ে নিতে নিষেধ করেছেন। যারা তা করে তাদেরকে তিনি লানত করেছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন:

ﷺ :(:)

.   .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় বলেন : 'আল্লাহর লানত-অভিশাপ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপর, তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।' এই কারণ না-থাকলে তাঁর কবরকে প্রকাশ্য স্থানে রাখা হতো। কিন্তু তিনি ভয় পান, বা তাঁর সাহাবীগণ ভয় পান যে, তাঁর কবরকে মাসজিদ বানিয়ে ফেলা হবে।"[১]

অন্য হাদীসে আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন :

ﷺ)

. (

"যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকালের সময় উপস্থিত হলো তিনি তাঁর একটি চাদর নিয়ে বারবার মুখের উপর রাখতে লাগলেন। যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলেন তখন আমরা তা তুলে নিচ্ছিলাম। এই অবস্থায় তিনি বলেন : 'আল্লাহর লানত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপর, আল্লাহ ইহুদি-খ্রিষ্টানদেরকে ধ্বংস করুন, তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে মসজিদ ও নামাযের স্থান বানিয়ে নিয়েছিল।' এভাবে তিনি তাঁর উম্মতে এই ধরনের কাজ করা থেকে সাবধান করছিলেন।"[২]

আবু উবাইদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ যে কথা বলেন তা হলো:

"…. তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নেয়।"[৩]

আবু হুরাইহরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

(:)

"হে আল্লাহ, আমার কবরকে যেন পূজার বস্তু বানিয়ে দিবেন না যাকে ইবাদত করা হবে। আল্লাহর অভিশাপ ও গজব সেই সম্প্রদায়ের উপর যারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।"[৪]

জুনদুব (রা) বলেন, আমি নবীজী ﷺ -কে ইন্তেকালের পাঁচ দিন আগে বলতে শুনেছি :

"তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবী ও ওলীদের কবরগুলি মসজিদ, ইবাদতগাহ বা নামাযের স্থান বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদকে বা ইবাদত ও নামাযের জায়গা বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এই কাজ থেকে।"[৫]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কবর বা কবরস্থের পূজা নয় বা মৃতের কাছে চাওয়া নয়, কবরের কাছে মসজিদ বানানো বা নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদি-নাসারাদেরকে এভাবে কঠিন ভাষায় লা'নত ও অভিশাপ করেছেন। মসজিদ ও মসজিদ কেন্দ্রিক সকল কর্ম আল্লাহর ইবাদত। অথচ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য তিনি ঐসব জাতিকে লা'নত করলেন, শুধুমাত্র কবরের কাছে এই ইবাদতগুলি পালন করার কারণে।

এখানে ইহুদি-নাসারারা অনেক "অকাট্য! দলিল" দিতে পারে : মসজিদ তৈরি ইবাদতের জন্য। মসজিদে নামায, দোয়া ইত্যাদি যা কিছু করা হয় সবই ইবাদত। সব জায়গাতেই এসকল ইবাদত পালন করা যায়। নবী-ওলীদের কবর বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে এগুলি পালন করলে মহব্বত, অনুসরণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়… ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এভাবে আমরা দেখছি যে কবর পাকা করা বর্জন করা, কঠোরভাবে তা নিষেধ করা এবং কবরের পাশ মসজিদ বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বা আদর্শ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে তাঁর সাহাবায়ে কেরামও এভাবেই চলেছেন। একইভাবে পরবর্তী দুই মুবারক যুগের মানুষেরা চলেছেন। এসকল যুগের উলামায়ে কেরাম আলেম, দরবেশ, ইমাম, সাধক কারো কবর তাঁরা পাকা করতেন না, গম্বুজ বানাতেন না। কবর কেন্দ্রিক কোনো প্রকারের অনুষ্ঠান, উৎসব,ওরস, ইসালে সাওয়াব, মাহফিল, আয়োজন, কোন কিছুই তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল-না।

এমনকি প্রাচীন যুগের কোনো নবীর কবরকেও তাঁরা পাকা করে, গম্বুজ গেলাফ দিয়ে মাজার বানিয়ে দেননি। উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে ইরাকে দানিয়েল নবীর কবরের সন্ধান পান। কবরের মধ্যে অনেক কিতাবও পাওয়া যায়। তিনি কবর লোকচক্ষুর আড়াল করে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। সেখানে প্রাপ্ত কাগজপত্রও দাফন করে দিতে নির্দেশ প্রদান করেন।[৬] প্রখ্যাত তাবেয়ী ইব্রাহীম নাখয়ী (৯৬ হি.) বলেন : সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কারো কবরের উপর চিহ্ন রাখাকেও মাকরুহ মনে করতেন।[৭]

তৃতীয়ত, কবরে অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গান : কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাহাবীগণের যুগের শেষদিক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন খেলাফে সুন্নাত মতামত, কর্মকাণ্ড ও রীতি পদ্ধতি প্রচলিত হতে থাকে। বিশেষ করে খিলাফতে রাশেদার পরে, সাহাবীদের সংখ্যা কমার সাথেসাথে বিভিন্ন বিদ'আত ক্রমান্বয়ে সমাজে সামান্য সামান্য প্রবেশ করতে থাকে। বিদ্যমান সাহাবীগণ ও নেতৃ-স্থানীয় তাবেয়ী আলেমগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের বিদ'আত, যেমন খারেজী, রাফেযী, কাদারীয়া, জাবরীয়, মুতাযিলা, জাহমীয়া ইত্যাদি বিভন্ন বিদ'আতী মতবাদ ও বিদ'আত কর্ম সমাজে প্রবেশ করতে থাকে। নবুয়তের যুগ যত দূরে সরে যেতে থাকে, হেদায়েতের আলোও তত কমতে থাকে। শুরু হয় বিদ'আতের সাথে সুন্নাতের সংঘাত।

এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজের মধ্যে কিছু ছিল মৃত্যু কেন্দ্রিক। মৃত্যু বড় কঠিন সত্য। প্রিয়মত মানুষের বিয়োগ বেদনায় অধীর জীবিত প্রিয়জন চায় যে, সেও নিজেকে মৃতের সাথে কবরের মধ্যে স্থান দেয়। অনেকে কবরের পাশেই বসে থেকে মৃতের সাহচর্য পেতে চায়। কেউ বা আবেগে অধীর হয়ে প্রিয়জনকে ঢেকে রাখতে চায়। কেউ বা বিভিন্ন অমুসলিম সমাজে প্রচলিত রীতি দেখে প্রভাবিত হয়ে তাদের আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করতে চায়।

মহিলাদের দাফনের সময় তাঁদের মৃতদেহ ও কবর আড়াল করা সুন্নাত, যেন কোনো প্রকারে তাঁদের পর্দার কোনো ক্ষতি না-হয়। এ জন্য সাহাবীদের যুগে কখনো কখনো মহিলাদের দাফনের সময় কবরের উপরে অস্থায়ী তাঁবু বা পর্দা টাঙ্গানো হয়েছে, দাফনের পরে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযর উমর (রা.) যাইনাব বিনতে জাহশের দাফনের সময় তাঁর কবরের উপরে 'ফুসতাত'[১] বা চামড়ার তাবু টাঙ্গান।[২]

সাহাবীগণের যুগের শেষের দিকে পুরুষদের কবরের উপরেও অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গানোর প্রচলন দেখা দেয়। কারো মৃত্যুর পরে তাঁর কবরের পার্শে তাঁবু বা ঘর বানিয়ে তিন দিন বা বেশি দিন শোকের জন্য অবস্থান করেছেন কোনো কোনো আপন জন। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় যে, ৬৮ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকলের পর তাঁর ছাত্র, আলী (রা)-র পুত্র তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়্যহ (২১-৮১ হি.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তিনি তিনদিন পর্যন্ত তাঁর কবরের উপর তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাখেন।[৩]

সাহাবীদের যুগের শেষ দিকে থেকে, ১ম হিজরীর শেষার্ধে কবরের উপর কিছুদিন তাঁবু টাঙ্গিয়ে রাখা বেশ প্রসার লাভ করে। এ সকল তাঁবু ছিল অস্থায়ী। কিছুদিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ ও আবেগ প্রকাশের জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এ ধরনের অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গাননি। কোনো কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী তা করেছেন। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ী তা অপছন্দ করেছেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (৭৩ হি.) আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর সিদ্দীক (৫৩ হি.)-এর কবরের উপর একটি 'ফুসতাত' বা চামড়ার তাঁবু দেখতে পান। তিনি বলেন : হে ছেলে, তাঁবুটি উঠিয়ে ফেল; তাঁর আমলই কেবলমাত্র তাঁকে ছায়াদান করবে। (কাজেই, তাঁবু টাঙ্গানো অহেতুক ও অনর্থক)।[৪]

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। সাহাবীদের যুগের পরে, তাবেয়ীদের যুগে, ৯৭ হিজরীতে, ইমাম হাসান ইবনু আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান ইবনু হাসান ইন্তেকাল করলে তাঁর স্ত্রী তাঁর কবরের উপরে এক বৎসর যাবৎ তাঁবু খাটিয়ে রাখেন। এরপর তিনি তাঁবু উঠিয়ে নেন। তখন সবাই শুনতে পান যে, অদৃশ্য থেকে কেউ বলছে : সবাই শোনো! যা তারা হারিয়েছিল তা কি তারা (এক বৎসর তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করে) ফেরত পেয়েছে? অদৃশ্য থেকে দ্বিতীয় কণ্ঠ উত্তর দেয় : না, বরং তারা নিরাশ হয়ে ফিরে চলে গেছে।"[৫]
গেছে।"[৫]

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগের এই ধরনের আরো দুই চারটি ব্যতিক্রম ঘটনা ইতিহাসের পাতা ঘাটলে পাওয়া যাবে। প্রথম হিজরী শতকের শেষার্ধে বেঁচে ছিলেন যেসকল সাহাবী তাঁদের কেউ কেউ এই তাঁবু টাঙ্গনোর প্রতিবাদ করেছেন, নিষেধ করেছেন এবং কেউ কেউ এই রীতিকে বিদ'আত বলেছেন। আবু হুরাইরা (৫৭হি.) মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত করেন যে, তাঁর কবরের উপরে যেন এই ধরনের তাঁবু টাঙ্গানো না হয়। অনুরূপভাবে আবু সাঈদ খুদরী (৭৪ হি.) তাঁবু টাঙ্গাতে নিষেধ করে যান। তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী (১১৮ হি.) বলেন : কবরের উপরে এধরনের তাঁবু টাঙ্গানো বিদ'আত।[৬]

তাবু টাঙ্গানোর এই ঘটনাগুলি যে শরীয়তের কোনো প্রামাণ্য বিষয় নয় তা সম্ভবত আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম ও নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর কর্ম কোনো অবস্থাতেই শরীয়তের প্রামাণ্য বিষয় নয়। আশা করি আমরা কেউই একথা বলব-না যে, ২/১ জন তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী কবরের উপরে তিনি দিনের জন্য বা এক বৎসরের জন্য তাঁবু টাঙ্গিয়ে রেখেছেন বলে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত পরিত্যাগ করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কবরের উপরে স্থায়ী ঘর তৈরি করব। কোনো কোনো তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী যবের তৈরি সামান্য মাদকতাপূর্ণ 'নাবীয' (wine) পান করেছেন বলে আমরা কুরআন ও হাদীসের অগণিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মদপান জায়েয করে দেব?

আমরা জানি যে, হাদীস শরীফে কবরের উপরে ঘর বানানো, ইমারত বানানো, উঁচু করা, চুনলেপা ইত্যাদি স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিপরীতে কোনো প্রকার অনুমতি প্রদান করা হয়নি। কাজেই এগুলি স্পষ্ট হারাম। তবে হাদীসে "অস্থায়ী তাঁবু

টাঙ্গানোর” স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই। এজন্য, যদি অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বিরোধিতা না আসত, তাহলে কয়েকজন তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীর কর্ম থেকে আমরা বড়জোর বলতে পারতাম যে, কবরের উপরে বৃষ্টির কারণে বা কবরের পাশে শোক প্রকাশকারীর অবস্থানের জন্য অস্থায়িভাবে তাঁবু টাঙ্গানো জায়েয ; তবে তা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত নয়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ নবুয়তী জীবনে হাজারো আপনজনকে দাফন করেছেন। কিন্তু কখনো কারো কবরের উপরে বা পাশে তাঁবু টাঙ্গাননি। অনুরূপভাবে কবরের পাশে অস্থায়ী তাঁবু টাঙ্গানো সুন্নাতে সাহাবাও নয়। সাহাবীগণের মধ্যে এর প্রচলন ছিল-না।

যদি এই অস্থায়ী তাবু টাঙ্গনোর ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবেয়ীগণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ না আসতো তাহলে আমরা একে এভাবে জায়েয বলতে পারতাম। যেমনভাবে আমরা দাঁড়িয়ে পেশাব করা, পায়ে চুমু খাওয়া ইত্যাদিকে জায়েয বলতে পারি। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এই প্রকারের অস্থায়ী তাবু টাঙ্গানোর প্রচলন শুরু হলে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ প্রতিবাদ করেছেন। ফলে আমরা একে জায়েয বলারও সুযোগ পাচ্ছি না। একদিকে সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) ও সুন্নাতে সাহাবার বিপরীত। অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের নিষেধাজ্ঞা।

দুই একজনের জীবনের দুই একটি কর্মকে যদি সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করি তাহলে অধিকাংশের আজীবনের কর্মকে কী বলব। সুন্নাতকে এভাবে বুঝলে দাঁড়িয়ে পেশাব করাকে সুন্নাত বলতে দোষ কি? বিশেষত সেক্ষেত্রে ‘সুন্নাতে নববী’ ও ‘সুন্নাতে সাহাবা’ রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

আমরা দেখেছি যে, কখনো কখনো দুএকজন সাহাবীও সুন্নাত না-জানার ফলে, অথবা নিজস্ব ইজতিহাদের ফলে খেলাফে-সুন্নাত কাজ করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে মা’যুর। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর কোনো আলেম কখনোই তাঁদের এ সকল কর্মের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করতে অথবা তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে নির্দেশ প্রদান করেননি। এবিষয়ে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

চতুর্থত, একটি বিশেষ ব্যতিক্রম : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাফন

(১). আয়েশার (রা) ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাফন করা হয়

একটি ব্যতিক্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হলো : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণ একমত হয়ে তাঁকে, যে স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন ঠিক সেই স্থানে, আয়েশা (রা)-র কুটিরের মধ্যে দাফন করেন। এতে কবরের উপরে ঘর বানানো হলো না, কিন্তু পূর্বে নির্মিত আবাস ঘরের মধ্যে দাফন করা হলো।

তাবেয়ী আব্দুল আযীয ইবনু জুরাইজ বলেন :

ﷺ ﷺ ﷺ :ﷺ

.

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোথায় দাফন করতে হবে তা সাহাবীগণ ঠিক করতে পারেন না। তখন আবু বকর (ﷺ) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “কোনো নবী যেখানে মৃত্যুবরণ করেন সেখানেই তাঁকে কবর দিতে হবে, অন্যত্র তাঁকে কবর দেওয়া হবে না।” এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর বিছানা সরিয়ে, বিছানার নিচেই তাঁর জন্য কবর খনন করেন।”[1]

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

ﷺ ﷺ

.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পরে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর দাফনের স্থান সম্পর্কে মতবিরোধ করেন। তখন আবু বকর (ﷺ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে একটি কথা বলতে শুনেছি, তা ভুলিনি। তিনি বলেছেন: “আল্লাহ তা’আলা কোনো নবীর রুহ সেখানেই কবজ করেন যেখানে তাঁকে দাফন করা তিনি পছন্দ করেন।” তোমরা তাঁকে তাঁর বিছানার স্থানেই দাফন কর।”[2]

এভাবে আমরা দেখছি, নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) জন্য আল্লাহ বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন, যা আর কারো জন্য নয়। এই বিধানের আলোকেই সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যেস্থানে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন সে স্থানে, আয়েশার (রা.) ঘরের মধ্যে, তাঁকে দাফন করেন।

এই বিশেষ বিধানের কারণ কি ? আমরা বিভিন্ন কারণ বলতে পারি। তবে আমরা দেখেছি যে, উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, তাঁর কবরকে মসজিদ বা ইবাদতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করার ভয়েই এভাবে ঘরের মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাড়ির বিবরণ

আমরা, সুন্নাত প্রেমের দাবিদারগণ দস্তরখান, খাওয়ার জন্য বসার পদ্ধতি ইত্যাদি সুন্নাত পালন করলেও, ঘরের সকল খাদ্য দরিদ্রদের দান করে সারাদিন না খেয়ে থাকা, মাসের পর মাস না খেয়ে থাকা, সারাদিনে শুধুমাত্র কয়েকটি খেজুর ও পানি খেয়ে থাকা ইত্যাদি সুন্নাত পালন করতে মোটেও আগ্রহী নই। অনুরূপভাবে সুন্নাতের নামে লুঙ্গি-চাদর পরতে আগ্রহী হলেও, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মতো বিছানায় ও ঘরে বসবাস করতে রাজি নই।

আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে তাঁর বাড়িতে, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-র সাথে যে বাড়িতে

তিনি বসবাস করতেন সেই ঘরেই দাফন করা হলো। এই বাড়ির পরবর্তী বিবর্তন না জানলে আমরা কবর বিষয়ক বিধান বুঝতে পারব না। এজন্য প্রথমে তাঁর বাড়ির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করছি। আমরা এরকম বাড়িতে হয়ত থাকতে পারব না। তবে অন্তত বুঝতে পারব যে, আমরা তাঁর প্রকৃত সুন্নাত থেকে কত দূরে রয়েছি।

অতি সরল ও সাধাসিধা জীবন ছিল তাঁর অন্যতম সুন্নাত। এরই অংশ হলো অতি সাধারণ বাড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের প্রত্যেকের জন্য পৃথক "বাড়ি" ছিল। বাড়িগুলি ছিল মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে, মসজিদ সংলগ্ন। অর্থাৎ একই কাদামাটির দেওয়াল মসজিদ ও বাড়িকে বিচ্ছিন্ন করতো। আমরা জানি যে, মসজিদের নববীর কেবলাহ হলো দক্ষিণ দিকে। এতে আমরা বুঝতে পারছি যে, মসজিদে নববীতে নামাযে দাঁড়ালে ঘরগুলি বামদিকে থাকে।

তাঁর একটি বাড়ির আয়তন ছিল কমবেশি ১৬ হাত X ৮ হাত। অর্থাৎ ,তাঁর পুরো বাড়িটি ছিল ৩০০ বর্গফুটেরও কম জায়গা। উচ্চতা ছিল প্রায় ৪/৫ হাত। একজন কিশোর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করলে ছাদ নাগাল পেত। বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন ৬/৭ হাত প্রশস্ত অংশটুকু বসার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। পিছনের অংশটুকু (১০ হাত X ৮ হাত) শয়ন ও অবস্থানের ঘর বা বেডরুম। বাড়িগুলি একটি মাত্র দরজা ছিল মসজিদের দেওয়ালের সাথে। অর্থাৎ মসজিদের ভিতর দিয়েই তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতে হতো। খেজুরের পাতার সাথে মাটিকাদা মিশিয়ে এই বাড়ির সকল দেওয়াল ও ছাদ নির্মাণ করা হয়। একবার একজন স্ত্রী নিজের টাকায় ভালো আড়ালের নিয়্যাতে ঘরের পিছনের দেওয়ালটি খেজুরের পাতার বদলে কাঁচা ইট দিয়ে তৈরি করে নেন। এতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[১]

(২). নবীজীর ﷺ দাফনের পরেও আয়েশা (রা) সে ঘরে বাস করতেন

আয়েশা (রা.)-এর বাড়িটি ছিল মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে। মসজিদ সংলগ্ন একটি ছোট্ট কুটির। এই বাড়ির বসত ঘর বা বেডরূমের মধ্যে (১০ হাত লম্বা ও ৮ হাত চওড়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাফন করা হয়। দাফনের পরেও আয়েশা (রা.) সেখানে বসবাস করতেন। আর কোনো বসতবাড়ি তাঁর ছিল-না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের ২ বৎসর ৩ মাস পরে ১৩ হিজরীতে আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশে আয়েশার (রা) ঘরের মধ্যে দাফন করা হয়। তাঁর পরে ১০ বৎসর উমর (রা.) খলীফার দায়িত্ব পালন করেন। ২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি আয়েশার (রা.) কাছে তাঁর ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরের পাশে তাঁকে দাফন করার সুযোগ দেওয়ার আবেদন করেন। আয়েশা (রা.) অনুমতি প্রদান করলে তাঁকেও সেখানে দাফন করা হয়।

এই ঘরের মধ্যে কবরগুলির পাশেই আয়েশা (রা.) প্রায় ৫০ বৎসর জীবনযাপনের পর ৫৮ হিজরীতে মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে ওসীয়ত করেন যে, তাঁকে যেন তাঁর ঘরের মধ্যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের পাশে দাফন না-করে রাসূলুল্লহ (ﷺ)-এর অন্যান্য স্ত্রীর পাশে বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়। সেভাবে তাঁকে বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়।[২] তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এটি ছিল তাঁর বসতবাড়ি, আবাসিক ঘর। তাঁর ইন্তেকালের পরে তা শুধুমাত্র রওযা হিসাবে সংরক্ষিত হয়।

(৩). আয়েশা (রা.)-এর ঘরে কবরগুলির হেফাযতের অবস্থা

আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ঘরের মাঝখানে, কবর ও তাঁর বসবাসের স্থানের মধ্যে একটি পর্দা বা দেওয়াল দিয়ে রাখতেন। প্রথমদিকে তিনি ঘরের মধ্যে চলাচল কালে কবরের দিকে যেতে বিশেষ পর্দা করতে না, বরং ঘরের স্বাভাবিক কাপড়ে যেতেন। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-র দাফনের পরে তিনি কবরগুলির অংশে যেতে হলে কাপড় গুছিয়ে যেতেন।[৩] ঘরের মধ্যে কবরগুলি স্বাভাবিক কাঁচা অবস্থায় ছিল। কোনোভাবে পাকা করা হয়নি, চুনকাম করা হয়নি বা গেলাফ লাগান হয়নি।

তাবেয়ী কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবু বকর সিদ্দীক আলী (রা.)-এর শাসনামলে (৩৫-৪০ হি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[৪] তিনি বলেন :

ﷺ

."

"আমি আমার ফুফু আয়েশা (রা.)-এর ঘরে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আম্মাজান, আপনি পর্দা তুলে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর দুই সাহাবীর কবর দেখান-না একটু! তখন তিনি পর্দা সরালেন। আমি তিনটি কবর দেখলাম। কবরগুলি জমিন থেকে উঁচু নয় আবার একেবারে জমিনের সাথে মিশানোও নয় (স্বাভাবিক কবরের উচ্চতা), সমভূমির লাল বালুময়।"[৫]

দ্বিতীয় হিজরী শতকের তাবে-তাবেয়ী সুফিয়ান আত-তাম্মার বলেছেন:

ﷺ

"তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবর দেখেছেন। তা (সাধারণ কবর যেভাবে তৈরি করা হয় সেইরূপ) মাঝে উঁচু টিপি করা

ছিল।[১]

(৪). রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাড়ির বিবর্তন

একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রিয়তম সাহাবীদ্বয়ের (রা.) কবর, আবার আয়েশার (রা.) আবাসগৃহ, তাও আবার মসজিদ সংলগ্ন। বিভিন্ন সময়ে এর সংরক্ষণ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আয়েশার (রা.) জীবদ্দশায় কোনো কোনো নও মুসলিম কবরের মাটি নিয়ে যেত, এজন্য তিনি একটি দেওয়াল নির্মাণ করতে বলেন। যিয়ারতের জন্য দেওয়ালের মধ্যে একটি গোল ফাঁকা স্থান রাখা হয়। অনেকে সেখান থেকেই মাটি নেওয়ার চেষ্টা করত। তখন তিনি তাও বন্ধ করে দেন। আয়েশা (রা.)-এর জীবদ্দশাতেই উমর (রা.) আয়েশার ঘরসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাড়ির চারিদিকে প্রাচীর (বাউন্ডারি ওয়াল) তৈরি করে দেন।[২]

উমর ফারুক ও উসমান যিন্নুরাইন (রা.)-এর খেলাফতের সময় দুইবার মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মসজিদ বাড়ানো হয়। কিন্তু পূর্ব দিকে উম্মুল মুমিনীনদের বাড়ি থাকার কারণে এদিকে মসজিদ বৃদ্ধি করা হয়নি। ৬০ হিজরীর মধ্যে মুমিনদের মাতা নবীপত্নিগণ ইন্তেকাল করেন। মুসলিম খলিফাগণ তাঁদের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে তাঁদের বাড়িগুলি মসজিদের জন্য কিনে নেন। সকলের ইন্তেকালের পরে এগুলিকে তাঁরা বিশেষভাবে সংরক্ষণসহ মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন।

উম্মুল মুমিনীনগণের (রা.) ইন্তেকালের পরে তাঁদের বিরাণ ঘরগুলিতে অনেকে নামায পড়ত। ১ম শতাব্দীর শেষে উমাইয়া খলীফা ওলীদের সময়ে (৮৬-৯৬ হি.) মদীনার শাসক উমর ইবনু আব্দুল আযীয দেখেন যে, অনেকে আয়েশার (রা.) ঘরের (রওযা মুবারকের) পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে কিবলার দিকে রেখে, কবরের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে। তখন তিনি একটি উঁচু দেওয়াল তৈরি করে ঘরটি ঘিরে দেন। দেওয়ালের উত্তর দিকটি তিনি তিনকোণ বিশিষ্ঠ করেন, যেন কেউ সেখানে নামাযে দাঁড়াতে না পারে। এরপর আয়েশার (রা.) বাড়ি সহ উম্মুল মু'মিনীনদের বাড়িগুলি মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে পূর্ব দিকে মসজিদ কিছুটা বাড়ানো হয়। রওজা শরীফকে অতিরিক্ত একটি দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।[৩]

আলোচনা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। আমরা উদ্দেশ্য হলো আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সারাজীবনের রীতির বাইরে তাঁকে ঘরের মধ্যে দাফন করার ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগ পর্যন্ত রাওজা শরীফের বিবর্তনের ঘটনা অনুধাবন করা।

পঞ্চমত, সুন্নাত ও ব্যতিক্রম : সিদ্ধান্ত গ্রহণ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সারাজীবনের রীতি ও কর্ম হলো সকল মাইয়্যেতকে গোরস্থানে দাফন করা এবং কোনো প্রকারে কোনো কবর পাকা করা, চুনকাম করা বা গেলাফ লাগান সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। তাঁর শিক্ষাও তাই। তিনি কঠোরভাবে এগুলি নিষেধ করেছেন। নিষেধের বিপরীতে কোনো প্রকার অনুমতি তিনি প্রদান করেননি। কখনো কোনো পরিস্থিতিতে কবর পাকা করা যাবে, চুনকাম বা গেলাফ দেওয়া যাবে এরূপ কোনো অনুমতি তিনি প্রদান করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুলাফায়ে রাশেদীনসহ সাহাবীগণ ঘরের মধ্যে দাফন করেছেন। পরবর্তীতে আবু বকর ও উমরকেও (ﷺ) সেখানে দাফন করা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের জীবনের দীর্ঘ সময়ে অন্য কাউকে কখনো ঘরের মধ্যে দাফন করেননি। খলীফাদ্বয়ের দেখাদেখি পরবর্তীতে কোনো সাহাবীও তাঁর নিজেকে ঘরের মধ্যে দাফন করতে বলেননি, বা অন্য কাউকে ঘরের মধ্যে দাফন করেননি। এখন আমরা এই ব্যতিক্রমকে কী-ভাবে ব্যাখ্যা করব?

প্রথমত, আমরা বলতে পারি যে, ঘরের মধ্যে দাফন করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য বিশেষ বিধান, অন্য কারো জন্য তা জায়েয নয়। যেহেতু তাঁর দাফনের পরেও ঘরে আরো মানুষের দাফনের যায়গা ছিল তাই সেখানে অন্য কাউকে দাফন করাতে অসুবিধা ছিল না। এজন্যই তাঁর প্রিয়তম সাহাবীদ্বয় (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সেখানে নিজেদের দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আয়েশা (রা)-এর নিকট অনুমতি চেয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, তাঁর বলেন নি যে, আয়েশার (রা) ঘরে জায়গা না হলে বা অনুমতি না মিললে আমাদেরকে আমাদের ঘরে দাফন করবে। বরং বলেছেন, সেখানে দাফন সম্ভব না হলে গোরস্থানে আমাকে দাফন করবে।[৪] এভাবে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বসত বাড়ির মধ্যে দাফন করা নবীগণের জন্য বিশেষ বিধান। অন্য কোন মানুষের জন্য তা জায়েয নয়।

দ্বিতীয়ত, উপরের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কেউ বলতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা ও কর্মের আলোকে কোনো কবর পাকা করা, চুনকাম করা, গম্বুজ দেওয়া বা গেলাফ দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাইরে থেকে ইট তো দূরের কথা বাইরে থেকে মাটি এনে কোনো কবরকে অতিরিক্ত উঁচু করাও জায়েয নয়। এ সকল কাজ একদিকে সুন্নাত বিরোধী অপরদিকে নিষিদ্ধ ও হারাম। তবে আগে থেকে তৈরি কোনো বসত বাড়ির ঘরের মধ্যে কেউ ইন্তেকাল করলে সেখানে তাকে দাফন করা জায়েয। কেউ যদি সাধারণ সাহাবীগণের চেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন হন (!) এবং কোনো-না কোনো দিক থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের সমপর্যায়ের হন (!) তাহলে তাঁকে তাঁর আবাসঘরের মধ্যে দাফন করা যেতে পারে।

তবে তা সুন্নাত নয় বা তাকে রীতিতে পরিণত করা যাবে না। কারণ খুলাফায়ে রাশেদীন একে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আজীবনের সুন্নাত হলো গোরস্থানে দাফন করা। ব্যতিক্রম হলো শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদ্বয়কে ঘরের মধ্যে দাফন করা। আমরা অবশ্যই তাঁদের আজীবনের কর্মের বিপরীতে একটি কর্মকে সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করব-না। তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুন্নাত হিসাবে গ্রহণ করাতে হবে। বরং আমরা তাঁদের সাধারণ

কর্মকে সুন্নাত ও এই ব্যতিক্রমকে জায়েয বলে গণ্য করব। সমাজে কেউ যদি আবু বকর ও উমরের, বা আয়েশার (ﷺ) সমপর্যায়ের হন (!), তাকে তার আবাসগৃহের মধ্যে দাফন করা হয়, তার পরিবার সে ঘরেই বসবাস করতে থাকে এবং তাঁর কবর কোনোভাবে পাকা করা না-হয় তাহলে আমরা তাঁর এই কাজকে জায়েয বলব। তবে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে, আমাদের কারোরই উচিত নয় নিজেকে তাঁদের সমপর্যায়ের মনে করে সাধারণ সাহাবীদের রীতির বাইরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপরের দুই পর্যায়ে আমরা সুন্নাতের মধ্যেই থাকতে পারব বলে আশা করি এবং আমাদের দ্বারা সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এর অতিরিক্ত পর্যায়গুলি আমাদেরকে সুন্নাত বিরোধিতার মধ্যে নিয়ে যাবে। সুন্নাত বিরোধিতার পর্যায়গুলি নিম্নরূপ:

(১). কেউ যদি বসতঘরের মধ্যে দাফন করাকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন তাহলে নিঃসন্দেহে তা খেলাফে-সুন্নাত হবে এবং এই রীতির ফলে সুন্নাত মৃত্যুবরণ করবে।

(২). কেউ যদি আরো অগ্রসর হয়ে বলেন যে, শুধু বসত ঘরের মধ্যেই নয় কবরের জন্য আগে থেকে ঘর বানিয়ে রেখে সেই ঘরে দাফন করা জায়েয তাহলে তা অবশ্যই আরো বেশি সুন্নাত বিরোধী হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে একেবারেই অপরিচিত, বানোয়াট একটি পদ্ধতিকে এভাবে জায়েয বলা দ্বীনকে বিকৃত করার নামান্তর।

(৩). সুন্নাত বিরোধিতার তৃতীয় ও জঘন্যতর পর্যায় হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মনগড়া "জায়েয"-কে, অর্থাৎ, মৃত্যুর পূর্বে দাফনের জন্য ঘর বানিয়ে রাখা ও মৃত্যুর পরে সেই ঘরে দাফন করাকে রীতিতে পরিণত করা। এই রীতির প্রচলন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত মুসলিম সমাজ থেকে উঠিয়ে দেবে এবং একটি ঘৃণিত বিষয়ে পরিণত করবে।

(৪). আরো বেশি জঘন্য পর্যায় হলো, ঢালাওভাবে কবর পাকা করা, বাঁধানো, কবরের উপরে ইমারত ও গম্বুজ তৈরি করা, গেলাফ দেওয়া ইত্যাদিকে জায়েয বলা।

(৫). সুন্নাতে নববীকে অপছন্দ করার জঘন্যতম পর্যায় হলো এ সকল কাজকে জায়েয বলার পর তাকে সুন্নাতের চেয়েও উত্তম মনে করা। যদি কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদ্বয়ের দাফনের ব্যতিক্রম ঘটনাকে পুঁজি করে অথবা অন্যান্য দুই একটি ব্যতিক্রম ঘটনা, ব্যক্তিগত কর্ম বা গল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের সুন্নাত, সারা জীবনের শিক্ষা ও সকল নিষেধাজ্ঞা মনগড়াভাবে বাতিল করে দিয়ে বলব: কবর পাকা করা, কবরে গম্বুজ তৈরি করা, গেলাফ দেওয়া ইত্যাদি জায়েয, বরং ভালো কাজ এবং এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, তাহলে তাঁর অবস্থা অবিকল ঐ ব্যক্তির মতো, যিনি দুই একটি ব্যতিক্রম ঘটনা, কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা ও কোনো কোনো ফকীহ ও ইমামের ভুল মতের বিকৃত অর্থ করে মদপান, ব্যভিচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মকে জায়েয বলেছেন, এরপর সেগুলিকে উত্তম ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ বলে দাবি করেছেন।

পাঠক হয়ত বলবেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কবর পাকা না করলেও বা করতে নিষেধ করলেও কোনো কোনো কিতাবে কবর বাঁধানো, পাকা করা, গম্বুজ দেওয়া বা গেলাফ দেওয়ার অনুমতি আছে। আমি বলব: হাঁ, তা আছে। অনেক কিতাবে নাচগান করার কথা আছে, অনেক কিতাবে মানুষকে সাজদা করার কথা আছে। বিপরীতে অগণিত ইমাম আলেম ও বুজুর্গ বারংবার এগুলি নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাসমূহকে এভাবে বাতিল করতে তাঁরা ঘোর আপত্তি করেছেন।

যেসকল উলামা এ সকল নতুন নিয়মগুলি জায়েয বলেছেন তাঁরা কেউই সাধারণত এ সকল পদ্ধতি চালু করেননি। ক্রমান্বয়ে যখন কোনো বিষয় সমাজে বহুল প্রচলিত হয়ে গিয়েছে, তখন অনেক আলেম সমাজের মানুষের প্রতি ভক্তি বা মমতা হেতু এগুলির কোনো শরীয়ত-সঙ্গত পথ বের করা যায় কি-না তা ভেবে দেখেছেন। তাঁরা বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা বলছেন। তাঁরা বিভিন্ন কারণ ও অজুহাত দেখাচ্ছেন।

তাঁরা একটি স্পষ্ট হাদীসও দেখাতে পারছেন-না যে, এসকল কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত বা মাঝে মাঝে করেছেন। অর্থাৎ এগুলি নিয়মিত করা বা মাঝে মাঝে করা অথবা কারো ক্ষেত্রে করা ও কারো ক্ষেত্রে বর্জন করা সুন্নাত – সে কথা তাঁরা দাবিও করছেন না, প্রমাণও করছেন না। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এ সকল কাজের অনুমতি দিয়েছেন তাও তাঁরা বলছেন না। আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আমরা সুন্নাতের মধ্যে থাকতে চাই। সকল কর্ম, পদ্ধতি, প্রকরণ, নিয়ম, সময় ও স্থানের ক্ষেত্রে আমরা সুন্নাতের মধ্যে থাকতে চাই।

আমরা সকল আলেমকে শ্রদ্ধা করি ও তাঁদের জন্য দোয়া করি। তবে গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের মানদণ্ড সুন্নাত। যে কিতাবের কথার সাথে সুন্নাতের স্পষ্ট মিল আছে সে কিতাবের কথা আমরা গ্রহণ করি। আর যে কিতাবের কথা মানতে গেলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা করতে হয় বা সুন্নাত বর্জন করতে হয় সে কিতাবের কথা আমরা ব্যাখ্যা করি, অথবা বর্জন করি। আমরা জায়েয ও নাজায়েযের অন্তহীন বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না-করে শুধুমাত্র কোনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত তা নির্ধারণ করি এবং সেভাবেই, তাঁর সুন্নাত মতোই চলতে চেষ্টা করি। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যত চাই।

ষষ্ঠত, কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করব

আমরা কী করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন যা করেছেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবয়ে কেরাম সাধারণভাবে যা করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা কি তা করব? না রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করতে বারবার নিষেধ করেছেন, তা করব? দু'একজন মানুষের কাজকে বা কথাকে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে আমরা কি স্পষ্ট সুন্নত পরিত্যাগ করব? কোনটি আমাদের জন্য উত্তম হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজ ও কথাকে স্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করে দু'একজন যারা তাঁর বাইরে গিয়েছেন তাঁদের কথা বা কাজের জন্য ওজরখাহী করব? না তাঁদের কথা ও কাজকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা ও কাজের ওজর ও ব্যাখ্যা করব?

আবু হুরাইরা (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

“আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করলে তা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করবে। আর যদি কোনো কিছুর নির্দেশ প্রদান করি তাহলে যতটুকু সাধ্যে কুলায় ততটুকু করবে।”[১]

এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজ করতে নিষেধ করলে তা কোনোভাবেই করা যাবে না। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, তিনি আজীবন কবর পাকা করতে, বাঁধাতে, চুনকাম করতে, কবরের গায়ে কিছু লিখতে, এমনকি বাইরে থেকে অতিরিক্ত মাটি এনে কবর কাঁচা রেখেই একটু উচু করতে নিষেধ করলেন। এই নিষিদ্ধ কাজ আমরা কেন করব? একটি হাদীসেও কি তিনি এসকল নিষেধের বিপরীতে কোনো অনুমতি দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ঘুণাক্ষরে কোথাও বলেছেন যে, কোনো ভালো বান্দার কবর পাঁকা করলে বা কবরের উপর গেলাফ দিলে কোনো রকমের সাওয়াব হবে?

কেউ হয়ত বলবেন: যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য আমরা ঘর তৈরি করি। আমরা কবরের উপরে যে ধরনের ঘর ও ইমারত নির্মাণ করি একে কি কেউ যিয়ারতের ঘর বলবেন? কেউ কি মনে করবেন যাত্রী-ছাউনির ন্যায় যিয়ারতকারীদের দাঁড়ানোর জন্য এই ছাউনিটা দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম কবর যিয়ারত করেছেন এবং করতে বলেছেন। দ্বীনের পূর্ণ পালনের জন্য তাঁদের আদর্শই যথেষ্ট। তাঁরা কি কখনো বাকী' গোরস্থানে, বা অন্য কোথাও, বা কারো কবরের উপরে স্থায়ী কোনো ঘর বা 'যিয়ারত ছাওনি' তৈরি করে দিয়েছেন যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য?

সপ্তমত, ওলীর তা'যীমের নামে কবর বাঁধানো ও কবর পূজা

উপরের সকল বিষয় বুঝার পরেও অনেক মুসলিম শুধুমাত্র “ওলী আউলিয়ার” তা'যীম ও ভক্তির নামে এ সকল স্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজগুলি পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন। এজন্য এই বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

(১). ওলীর পরিচিতি

“বেলায়াত” ( ) শব্দের অর্থ বন্ধুত্ব, নৈকট্য, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি। “বেলায়েত” অর্জনকারীকে “ওলী” ( ), অর্থাৎ বন্ধু, নিকটবর্তী বা অভিভাবক বলা হয়। ওলীদের পরিচয় প্রদান করে আল্লাহ বলেন:

“জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না। যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন বা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেন।”[২]

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত ঈমান। “তাকওয়া” শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহিমাময় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেই কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়।

এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এই দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলীর বা বেলায়াতের পথের কর্মকে দুইভাগে ভাগ করেছেন : ফরয ও নফল। সকল ফরয পালনের পরে অনবরত বেশি বেশি নফল ইবাদত পালনের মাধমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্যের পথে বেশি বেশি অগ্রসর হতে থাকে।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি:) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ রাহিমাহুমুল্লাহ ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে বলেন:

“সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানী (ততবেশি ওলী)।[৩]

তাহলে ওলী ও বেলায়েতের মানদণ্ড হচ্ছে : ঈমান ও তাকওয়া: সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। এ সকল বিষয়ে যে যতুটুকু অগ্রসর হবেন তিনি ততটুকু আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াত অর্জন করবেন।

(২). সাহাবীগণের পরে কাউকে নিশ্চিতরূপে ওলী বা জান্নাতী বলা যায় না

তবে একটি বিষয় আমাদেরকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, কার ইবাদত আল্লাহ কতটুকু কবুল করেছেন বা কে আল্লাহর কতটুকু ওলী তা একমাত্র তিনিই জানেন। কুরআন কারীমে বা হাদীস শরীফে যাঁদের কবুলিয়ত বা জান্নাতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে তাঁদের বাইরে কাউতে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করে আল্লাহর প্রিয় বা ওলী বলে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি-না।

এমনকি আমরা এটুকুও বলতে পরি-না যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতে যাবেনই। কোনো আমলই জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয়-না।

কোনো কারামত বা অলৌকিকত্বও এবিষয়ে কোনো রকম প্রমাণ পেশ করে-না। কারণ আমরা যাকে কারামত মনে করছি তা শয়তানী অলৌকিকত্ব বা ইস্তিদরাজ কি-না তা কেউ বলতে পারবে না। কুরআন কারীম থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক সময় কারামতের অধিকারী ওলীও গোমরাহ ও বিভ্রান্ত হয়েছেন।[১] আমি এখানে অনেক মানুষের নাম উল্লেখ করতে পারব যাদের অনুসারীগণ তাদের অনেক কারামত দাবি করেন, কিন্তু তাদের প্রতিপক্ষগণ তাদেরকে বিদ'আতী, ওহাবী, কাফির বা মুশরিক বলে দৃঢ়বিশ্বাস করেন।

ইমাম তাহাবী (রাহ) হানাফী মাযহাব ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা বর্ণনা করে বলেন : "মুমিনদের মধ্য থেকে যারা ইহসানের স্তরে পৌঁছেছেন তাঁদের বিষয়ে আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ রহমত করে তাঁদেরকে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাত দান করবেন। কিন্তু তাঁদের বিষয়ে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত বা নিরুদ্বিগ্ন হতে পারি না। তাঁরা জান্নাত লাভ করবেন বলে আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি না।"[২]

কাজেই, আমরা যখন কাউকে ওলী বলি তখন মূলত আমাদের ধারণাটাই বলি, প্রকৃত সংবাদ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

(৩) কোনো নির্দিষ্ট মানুষকে ওলী বলা খেলাফে-সুন্নাত

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানছি যে, কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে যাঁদের ঈমান ও তাকওয়া কবুল হওয়ার ও জান্নাতী হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে নিশ্চিতরূপে ওলী বা জান্নাতী বলে বিশ্বাস করা ইসলামী বিশ্বাস ও আকীদার পরিপন্থী। সাহাবীগণকে আমরা নিশ্চিন্তে ওলী ও জান্নাতী বলতে পারি, কারণ কুরআন কারীমে তাঁদের সকলের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ও পরবর্তী মুবারক দুই যুগে সাধারণত কাউকে ওলী বলা হতো না। নির্দিষ্ট কাউকে "ওলী" উপাধি প্রদান করা সুন্নাতের খেলাফ। উপাধি ও সম্বোধনের বিষয়ে সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত আমরা পরবর্তীতে কিছু আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

(৪) ওলীর তাযীমের উদ্দেশ্য : ইসলামী ও ইসলাম বিরোধী

আলেম, কারী, বয়স্ক, সমাজের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতাদের আনুগত্য, ভালবাসা ও সম্মানের বিভিন্ন নির্দেশ সুন্নাতে রয়েছে। এঁদেরকে ভালবাসা বা সম্মান করা একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। এ সকল নির্দেশের আলোকেই আমরা বলি "ওলী"-র তা'যীম করতে হবে, অর্থাৎ সৎকর্মশীল মুত্তাকীগণকে ভালবাসতে হবে ও সম্মান করতে হবে। এখানে আমাদের জানতে হবে যে, কেন এবং কিভাবে আমরা তাঁদের সম্মান করব বা ভালবাসব।

আলেম, নেককার মানুষ বা "ওলী"-কে সম্মানের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য ২ প্রকার হতে পারে। এক প্রকার উদ্দেশ্য ইসলাম বিরোধী। দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য ইসলামী।

প্রথম প্রকার ইসলাম বিরোধী উদ্দেশ্য : কেউ মনে করতে পারে যে, এই "ওলী" ব্যক্তি আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের মালিক। তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করলে তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককর্ম করি বা না-করি তাঁকে ভক্তি করলে তিনি আমাকে পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে, সুন্নাত অনুসারে বা সুন্নাতের বাইরে, যেভাবে পারি একে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। যদি কেউ এই ধরনের কোনো চিন্তা নিয়ে "ওলী"-কে সম্মান করেন তাহলে তিনি একজন মুশরিক। তিনি ভক্তির নামে একজন মানুষকে আল্লাহর সাথে তাঁর ক্ষমতা ও গুণাবলীতে শরীক বানিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকার ইসলামী উদ্দেশ্য : "ওলী"-র তা'যীমের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের চিন্তা হলো, এই ব্যক্তি আল্লাহর ভালো বান্দা। তিনি আমার মালিকের অনুগত গোলাম। আমার মালিকের গোলামীতে তিনি অগ্রসর বলেই আমি তাঁকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, যেন আমার মালিক মহান প্রভু আল্লাহ খুশি হন। আমি আল্লাহর গোলামীকে ভালবাসি। আর তাঁর গোলামীতে যে ভালো তাকেও ভালবাসি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালবাসি। তাঁর অনুসারীকেও আমি নিঃশর্তে ও নিস্বার্থে ভালবাসি। আমার এই ভক্তি ও ভালবাসা একান্তই আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এই ব্যক্তির কাছে আমার কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই। কোনো ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবে আমি জানি যে, আল্লাহর গোলামী ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে লিপ্ত মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুশি হন, তাই ভালবাসি। এজন্য যে পদ্ধতিতে এ সকল মানুষকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সে পদ্ধতিতে তাঁদের ভালবেসে ও সম্মান করে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হতে চাই।

(৫) "ওলী"-র তা'যীমের পদ্ধতি : সুন্নাতী ও সুন্নাত বিরোধী

নেককার মানুষদের সম্মান করা সাধারণ নির্দেশনা। এখন আমাদের দেখতে হবে এগুলি পালনের "সুন্নাত" কী? অর্থাৎ ওলীর তা'যীম কী-ভাবে করব? ইসলামের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের ন্যায় এই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রেও আমাদের অবশ্যই সুন্নাতের মধ্যে থাকতে হবে। এঁদেরকে ভালবাসা ও ভক্তির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ, এরপর তাঁদের পরবর্তী দুই যুগ: তাবেয়ী ও তাবে- তাবেয়ীগণ। আমরা কখনোই তাঁদের পদ্ধতির বাইরে কোনো কল্যাণের আশা করতে পারি না।

প্রিয় পাঠক, ওলীর তা'যীমের জন্য কি আল্লাহ বা তাঁর রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিষিদ্ধ কাজ করা যাবে কি? এই তা'যীমের যুক্তি দেখিয়ে কিছু মুসলমান তথাকথিত আউলিয়া ও তাঁদের কবরকে সাজদা করা জায়েয করেছেন, এরপর জায়েয থেকে ভালো,

উপকারী ও মুস্তাহাব বানিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হলো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ভালবাসা, ভক্তি করা ও সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ। তাঁদেরকে সাজদা করলে এই নির্দেশ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পালিত হয়। এছাড়া সাজদার মাধ্যমে ভক্তের হৃদয়ে উক্ত ওলীর প্রতি প্রেমের জোয়ার সৃষ্টি হয়। আর এদের মহব্বত যত বেশি করা যাবে তত আল্লাহ খুশী হবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতকারীদের আল্লাহ কেয়ামতের দিন আরশের নিচে স্থান দান করবেন। সাজদার মাধ্যমে এই মহব্বত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। হয়ত একটু বাড়িয়ে বলবেন বুজুর্গদেরকে সম্মানের জন্য সাজদা করা ফিরিশতাদের সুন্নাত ও নবীগণের সুন্নাত, আর সাজদা না করা শয়তানের সুন্নাত। এখন, যার খুশি ফিরিশতা ও নবীগণের সুন্নাত পালন করুক, আর যার খুশি শয়তানের সুন্নাত পালন করুক।

হয়ত আপনি তাঁদেরকে বলবেন যে, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এসব নিষেধাজ্ঞার কী কোনো মূল্য মুসলমানদের কাছে আছে? কবর পাকা করা, চুনকাম করা, উঁচুকরা ইত্যাদি নিষেধ যেমন কেউ কেউ বিভিন্ন মনগড়া অজুহাতে অমান্য করছেন, বরং মান্য করার চেয়ে অমান্য করাকেই বেশি তাকওয়া ও সাওয়াবের মনে করছেন, তেমনি কেউ কেউ সাজদার নিষেধাজ্ঞাও বিভিন্ন অজুহাতে অমান্য করছেন এবং অমান্য করাকেই আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম মনে করছেন!

সাজদাপন্থীরা বলবেন: কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত হিসাবে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সম্মান প্রদর্শনের সাজদা কোথাও নিষেধ করা হয়নি। প্রমাণ কুরআন। কুরআনে ফিরিশতাগণ আদমকে সাজদা করেছেন, ইউসূফের (আ.) পিতামাতা ও ভাইয়েরা তাঁকে সাজদা করেছেন। এ সাজদা ইবাদতের হলে তো শিরক হতো, শিরক সকল শরীয়তেই নিষিদ্ধ। এ সাজদা সম্মানের সাজদা। কুরআনে এর উল্লেখ করে কোনো নিষেধ করা হয়নি। কাজেই, তা জায়েয এবং ফিরিশতা ও নবীগণের সুন্নাত!

এছাড়া অনেক বানোয়াট মিথ্যা গল্প তারা প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করবেন। অনেক বুজুর্গের কর্মের উদাহরণ দিবেন। বিভিন্ন কেতাবের উদ্ধৃতি? তার তো কোনো শেষ নেই। আপনি যে মত-ই পোষণ করেন তার পক্ষে দুই চার জন আলেম বা কেতাব লেখক পেয়ে যাবেন।

সাধারণ মুসলমান অনেক সময় তাদের এ সকল যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কোনো ফাঁক নেই তাঁদের যুক্তিতে। যে কাজের মাধ্যমে এতগুলি ফযীলতের কাজ অর্জিত হয় তা পালন করা-তো অবশ্যই ফযীলতের কাজ। তবে ফাঁক একটিই তা হলো সুন্নাত। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সম্মান করার কথা কি সাহাবীগণ জানতেন না? আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের ফযীলত কি তারা জানতেন না? আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাকে কি তাঁরা সাজদা করতেন? তাঁরা কখনো তা করেননি। তাঁর অর্থ হলো এগুলি সবই শয়তানের যুক্তি মুসলমানকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের পথ থেকে সরিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত করার জন্য।

"ওলী", আলেম বা ধার্মিক মানুষের সম্মান একটি সাধারণ নির্দেশ, যেমন স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার বা তার মুখে হাঁসি ফুটান একটি সাধারণ নির্দেশ। এই নির্দেশ পালন করতে আমাদেরকে 'সুন্নাত' বা শরীয়তের সীমা ও নির্দেশনার মধ্যে থাকতে হবে। স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারের জন্য বা তাকে খুশি করার জন্য আমরা শরীয়তের নির্দেশনার বাইরে কিছু করতে পারি না। যেমন, কেউ যদি জামাতে নামায আদায় বাদ দেন বা সিনেমা দেখতে যান বা দাড়ি কেটে ফেলেন অথবা পিতামাতার অধিকার নষ্ট করেন এবং কারণ হিসাবে বলেন যে, ইসলামে স্ত্রীদেরকে খুশি রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই আমি এগুলি করছি, তাহলে আমরা কেউই তার এই অজুহাত মানতে রাজি হব না। অনুরূপভাবে কারো সম্মান করতে গিয়ে আমরা এমন কিছু করতে পারি-না যা 'সুন্নাতে' নিষেধ করা হয়েছে। সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি, প্রকরণ ও নিয়মে আমাদেরকে সাহাবীগণের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও রীতি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, তাঁরা জীবিত বুজুর্গদের সাহচর্য পছন্দ করেছেন, তাঁদেরকে ভালবেসেছেন, তাঁদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মৃত্যুর পরে তাঁদেরকে দাফন করেছেন। সাধারণত এলাকার গোরস্থানে অন্য সকল মুসলমানদের সাথে তাঁরা তাঁদের দাফন করতেন। সুযোগমতো তাঁদের কবর যিয়ারত করেছেন ও তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনই কোনো বুজুর্গের কবর পাকা করা, গম্বুজ করা, গেলাফ লাগান, শিরনী প্রদান, নযর মানত প্রদান, ওরস করা ইত্যাদি কবর কেন্দ্রিক কোনো অনুষ্ঠানের রীতি চালু করেননি। এ সবই তাঁদের পরের যুগগুলিতে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অন্ধভক্তি, আবেগ, অন্যান্য ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি কারণে সমাজে ছড়াতে থাকে।

কোনো কোনো আলেম বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে এগুলিকে জায়েয বলতে থাকেন। এভাবে এসকল আলেম শিরকের যে পথগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্ধ করে গেলেন তা খুলে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। যখন সাধারণ মানুষ শিরকে লিপ্ত হচ্ছে, এদের নামে মানত, সাজদা করছে তখন তারা তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে তা জায়েয করছেন। হয়ত এভাবে একদিন তাঁরা মূর্তি পূজাও জায়েয করে দেবেন। বলবেন : সেতো ঠিক মূর্তির কাছে চাচ্ছে না, তার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ যদি তার মনের আশা পূরণ করেন তাহলে এই মূর্তির কাছে নযর মানত দেবে। সেতো মূর্তিকে সাজদা করছে-না, শুধুমাত্র ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য তাকে ভক্তি জানাচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নাউযু বিল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে, চুনকাম করতে, কবরে লিখতে ও কবরের উপরে কোনো প্রকার ঘর, ইমারত বা গম্বুজ তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমরা কেউই একটি হাদীসও দেখাতে পারছি-না যে, তিনি কখনো এগুলি করতে অনুমতি দিয়েছেন অথবা নিজে করেছেন। আমরা কেউই বলছি-না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে ২৩ জনের কবর পাকা করেছেন বা গম্বুজ তৈরি করেছেন এবং গেলাফ দিয়েছেন। খেজুরের ডাল পোতার ক্ষেত্রে ও দাঁড়িয়ে পেশাব করার ক্ষেত্রে তো আমরা অন্তত একটি ঘটনা পাই যে, তিনি সাধারণ সুন্নাতের ব্যতিক্রম একদিন এই কাজটি করেছেন। কবর পাকা করার ক্ষেত্রে আমরা তাও পাই না। শত শত ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনাও আমরা পাই না।

আমরা এ কথাও প্রমাণ করতে পারছি-না যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের জুগে তাঁরা ৩০ বৎসরে ৩০ জনের কবর পাকা করেছিলেন এবং

গেলাফ দিয়েছিলেন। আমরা একথাও প্রমাণ করতে পারছি-না যে, কোথাও কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনোভাবে কোনো ওলী, আলেম বা আব্বা-আম্মার কবর পাকা করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দিয়েছেন। তাহলে কেন আমরা তা করব? কেন আমরা তা রীতিতে পরিণত করব? কেন আমরা তাকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বলব?

জায়েয না-জায়েয, হালাল হারাম ইত্যাদি সকল বিতর্কের বাইরে আমরা কি স্বীকার করতে বাধ্য নই যে, কবর পাকা করা, কবরে গম্বুজ তৈরি করা, গেলাফ দেওয়া ইত্যাদি রীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত নয়। তাহলে আমাদের বিভিন্ন ঘোরপ্যাচ, সম্ভাবনা, কারণ, ইত্যাদি খুঁজে এ সকল কাজ করার প্রয়োজন কি?

অনেক বুজুর্গ ও নেককার মানুষ করেছেন বা করা জায়েয বলেছেন। আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। তাঁদের অগণিত নেক আমলের মধ্যে এ সকল ভুলত্রুটি ধর্তব্য নয়। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁদের জন্য দোয়া করি। তবে আমরা নিজের কর্মক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ করতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে আরেকটি কথা আমাদের বুঝতে হবে। অধিকাংশ বুজুর্গের মাজারে কবর পাকা করা হয়েছে তাঁদের মৃত্যুর পরে, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কবর পাকা করার প্রচলন ছাড়িয়ে যাওয়ার পরে গত কয়েক শতাব্দীর অধিকাংশ বুজুর্গ ইন্তেকালের আগে তাঁর কবর পাকা করতে, কবরে গম্বুজ করতে বা গেলাফ দিতে বারংবার নিষেধ করে গিয়েছেন। তাঁদের ইন্তেকালের অনেক দিন পরে তাঁদের কবরে এগুলি করা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠক, আসুন একটু চিন্তা করে দেখুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ২৩ বৎসরের নবুয়তী জীবন, পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দী সাহাবীগণের যুগে মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ইত্যাদি ইসলামের প্রাণকেন্দ্রে কোনো পাকা কবর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কবরের উপর গম্বুজও দেওয়ার রীতিও নেই। সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য পুরোটা চক্কর লাগালে ২/৪টি ব্যতিক্রম ধরা পড়বে কি-না সন্দেহ। এবার আমাদের সমাজের দিকে তাকান : যেদিকে তাকাবেন সুবিশাল মাজার ও গম্বুজ। প্রতি গ্রামেই আল্লাহর অনেক ওলী, মস্তান ও দরবেশ রয়েছেন। তাদের জীবদ্দশায় তাদের তা'যীম না করলেও মৃত্যুর পরে তো করতেই হবে। তাদের প্রত্যেকের কবরের উপর সুবিশাল ইমারত তৈরি হচ্ছে। অনেক ফকীর দরবেশের ইন্তেকালের পরে ভক্তগণ লাশ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করছেন। প্রত্যেকেই নিজ এলাকায়, নিজ আয়ত্বে দাফন করে মাজার শরীফ তৈরি করতে চাচ্ছেন। এজন্য রাতের আঁধারে পঁচাগলা লাশ চুরি করার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। অনেকগুলি বিশাল মাজার ছাড়া কোনো গ্রামই কল্পনা করা যায় না। কয়েক শতাব্দী পরে বোধহয় দেশ মাজারেই ভরে যাবে। দুটি চিত্র কি মিলে গেল?

(৬) "ওলী"-র কবরকে আল্লাহর শাআইর বলে সম্মান করা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হজ্বের মধ্যে হজ্বের বিধানাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক হজ্বের ঘোষণা প্রদান এবং হজ্বের সময় (জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে, মিনায়) জীবজানোয়ার কুরবানি করা, তা ভক্ষণ করা ও বিতরণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর ইহ্‌রাম শেষ করে কা'বা শরীফের তাওয়াফের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন : "আর কেউ আল্লাহর সম্মান-যোগ্য বিধানাবলীর প্রতি তা'যীম প্রদর্শন করলে তার পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম।"[১] পরবর্তী এক আয়াতে বলেছেন : "যদি কেউ আল্লাহর শা'আইর বা নামযুক্ত বস্তুসমূহের তা'যীম করে, তাহলে তা তার হৃদয়ের তাকওয়ার কারণে।"[২]

এখানে স্বভাবতই হজ্বের আহকাম ও হজ্বের শেষে কুরবানির জন্য নির্ধারিত জানোয়ারের কথা বোঝান হচ্ছে। তবে কেউ কেউ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চান যে, ওলীদের কবর পাকা করা, গেলাফ দেওয়া ইত্যাদি উত্তম কাজ। তারা দাবি করেন যে, এ সকল কবর আল্লাহর শা'আইর বা আল্লাহর নামযুক্ত বস্ত, কাজেই এগুলির সম্মান করা তাকওয়ার কারণ।

এখানে অনেক বড় ফাঁক রয়েছে। আল্লাহর নামযুক্ত বা সম্মানযোগ্য বস্তু কী? কী-ভাবেই বা তার তা'যীম করতে হবে? কুরআন ও হাদীসের উল্লেখের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে 'ওলী" বলাই খেলাফে-সুন্নাত। আর কোনো কবরকে আল্লাহর নামাঙ্কিত বস্তু বলাও বানোয়াট মিথ্যা কথা। দুটি বানোয়াট কথার উপরে ভিত্তি করে বানোয়াটভাবে তা'যীম করা হয় কবরগুলিকে। এখন আসল "আল্লাহর নামাঙ্কিত বস্তুর" তা'যীমের পদ্ধতি দেখুন।

মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেছেন : "হজ্বের জন্য কা'বার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের অর্ন্তভুক্ত করে দিয়েছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় এদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর (আল্লাহর নামে এদের জবাই কর)। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে তখন তোমরা তা থেকে আহার কর এবং ভিক্ষুক ও অ-ভিক্ষুক সবাইকে আহার করাও।"[৩]

এখানে আমরা দেখছি যে, এসকল উট আল্লাহর নামযুক্ত বস্তু। তাহলে এদের তা'যীম করা আল্লাহর নির্দেশ । এখন কী-ভাবে আমরা উটগুলির তা'যিম করব? মাথায় বহন করে? এদের পেশাব পায়খান খেয়ে? বিশাল গম্বুজ তৈরি করে সেখানে এদেরকে রেখে? এদেরকে সাজদা করে? কী-ভাবে আমরা আমাদের তাকওয়া প্রমাণিত করব? নিজেদের মনগড়াভাবে না আল্লাহর শেখান ভাবে? আল্লাহ শেখালেন এদেরকে জবাই করে গোশত খাওয়া ও খাওয়ানো। আল্লাহর নির্দেশ মতো কর্ম করলেই এদের তা'যীম হবে। আর যদি কেউ শুধুমাত্র আয়াতের প্রথমাংশ বলে এরপর এসকল উটের পেশাব পান করতে শুরু করেন বা এদেরকে মাথায় তুলে নাচতে থাকেন এবং প্রশ্ন করলে বলেন যে, আমি আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুর তা'যীম করছি, তাহলে সেখানে আপনি কী বলবেন?

অষ্টমত, প্রথম যুগের ইমাম ও ফকীহগণের মতামত

ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর উলামায়ে কেরাম ও ফকীহগণ এ সকল ক্ষেত্রে সর্বদা সুন্নাতের মধ্যে থেকেছেন। উপরে বর্ণিত ব্যতিক্রম ঘটনাগুলি পুঁজি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর আজীবনের সুন্নাত ও তাঁর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার কোনো প্রবণতা তাঁদের মধ্যে ছিল না। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান (১৮৯ হি.) এ সংক্রান্ত হাদীস ও ব্যতিক্রম উল্লেখ করার পরে লিখছেন: "আমাদের মত হলো, কবর খুড়তে যে মাটি বেরিয়েছে তা ছাড়া অন্য মাটি এনে কবর উঁচু করা যাবে না। কবরের মাটি দিয়েই শুধু এতটুকু উঁচু করতে হবে যেন কবর বলে চেনা যায়, কেউ তা পদদলিত না করে। কবরকে চুনকাম করা বা কাদা দিয়ে লেপে দেওয়া মাকরুহ। অনুরূপভাবে কবরের নিকট মসজিদ তৈরি করা বা কোনো পতাকা, চিহ্ন, স্তম্ভ বা স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করাও মাকরুহ। কবরের উপরে কিছু লিখাও মাকরুহ। ইট দিয়ে কবরের উপরে ঘর বানানো বা কবরের মধ্যে ইট দিয়ে পাকা করা সবই মাকরুহ। তবে (কবরের উপরে) পানি ছিটিয়ে দেওয়াকে আমরা না-জায়েয মনে করি না।"[১]

কারো কবর পাকা করলে বা উঁচু করলে তার সম্মান করা হয় একথা তাঁরা কখনোই মনে করেননি। এজন্য এখানে 'ওলী-গাইর ওলী' কোনো প্রকারের শ্রেণিভাগ নেই। কারো কবর পাকা করা যাবে আর কারো যাবে না, এমনটি নয়। এজন্য কোনো রকমের ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল শ্রেণির মুসলমানের কবরকে একই ভাবে কাঁচা ও স্বাভাবিক যে উচ্চতায় কবর হিসাবে চেনা যায় সেভাবে রাখতে বলেছেন। বাইরে থেকে ইট এনে কবর উঁচু করা বা পাকা করা তো দূরের কথা বাইরে থেকে মাটি এনেও কবর উঁচু করা তাঁরা মাকরুহ জেনেছেন। অনুরূপভাবে, কবরের উপর কিছু লেখা, স্মৃতিচিহ্ন রাখা ইত্যাদি সবই তাঁরা মাকরুহ বলেছেন।

প্রিয় পাঠক, 'মাকরুহ' শব্দ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। কেউ হয়ত ভাববেন তাঁরা তো মাকরুহ বলেছেন হারাম বলেননি, এতে বোঝা যায় যে, কেউ তা করলে বেশি গোনাহ হবে না, কম গোনাহ হবে। কাজেই, তা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কম গোনাহ হলেই বা আমরা করব কেন? টাকা পয়সা দিয়ে, কষ্ট পরিশ্রম করে কেন আমরা অল্প গোনাহের কাজ করতে যাব।

এছাড়া আমাদেরকে বুঝতে হবে, প্রথম যুগের ইমামগণ সরাসরি কুরআনে যাকে হারাম বলা হয়নি তাকে হারাম বলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের জিহ্বার বর্ণনা মতো এটি হালাল, এটি হারাম বলবে না, এভাবে আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দেবে না। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয় তারা কখনো সফলতা লাভ করবে না।"[২] এ জন্য তাঁরা কোনো কিছুকে 'হালাল' অথবা 'হারাম' বলতে ভয় পেতেন। তাঁরা কুরআনে যাকে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে হারাম বলা হয়েছে তাকেই শুধু হারাম বলতেন। কুরআনের বর্ণনা বা হাদীসের নির্দেশ থেকে যে কাজকে তাঁরা হারাম বলে জানতে পারতেন তাকে তাঁরা 'মাকরুহ' বলতেন। এজন্য পরবর্তী যুগে 'মাকরুহ তাহরীমী' শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। অর্থাৎ, হারাম পর্যায়ের মাকরুহ।

ইমাম আবু ইউসূফ (১৮২ হি.) লিখেছেন: "আমি আমার উস্তাদগণকে দেখেছি কুরআন কারীমে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ছাড়াই যাকে স্পষ্টভাবে হারাম বা হালাল বলা হয়েছে তাকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে তাঁরা হালাল বা হারাম বলে ফাতওয়া দিতে অপছন্দ করতেন।"[৩]

প্রথম যুগের সব ইমামই কবর বাঁধানোর করার বিরোধিতা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (২০৪ হি.) লিখেছেন: "আমি পছন্দ করি যে, কবর জমিনের উপরে এক বিঘত বা তার কাছাকাছি উঁচু করা হবে। কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে কোনো ঘর তৈরি করা বা কবর চুনকাম করা আমি পছন্দ করি না। কারণ এগুলি সৌন্দর্য (ডেকরেশন), অহংকার বা বড়লোকি প্রকাশের মতো। মৃত্যু এ সকল সৌন্দর্য বা অহংকারের স্থান নয়।... এছাড়া আমি কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ, কবরের দিকে মুখ করে বা কবর সামনে রেখে নামায আদায় করা ইত্যাদি মাকরুহ মনে করি। কারণ হাদীস শরীফে ও সাহাবীগণের শিক্ষায় এসকল কাজ অপছন্দ করা হয়েছে।[৪]

পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এভাবেই আমাদের ফকীহগণ কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়া সকল প্রকার কবর পাকা করতে বা কবরের পাশে কোনো কিছু লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন। কোনো অজুহাতেই তাঁরা এ সকল নিষিদ্ধ কাজ করার অনুমতি দেননি। পঞ্চম হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী ফকীহ আল্লামা সারাখসী (৪৮৩ হি.) এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করে লিখেছেন: কবরকে ঢিবির মতো উঁচু করতে হবে। চারকোণা করা চলবে না। কোনো ঘর বানাতে গেলে চারকোণ করতে হয়, ঘরের মজবুতীর জন্য। কবরের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, সকল প্রকার মজবুতি বা ঘর তৈরির পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে হবে। এজন্যই (কবরের জন্য কোনোরূপ মজবুতী বা সৌন্দর্যের প্রয়োজনীতা নেই বলেই) কবরে চুনকাম করা যাবে না। কারণ চুনকাম করা হয় সৌন্দর্যের জন্য অথবা মজবুতীর জন্য।[৫]

৭ম হিজরী শতকের অন্যতম হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী (৫৮৭ হি.) বিভিন্ন হাদীস ও ইমামদের মতামত উল্লেখপূর্বক লিখেছেন: কবরের উপর চুন দেওয়া, কাদা দিয়ে লেপে দেওয়া, কবরের উপর কোনো ঘর তৈরি করা, কিছু লিখা সবই মাকরুহ। কারণ হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া এগুলো তো সৌন্দর্য ও সাজানোর বিষয়, মাইয়েতের জন্য এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। উপরন্তু এতে কোনোরূপ ফায়দা ছাড়া টাকাপয়সা অপচয় করা হয়। এসকল কারণে এই কাজ মাকরুহ। কবর খুড়তে যে মাটি বের হয়েছে এর অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করাও মাকরুহ; কারণ অতিরিক্ত মাটি এনে কবরে দেওয়াও কবরের উপরে ঘর বানানো বা কবর পাকা করারই নামান্তর।[৬]

অনুরূপভাবে, আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (৬৮১ হি.) কবরের উপরে কোনো রকম ইমারত, ঘর বা কিছু তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ লিখেছেন, শুধুমাত্র কবরের মাটি সামান্য ঢিবি করে উঁচু করতে হবে বলে লিখেছেন, যেন কবর চিনতে পারা যায়।[১]

নবমত, সমাজের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে নতি স্বীকারের প্রবণতা

(ক). কবর পাকা ইত্যাদি জায়েয করার প্রবণতা

আমরা আগেই বলেছি, তাবেয়ীদের যুগ থেকেই বিভিন্ন অনৈসলামিক রীতিনীতির প্রভাব ও আবেগের ফলে বা অজ্ঞানতার কারণে বিশাল মুসলিম সমাজে কিছু কিছু ব্যতিক্রম কাজ প্রবেশ ও প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রথম যুগের আলেমগণ এগুলির বিরোধিতা করেছেন এবং কোনো অজুহাতেই তা জায়েয করেননি, যা আমরা দেখতে পেলাম। কয়েক শতাব্দী পরে যখন সমাজে কবর পাকা করার রীতি প্রসার লাভ করে গেল, তখন কেউ কেউ বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে এগুলি জায়েয বলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এধরনের চেষ্টার নমুনা পাই আমরা দশম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম, হানাফী ফকীহ আল্লাম ইবনু নুজাইম, যাইনুদ্দীন ইবনু ইবরাহীম (৯৭০ হি.)-এর আলোচনায়। তিনি হাদীস ও ইমামগণের মতামতের ভিত্তিতে কবরের উপর কোনোরকম ঘর, স্তম্ভ ইত্যাদি তৈরি করা, কবরের উপরে চুন লেপে দেওয়া, কোনো কিছু লিখে রাখা ইত্যাদি সকল কর্মের নিষিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ করার পরে লিখেছেন যে, কোনো কোনো আলেম বিশেষ প্রয়োজনে কবরের চিহ্ন সংরক্ষণের জন্য, যাতে কবর অপমানিত না হয় এজন্য লিখতে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আলোচনার ফাঁকে একথাও বলেছেন যে, হাদীসে যেহেতু কোনো কিছু লিখে রাখা নিষেধ করা হয়েছে, এজন্য হাদীসের উপরেই নির্ভর করা উচিত।[২]

পরবর্তী যুগে কোনো কোনো আলেম এভাবে সমাজের প্রচলনের কাছে নতি স্বীকার করতে থাকেন। অন্য অনেকে সুন্নাতকেই ঊর্ধ্বে রেখে সমাজের প্রচলনের বিরোধিতা করে সমাজকে যথসম্ভব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের মতো করার চেষ্ট অব্যাহত রাখেন।

(খ). নগ্নতাকে জায়েয বলার চেষ্টা : ইবনু বতুতার বর্ণনা

সমাজের প্রচলনের কাছে নতি স্বীকারের প্রবণতা সব সমাজেই আছে। ইবনু বাতুতা (৭৭৯ হি.) লিখেছেন যে, তিনি আফ্রিকার মালি দেশ সফর কালে (৭৫২-৭৫৪হি./১৩৫১-১৩৫৩ খ্রি.) দেখেন যে, সে দেশের ধার্মিক মুসলিম নারীগণও পর্দা করতেন না। সে দেশের অত্যন্ত দ্বীনদার ধার্মিক আলেম, কাজী ও বুজুর্গগণের স্ত্রী ও কন্যাগণও একেবারে বেপর্দা হয়ে বরং অর্ধনগ্ন হয়ে চলাফেরা করতেন, বেগানা পুরুষদের সাথে নির্জনে গল্পগুজব করতেন। এতে আশ্চার্য হয়ে তিনি সে দেশের অন্যতম প্রধান আলেম ও কাজীকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : আরব দেশের মেয়েরা অসৎ, তাঁদের মনে কু-প্রবৃত্তি আছে, তাই তাদের জন্য পর্দার প্রয়োজন, আমাদের মেয়েদের জন্য পর্দার প্রয়োজন নেই।[৩]

এভাবে এই প্রাজ্ঞ ধার্মিক আলেম ও কাজী নিজের দেশের রীতি ও প্রচলনকে সঠিক প্রমাণিত করার জন্য মনগড়া কারণ তৈরি করে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাকে জায়েয করে দিলেন।

(গ). গান-বাজন ও সৌন্দর্যের জন্য মূর্তি স্থাপন

আমি (লেখক) ইন্দোনেশিয়ায় দেখেছি যে, গানবাজনা, ধূমপান ও মূর্তির খুব প্রচলন। এগুলি যে শরীয়ত নিষিদ্ধ সে বিষয়ে কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করেন না। মুসলমানগণও ঘরে, বাগানে, রাস্তায় বা পার্কে বিভিন্ন ধরনের বড় বড় পাথরের, লোহার, টিনের বা ইটের তৈরি মানুষ ও জীবজানোয়ারের মূর্তি সৌন্দর্যের জন্য রাখেন। আলেমগণ এখন এগুলোর তেমন প্রতিবাদ করেন না। বরং অনেকে বিভিন্ন যুক্তি বা অজুহাত দিয়ে এগুলিকে জায়েয বলতে চান। আমার সফরকালে আমি মূর্তির বিষয়ে কথাবার্তা বললে আমাদের ইন্দোনেশীয় সঙ্গীদের অনেকেই আশ্চার্য হলেন। অথচ আমাদের মালয়েশীয় সফর সঙ্গী বললেন : আমাদের দেশে (মালয়েশিয়ায়) কেউ এরূপ মূর্তি তৈরি করলে আলেমগণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবেন।

(ঘ). জাতিভেদ ও বিধবা বিবাহ

সমাজের রীতিনীতি ও প্রচলনের কাছে নতি স্বীকার করে সুন্নাত বর্জনের অসংখ্য নজির রয়েছে। ইসলামে মানুষের মধ্যে জাতভেদ বা শ্রেণিভেদ নেই। সকল মানুষ আক্ষরিক অর্থেই সমান। ইসলামের সুন্নাত হলো মানুষের সম্মানের ক্ষেত্রে কোনো বাছবিচার না করা। এজন্য আরব দেশে সকল শ্রেণির মুসলমান একসাথে পানাহার করেন, একই গ্লাসে পানি পান করেন, এক প্লেটে সবাই খাচ্ছেন। কোনো রকম বাছবিচার নেই। ঝুটো বলে খাব না, এ কথাই তাঁরা জানেন না। অথচ আমাদের দেশে মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক বাছবিচার এবং তা ধর্ম হিসাবেই পালন করা হয়। এসকল মানসিকতা দেশের পূর্ববতী ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে আমাদের মধে প্রবেশ করেছে, অথবা রয়ে গিয়েছে। এ সকল পেশাভিত্তিক জাতিভেদ, ঝুটাবিচার ইত্যাদি একদিকে হারাম, কারণ শরীয়তে তা নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে তাতে অতিরিক্ত বিদ'আতের গোনাহ হচ্ছে, কারণ এই হারামকে বর্তমানে আমরা দ্বীনের অংশ ও ইসলামী বিধিবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি।

এখনো আমাদের মুসলিম সমাজে নিকেরি, জোলা, তাঁতি, বেদে ইত্যাদি পেশা ভিত্তিক বা বংশভিত্তিক বাছবিচার বিরাজমান। একটি বিশেষ উদাহরণ হলো বেদে সম্প্রদায়। এরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে সাধারণ মুসলমান এবং আলেম, উলামা, পীর দরবেশ কেউই এদের সাথে মিশেন না বা এদের উন্নত মানবিক ও ধর্মীয় জীবনের জন্য চেষ্টা করেন না। জানি না কবে এই ঘৃণিত অনৈসলামিক চিন্তা চেতনা আমাদের মধ্য থেকে বিদায় নেবে!

কুরআন করীমে বিধবা বিবাহের নির্দেশনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম বিধবা বিবাহ করেছেন। যেকোনো

বিধবা ইচ্ছা করলে নতুন বিবাহ করবেন, এতে সামন্যতমও কোনো নিন্দা বা অসম্মানের কারণ হয় না। বরং তাকে উত্তম বলে মনে করা হয়। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ বিগত শতাব্দীগুলিতে এবং এখনো বিধবা বিবাহকে নিন্দনীয় মনে করেন। ইসলামী শারাফতের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন। অর্থাৎ, জায়েয ও মুস্তাহাবকে মাকরুহ মনে করে বিদ'আতে পতিত হন।

অপরদিকে নাইজেরিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে বিধবাদের বাধ্যতামূলক বিবাহের নিয়ম আছে। কোনো মহিলা বিধবা হলে তার ইদ্দতের পরে তাঁর মৃত স্বামীর কোনো ভাই বা আত্মীয় তাঁর ঘরে ঢুকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তাকে তা মানতেই হবে। প্রাক-ইসলামী যুগের এই রীতি এখনো মুসলমানদের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন অজুহাতে তারা একে ইসলামের অংশ বানিয়ে নিয়েছেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত সাধারণ আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে অনেক আলেম এগুলির সমর্থন করছেন।

দশমত, মদপানকেও বিদ'আতে হাসানা মনে করা হয়েছে

এভাবে যদি আমরা সুন্নাত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সার্বিক জীবন পদ্ধতি, তাঁর কর্ম ও বর্জনকে বাদ দিয়ে শুধু কুরআন বা হাদীসের সাধারণ বাক্যকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করি তাহলে মদপান, জুয়া ইত্যাদিও সহজেই হালাল করে নিতে পারব। শুধু হালালই নয় আল্লাহর পথে পাথেয় হিসাবে প্রমাণ করতে পারব! অর্থাৎ বিদ'আতে হাসান হিসাবে প্রমাণিত করতে পারব। আল্লাহ কুরআন কারীমে মদ, জুয়া ইত্যাদি হারামের কারণ হিসাবে বলেছেন যে, এগুলির মাধ্যমে শয়তান মানুষদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর যিক্র ও নামায থেকে বিরত রাখে। এ থেকে কেউ দাবি করবে যে, যদি উল্লেখিত কারণগুলি না-থাকে তাহলে আর মদপানে দোষ নেই! মানব কল্যাণে ক্ষতিহীন মদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি জায়েয বা বিদ'আতে হাসানা!

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলছেন : "যদি মুমিনগণ ঈমান ও সৎকর্মশীল হন, ইহসান ও তাকওয়া থাকে তাহলে তারা যা পান করেছে তাতে তাদের অপরাধ হবে না।" এ থেকে মদ্যপ দাবি করতে পারে যে, যিনি আল্লাহর পথের পথিক, শুধুমাত্র আলস্য দূর করে রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায়, গবেষণা ও ধ্যান করার উদ্দেশ্যে মদপান করেন তার কাজ নিন্দনীয় নয়। যদি কেউ বলেন যে, সুন্নাত থেকে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কঠোরভাবে মদপান বর্জন করেছেন তাহলে মদ্যপ বলবেন : তাঁরা সাবধানতামূলকভাবে বর্জন করেছেন, অথবা তাঁদের প্রয়োজন ছিল না, অথবা... অথবা, বর্তমান যুগে তা বিদ'আতে হাসানা।

উমর (রা.)-এর সময়ে সিরিয়ার একদল মুসলমান উপরের আয়াতের দলিল দিয়ে মদপানকে জায়েয বলে মদপান করতে থাকেন। তিনি সংবাদ পেয়ে সিরিয়ার প্রসাশককে সমাজে এদের বিষ ছড়িয়ে পড়ার আগেই দ্রুত এদেরকে আটক করে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি কুরআরের মনগড়া অপব্যাখ্যা দানের কারণে তাদেরকে মুরতাদ হিসাবে তাওবা না করলে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোষণ দেন। তারা তাওবা করলে তিনি তাদেরকে মদপানের শাস্তি হিসাবে বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেন।

এ ছিল নিষিদ্ধকে জায়েয করার ঘটনা। দ্বিতীয় পর্যায় হলো উত্তম বা আল্লাহ পথে চলার জন্য উপকারী মনে করা বা বিদ'আতে হাসানা বলে মনে করা। মদপানকে কোনো কোনো মুসলমান দার্শনিক ও আলেম এই পর্যায়ে নিয়েছেন। তারা দাবি করেছেন যে, মদপান সুনির্দিষ্ট কারণের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত কারণ না থাকলে তা জায়েয হবে। বিশেষত জ্ঞান চর্চা, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি ইবাদতের প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানকারী হিসাবে মদপান করলে তা উত্তম হবে। কারণ এর উদ্দেশ্য উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ইবাদতের ক্ষেত্রে উদ্দীপনার জন্য এগুলির প্রয়োজন ছিল না, এখন প্রয়োজন। কাজেই, বিদ'আতে হাসানা হিসাবে গণ্য করতে হবে।[১]

(১১) কবরে বাতি প্রদান

কবর বাঁধানো, মদপান ইত্যাদির মতো নিষিদ্ধ যে সকল কর্ম মুসলিম সমাজে প্রথমে "জায়েয" ও তারপর উত্তম ও সুন্নাত বানানো হয়েছে সেগুলির একটি হলো কবরে বাতি বা আলো প্রদান। কবরে বাতি দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন:

ﷺ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল মহিলা কবর যিয়ারত করে বেড়ান তাদেরকে লানত করেছেন। আর যে সকল মানুষেরা কবরের উপরে মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং কবরের উপরে বাতি জ্বালায় তাদেরকেও তিনি লানত করেছেন।"[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার পরেও অনেক আলেম বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তা জায়েয করেছেন। কেউ বলেছেন : অপচয় হলে তা নিষেধ হবে। কেউ বলেছেন : পথ দেখানর নিয়্যাতে হলে জায়েয হবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ কর্ম জীবনে করেননি, উপরন্তু করতে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন, সাধারণ নিষেধাজ্ঞা নয়, লা'নত করেছেন, কোথাও অন্য কোনো হাদীসে কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণের বা কবরের উপরে বাতি দেওয়ার বা আলো জ্বালানোর অনুমতি প্রদান করেননি, নিষেধের কোনো সীমারেখা বা কারণ নির্ধারণ করেননি, অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় কোনো কারণ নির্ধারণ ছাড়া তা হারাম ও অভিশাপের কারণ।

এত কিছুর পরেও যেহেতু সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে তাই আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তা জায়েয করতে চেষ্টা করছি। এরপর তাকে আল্লাহর নৈকট্য ও বরকত লাভের মাধ্যম মনে করছি। যারা মদপান জায়েয করেছেন তাদের যুক্তি এক্ষেত্রে অধিক জোরালো, কারণ তারা মদপান হারাম হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ কুরআনের আয়াত থেকেই উদ্ধৃতি করছেন। তারা শুধু অতিরিক্ত মনগড়া দাবি করছেন যে, এসকল কারণ না থাকলে তা হালাল এবং ভলো নিয়্যাতে হলে তা বিদ'আতে হাসানা। আর কবর পাকা করা, কবরে বাতি দেওয়া ইত্যাদি যারা জায়েয করছেন তারা প্রথমত, মনগড়াভাবে কোনো কোনো আলেমের কথা থেকে এসকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিষেধাজ্ঞার কারণ

নির্ধারণ করছেন। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মনগড়াভাবে দাবি করছেন যে, উক্ত কারণ না-থাকলে বা অন্য কোনো ভালো উদ্দেশ্য থাকলে তা জায়েয বা উত্তম!

প্রিয় পাঠক, এভাবে সকল পাপকে হালাল করা যায়। ইসলামে শূকরের গোশত, প্রবাহিত রক্ত, ব্যভিচার, সুদ ইত্যাদি হারাম করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে কোনো কোনো আলেম এসকল বিষয় হারাম হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর বিধানের হিকমত ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করা। এখন যদি আমরা তাঁদের কথার উপর নির্ভর করে বলি যে, তাঁরা যেসকল কারণ উল্লেখ করেছেন সেসকল কারণ না থাকলে উপরিউক্ত হারাম বিষয়গুলি হালাল হবে, তাহলে কি আমরা মুসলমান থাকতে পারব?

পঞ্চম পদ্ধতি, ইবাদত ও উপকরণের পার্থক্য নষ্ট করা

সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে যাওয়ার আরেকটি কারণ হলো ইবাদত ও উপকরণের পার্থক্য নষ্ট করে উপকরণকে ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াবের কারণ মনে করা। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, জাগতিক বিষয়াদি ও ইবাদতের জাগতিক উপকরণের মধ্যে উদ্ভাবন বা পরিবর্তন খেলাফে-সুন্নাত হলেও তা জায়েয হবে, কারণ সেখানে এই নির্দিষ্ট উদ্ভাবনের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য বা সাওয়াবের উদ্দেশ্য থাকে না। জাগতিক প্রয়োজনেই তা হয়ে থাকে। তবে এ সকল ক্ষেত্রে সুন্নাতের মধ্যে অবস্থান করা নিঃসন্দেহে উত্তম।

উপকরণের বিবর্তন ও উদ্ভাবন

আমরা আগেই বলেছি যে, ইবাদত ও উপকরণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দ্বীনে কোনো নতুন ইবাদত বন্দেগি তৈরি, উদ্ভাবন বা প্রচলন করার কোনো অধিকার কারো নেই। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য, অন্যকথায় – সাওয়াব ও গোনাহের সকল বিষয় তিনি নিজে আচরণ করে ও মুখে নির্দেশনা দিয়ে উম্মতকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভে ও দ্বীন পালনে সর্বোচ্চ আদর্শ তিনি। তাঁর পরেই তাঁর সাহাবীগণ। তাঁর পরে তাঁর দ্বীনে আর কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা ব্যতিক্রম করার কোনো রকম সুযোগ নেই।

তবে তাঁর আচরিত ও নির্দেশিত 'সুন্নাত' ইবাদত বন্দেগি পালনের ক্ষেত্রে জাগতিক উপকরণ ও মাধ্যমের মধ্যে বিবর্তন আসতে পারে। এমনকি নতুন উপকরণটি ব্যক্তি বা সমাজের জন্য ওয়াজিব বা জরুরিও হতে পারে। আমরা ইতঃপূর্বে উপকরণের ওয়াজিব হওয়া ও ইবাদতের ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছি। এখানে আমরা উপকরণ উদ্ভাবন ও ব্যবহারের শর্তাবলী ও কিভাবে উপকরণ বিদ'আতে পরিণত হয় তা আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি।

(১). উপকরণ উদ্ভাবন বা ব্যবহারে সতর্কতা

উপকরণটি দ্বীনের অংশ নয়, ইবাদতও নয়। ইবাদতের সাহায্যের উদ্দেশ্যে তা অবলম্বন করলে তাতে সাওয়াব হবে। তা সত্ত্বেও উপকরণ বা মাধ্যমের প্রচলনেও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যেন, উপকরণ বা মাধ্যম ইবাদতের অংশ হিসাবে বা মূল ইবাতের পদ্ধতির মধ্যে গণ্য না-হয়। একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা তা বুঝার চেষ্টা করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অবিচল চিত্তে নামায আদায় করতেন। আমরা সেভাবে 'পরিপূর্ণ সুন্নাত' হালতে তা আদায় করতে পারি না। হৃদয়ের এই অবস্থা আনয়নের জন্য আমরা নামাযের বাইরে শরীয়তসঙ্গত বিভিন্ন উপকরণের সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু যদি কোনো এলাকার মানুষেরা যদি বলেন যে, মৃত্যুর কথা স্মরণ করার জন্য আমরা সবাই নিয়মিত কাফনের কাপড় পরিধান করে নামায পড়ব, আমরা সবাই গলায় লোহার বেড়ি লাগিয়ে নামায আদায় করব যেন জাহান্নামের কথা মনে থাকে, তাহলে আমরা তা সমর্থন করতে পারব না। কারণ তাতে এক পর্যায়ে এই পদ্ধতি নামাযের অংশ হিসাবে পরিণত হবে। মনে হবে এই পদ্ধতি ছাড়া নামায বুঝি পূর্ণ হলো না। এভাবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অপছন্দ করার পর্যায়ে ও বিদ'আতের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

কেউ হয়ত বলবেন যে, কাফনের কাপড়ে নামায পড়া তো না-জায়েয নয়, অথবা নামাযের সময় গলায় বেড়ি রাখা তো না-জায়েয নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, কোনোকিছু জায়েয হওয়া এবং কোনোকিছুকে ইবাদতের রীতিতে পরিণত করার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি বিশেষ কোনো সময়ে কাফনের কাপড় পরে নামায পড়েন তাহলে আমরা বলতে পারি যে, তিনি না-জায়েয কোনো কাজ করেননি। কিন্তু কোনো দেশে যদি কাফনের কাপড় পরিধান করে নামায আদায় রীতিতে তৈরি করা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই বলব যে, তারা রাসূলুল্লহ ﷺ -এর রীতি পরিত্যাগ করেছে ও তাকে অপছন্দ করেছে।

(২). উপকরণ উদ্ভাবনের শর্তাবলী

(ক). মাসনূন ইবাদত মাসনূনভাবে আদায়ের জন্যই উপকরণ উদ্ভাবন

যে কর্মের জন্য নতুন উপকরণ উদ্ভাবন করা হচ্ছে সেই ইবাদতটি মূলত মাসনূন (সুন্নাত সম্মত) হতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন-হাদীসের ইল্ম অর্জন, রাষ্ট্র পরিচালনা, আল্লাহর পথে আহ্বান করা ইত্যাদি শরীয়ত বা সুন্নাত-সম্মত ইবাদত। যদি কোনো কারণে, কোনো সমাজে এসকল ইবাদত পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগের উপকরণ বা মাধ্যমগুলির পাশাপাশি শরীয়ত সম্মত কোনো উপকরণ উদ্ভাবন প্রয়োজন হয় তাহলে তা করা যাবে। অথবা যদি সমাজে এমন কোনো উপকরণ পাওয়া যায় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ছিল না, তাহলে শরীয়তের মানদণ্ডের মধ্যে তাকে ব্যবহার করা যাবে।

যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে মসজিদে ও বিভিন্ন মাদ্রাসায় অর্থাৎ বিভিন্ন আবাসিক বাড়িতে ইল্ম শেখানর ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে তালেবে ইল্মের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইল্মের উপকরণের ব্যাপকতা ইত্যাদি কারণে শুধুমাত্র ইল্ম শেখানোর জন্য পৃথক বাড়ি বা মাদ্রাসা তৈরি করা হয়, সহজে বিভিন্ন ইল্ম শিক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাদি লেখা হয়।

মসজিদ তৈরি, সাধারণ জনগণের অথবা বিশেষ কোনো শ্রেণির মানুষের সাহায্যের জন্য ঘরবাড়ি, আবাসস্থল তৈরি করা

সুন্নাত-সম্মত ইবাদত। এসকল ইবদাত পালনের জন্য আমরা পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত নতুন নতুন উপকরণ শরীয়ত সম্মত হলে ব্যবহার করতে পারি। এ সকল উপকরণের মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই, এগুলি দ্বীনের অংশ নয়। তবে মূল ইবাদত পালনে যতটুকু সাহায্য করবে ততটুকু সাহায্যের সাওয়াব হবে। ঐ পরিমাণ সাহায্য অন্য উপকরণের মাধ্যমে হলেও তাতেও একই সাওয়াব হবে। উপকরণের কোনো বিশেষত্ব নেই।

আর যদি মূল ইবাদতটিই সুন্নত-সম্মত না হয় তাহলে সেখানে উপকরণের বিবর্তনের কোনো অবকাশ নেই। যেমন, কবর পাকা করা, কবরের উপরে গম্বুজ তৈরি করা, কবরে গেলাফ চড়ান, কবরে বাতি দেওয়া ইত্যাদির রীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না, বা কোনো হাদীসে কোনোভাবে এসকল কাজের কোনো ফযীলতের কথা বলা হয়নি, বরং কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই, এ সকল ক্ষেত্রে উপকরণের বিবর্তনের কোনো প্রশ্ন আসে না। যদি এমন হতো যে, তিনি তাঁর সময়ে কবরগুলির উপর মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে গম্বুজ তৈরি করতেন অথবা মাটির প্রদীপ জ্বালাতেন, আর আমরা উন্নত উপকরণ ব্যবহার করছি, তাহলে আমরা তাকে উপকরণের উত্তরণ বলে মনে করতাম। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

(খ). উপকরণটি সুন্নাত অর্থাৎ শরীয়ত অনুমোদিত হতে হবে

যদি সুন্নাতে কোনো উপকরণের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে আমরা যত প্রয়োজনই হোক সে উপকরণ ব্যবহার করতে পারি না। যেমন, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই, কোনো সুন্নাত-সম্মত ইবাদত, যেমনঃ তাহাজ্জুদের, যিক্রের বা জনসেবার উদ্দীপনার উপকরণ হিসাবে আমরা মদ, গাজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করতে পারি না। অনুরূপভাবে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, ধর্ষণ, রক্তপাত, আঘাত, বিনা বিচারে হত্যা ইত্যাদি শরীয়তে নিষিদ্ধ। কাজেই দান, দরিদ্রের উপকার, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ, ইসলাম বিরোধী বা জালিমের শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সুন্নাত-সম্মত ইবাদতের মাধ্যম হিসাবে আমরা এগুলি ব্যবহার করতে পারি না।

একই ভাবে মূর্তি, প্রতিকৃতি, ছবি, কবর পাকা করা ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ। এখন কোনো সুন্নাত-সম্মত ইবাদতের জন্য আমরা এ সকল উপকরণ ব্যবহার করতে পারি না। আমরা কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন হাদীসের ইল্‌ম অর্জন, আল্লাহর পথে দাওয়াত, আল্লাহর ওলী, উলামায়ে কেরাম, জাতীয় নেতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভক্তি ও ভালবাস প্রদর্শনের জন্য এধরনের কোনো উপকরণ কখনোই ব্যবহার করতে পারি না। কেউ ব্যবহার করলে তা অবশ্যই হারাম ও শরীয়ত বিরোধী বলে গণ্য হবে। আর এই হারামকে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বা সওয়াবের কারণ মনে করলে অতিরিক্ত বিদ'আতের গোনাহ হবে। এছাড়া এক্ষেত্রে ঈমান নষ্ট হতে পারে।

(গ). উপকরণটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক বর্জিত হবে না

আমরা দেখেছি যে, বর্জন দুই প্রকার : প্রথমত, ইচ্ছাকৃত, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উপকরণ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। দ্বিতীয়ত, অনিচ্ছাকৃত, অর্থাৎ উপকরণটির তাঁর যুগে ছিলই-না তাই তিনি ব্যবহার করেননি। প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর বর্জিত উপকরণ আর আমরা ব্যবহার করতে পরি না। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপকরণটির ব্যবহার সুন্নাতের শিক্ষার আলোকে জায়েয অথবা না-জায়েয হবে।

যেমন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে স্বরচিহ্ন, আরবি ভাষা শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এর প্রয়োজনীতা দেখা দেয়নি। এজন্য আমরা বলতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বরচিহ্ন ব্যাবহার বর্জন করেছেন। বরং আমরা প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারি। যদি দেখা যায় যে তাঁর যুগে এই প্রয়োজনীয়তা বর্তমান ছিল এবং এই উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব ছিল তা সত্ত্বেও তিনি তা ব্যবহার করেননি, তাহলে তাঁর বর্জনই নিষেধ হিসাবে গণ্য হবে।

আমরা আগেই দেখেছি যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি কোনো কাজ বা পদ্ধতি বর্জন করলেই তা নিষেধ বলে গণ্য করা হবে। কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবরের উপর লিখা, গম্বুজ করা, গেলাফ লাগান ইত্যাদি এই পর্যায়ের। মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ মর্যাদার ওলী ও বুজুর্গ তাঁর প্রিয়তম সাহাবীদের, শহীদদের সম্মান করার প্রয়োজনীয়তা তাঁর ছিল এবং এসকল উপকরণও সে যুগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করেননি। তাঁর বর্জনই নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু তিনি বর্জন ছাড়াও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

অনুরূপভাবে ভক্তি ও মহব্বতের ক্ষেত্রে জমিনবুসি, কদমমুছি ইত্যাদি উপকরণও এই পর্যায়ের। নামাযে মনোযোগ অর্জন একটি ইবাদত। এর প্রয়োজনীয়তা তাঁর যুগে ছিল, কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা অর্জনে চক্ষু বন্ধ করে রাখার মাধ্যম তিনি প্রচলন করেননি, যদিও তা করা তাঁর জন্য সম্ভব ছিল। তাঁর বর্জনই এই উপকরণ প্রচলন নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। হজ্বের জন্য উট ইত্যাদি যানবাহন থাকলে হেঁটে যাওয়া তিনি বর্জন করেছেন। কাজেই যানবাহন থাকা সত্ত্বেও হেঁটে যাওয়া বর্জিত উপকরণ ও নিষিদ্ধ।

(ঘ). একান্ত প্রয়োজনেই উপকরণের উদ্ভাবন করতে হবে: জুম'আর খুত্‌বা

শুধুমাত্র একান্ত প্রয়োজন ও বিশেষ জরুরতের জন্যই এই উপকরণগত পরিবর্তন করা যেতে পারে। মুসলিম উম্মাহর মনের সার্বক্ষণিক আকুতি, সকল বিষয়ে রাসূলুল্লহ ﷺ -এর অবিকল অনুকরণ। শুধুমাত্র বাধ্য হয়েই তাঁরা কোনো উপকরণের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়, তা সত্ত্বেও তাদের মন ব্যাকুল থাকে, যদি উপকরণটিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের মতোই হতো!

উদাহরণ হিসাবে আমরা জুম'আর নামাযের খুত্‌বার কথা বলতে পারি। জুম'আর নামাযের অন্যমত বিষয় খুত্‌বা। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে মু'মীনগণকে জুমআর আযানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত 'যিক্‌রের' জন্য মসজিদে গমনের নির্দেশ দান করেছেন।[1] এখানে 'যিক্‌র' অর্থ খুত্‌বা। যিক্‌র শব্দের অর্থ স্মরণ করা বা করানো। আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী, বিধিবিধান, শাস্তি-পুরস্কার

ইত্যাদি যেকোন বিষয় স্মরণ করা বা করানই কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'যিকর'।[১] হাদীস শরীফে বারংবার খুতবাকে 'ওয়াজ' বা 'মাওয়িযা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২]

হাদীস শরীফে জুম'আর দিনে গোসল করে সর্বোত্তম পোশাকে সকাল সকাল মসজিদে গমন করে যথাসম্ভব ইমামের কাছে বসতে এবং ইমাম খুত্বা দিতে শুরু করলে সর্বোচ্চ মনোযোগের সাথে নিশ্চুপে নিশব্দে তাঁর খুত্বা শুনতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি খুত্বা চলাকালীন সময়ে কোনো রকম কথাবার্তা বলে খুত্বা শোনার ব্যাঘাত ঘটায়, তাহলে তাঁর নামায নষ্ট হওয়ার ও শাস্তির ভয় দেখান হয়েছে। এ সবই খুত্বা প্রদান ও খুত্বা শোনার গুরুত্ব প্রকাশ করে।

জুম'আর খুত্বা ও নামাযের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত বা রীতি হলো এদিনে সকাল সকাল, দুপুরের আগে থেকেই, সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে যেতে শুরু করতেন। সবাই নিজ নিজ সাধ্যমত নফল নামায আদায় করতেন বা ইমামের জন্য অপেক্ষা করতেন। ইমাম মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে আসন গ্রহণ করলে মুয়াজ্জিন আযান দিতেন। আযানের পরে ইমাম উঠে দাঁড়িয়ে আরবি ভাষায় মুসল্লীদেরকে নসীহত করতেন।

খুত্বার ক্ষেত্রে মুসল্লীগণের জন্য সেই সপ্তাহের প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হতো। খুত্বার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত একটি লাঠির উপর ভরদিয়ে দাঁড়াতেন। তিনি সাধারণত উত্তেজিত হয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে নসীহত করতেন। খুত্বার শেষে নামাযের ইকামত দেওয়া হতো। জামাত শেষ হলে মুসল্লীগণ সাধারণত বাড়িতে গিয়ে সুন্নাত আদায় করতেন। কেউ কেউ মসজিদেই সুন্নাত আদায় করতেন। এই ছিল জুম'আর নামায আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। তাবেয়ীগণের যুগে ও পরবর্তী যুগেও এই রীতি চলতে থাকে।

আমরা এই সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা অনারব দেশের মানুষেরা আরবি না বুঝার কারণে সে যুগের মতো খুত্বা দিতেও পারছি না, বুঝতেও পারছি না। আরবি না জানার ফলে আমরা খুত্বা দিতে পারি না, বরং বই দেখে খুত্বা পড়ি। অপর দিকে আরবি না বোঝার ফলে আমরা খুত্বা থেকে কোনো প্রকারের উপকার পাচ্ছি না। এতে খুত্বার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে। কুরআনের নির্দেশনা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অনুযায়ী খুত্বার উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর হুকুম আহকাম স্মরণ করা ও করানো। এই মাসনূন উদ্দেশ্যের কিছুই অর্জিত হচ্ছে না। এখন আমরা কী-ভাবে এর সমাধান করতে পারি?

যদি আমরা পরিপূর্ণ সুন্নাত রীতিতে জুম'আর খুত্বা ও নামায আদায় করি, অর্থাৎ নামাযের আগে পরে কোনো আলোচনা না হয় এবং শুধুমাত্র আরবিতে খুত্বা প্রদান করা হয় তাহলে আমরা আরেকটি সুন্নাত পালন থেকে বঞ্চিত হই। অর্থাৎ আল্লাহর বিধিবিধান স্মরণ করা ও করানোর দায়িত্ব পালিত হয় না। অপর দিকে যদি আমরা খুত্বার আগে বা পরে মাতৃভাষায় খুত্বার অনুবাদ বা অন্য আলোচনা করি, অথবা আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুত্বা প্রদান করি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে চলে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের এই নামায আদায়ের পদ্ধতি ও আমাদের পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদের পদ্ধতি কি? মুসল্লীগণ আসছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী নফল-সুন্নাত নামায আদায় করছেন। ইমাম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করার পরে আযান হলো। আরবিতে খুত্বা দেওয়া হলো। এরপর জামাতে নামায আদায়ের পরে সবাই নিজ নিজ সুবিধা মতো মসজিদে বা ঘরে গিয়ে সুন্নাত নামায আদায় করলেন।

আর আমাদের পদ্ধতি কি? মুসল্লীগণ এসেছেন বা আসছেন। এমন সময় ইমাম মাতৃভাষায় ওয়াজ শুরু করলেন। এরপর আযান হলো। আবার আরবিতে খুত্বা দেওয়া হলো। অথবা মুসল্লীগণ আসছেন, ও নামায আদায় করছেন। আযান হলো। এরপর ইমাম অনারব ভাষায় খুত্বা প্রদান করলেন। অথবা নামায শেষে মুসল্লীগণ বসে থাকলেন। ইমাম মাতৃভাষায় আলোচনা করলেন। তিনটি ক্ষেত্রেই আমাদের রীতি বা সুন্নাত খুত্বার আগে অথবা খুত্বার মধ্যে অথবা নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের বাইরে চলে গেল।

এ ক্ষেত্রে অনারব দেশসমূহের আলিমগণ মূল ইবাদত ও উপকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। যারা মনে করেন যে, জুম'আর খুত্বার মূল ইবাদত 'যিক্র' ও 'ওয়ায', অর্থাৎ মুসল্লীগণকে আল্লাহর বিধিবিধান স্মরণ করানো ও উপদেশ প্রদান, ভাষা উপকরণ মাত্র, তাঁরা প্রয়োজনে উপকরণের পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মুসাল্লীদের বুঝানোর জন্য আরবী খুতবার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে বলেছেন, কিন্তু নামাযের আগে বা পরে নিয়মিত আলোচনা নিষেধ করেছেন, কারণ তাতে একটি নতুন রীতি প্রচলন করা হবে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না।

অন্য আলেমগণ খুত্বার মধ্যে আরবি শব্দ উচ্চারণকেই মূল ইবাদত মনে করেছেন। এজন্য তাঁরা মূল খুত্বাকে আরবিতে রাখার পক্ষে। তবে আল্লাহর বিধিবিধান স্মরণ করা, করানো, উপদেশ প্রদান ও গ্রহণের সুন্নাত আদায়ের জন্য তাঁরা আরবি খুত্বার আগে বা নামাযের পরে অতিরিক্ত অনুবাদ বা আলোচনা অনুমোদন করেছেন। কেউবা মূল খুত্বা অনারব ভাষায় প্রদানকে বিদ'আতে সাইয়্যেয়াহ ও আগে বা পরে অনুবাদ ও আলোচনাকে বিদ'আতে হাসানা বলেছেন। এবিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সর্বাবস্থায় সবাই একমত যে, একান্ত বাধ্য না হলে কোনো অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ্ধতির সামান্য ব্যতিক্রম করা আমাদের উচিত নয়।

এখন যদি কোনো আরব দেশের মানুষ এই সকল ফাতওয়ার আলোকে জুম'আর খুত্বার আগে বা নামাযের পরে নিয়মিত ওয়াজ নসীহতের রীতি প্রচলন করে, বা নিয়মিত অনারব ভাষায় খুত্বা প্রদানের রেওয়াজ চালু করে এবং দাবি করে যে, উলামায়ে কেরাম একে জায়েয বলেছেন বা বিদ'আতে হাসানা বলেছেন তাহলে আমরা কি একমত হতে পারব?

(ঙ). উপকরণের মধ্যে কোনো সাওয়াব বা নৈকট্য কল্পনা করা যাবে না

উদ্ভাবিত উপকরণের মধ্যে কোনোরূপ সাওয়াব কল্পনা করা যাবে না। সাওয়াব শুধুমাত্র মূল ইবাদতে। উপকরণের ব্যতিক্রমে সাওয়াবের ব্যতিক্রম হয় না। মূল ইবাদত আদায়ের ব্যতিক্রমে সাওয়াবের ব্যতিক্রম হয়। ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে এর আবশ্যকতার কারণে অনেক সময় একে ওয়াজিব বলা হতে পারে। কিন্তু তা একেবারেই আপেক্ষিক। আমরা ইতঃপূর্বে আরবি ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি উদাহরণের মধ্যে বিষয়টি দেখতে পেয়েছি।

আমরা জানি, বিভিন্ন পদ্ধতিকে কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিক্ষা করা হয়। মূল ইবাদত কুরআন কারীম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা। যত তাড়াতাড়ি তা শেখা যাবে ততই ভালো। যত বিশুদ্ধ হবে, ততই বেশি সাওয়াব হবে। কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে, তিলাওয়াতের বিশুদ্ধতাই শুধু বিবেচ্য নয়, পদ্ধতিও বিবেচ্য, পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ সাওয়াব আছে, তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

যেমন, যদি কেউ মনে করে যে, নূরানী ও নাদীয়া পদ্ধতিতে সমান সময়ে এবং সমান মানের বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা সম্ভব হলেও এই দুইয়ের এক পদ্ধতিতে শুধু পদ্ধতির বরকতে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে তাহলে তিনি বিদ'আতে নিপতিত হবেন। তিনি এমন একটি কর্মকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ও সাওয়াবের মাধ্যম মনে করেছেন যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দ্বীন হিসাবে পালন করেননি।

উপকরণ, ইবাদত ও বিদ'আত : কতিপয় উদাহরণ

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ মুসলিম উপকরণের বিদ'আতে নিপতিত হয়েছেন। সুন্নাত নির্দেশিত বিভিন্ন ইবাদত পালন করতে গিয়ে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে অনেক নতুন উপকরণ ব্যবহার করতে হচ্ছে। ইল্‌ম শিখতে ও শেখাতে বিভিন্ন পদ্ধতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে। দাওয়াত, তাবলীগ, সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, সমাজ সংস্কার, সমাজের যেসকল পর্যায়ে ইসলামী বিধি বিধান ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে তা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইবাদত পালনে আমরা বর্তমান যুগে অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করছি যা নতুন। এ সকল উপকরণের ব্যবহার আমরা মূলত বাধ্য হয়েই করছি। কিন্তু অনেক আবেগী মুসলিম ইবাদত ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পেরে উপকরণকেই ইবাদত ভেবে নিয়েছেন। যে মুসলিম তার মতো পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করছেন না তাকে তিনি খারাপ মনে করছেন ও তার ইবাদত অসম্পূর্ণ বলে মনে করছেন।

আমি এখানে ৬টি উদাহরণ আলোচনা করব। প্রথমে ঢিলা-কুলুখ-এর ইবাদত ও উপকরণের পার্থক্য আলোচনা করব। এরপর ইলম শিক্ষা ও মাযহাব সম্পর্কে সংক্ষেপ আলোচনা করব। পরবর্তী তিনটি দিক : জামাতবদ্ধ তাবলীগ, সাংগঠনিক ইসলামী রাজনীতি ও তাসাউফ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করব।

কারো সমালোচনা বা মন্দ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মহান আল্লাহ অন্তরের কথা জানেন। বর্তমান যুগে আমাদের দেশে ও সকল ইসলামী সমাজে ইসলামের পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই তিন ধারার অবদান খুবই বেশি। আমরা এই তিন ধারা ভালবাসি এবং এদের সফলতা ও কবুলিয়্যতের জন্য দোয়া করি। সাথে সাথে আমরা কামনা করি যে, তাঁদের কর্মের মধ্যে যে সকল খেলাফে-সুন্নাত কর্ম বা ধারণা রয়েছে সেগুলি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা আরো বিশুদ্ধ সুন্নাত মতো তাঁদের কর্মগুলি আঞ্জাম দান করেন, যেন তাঁদের কর্ম তাঁদের জন্য আরো বেশি সাওয়াব ও সফলতার উৎস হয়।

(ক). উপকরণ ও ইবাদত: ঢিলা কুলুখ ব্যবহার বনাম হাঁটাহাঁটি

মলমূত্র ত্যাগের পর পরিপূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া ইসলামের অন্যতম বিধান। আমরা দেখেছি যে, পেশাব থেকে সাবধান না হওয়া বা পেশাব থেকে আড়াল না করা কবরের শাস্তির কারণ। এমনভাবে পেশাব করে উঠে আসতে হবে যে, শরীরে কোনো রকম নাপাকী না লাগে। এ জন্য পাথর, ঢিলা বা টিস্যু পেপার জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যায় অথবা পানি ব্যবহার করা যায়। সুন্নাতের নির্দেশনা অনুযায়ী শুধু পাথর ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জনের চেয়ে শুধু পানি ব্যবহার উত্তম। যারা পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করেন হাদীসে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। পাথর ও পানি উভয়ের ব্যবহার অধিকতর উত্তম। এগুলি ইসলামের একটি সাধারণ বিধান। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কী-ভাবে এই বিধান পালন করতেন, কী-ভাবে তাঁরা এই ফযীলত আদায় করতেন।

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিঞ্জার সময় কখনো শুধুমাত্র পাথর বা ঢিলা ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি পানি ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো পাথর ও পানি দু'টিই ব্যবহার করতেন। সাহাবায়ে কেরামও এভাবেই ইস্তিঞ্জা করেছেন। তাঁরা কখনো শুধু পাথর, কখনো শুধু পানি এবং কখনো পাথর ও পানি দু'টোই ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ইস্তিঞ্জার সময় পাথর ব্যবহার করতে গিয়ে কখনো উঠে দাঁড়াননি, হাঁটাচলা, লাফালাফি, গলাখাকরি ইত্যাদি কিছুই করেননি। পেশাব ও পায়খানা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে বসা অবস্থাতেই পাথর বা পানি, অথবা প্রথমে পাথর এবং তারপর পানি ব্যবহার করে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করেছেন।

পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠে দাঁড়ানোর পরে পেশাব বের হতে পারে বলে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কোনো বিধান তিনি প্রদান করেননি। শুধুমাত্র একটি অত্যন্ত যয়ীফ সনদের হাদীসে দেখা যায় যে তিনি পেশাবের পরে তিনবার পুরাষাঙ্গ টান দিয়েছেন বা দিতে বলেছেন। যামআ' ইবনু সালিহ নামক যয়ীফ বর্ণনাকারী বলেন তাকে ঈসা ইবনু ইয়াদাদ বলেছেন, তাঁর পিতা ইয়াযদাদ ইবনু ফাসাআহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন তিন বার তাঁর পুরষাঙ্গ টান দেয়।" যামআ হাদীসের বর্ণনায় একবার

বলেন: “এভাবে তিনবার টান দেওয়াই তার জন্য যথেষ্ট হবে।”[১]

হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ। ঈসা নামক এই ব্যক্তি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে দাবী করেন যে, তাঁর পিতা তাকে এই হাদীসটি বলেছেন। তাঁর পিতা “ইয়াযদাদ” নামক ব্যক্তি কোন সাহাবী নন। তিনি তাবেয়ীদের যুগের একজন অজ্ঞাত পারিচয় মানুষ। তাঁর কোনো পরিচয় মুহাদ্দিসগণ খুঁজে পাননি। আর এই ইয়াযদাদ কার কাছ থেকে হাদীসটি তাও জানা যায় নি। তিনি কোনো সাহাবী থেকে শুনেছেন, নাকি লোকমুখের কথা শুনে বলেছেন, তা কিছুই জানা যায় না। আবার তাঁর পুত্র ঈসা নামক এই ব্যক্তিও অপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এইরূপ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।[২]

সর্বাবস্থায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর ইস্তিঞ্জার বিষয়ে অগণিত হাদীস রয়েছে। তিনি কিভাবে বসেছেন, পাথর ব্যবহার করেছেন, পানি ব্যবহার করেছেন, আড়াল করেছেন ইত্যাদি সকল বিষয় আমরা হাদীসে বিস্তারিত জানতে পারি। কিন্তু একটি হাদীসেও কোনো একজন সাহাবীও বর্ণনা করেননি যে, তিনি কখনো পেশাবের পরে পানি ব্যবহারের আগে “কুলুখ” ব্যবহারের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন বা হাঁটাহাঁটি করেছেন। তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণও তাঁর সুন্নাত মতো ইস্তিঞ্জা করেছেন। পাথর অথবা পানি ব্যবহার করেছেন। কখনো দু'টিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কখনো ইস্তিঞ্জার সময় হাঁটাহাঁটি, লাফালাফি, গলাখাকরি ইত্যাদি করেননি।[৩]

তাহলে আমরা কেন করি? আমরা উপকরণ ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য নষ্ট করে ফেলেছি, ফলে সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে নিপতিত হয়েছি। মূল বিষয় হলো ইস্তিঞ্জা শেষে কোনোরকম উঠে দাঁড়ানো বা হাঁটাহাঁটি ব্যতিরেকে বসা অবস্থাতেই পাথর, কাপড় বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করে ময়লা মুছে ফেলা ন্যূনতম সুন্নাত। শুধু পানি ব্যবহার করে ভালো করে ধুয়ে ফেলা উত্তম। অনেক ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব বা জরুরি। সর্বাবস্থায় শুধু পানি ব্যবহার করলেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। বসা অবস্থাতেই আগে পাথর বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করে এরপর পানি ব্যবহার করে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হলো ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সুন্নাত ও সর্বোত্তম পর্যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে উপরের দুর্বল হাদীসটির আলোকে পাথর ও পানি বা শুধু পানি ব্যবহারের পূর্বে তিনবার পুরুষাঙ্গ টেনে নেওয়া যায়।

পরবর্তী যুগে কোনো কোনো আলেম এই সাবধানতার পদ্ধতি ও উপকরণ বৃদ্ধি করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মানুষের তবিয়ত বিভিন্ন প্রকারের। যদি কারো একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে উঠে দাঁড়িয়ে বা দুই এক পা হেঁটে, গলা খাকরি দিয়ে বা এধরনের কোনো কাজের মাধ্যমে তারা ‘পেশাব একদম শেষ হয়েছে’ –এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে। আর যার মনে হবে যে, বসা অবস্থাতেই সে পরিপূর্ণ পাক হয়ে গিয়েছে তার জন্য সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।[৪]

এভাবে আমরা দেখছি, ঢিলা কুলুখ ব্যবহার সুন্নাত। কিন্তু তা ব্যবহারের সময় উঠে দাঁড়ানো, হাঁটাহাঁটি করা, গলা খাকরি দেওয়া, লাফালাফি করা ইত্যাদি সবই খেলাফে-সুন্নাত উপকরণ। একান্ত প্রয়োজন হলে বা বাধ্য হলেই শুধু আমরা তা করতে পারি। আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে, সুন্নাতের মধ্যে থাকা ও খেলাফে-সুন্নাত উপকরণকে অভ্যাসে পরিণত না করা।

কিন্তু দুঃখজনক হলো যে, আমরা খেলাফে-সুন্নাত উপকরণকে ইবাদত মনে করছি। পূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিকে অপূর্ণ মনে করছি। এভাবে হাঁটাচলা করে নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে বিদ্যমান ছিল, এগুলির মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকলে তাঁরা তা অবশ্যই ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাঁরা তা ব্যবহার করেননি। অথচ এগুলিকে আমরা ইবাদতের অংশ বানিয়ে নিয়েছি। এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। বিশেষ প্রয়োজন না হলে আমাদের সর্বদা সুন্নাত পদ্ধতিতেই ইস্তিঞ্জা করা উচিত।

অনেকের মনে হতে পারে যে, এভাবে সুন্নাত পদ্ধতিতে ইস্তিঞ্জা সম্পন্ন করলে পেশাব শরীরের মধ্যে রয়ে যাবে এবং উঠে দাঁড়ানোর পরে তা শরীরে বা কাপড়ে লাগবে। বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াসওয়াসা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভ্যাস। এভাবে যতক্ষণ আমরা গলাখাকরি প্রদান করব বা চাপাচাপি করব, কিছু পেশাব বের হতে থাকবে। আমরা মলত্যাগের সময় পেশাব করে থাকি। তখন কেউ হাঁটাহাঁটির চিন্তা করেন না। তখন হাঁটাহাঁটি ছাড়াই পবিত্রতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু যখন শুধুমাত্র পেশাব করতে বসি তখন এ সকল ওয়াসওয়াসা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়।

আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা পবিত্রতার আগ্রহের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের ঊর্ধে উঠতে পারব না। পবিত্রতার ক্ষেত্রে তাঁরাই সর্বোচ্চ আদর্শ। পবিত্রতা অর্জনের জন্য তাঁদের যে কাজের প্রয়োজন হয়নি আমাদের হবে কেন? তবে যদি সত্যিকার ভাবে কেউ নিশ্চিত জানতে পারেন যে একটু উঠে দাঁড়িয়ে দু'এক পা না-হাটলে তার পবিত্রতা পূর্ণ হবে না, তিনি অবশ্যই তা করবেন। তবে তার এই কর্মকে প্রয়োজনের জন্যই করবেন এবং সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে চলে যাচ্ছেন বলে মনে আফসোস থাকা উচিত। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা তাঁর মহান দরবারে সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি।

(খ). ইল্ম প্রচার : ইবাদত, উপকরণ বনাম বিদ'আত

সঠিক ইসলামী জ্ঞান বিস্তার সকল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এখানে মূল ইবাদত ইল্ম অর্জন ও শিক্ষাদান। মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সবই উপকরণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা উপকরণকেই ইবাদত মনে করে নিয়েছি। কে কতটুক আলেম এ কথা বিচারের আগে আমরা বিচার করি কে কোন্ পদ্ধতিতে ইল্ম অর্জন করেছেন। দরসে নিজামী, খারেজী, আলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি পদ্ধতিকে আমরা ইবাদতের অংশ বানিয়ে বিদ'আতে পতিত হয়েছি।

যেমন, তাফসীর শিক্ষা করা একটি ইবাদত। তাফসীরের একটি গ্রন্থ হলো “তাফসীরে জালালাইন”। যে প্রতিষ্ঠানে বা যে

পদ্ধতিতেই বইটি পড়া হোক মূল ইবাদত হলো তাফসীর শিক্ষা করা। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন যে, "কওমী মাদ্রাসা"-য় এই গ্রন্থটি পাঠ করলে "আলীয়া মাদ্রাসা" এই গ্রন্থটি পাঠ করার চেয়ে বেশি সাওয়াব বা বরকত হবে তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে একটি বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হলেন। আমাদের সমাজে বিশেষ করে "কওমী ও "আলিয়া" মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিদ্যমান। বিষয়টি শুধু খেলাফে সুন্নাত ও বিদ'আতই নয়, উপরন্তু এভাবে আমরা সম্পূর্ণ বানোয়াটভাবে মুসলিম আলেমগণের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পাপে লিপ্ত হচ্ছি।

বিভিন্ন পদ্ধতির ভুল, দুর্বলতা বা অন্যায়ের তথ্যভিত্তিক গঠনমূলক সমালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু কোন পদ্ধতি বা উপকরণকে ইবাদতের অংশ বা বরকতের কারণ মনে করা বা কোন পদ্ধতিকে পদ্ধতি হিসাবে ঘৃণা করার কোন কারণ নেই। এভাবে আমরা এমন একটি বিষয়ের মধ্যে সাওয়াব বা কল্যাণ কল্পনা করছি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে ছিল না। কে কোন্ পদ্ধতিতে ইল্ম অর্জন করল তা-তো আমাদের কোনোরূপ ধর্তব্যের বিষয় হতে পারে না। কে কতটুকু ইল্ম অর্জনের ইবাদত পালন করল এটাই আমাদের একমাত্র জানার বিষয় হবে।

উপকরণ বা পদ্ধতিকে ইবাদত মনে করার একটি অশুভ ফল হলো বিশেষ পদ্ধতি, বিশেষ ভাষা বা বিশেষ পুস্তককে ইলমের অপরিবর্তনীয় মাধ্যম মনে করা। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো সাহাবীগণের যুগের মতো মুসলিম সৃষ্টি করা। এর দু'টি দিক রয়েছে : প্রথমত, বিশুদ্ধ ইসলামী বিশ্বাস ও কর্ম পালনকারী সৎ, কর্মমুখী ও সমাজের গঠনমুখী মুসলিম নাগরিক সদস্য তৈরি করা ও দ্বিতীয়ত, কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাজ্ঞ ও গবেষক আলেম তৈরি করা, যারা উম্মতের সামনে যুগ সমস্যার ইসলামী সমাধান প্রদান করবেন এবং সকল ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে জাতিকে নেতৃত্ব প্রদান করবেন। এই উদ্দেশ্যেই যুগের প্রয়োজনীয়তার আলোকে বারবার শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত দরসে নিযামী, দরসে আলীয়া ইত্যাদি ব্যবস্থাও এই প্রক্রিয়ার অংশ। তবে দুঃখজনকভাবে "উপকরণ" বা "দরস"-কেই "ইবাদত" সাওয়াব বা বরকতের অংশ মনে করার ফলে আমাদের দেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশেষত, দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন আলেম তৈরির ক্ষেত্রে। দেশ ও যুগের জন্য অনুপযুক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ভাষা, বিষয় ও পুস্তক অনুপযুক্ত পদ্ধতিতে পাঠদানের ফলে প্রচুর ইখলাস, সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় সত্ত্বেও আমরা সঠিক ফল লাভ করতে পারছি না। আরবি ভাষা, বিভিন্ন ইসলামী বিষয়, মাতৃভাষা, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, ইসলাম বিরোধী কর্মের পদ্ধতি, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের দেশের ইসলামী শিক্ষাব্যস্থায় শিক্ষিতদের সীমাবদ্ধতা জাতির জন্য বেদনাদায়ক সত্য। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, তিনি আমাদের দেশের আলেমগণকে উপকরণের যুগোপযোগী পরিবর্তনের তাওফীক প্রদান করেন।

(গ). মাযহাব অনুসরণ : সুন্নাত, উপকরণ বনাম খেলাফে-সুন্নাত

প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলো কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে তার জীবন পরিচালনা করা। এজন্য সর্বোত্তম পর্যায় হলো, নিজে কুরআন ও হাদীস বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে শিক্ষা করে তদানুসারে জীবনযাপন করা। তবে স্বভাবতই সকলেই ইসলামী জ্ঞান বা অন্য কোনো জ্ঞানে সুপণ্ডিত হতে পারবেন না। সে কারণে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনের পরে বিস্তারিত বিধানাবলী সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আলেমগণকে প্রশ্ন করা ও তাঁদের অনুসরণ করা মুসলিমের দায়িত্ব।

ইসলামের প্রথম যুগে অগণিত আলেম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ সমাজের মানুষদের ধর্ম জিজ্ঞাসার সমাধান দিয়েছেন। যুগের বির্বতনে এদের অধিকাংশের মতামত অবলুপ্ত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ৪ জন ফকীহ ও তাঁদের মতামত বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। এঁরা হলেন : ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবনু সাবিত (১৫০হি.), ইমাম মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি.), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ-শাফেয়ী (২০৪হি.) ও ইমাম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হাম্বাল (২৪১ হি.), রাহিমাহুমুল্লাহ। এদের মতামতগুলি "মাযহাব" নামে পরিচিত। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য এঁদের কোনো একজনকে অনুসরণ করেন।

এখানে ইবাদত হলো কুরআন সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। আর উপকরণ হলো এসকল ইমামদের মতামত। সাধারণত কুরআন ও হাদীসে গভীর জ্ঞানার্জন করতে পারেন না বলেই মুসলমানগণ এঁদের মতামতের উপর নির্ভর করেন। এই উপকরণ সুন্নাত-সম্মত। সাহাবীগণের যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহ এভাবে ইসলাম বুঝা ও পালন করার ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করে আসছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষেপে এই বিষয়ে আমাদের সমাজের কিছু খেলাফে-সুন্নাত কর্ম বা ধারণা উল্লেখ করছি:

১. উপকরণকে ইবাদত মনে করা

অনেক আলেম "মাযহাব পালন"-কে ওয়াজিব বলেছেন। তাঁদের এই "ওয়াজিব" বলার অর্থ তা উপকরণ হিসাবে ওয়াজিব। যেমন আরবি ভাষা শিক্ষা করা ইসলাম শিক্ষার উপকরণ হিসাবে ওয়াজিব। আমরা ইতঃপূর্বে উপকরণের ওয়াজিব হওয়া ও ইবাদত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করেছি। কেউ যদি মনে করেন যে, কুরআন-সুন্নাহ মতো জীবনযাপন করা একটি ইবাদত ও এ সকল ইমামদের অনুসরণ করা আরেকটি ইবাদত, অথবা মনে করেন যে, কেউ কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানার্জন করে সরাসরি বিশুদ্ধভাবে ইসলাম পালন করলে তিনি একটি সাওয়াব পাবেন, আর কেউ এসকল ইমামের অনুসরণে ইসলাম পালন করলে একটু বেশি সাওয়াব বা দুটি সাওয়াব পাবেন তাহলে তিনি উপকরণকে ইবাদত মনে করে বিদ'আতে নিপতিত হবেন। অনুরূপভাবে কেউ যদি কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে কোনো বিষয়ে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানতে পারেন এবং এরপরও মাযহাব বা ইমামের মতামতের দোহাই দিয়ে তা পরিত্যাগ করেন তাহলে তিনি কঠিন অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত হবেন।

২. সুন্নাত-সম্মত উপকরণকে না-জায়েয মনে করা

অপরদিকে এই উপকরণকে না-জায়েয মনে করা একটি খেলাফে-সুন্নাত কর্ম। মাযহাব অনুসরণ করার ফলে কাউকে পাপী, অন্যায়কারী বা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বলে মনে করার অর্থ হলো একটি সুন্নাত-সম্মত উপকরণকে না-জায়েয বলা ও সাহাবীগণের সুন্নাত, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীসহ মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম, ফকীহ ও আলেমের মতামতকে অপছন্দ করা এবং বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিমকে বিনা পাপে পাপী বলে মনে করা। সকল যুগেই অনেক আলেম "মাযহাব" অনুসরণের নামে বাড়াবাড়ি বা উপরের খেলাফে-সুন্নাত পর্যায়কে নিন্দা করেছেন। কিন্তু তাঁরা "মাযহাব অনুসরণের" নিন্দা করেননি। স্কুল, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ইল্ম শিক্ষা ও প্রচারের সুন্নাত-সম্মত উপকরণ। এগুলির ব্যবহারে ভুল হলে সমালোচনা ও সংশোধন করতে হবে। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়াকে পাপ বলে গণ্য করা যায় না।

৩. ইমামগণকে ঘৃণা করা বা তাঁদের নিন্দা করা

আরো বেশি অন্যায় হলো ইমামগণকে ঘৃণা করা বা তাঁদের নামে কটূক্তি করা। আমরা দেখেছি যে, এ সকল ইমাম তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগের মানুষ। আবু হানীফা (রহ.) তাবেয়ী ছিলেন। মালিক (রহ.) ও শাফিয়ী (রহ.) তাবে-তাবেয়ী ছিলেন। আহমদ (রহ.) তাবে-তাবেয়ীগণের ছাত্র ছিলেন।

এঁদেরকে আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা সুন্নাত-সম্মত ও সুন্নাত নির্দেশিত ইবাদত। এঁরা সকলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশনা বুঝার ও পালনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন মাসআলা বা ব্যবহারিক কর্মের বিধানের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। প্রত্যেকে তাঁর জ্ঞান ও সাধ্যমতো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরের যুগে ইসলামের সোনালী দিনগুলিতে তাঁদের জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে শত শত ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আলেম এঁদেরকে ইমাম ও সুপণ্ডিত বলে মেনেছেন।

সমসাময়িক আলেমদের সাথে মতবিরোধের কারণে তাঁদের সকলেরই বিরুদ্ধে তাঁদের যুগের অনেক আলেম অনেক কথা বলেছেন। এছাড়া পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে মাযহাবী কোন্দল ছড়িয়ে পড়ার পরে অনেকের নামে অনেক মিথ্যা কুৎসা রটনা করে অনেক গ্রন্থে লেখা হয়েছে। এগুলি প্রচার করা অনর্থক হিংসা বিদ্বেষ ও সালফে সালেহীনের কুৎসা রটনা ছাড়া কিছুই নয়।

তাঁদের আপনি ঘৃণা করবেন কোন্ অপরাধে ? তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝা, বুঝানো, সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দান করা ও এর প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন বলে? নাকি আপনার মতানুসারে এই জিহাদে তাঁরা দুই একটি ইজতিহাদী ভুল করেছেন বলে? নাকি অনুসারীদের অন্যায়ের কারণে?

৪. মাযহাবী মতবিরোধের কারণে হিংসা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়ানো

সাহাবীগণের যুগ থেকে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিষয়ের খুঁটিনাটি দিকে মতবিরোধ চলে আসছে। এ সকল মতবিরোধের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের সুন্নাত হলো কুরআন ও হাদীস নির্ভর ব্যবহারিক মতবিরোধ মেনে নেওয়া। অনেক সময় কোনো একটি কর্মের দলিল প্রমাণাদি নিয়ে তাঁরা অনেক আলোচনা ও জ্ঞানমূলক বিতর্ক করেছেন, কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হননি।

৫ম হিজরী শতক থেকেই মুসলিম উম্মার রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত অধপতন হতে থাকে। তখন থেকেই অজ্ঞতা মিশ্রিত আবেগ ও বাড়াবাড়ির কারণে অনেক সময় মাযহাবী মতভেদ মুসলমানে মুসলমানে কোন্দল, মারামারি বা যুদ্ধের রূপ নিয়েছে। আমাদের যুগেও বিভিন্ন নামে ও রূপে তা রয়েছে। জোরে "আমীন" বলা, মেয়েদের জামাত, ঈদের নামাযের তাকবীর ইত্যাদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সামান্য বিষয়ের জন্য মারামারি, দলাদলি ও পৃথক জামাতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্টের কাজ এখনো চলে। অপরদিকে কুফর, শিরক, ধর্মান্তর ইত্যাদির জন্য আমাদের মাথাব্যথা কম।

আমাকে একজন প্রশ্ন করলেন, ঈদের নামাযে আপনারা ছয় তাকবীর কোথায় পেয়েছেন? আমি বললাম, ছয় তাকবীর তো আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, হুযাইফা, আবু মুসা আশ'আরী (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে তাঁদের কর্ম হিসাবে সহীহ সনদে প্রমাণিত, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্ম হিসাবে বর্ণিত হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আপনি ঈদের নামাযের তাকবীর নিয়ে এত মতভেদ করছেন ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন কেন ? ঈদের নামাযই যদি কেউ না পড়ে তাকে কি এত ঘৃণা করা সুন্নাত-সম্মত হবে? অথচ শত শত মুসলিম দ্বীনত্যাগী হয়ে যাচ্ছে সেজন্য কি আপনি অনুরূপ ব্যস্ত হতে পেরেছেন?

এক্ষেত্রে সুন্নাত হলো দলিল ভিত্তিক মতবিরোধকে মেনে নেওয়া, প্রয়োজনে দলিল আলোচনা করা, সম্ভব হলে সঠিক বা সর্বোত্তম মতের উপর একমত হওয়ার চেষ্টা করা ও সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ, গীবত, অহংকার, শত্রুতা ও দলাদলি পরিত্যাগ করা।

৫. মতবিরোধগত কর্মগুলিকে ঘৃণা করা

যে সকল বিষয় নিয়ে মতভেদ করা হয় সেগুলির অধিকাংশই হাদীস বা সাহাবীগণের কর্ম ভিত্তিক। যেমন, নামাযের রুকুর সময় দু'হাত উঠানো ও তা পরিত্যাগ করা, জোরে আমীন বলা বা আস্তে বলা, দুই হাত নাভির নিচে বা উপরে রাখা, ঈদের নামাযের তাকবীরের সংখ্যা ইত্যাদি সকল বিষয়েই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হয়ত সনদগত বা হাদীসগতভাবে একটি মত আরেকটির থেকে দুর্বল হতে পারে। আবার সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে উভয় প্রকার কর্মই প্রচলিত ছিল। কোনো ইমামই সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্ম ও মতামতের বাইরে কোনো মত প্রদান করেননি। প্রত্যেকেই নিজ এলাকার সাহাবীগণের প্রসিদ্ধ মতের উপর নির্ভর করেছেন।

সংক্ষেপে দুটি উদাহরণ দেখুন: ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সবগুলি হাদীসের সনদেই দুর্বলতা আছে। কোনো সংখ্যাই তাঁর থেকে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়নি। তবে অনেক মুহাদ্দিস ১২ তাকবীরকে সহীহ বলেছেন। অপরদিকে সাহাবীগণ থেকে ১৩, ১২, ৯, ৬ বিভিন্ন তাকবীর সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা কোন্‌টি উত্তম সে বিষয়ে অনেক বিতর্ক করতে পারি। কিন্তু তাই বলে কোনো একটি কর্মকে ঘৃণা করতে পারি না। কোনো একটি সংখ্যাকে ঘৃণা করার অর্থ

উক্ত কর্ম যারা করেছেন সে সকল সাহাবী ও তাবেয়ীকে ঘৃণা করা।

নামাযের মধ্যে রুকুর সময় ও রুকু থেকে উঠে ও তৃতীয় রাক'আতে উঠার সময় দুই হাত উঠানো অনেক সাহাবী কর্তৃক সহীহ সনদে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। আবার আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসকল সময়ে হাত উঠাননি। এখন যদি কেউ ইবনু মাসউদের হাদীসে আমল করেন তাহলে তিনি একটি সুন্নাত মতো চললেন। কিন্তু যদি তিনি অন্য সহীহ হাদীসে প্রমাণিত কর্মকে ঘৃণা করেন বা মন্দ বলেন তাহলে তিনি মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি কর্মকেই ঘৃণা করছেন বা নিন্দা করছেন।

(ঘ). দাওয়াত ও তাবলীগ : ইবাদত, উপকরণ বনাম বিদ'আত

ইসলামের প্রসার, প্রচার ও বিশ্বের বুকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান সকল ইসলামী সংস্থা, দল বা ব্যক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য আমরা বর্তমান যুগে এমন কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করছি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি। যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, গণমাধ্যম, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার, বিভিন্ন সংস্থা, দল, পদ্ধতি তৈরি করা, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য তাবলীগে বের হওয়া ইত্যাদি মাধ্যম। আমরা অনেকেই এ সকল উপকরণকে ইবাদত মতে করে বিদ'আতে পতিত হচ্ছি।

যে ব্যক্তি মাদ্রাসা, ওয়াজ ইত্যাদি পদ্ধতিতে এই ইবাদত আদায় করছেন তিনি অন্য উপকরণ ব্যবহারকারীর সমালোচনা করছেন। যিনি তাবলীগ জামাতের চিল্লাকাশি ইত্যাদি পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তা'লীমের কাজ করছেন তিনি তাঁর এই পদ্ধতিকেই ইবাদত ভাবছেন। এজন্য মাদ্রাসা, ওয়াজ, বই লিখা ইত্যাদি মাধ্যমে যিনি এই ইবাদত পালন করছেন তাঁকে তিনি এই ইবাদতের পূর্ণ পালনকারী বলে ভাবছেন না। তিনি মনে করছেন যে, শুধুমাত্র এই পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার না করার ফলে তাঁর ইবাদত হচ্ছে না বা কিছুটা অপূর্ণ থাকছে।

এখানে আমরা কয়েকভাবে সুন্নাত-বিরোধিতা ও বিদ'আতে নিপতিত হই:

১. খেলাফে-সুন্নাত উপকরণ ব্যবহার

তিনি এমন একটি উপকরণ বা পদ্ধতিকে ইবাদত মনে করছেন যা সুন্নাতের খেলাফ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো এভাবে চিল্লাকাশি বা এই পদ্ধতিতে তাবলীগ করেননি, যদিও এধরনের দিন নির্ধারিত করে, বিশেষ পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদান তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল।

২. উপকরণকে ইবাদত মনে করা

দাওয়াত, তাবলীগ, দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করা ও প্রদান করা ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বাইরে যাওয়া বা দেশে থাকা উপকরণ, ইবাদত নয়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত হলো এ সকল ইবাদত 'উন্মুক্ত'-ভাবে পালন করা, অর্থাৎ কোনো বিশেষ পদ্ধতি বা উপকরণকে এই ইবাদত পালনের জন্য সর্বদা পালন না করা বা জরুরি মনে না করা।

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণসহ পূর্ববর্তী যুগের উলামাগণ প্রয়োজনে দ্বীনের জন্য স্থায়ীভাবে হিজরত করেছেন। ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য দরকার হলে কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ না করে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন। আবার অনেকে জীবনে কখনো নিজ শহর থেকে হজ্ব বা ওমরা পালন ছাড়া বের হননি।

তাঁর সবাই "তাবলীগ ও দাওয়াতের" ইবাদত বা দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার ইবাদত পূর্ণরূপে পালন করেছেন। যিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে ইল্‌ম শিখেছেন তিনি কখনো মনে করেননি যে, দ্বিতীয় আলেম যিনি নিজ শহরে থেকেই ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন তাঁর সাওয়াব কম হয়েছে। আসল বিষয় হলো ইবাদত কতটুকু পালন করা হলো। যেমন : বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে বা হেঁটে সকল সময় যিক্‌র করা ইবাদত। যিনি হাঁটতে হাঁটতে যিক্‌র করছেন তিনি একটি ইবাদত করছেন : তা হলো যিক্‌র করা। তিনি যদি মনে করেন যে, তিনি দু'টি ইবাদত করছেন : হাঁটা ও যিক্‌র করা, অথবা হাঁটতে হাঁটতে যিক্‌র করার কারণে বসে বসে যিক্‌র করার চেয়ে তিনি বেশি সাওয়াব পাচ্ছেন তাহলে তিনি বিদ'আতে নিপতিত হবেন।

এই বিদ'আতে অনেকেই নিপতিত। মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, ওয়ায়েজ বা লেখক অনেক সময় জামাতবদ্ধভাবে "তাবলীগে" বেরোনো মানুষদের বেরোনো, পথে চলা, বোঝাটানা ইত্যাদি পদ্ধতির অযথা সমালোচনা করেন। অথচ এঁরা একই ইবাদত পালন করছেন, পার্থক্য শুধু পদ্ধতিগত। কেই স্থায়ী মাদ্রাসায় ও কেউ ভ্রাম্যমান মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা প্রদান করছেন।

অপর পক্ষে এই "জামাতবদ্ধ তাবলীগে" রত ব্যক্তিটি মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, লেখক বা ওয়ায়েজ সম্পর্কে ভাবছেন যে, লোকটি যেহেতু দিন নির্ধারিত করে তাঁর পদ্ধতিতে ভ্রাম্যমান মাদ্রাসায় পড়ছে না, সেহেতু তাঁর দ্বীন শিক্ষা ও শেখানোর জন্য সারাজীবন সময়প্রদানের সাওয়াব কম হবে।

৩. উপকরণ অর্জনের জন্য ফরয ইবাদত বর্জন করা

দাওয়াত, তা'লীম ও তাবলীগ কোনো কোনো পর্যায়ে ফরয, অন্য ক্ষেত্রে ফরযে কিফায়া বা নফল। আর এই ইবাদত পালনের জন্য নিজ শহর বা দেশের বাইরে গমন কোনো প্রকার ইবাদত নয়, শুধুমাত্র উপকরণ। প্রয়োজন অনুসারে এর গুরুত্ব নির্ধারিত হবে। আমরা অনেক সময় নফল পর্যায়ের ইবাদতকে ফরয পর্যায়ের গুরুত্ব দিয়ে পালন করে খেলাফে-সুন্নাতে নিপতিত হই। আমরা অনেক সময় ফরয ও মুস্তাহাব পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য না করতে পেরে নফল ইবাদত পালনের জন্য অন্য একটি ফরয ইবাদত ত্যাগ করি। এর চেয়েও খারাপ হলো নফল ইবাদতের উপকরণের জন্য ফরয ত্যাগ করা।

যেমন, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ ও দেখাশুনা একটি হক্কুল ইবাদ পর্যায়ের "ফরয আঈন" দায়িত্ব। আবার দ্বীন শিক্ষা করাও প্রথম

পর্যায়ে “ফরয আঈন” ইবাদত। দ্বীন শিক্ষা দেওয়া কখনো “ফরয কিফায়া” ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নফল ইবাদত। আর দ্বীন শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়া কোনো ইবাদত নয়, উপকরণ মাত্র। এই উপকরণ কখনো “জরুরি” হতে পারে, তবে উপকরণ হিসাবে। কাজেই এই উপকরণের জন্য ফরয ইবাদত ত্যাগ করা বা করতে উৎসাহ দেওয়া খেলাফে-সুন্নাত।

দ্বীন শিক্ষা করা ও দাওয়াতের জন্য বাইরে যাওয়া ইল্‌ম ও দাওয়াতের ইবাদত পালনের উপকারী মাধ্যম। এতে কিছুদিন পারিপার্শিক ঝামেলা থেকে মুক্ত অবস্থায় নেককার মানুষদের সাহচর্যে অবস্থানের মাধ্যমে সুন্দরভাবে দ্বীন শিক্ষা করা যায়। সাথে সাথে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার ইবাদত পালনের সুযোগ পাওয়া যায়। সুযোগ না থাকলে নিজ এলাকায় এই দায়িত্ব পালন করলেও একই প্রকার সাওয়াব পাওয়া যাবে। সাওয়াবের কমবেশি হবে ইল্‌ম শিক্ষা ও দাওয়াতের কমবেশির কারণে, বাহির হওয়া বা না-হওয়ার কারণে নয়। বাহির হওয়া শুধু ভালভাবে ইবাদত পালনের সুযোগ দেয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এজন্য কোনো ফরয তরক করা যায় না।

আমরা অনেক সময় আবেগে বলি যে, বিদেশে চাকরী পেলে তো তিন বৎসরের জন্য পরিবার ছেড়ে চলে যাবে তখন ফরয পালন কোথায় থাকবে? কথাটি বিভিন্নভাবে অন্যায় :

প্রথমত, একজনকে একটি ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করতে উৎসাহ দিচ্ছি, বিশেষত, হক্কুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট ফরয ইবাদত।

দ্বিতীয়ত, আমরা একটি অন্যায়ের দোহাই দিয়ে আরেকটি অন্যায় করতে উৎসাহ দিচ্ছি। হালাল জীবিকা উপার্জন ফরয। এজন্য বিদেশ গমন কখনো প্রয়োজন, কখনো জায়েয ও কখনো না-জায়েয হতে পারে। সর্বাবস্থায় যদি কেউ এ জন্য কোনো না-জায়েয কাজ করে তাহলে আমরা বলতে পারি না যে, তুমি আরেকটি না-জায়েয কাজ কর।

অনেক সময় আমরা বলি, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, আল্লাহই দেখবেন। এভাবেও আমরা একজন মুসলিমকে ইসলাম বিরোধী পদ্ধতিতে একটি ফরয কাজ পরিত্যাগ করতে উৎসাহ প্রদান করি। আর এই ফরয তরক অন্য কোনো ফরয পালনের জন্য নয়, অন্য একটি ফরয বা নফল ইবাদত পালনের একটি উপকরণ অর্জন করার জন্য।

এক্ষেত্রে সুন্নাত-সম্মত পদ্ধতি হলো, ঐ ব্যক্তিকে তার পরিজনের প্রতি ফরয দায়িত্ব পালনে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। সাথে সাথে তার দ্বীন শিক্ষার ফরয দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বুঝাতে হবে। তাকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে উভয় ইবাদত পালনের মধ্যে সমন্বয় করতে। ইল্‌ম শিক্ষা ও পালনের ক্ষেত্রে কিছুদিন বাড়ির বাইরে নেককার মানুষের সাহচর্যে থাকার উপকরিতা বুঝাতে হবে। প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করতে হবে। যদি সে এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তাকে বাড়িতে থেকেই সঠিকভাবে ইল্‌ম শিক্ষা ও পালনের জন্য উৎসাহ ও সহযোগিত দিতে হবে।

৪. উপকরণকে ইবাদত মনে করে অন্যান্য মাসনূন উপকরণ বর্জন করা

আগেই বলেছি, বাহির হওয়া বা রাস্তায় চলা কোন ইবাদত নয়। ইবাদত হলো দ্বীন শিক্ষা, পালন ও দাওয়াত। এগুলির জন্য কুরআন, হাদীস ও ইসলামী বই পাঠ, আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি অনেক মাসনূন উপকরণ রয়েছে। অনেক সময় আবেগী মুসলিম অন্যকে কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থ পড়তে বা ইসলামী আলোচনা শুনতে নিরুৎসাহিত করেন। হয়ত বলেন, আগে আমল করুন। অথবা বলেন, এগুলির মধ্যে ভুল থাকতে পারে। এই বিষয়টি খুবই আপত্তি জনক। বিশেষত, কুরআন, তাফসীর ও হাদীসের মৌলিক গ্রন্থসমূহ বর্জন করে শুধুমাত্র দুই একটি বই ও নির্ধারিত কিছু আলোচনার উপর নির্ভর করে ইসলাম শিক্ষার ধারণা কঠিন অন্যায়।

৫. খেলাফে সুন্নাত সময় নির্ধারণকে ইবাদত বা সাওয়াবের অংশ ভাবা

দ্বীন শিক্ষা ও দাওয়াতের জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই। যে যতটুকু পালন করবেন ততটুকু সাওয়াব পাবেন। প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী, সময়সূচী ইত্যাদি তৈরী করা যেতে পারে। এগুলি সবই উপকরণ। সাওয়াব নির্ভর করবে মূল ইবাদত পালনের উপর। তিন মাসের জন্য বাহির হয়ে দুই মাসে ফিরে আসলে উক্ত দুই মাসের সাওয়াবের কোন কমতি হবে ধারণা ভিত্তিহীন। সময়ের উপর গুরুত্বারোপ খেলাফে সুন্নাত।

৬. ইসলামী পরিভাষার ভুল ব্যবহার ও অন্যান্য ইবাদতে অবহেলা

ইসলামে প্রত্যেক ইবাদতের নির্দিষ্ট নাম ও বিধান রয়েছে। যেমন : দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ, সৎকর্মে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ, আত্মশুদ্ধি। এ সকল ইবাদত পৃথক হলেও এদের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা আছে এবং সকল ক্ষেত্রেই আবেদ শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করে। অনেক সময় আমরা একটি ইবাদতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে অন্য একটি ইবাদতের প্রতি অবহেলা করি। যেমন, জিহাদ একটি পৃথক ইবাদত। আল্লাহর দ্বীন ও ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাজতের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের নির্দেশে তাঁর বা তাঁর মনোনীত সেনাপতির নেতৃত্বে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মূলত ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ। হাদীসে ও ফিকাহতে জিহাদ বলতে এই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বোঝান হয়েছে। 'আল্লাহর রাস্তায়' – বলতে মূলত এই যুদ্ধরত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

এছাড়া আভিধানিক অর্থে ব্যক্তি জীবনে ও সমাজে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকারের চেষ্টাকেও জিহাদ বলা যায়। এই অর্থে হাদীসে আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টাকেও জিহাদ বলা হয়েছে। নিয়মিত ওযু ও নামায আদায়কেও জিহাদ বলা হয়েছে। হজ্ব আদায়কেও জিহাদ বলা হয়েছে। সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করাকেও জিহাদ বলা হয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হালাল মাল উপার্জনের জন্য বা স্ত্রী-পুত্র ও পরিজনের সেবার জন্য বা পিতা-মাতার খেদমতের জন্য পথচলাকেও 'আল্লাহর রাস্তায়' চলা বলা হয়েছে। এগুলির অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি চাকুরি করল, উপার্জন করল বা সংসারের সেবা করল অথবা নামাযে রত থাকল বা আত্মশুদ্ধিতে রত থাকল তার জিহাদের ও যুদ্ধের দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল। অথবা, যে ব্যক্তি কোনো জালেম প্রশাসককে হক কথা বলে 'সৎকাজে আদেশের' ফরয পালন করল তাঁর জন্য আর শরীয়তের পরিভাষার 'জিহাদ' ও যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। হাদীসে কখনো

যিক্‌রকে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ ও শাহাদতের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে। এর অর্থ 'জিহাদ' নামক ইবাদতের দায়িত্ব ও গুরুত্ব কমানো নয়। এগুলি সার্বিক সুন্নাতের আলোকে বুঝতে হবে।

কখনো এই শাব্দিক ব্যবহার অবলম্বন করে আমরা একটি ইবাদতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অন্য ইবাদতকে অবহেলা করার পর্যায়ে চলে যাই। যেমন আত্মশুদ্ধিকেই জিহাদ মনে করে মূল জিহাদের দায়িত্ব হয়ে গেল মনে করি। অথবা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসকে দাওয়াত ও তাবলীগের অর্থে প্রয়োগ করি। ফলে আমরা মনে করি যে, জিহাদের সকল ফযীলত বোধ হয় আমরা পেয়ে গেলাম। একারণে শরীয়তের মূল জিহাদ ইবাদতের প্রতি আমাদের আর আগ্রহ থাকে না। তাবলীগের গুরুত্ব ইসলামে অনস্বীকার্য। তবে এর গুরুত্ব বর্ণনার অর্থ জিহাদ বা অন্য ইবাদতকে অবহেলা করা নয়।

এছাড়া এই পর্যায়ে অন্যভাবে ভুল করি। "আল্লাহর রাস্তায়" কর্মরত থাকার ফযীলতের হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলি যে, দাওয়াতের জন্য বাইরে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন কর্মে অনেক বেশি সাওয়াব। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সাওয়াবের ক্ষেত্রে বানোয়াট কথা বলা হয়, তেমনি "আল্লাহর রাস্তা" বলতে ভুল বুঝা হয়। এভাবে অনেকেই "বাহির হওয়া"-কেই ইবাদত মনে করেন।

একটি উদাহরণ চিন্তা করুন। হাদীসে ইল্‌ম শিক্ষার জন্য পথচলার প্রশংসা করা হয়েছে ও অফুরন্ত সাওয়াবের কথা বলা হয়েছে। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, পথ চলাই ইবাদত, কাজেই আমার বাড়ির পাশে ইল্‌ম শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান থাকলেও আমি বিশ্বের দূরতম প্রান্তে যেয়ে ইল্‌ম শিখব, অথবা যেহেতু পথ চলাতেই সাওয়াব সেহেতু আমি কোনো প্রতিষ্ঠানে ঢুকে ইল্‌ম শিক্ষা না-করে শুধু ইলমের সন্ধানে পথেই চলব, তাহলে কি এই ব্যক্তির চিন্তা ঠিক হবে? আসলে ইবাদত "ইল্‌ম শিক্ষা"-র মধ্যে। এখানে বাড়ির পাশের মাদ্রাসায় শিক্ষা করলেও পথচলা হবে, দূরে গেলেও পথ চলা হবে। সাওয়াব হবে ইল্‌ম শিক্ষা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় কষ্ট ও চেষ্টার জন্য।

৭. উপকরণকে অপরিবর্তনীয় মনে করা

উপকরণকে ইবাদত মনে করার আরেকটি পর্যায় হলো একে অপরিবর্তনীয় মনে করা ও এর ভুলত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা না-করা। বর্তমান যুগের "জামাতবদ্ধ দাওয়াত" ইসলামের প্রচার ও প্রসারের একটি অন্যতম মুবারক আন্দোলন। এটি একটি "ভ্রাম্যমাণ মাদ্রাসা"-র মতো সমগ্র বিশ্বে অগণিত মানুষকে ইসলামের পথে নিয়ে আসছে। তবে অন্যান্য সকল মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পদ্ধতির মতো এর পদ্ধতিও কিছু মানুষ তৈরি ও পালন করেছেন, যাঁদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া সময়ের পরিবর্তনে পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় খেলাফে-সুন্নাত আবেগের ফলে আমরা উপকরণকে ইবাদতের মতো অলঙ্ঘনীয় বলে চিন্তা করি। ফলে এর কোনো দোষ বলাও অপরাধ মনে করি। অথচ মুসলমানের দায়িত্ব হলো, মানব রচিত ও উদ্ভাবিত যে উপকরণ, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে যে ইবাদত পালনের চেষ্টা করে, তাহলে তাতে কোনো ভুল বা সুন্নাত-বিরোধিতা আছে কি-না তা বারবার যাচাই করা। আর যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে তা-হলে তা সংশোধন করা।

নূরানী কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি, দরসে নেযামী ইল্‌ম শিক্ষা পদ্ধতির মতো "জামাতবদ্ধ দাওয়াতের" পদ্ধতিও ইল্‌ম শিক্ষা, পালন ও দাওয়াতের ইবাদতকে "সুন্নাত পর্যায়ে" পালনের জন্য একটি নব-উদ্ভাবিত উপকরণ। কুরআন হাদীসের আলোকে যাঁরা এর উদ্ভাবন করেছেন তাঁরা ইনশা-আল্লাহ "সুন্নাতে হাসানা"-র সাওয়াব পাবেন। কিন্তু যারা এই উপকরণকে ইবাদত মনে করবেন, এর ভুলভ্রান্তি ও সুন্নাত বিরোধিতা চোখে পড়লেও তা সংশোধন করবেন না, বরং বিভিন্ন অজুহাত ও ওজর দেখিয়ে "সুন্নাত বিরোধিতা" স্থায়ী করতে চেষ্টা করবেন তারা নিজেদের এরূপ অপকর্মের জন্য অপরাধী হবেন। মিথ্যা বা অতি দুর্বল হাদীসের উপর নির্ভর করা, উপকরণকে ইবাদত মনে করা, ফযীলতের ক্ষেত্রে বাড়তি কথা বলা, ইসলামের কিছু দিক শেখানো ও কিছু দিক অবহেলা করা ইত্যাদি কিছু বিষয় এই মুবারক আন্দলোনের পদ্ধতিগত খেলাফে-সুন্নাত কর্ম। এগুলি দূর করতে পারলে তাঁরা তাঁদের কর্মের জন্য আরো বেশি সাওয়াব ও সফলতা লাভ করবেন বলেই সুন্নাতের আলোকে আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা দোয়া করি, দাওয়াতে কর্মরত মুহতারাম উলামায়ে কেরামকে আল্লাহ তাওফীক দান করুন, আমাদেরকে ও তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত বৃদ্ধি করুন এবং আমাদের সকলকেই পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসরণের তাওফীক দান করুন।

(ঙ). ইসলামী রাজনীতি : ইবাদত, উপকরণ বনাম বিদ'আত

সমাজের সকল পর্যায়ে ইসলামের পরিপূর্ণ প্রতিফলন বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা সকল ইসলাম প্রেমিক মানুষের প্রচেষ্টা। এজন্য কেউ ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণকেই উত্তম মাধ্যম মনে করছেন। কেউ ওয়াজ নসীহতকেই সর্বোত্তম মাধ্যম মনে করছেন। কেউ সার্বিক গণচেতনা জাগানোর জন্য বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদিকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছেন। কেউ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অধীনে দলীয় রাজনীতিকে এই ইবাদত পালনের সর্বোত্তম উপকরণ বলে মনে করছেন। সকলেই একই ইবাদত পালনের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করছেন। প্রত্যেকেই নিজ উপকরণ বেশি ফলদায়ক বলে মনে করছেন।

অন্যান্য উপকরণ ও পদ্ধতি যেহেতু ইসলামের প্রথম যুগ থেকে চলে আসছে এজন্য এসকল ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো বিতর্ক হয় না। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি আছে এবং উপকরণ ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য না করাতে অনেকে বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হন। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দাতা, তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

প্রথমত, ইসলামী সমাজে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও দলীয় রাজনীতি

(ক). রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দ্বীনের জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। একপর্যায়ে যখন মদীনার অধিকাংশ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন তখন সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর ওহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা

অনুযায়ী শাসন করেন এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের ও মুসলমানদের সংরক্ষণ করেন ।

(খ). খেলাফতে রাশেদার পরে সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক ধরনের ব্যতিক্রম, অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড দেখতে পান । এ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের পদ্ধতি ছিল কথাবার্তা, লিখনী ইত্যাদির মাধ্যমে শাসকগণকে পরিপূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে শাসন করতে এবং জনগণকে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থার মধ্যে চলতে আহ্বান করা ।

(গ). তাঁদের সামগ্রিক কর্মের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, যিনি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তাঁর জন্য পরিপূর্ণ ইসলাম অনুযায়ী দেশ পরিচালনা ফরয । আলেম, ফকীহ ও সমাজের দায়িত্ববানদের জন্য ফরয হলো শাসকের শাসন কার্জে তাঁকে সহযোগিতা করা, তাঁর কোনো ভুল হলে তাঁকে সংশোধনের পথ দেখানো ও সঠিক পথে শাসন পরিচালনা করতে আহ্বান করা ।

(ঘ). পূর্বের যুগগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহ বা রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া 'সরকার পরিবর্তন'-এর কোন সুযোগ ছিল না । এজন্য সাহাবী, তাবেয়ীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সকল যুগে আলেম, ফকীহ ও সমাজ সংস্কারকগণ সাধারণত 'সরকার পরিবর্তন' করার সকল প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করেছেন । তাঁরা সর্বদা 'সরকারকে সংশোধন' করতে চেষ্টা করেছেন ।

(ঙ). বর্তমান যুগে আমরা একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি, যা তাঁদের যুগে ছিল না । একদিকে আমরা অনেকে এমন সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস করি যেখানে সামান্য কিছু ইসলামী ব্যবস্থার পাশাপাশি সর্বস্তরে অনৈসলামিক পরিবেশ ও ব্যবস্থা বিদ্যমান । এগুলির প্রতিবাদ করা ও পরিবর্তনের চেষ্টা করা আমাদের উপর ফরয । অপরদিকে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে আমরা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি শিখতে পেরেছি, যা পূর্ব যুগের মুসলিমগণ কোনোদিন জানতেন না । আগের যুগে নির্বিঘ্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না । বর্তমানে তা আছে । তার মাধ্যম হচ্ছে আধুনিক গণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতি ।

(চ). রাজনীতি বলতে বুঝাচ্ছি – গণতান্ত্রিক পন্থায় দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে পছন্দসই মানুষকে সরকারে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া । রাজনীতি বলতে রাষ্ট্র পরিচালনা বুঝাচ্ছি না । যে মুসলমান রাষ্ট্রক্ষমতা বা বিচারক্ষমতা গ্রহণ করেছেন তাঁর জন্য সুন্নাতে মুহাম্মাদী অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা ফরয । অন্যদের জন্য তাকে পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করা ফরয । এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই । বিতর্ক হচ্ছে নব উদ্ভাবিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়ে । প্রশ্ন হলো : আমরা এখন কী-ভাবে কাজ করব? সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের মতো শুধুমাত্র শাসক ও জনগণকে ইসলামের দিকে আহ্বান, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখব ? না-কি এই আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করব ?

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক ও দলীয় রাজনীতির সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত

(১). রাজনীতি না করা

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে অনেক খ্যাতনামা আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, চিন্তাবিদ ও ধার্মিক মানুষ আধুনিক দলীয় ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন । কারণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বা সমাজের ইসলাম বিরোধী কাজ রোধে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ , তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা তাবে- তাবেয়ীগণ কখনো রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের জন্য দলগঠন, নির্বাচন ইত্যাদি করেননি । তাঁরা শাসক ও জনগণকে ইসলাম মতো চলতে আহ্বান করতেন, শাসকের ভুলগুলি তাকে বলে তাকে সংশোধিত হতে আহ্বান করতেন এবং ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রচারে সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন । কাজেই, আমাদেরও সেভাবে চলা উচিত ।

এখানে সমস্যা হলো ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত বর্জনের মধ্যে পার্থক্য না করা । প্রথম যুগের মুসলিমগণ দলীয় রাজনীতি করেননি বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন করে ভালো সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি তার কারণ হলো এই ব্যবস্থা তাঁদের যুগে ছিল না । তাঁদের সমাজে রাষ্ট্রের শাসককে শান্তিপূর্ণভাবে পরিবর্তন করা যেত না । তাই তাঁরা সাধারণত শাসকের পরিবর্তনের চেষ্টা না করে তার সংশোধনের চেষ্টা করতেন । কিন্তু বর্তমান সময়ে সে সুযোগ আছে । আমরা যদি তা ব্যবহার না করি তাহলে দুই দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হব :

প্রথমত, সৎকাজে আদেশ ও সমাজের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিবর্তন করে পরিপূর্ণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার একটি বড় মাধ্যম আমরা হারাব । যদিও আমাদের দায়িত্ব শুধু চেষ্টা করা । সালফে সালেহীনের পদ্ধতিতে কথা, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে চেষ্টা করলেই আমাদের দায়িত্ব পালিত হবে, তবুও অধিক উপকারী মাধ্যম অকারণে পরিত্যাগ করা অনুচিত ।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে সমাজে যারা ইসলামী মুল্যবোধের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা চান না, তারা এই মাধ্যম ব্যবহার করে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ রোধ করবেন । একারণে, ইসলামের বিরুদ্ধে সকল প্রচেষ্টার মুকাবিলা করাও আমাদের দায়িত্ব ।

এজন্য রাজনীতিকে একটি নব উদ্ভাবিত উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ইসলামী শরীয়তের শিক্ষার আলোকে শরীয়ত-সম্মতভাবে সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি ইসলামের সুনির্দিষ্ট ইবাদত পালনের মাধ্যম হিসাবে একে ব্যবহার করতে হবে ।

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সকল যুগের সকল জাতির সকল মানুষের পালন ও অনুসরণ যোগ্য করে প্রেরণ করেছেন । জাগতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জনকল্যাণমূলক ও প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ইসলামে খুবই প্রশস্ততা রাখা হয়েছে । যেন প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মানুষ তাদের সমাজের প্রচলিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির মধ্যে থেকেই পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে । এরই একটি দিক হলো রাষ্ট্র পরিচালনার দিক ।

মহিমাময় আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ গ্রহণের এবং ন্যায়নীতি ও ইনসাফের সাথে শাসনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন । কিন্তু পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেননি । যেন সকল যুগের ও সকল দেশের মানুষ নিজ নিজ দেশের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলামের অনুশাসনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারে। ফলে অতীত যুগের এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত গোত্রীয় বা রাজতান্ত্রিক

কাঠামোর মধ্যে থেকে ইসলামের এই নির্দেশ পালন সম্ভব ছিল। এজন্য কোনো সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। তেমনি বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও একইভাবে আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করা সম্ভব। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের পরামর্শ গ্রহণের একটি নব উদ্ভাবিত উপকরণ ও পদ্ধতি হলো গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি। যেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ আছে সেখানে মুসলিমগণ শরীয়তের নির্দেশনার ভিতরে তা ব্যবহার করবেন।

(২). উপকরণকে ইবাদত মনে করা

অপরপক্ষে যারা প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামের খেদতম ও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশের চেষ্টা করছেন তারাও এক্ষেত্রে বহুবিধ খেলাফে সুন্নাত বা বিদ'আত কর্ম ও ধারণার মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন।

প্রধান বিভ্রান্তি হচ্ছে, তাঁরা এই 'উপকরণ'-কে ইবাদত মনে করছেন। লাফালাফি করে যিক্‌রকারী যেমন যিক্‌রের ফযীলতে বর্ণিত আয়াত ও হাদীসকে নিজের কাজের প্রমাণ হিসাবে পেশ করে তার 'লাফালাফিকে' ইবাদত হিসাবে প্রমাণ করছেন, চিল্লা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাবলীগের ইবাদত আদায়কারী যেমন দাওয়াত, তাবলীগ ও জিহাদের আয়াত ও হাদীসকে নিজের বিশেষ পদ্ধতির সমর্থনে পেশ করছেন, তেমনিভাবে রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত, সংস্কার, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইবাদত পালনকারী সৎকর্মে আদেশ, অসৎকর্ম থেকে নিষেধ, জিহাদ, দাওয়াত ইত্যাদি বিভিন্ন ইবাদতের সাধারণ ফযীলতমূলক আয়াত ও হাদীসকে তার বিশেষ পদ্ধতির সপক্ষে পেশ করে তাঁর পদ্ধতিটাকেই ইবাদত বলছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ এ সকল ইবাদত করেছেন, তবে এই দলীয় রাজনীতির পদ্ধতিতে নয়। আমরা জানি যে, উপকরণ কখনো উপকরণ হিসাবে জরুরি হতে পারে, কিন্তু উপকরণকে ইবাদত, ইবাদতের অংশ বা সাওয়াবের কারণ মনে করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করি :

(ক). রাজনৈতিক দল গঠন, সদস্য, সমর্থক ইত্যাদি ফরম পূরণ বা দলে নাম লিখানো, সদস্যসংগ্রহ, ভোট, প্রার্থি, প্রচার ইত্যাদি ইবাদত হতে পারে না, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলি এভাবে করেননি। এগুলিকে ইবাদত বা ইবাদতের অংশ মনে করার অর্থ লাফালাফিকে যিক্‌রের অংশ মনে করা। উভয়ই একই প্রকার বিদ'আত।

(খ). আমাদের দেখতে হবে এই কাজগুলির মাধ্যমে আমরা কোন্ ইবাদত করতে চাচ্ছি। অনেকে একে "ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব" বলে মনে করি। ইসলাম মানব জীবনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। এখানে "রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা", "ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি পৃথকভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ইবাদতের নাম দেওয়া হয়নি। এখানে সার্বিকভাবে "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সকল পর্যায়ে ইসলামের ঈমান, ইবাদাত, মুআমালাত বা ইসলামী বিশ্বাস, ইবাদত ও ইসলামী জাগতিক ব্যবস্থাদি প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই যিনি এগুলির সব একত্রে বা এগুলির কোনো একটি প্রতিষ্ঠা করার কাজে রত রয়েছেন তিনিই "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে রত রয়েছেন। এখন পদ্ধতি ও উপকরণের কারণে যদি কেউ মনে করেন যে, আমার কর্ম "দ্বীন প্রতিষ্ঠার ইবাদত" বলে গণ্য ও আপনার কর্ম এই ইবাদত বলে গণ্য নয় তাহলে তা বিদ'আত, বিচ্ছিন্নতা ও অকারণ বিবাদে পরিণত হবে।

(গ). দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই দায়িত্ব কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় "হুসবা" বা "আমরু বিল মা'রুফ ওয়ান নাহউ আনিল মুনকার" অর্থাৎ সৎকাজে আদেশ দান ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমান যুগে কোনো কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ কুরআন কারীমের ব্যবহারের আলোকে একে "ইকামতে দ্বীন" বা "দ্বীন প্রতিষ্ঠা" বলে অভিহিত করেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দুই পর্যায়ের : ফরয আঈন বা ব্যক্তিগত ফরয দায়িত্ব ও ফরয কিফায়াহ বা সামষ্টিক ফরয দায়িত্ব। মুসলিমের ব্যক্তি জীবনে ও নিজের অধিনস্থদের জীবনে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা তার জন্য ফরয আঈন দায়িত্ব। সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যদের জীবনে তা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা সাধারণভাবে ফরয কিফায়া।

(ঘ). সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বে দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণসহ পূর্ববর্তী যুগের মুসলিম উম্মাহর উপকরণ ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। এবং উপকরণের বিবর্তন ও নতুন উপকরণের প্রয়োজনীয়তাও দেখেছি।

(ঙ). এই অবস্থায় আমরা বলতে পারি, যে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, ওয়াজ, লিখনী, প্রচার, তাবলীগ ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড দূর করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে, অথবা ইসলমী ব্যবস্থার কোনো দিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন তিনিও "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে নিয়োজিত। অপরদিকে যিনি রাজনৈতিক দল গঠন, ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এই দায়িত্ব পালন করছেন তিনিও "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে নিয়োজিত। কোন্ উপকরণ বেশি সুন্নাত-সম্মত, কোন্ উপকরণ বর্তমান সমাজের জন্য বেশি উপাকরী বা উপযোগী ইত্যাদি বিষয়ে আমরা অনেক আলোচনা ও বিতর্ক করতে পারি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কোনো একটি নতুন ও খেলাফে-সুন্নাত উপকরণকে একমাত্র উপকরণ বা ইবাদতের অংশ মনে করতে পারি না।

(চ). উপকরণ বা রাজনীতিকে ইবাদত মনে করার ফলে অনেকে মূল ইবাদত পালনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি মনে করছেন যে, প্রথম ব্যক্তির "দ্বীন প্রতিষ্ঠার" দায়িত্ব পালিত হচ্ছে না। অথবা এই কাজগুলি কোনোটিই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ নয়, শুধুমাত্র পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাজনীতিই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ। অথবা উপরের কাজগুলি সবই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ বলে গণ্য হবে, যখন ঐ ব্যক্তি আমরা দলের ব্যানারে বা অনুরূপ কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে তা করবে। এই চিন্তাগুলি সবই বিদ'আত ও উপকরণকে ইবাদত মনে করার ফল। অর্থাৎ, তিনি মনে করছেন যে, সদস্য ফরম পূরণ করা অথবা দলে নাম লিখানো "দ্বীন প্রতিষ্ঠা" নামাক ইবাদতের অংশ। এই অংশটুকু বাদে দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্য সকল কাজ অপূর্ণ রয়ে যায়।

এই ব্যক্তির উদাহরণ ঐ ব্যক্তিটির মতো যিনি বলেন যে, আপনি যতই তাকওয়া, ইবাদত, জিহাদ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা করুন,

আমার পীরের মুরীদ না হলে আপনার কোনো কাজই ইবাদত বলে গণ্য হবে না, অথবা এগুলির পূর্ণ সাওয়াব পাবেন না। তিনিও উপকরণকে ইবাদতের অংশ মনে করছেন।

এই পর্যায়ের বিদ'আতে ইসলামী রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত অনেক মানুষই নিপতিত হচ্ছেন। শুধুমাত্র নিজের দলে যোগ না দেওয়ার কারণে বা সক্রিয় গণতান্ত্রিক দলীয় রাজনীতি না করার জন্য অন্য পদ্ধতিতে বা সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের পদ্ধতিতে "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির কঠোর সমালোচনা করছেন। তাঁর দাবি ঐ ব্যক্তি এই ইবাদতটি করছেনই না। অর্থাৎ, তিনি রাজনীতিকেই একটি পৃথক ইবাদত মনে করছেন। তিনি এমন একটি উপকরণকে ইবাদত মনে করছেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ ব্যবহার করেননি। এই সমালোচনা পাল্টা সমালোচনার সৃষ্টি করে। এভাবে ইসলামী কর্মে নিয়োজিত মানুষেরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হন।

(৩). ফরযে আইনকে ফরযে কেফায়া বা উপকরণের অধীন কল্পনা করা

অনেক আবেগী ইসলাম-প্রিয় মুসলিম রাজনীতিকে শুধু ইবাদতই নয়, আরকানে ইসলাম ও অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, রাজনীতির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে তো ইসলাম ঠিকমতো পালন করা যাচ্ছে না। কাজেই, যে ব্যক্তি "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র দায়িত্ব পালন করছেন না, অথবা "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র জন্য জন্য অন্যান্য মাসনূন বা 'গাতানুগতিক' পদ্ধতিতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু রাজনীতি করছেন না তাঁর শুধু এই একটি ইবাদতই নষ্ট হচ্ছে না, বরং তাঁর অন্যান্য ইবাদতও হচ্ছে না ; বা হলেও কম সাওয়াব হচ্ছে। এজন্য তিনি "রাজনীতি" না করে শুধু ঈমান বিশুদ্ধ করা, নামায আদায় করা, যিক্‌র করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্ব করা, রোযা রাখা, ইল্‌ম শিক্ষা, দাওয়াত প্রদান ইত্যাদি সকল ইবাদত পালনকে অর্থহীন বা অপূর্ণ বলে দাবি ও প্রচার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজে জঘন্য হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়াও তাঁরা কয়েকভাবে অনেকগুলো ভুল করছেন :

প্রথমত, রাজনীতি কোনো ইবাদত নয়। 'দ্বীন প্রতিষ্ঠা' নামাক ইবাদত পালনের অনেক উপকরণের মধ্যে একটি নতুন উপকরণ। কিন্তু আমরা উপকরণকেই ইবাদত ভাবছি।

দ্বিতীয়ত, কোনো একটি ইবাদত না করলে অন্য কোনো ইবাদত হবে না, – একথা বলতে হলে স্পষ্টভাবে কুরআন বা হাদীসের নির্দেশনা প্রয়োজন। শুধুমাত্র যুক্তিতর্ক দিয়ে একথা বললে আল্লাহর নামে বানোয়াট কথা বলা হবে। কেউ যদি সমাজের অন্যায় ও ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড দেখে অসন্তুষ্ট হলেও এর প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য একেবারেই চেষ্টা না করেন তাহলে তিনি গোনাহগার হবেন। কিন্তু তাঁর অন্য কোনো ইবাদত কবুল হবে না বা সাওয়াব হবে না অথবা কম হবে – একথা স্পষ্টভাবে কোথাও বলা হয়নি। আর যদি তিনি নিজের সাধ্যমতো অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, তাহলে নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার না করার জন্য তাঁর কোনো গোনাহ হবে মনে করা খেলাফে-সুন্নাত।

তৃতীয়ত, ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ব্যক্তি জীবনে "দ্বীন প্রতিষ্ঠা" ফরয আঈন। সমাজ ও রাষ্ট্রে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা "ফরয কিফায়া"। প্রথম প্রকারের ইবাদতের জন্য মুমিন ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ও এর শাস্তি বা পুরস্কার পাবে। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদত সামাজিক দায়িত্ব। এক্ষেত্রে মু'মিনের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের অন্যান্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, আহ্বান করা, নির্দেশ দেওয়া ও নিষেধ করা। সাধ্য ও ক্ষমতা অনুসারে তা পালন করতে হবে। দাওয়াত ও আহ্বানের দায়িত্ব পালনের পরে যদি কেউ না শোনেন, তাহলে মু'মিনের কোনো গোনাহ হবে না। সমাজ পরিবর্তন, অন্যায় রোধ বা ইসলাম প্রতিষ্ঠা এই পর্যায়ের ইবাদত। এজন্য মু'মিনের সাধ্যমতো আহ্বান, নির্দেশ ও নিষেধের পরেও সমাজের মানুষ ইসলাম বিরোধী কর্মে লিপ্ত থাকলে সে জন্য তাঁর কোনো অপরাধ হবে না। আর এই আহ্বান, নির্দেশ ও নিষেধের ইবাদত পালনে মু'মিন সুন্নাতের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করতে বাধ্য নয়। আমরা বিষয়টি উল্টে নিয়েছি এবং মনে করছি – সমাজের অন্য মানুষে গোনাহ করছে বলে আমার সাওয়াবের কাজ বোধহয় কবুল হচ্ছে না।

চতুর্থত, এই ধারণা ও কর্মের ফলে "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্ম ব্যহত হচ্ছে। সমাজে অনেক ধার্মিক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে সরাসরি বা সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজনীতা অনুভব করেন-না বা স্বীকার করেন-না। তবে তাঁরা ইসলামকে ভালবাসেন ও ধার্মিক মানুষদেরকে ভালবাসেন। সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত না থাকলেও ভোটাভুটির সময় তাঁরা ইসলামপ্রিয় ধার্মিক মানুষকে ভোট দিতে আগ্রহী থাকেন। কিন্তু "ইসলাম প্রিয় ধার্মিক রাজনীতিবিদের" পক্ষ থেকে যখন এ সকল রাজনীতি বিমুখ ধার্মিক মানুষগুলিকে গালাগালি করা হয় এবং তাঁদের কোনো ইবাদতই হচ্ছে-না বলে বলা হয় তখন স্বভাবত মানবীয় দুর্বলতা ও জেদাজেদির ফলে তাঁরা উক্ত ইসলামী রাজনীতিতে লিপ্ত ব্যক্তির বিরোধিতা ও গালাগালিতে লিপ্ত হন।

অথচ, ইসলামী রাজনীতিতে লিপ্ত ব্যক্তি যদি এদের ধর্মপালনের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও প্রকৃত ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধসহ এদেরকে বুঝাতেন যে, আপনারা যে উদ্দেশ্যে নামায, যিক্‌র, মাদ্রাসা, দাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতে নিয়োজিত রয়েছেন সেই উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্যই আমরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছি। আপনারা ও আমরা সকলেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মে নিয়োজিত। আপনারা আপনাদের প্রক্রিয়া কাজ করুন, আমাদের জন্য দোয়া করুন এবং অন্য সময় সক্রিয় না-হলেও ভোটের সময় সেই ব্যক্তিকে ভোট দিন যিনি আপনাদের এই কর্মগুলি করবেন ও করাবেন। প্রচলিত "রাজনৈতিক মুনাফেকী" নয়, প্রকৃত ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধসহ এভাবে কাজ করলে "দ্বীন প্রতিষ্ঠা"-র কর্ম উত্তমরূপে পালিত হতো।

উপকরণকে ইবাদত মনে করার কারণেই আমরা চিন্তা করি যে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দলে নাম লিখানো এবং দলের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া ফরয আঈন। কাজেই, দলে নাম না লিখিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্যান্য কর্মে রত থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এতে "দ্বীন প্রতিষ্ঠার"-র দায়িত্ব পালিত হবে-না বা পূর্ণ হবে-না। এভাবে আমরা এমন একটি কর্মকে দ্বীনের অংশ

মনে করছি যা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ দ্বীন হিসাবে পালন করেননি।

(৪). অন্য কিছু ইবাদতকে অবহেলা করা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আভিধানিক অর্থে নিজ জীবনে বা সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টাই জিহাদ। তবে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ একটি বিশেষ ইবাদত। ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাজত, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সংরক্ষণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে তাঁর নেতৃত্বে কাফির বা বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ফিকহের পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়। হাদীসেও মূলত জিহাদ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন কারীমে এই অর্থে ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রচেষ্টার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

"দ্বীন প্রতিষ্ঠার" ইবাদত বা "আমর বিল মা'রুফ ওয়ান নাহইউ আনিল মুনকার" নামক ইবাদতকে শাব্দিক অর্থে "জিহাদ" বলা চলে এবং এ বিষয়ে কিছু হাদীস রয়েছে। তবে ইসলামের পরিভাষাগত জিহাদ অন্য ইবাদত। রাজনীতিকে জিহাদ বলে জিহাদের সকল আয়াত ও হাদীস এক্ষেত্রে ব্যবহার করে আমরা অনেক সময় মনে করছি যে, আমরা বোধহয় মূল জিহাদের সাওয়াব পেয়ে যাচ্ছি। যেমন, কেউ মনে করছেন যে, আত্মশুদ্ধি করে বা নিয়মিত নামায আদায় করে বা দাওয়াতের কাজ করেই তিনি জিহাদের ইবাদত আদায় করছেন। এতে মূল জিহাদ নামক ইবাদতের প্রতি অবহেলা হচ্ছে।

(৫). ইসলামী পরিভাষার অপব্যবহার ও ভুল ধারণা

এছাড়া এভাবে 'জিহাদ' শব্দের অপব্যবহার হচ্ছে। ফিকহ শাস্ত্রে পারিভাষিক জিহাদের যে সকল বিধান আছে, দাওয়াত, আত্মশুদ্ধি, সমাজশুদ্ধি বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক উপকরণের ক্ষেত্রে সেসকল বিধান ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, যুদ্ধের সময় রেশম পরিধান করার বা দাড়িতে খেযাব লাগানোর অনুমতি আছে। এখন কোনো আত্মশুদ্ধি, তাবলীগ বা রাজনীতির মাধ্যমে 'জিহাদ' পালনকারী নিজের জন্য এগুলি জায়েয করে নিচ্ছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বে জিহাদের ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষকে আঘাত করা, হত্যা করা ও যুদ্ধের অন্যান্য বিধান আছে। আমরা অনেক সময় দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিকে পারিভাষিক 'জিহাদ' মনে করে সে ক্ষেত্রেও বিরোধী ব্যক্তিকে আঘাত করা জায়েয ভেবে স্পষ্ট হারামে নিপতিত হই। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত না দেখে সাধারণ ফযীলতের আয়াত ও হাদীসের উপর আমল করতে যেয়ে আমরা পাপে নিপতিত হই।

তাঁদের সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা, সমাজ সংস্কার, অন্যায় পরিবর্তন, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদত পালনের দুটি পর্যায় রয়েছে : রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র বহির্ভূত বা ব্যক্তিগত ও দলগত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োজনে এগুলির ক্ষেত্রে ক্ষমতা ব্যবহার করা ফরয। আর রাষ্ট্র বহির্ভূত ব্যক্তিগত বা দলগত পর্যায়ে এগুলি পালনের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

আইনানুগ বিচারকের বিচার ও রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ ব্যতিরেকে কাউকে আঘাত করা, শাস্তি দেওয়া বা হত্যা করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম কবীরা গোনাহগুলির অন্যতম। ইসলামী বিচার বা রাষ্ট্র না থাকলে বিভিন্ন সুন্নাত সম্মত "গতানুগতিক" বা প্রয়োজনীয় নতুন উপকরণের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থার বাইরে আইন, বিচার বা শাস্তি প্রদান করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে ও নেতৃত্বেই শুধুমাত্র এই পর্যায়ের জিহাদ ও বিচার করা যায়।

ব্যক্তি বা দলপর্যায়ের দাওয়াত বা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজকে যতই শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা হোক তা কখনোই ইসলামের পারিভাষিক জিহাদ নয়, বরং তা 'সংস্কার' ও 'পরিবর্তন' এবং শরীয়তের পরিভাষায় তা 'দাওয়াত' বা 'আদেশ-নিষেধ'। এক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন ও শরীয়ত-সিদ্ধ উপকরণাদি ব্যবহার করতে হবে।

"খারিজী' ও "বাতেনী শিয়া" সম্প্রদায় ছাড়া মুসলিম উম্মাহর আলেমগণ কখনোই দলকে "রাষ্ট্র" ভাবা, দলগত "সৎকাজে আদেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ" বা "ইসলাম প্রতিষ্ঠার" কর্মকে জিহাদ মনে করা এবং দল বা দল প্রধানের নির্দেশে রাষ্টের নাগরিককে হত্যা, অপহরণ, সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি কর্মের অনুমতি দেননি বা এ ধরনের কর্মে কেউ লিপ্ত হননি। তাঁরা সর্বদা সাহাবীগণের কর্মের আলোকে ব্যক্তি বা দলগত কর্ম ও রাষ্ট্রগত কর্মের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করেছেন।

(৬) উপকরণের অনৈসলামিক ব্যবহার

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাজনীতির মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত, বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে ইউরোপে। এর অনেক পদ্ধতি বা কর্মকাণ্ড রয়েছে যা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের বিরোধী। আমরা দেখেছি যে, নব-উদ্ভাবিত উপকরণকে ইসলামের শিক্ষার আলোকে ব্যবহার করতে হবে। এজন্য মুসলিম উম্মাহকে রাজনীতির উপকরণ ব্যবহারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে উলামাগণ পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিটি ইসলামের আলোকে ব্যবহার করা যাবে কি- না।

যেমন, হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ, র‍্যালি, ভোট ও ভোটের প্রচারণা, বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা, একদল কর্তৃক অন্য দলের ভুল জনগণের সামনে তুলে ধরা ইত্যাদি বিষয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ। এগুলির সাথে বিভিন্নভাবে ইসলামী মূল্যবোধ, দায়িত্ব ও অধিকারের চেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদির সংঘর্ষ হতে পারে।

যেমন, হরতালের সময় কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ কাজ বন্ধ করে দেন। ইসলামের নির্দেশে কর্মচারী বা কর্মকর্তা কর্মদাতার সাথে চুক্তি মোতাবেক পরিপূর্ণ সময় কর্ম করতে বাধ্য। তিনি তাঁর চুক্তি বাতিল করতে পারেন, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ করতে পারেন না। তাহলে জুলুম ও মানুষের হক্ক নষ্ট করার পাপে পতিত হবেন। তিনি তাঁর কর্মদাতার অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু পাপের মাধ্যমে নয়। কর্মদাতার অন্যায়ের ক্ষেত্রেও তিনি কর্ম না করে টাকা নিতে পারেন না। আইনানুগ পদ্ধতিতে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে পারেন।

তাহলে যেক্ষেত্রে কর্মদাতার কোনো অন্যায় নেই, রাষ্ট্রের বা অন্য কারে অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি চুক্তির খেলাফ করে কর্মবর্জনের পাপ

করবেন কী-ভাবে! বিষয়টি খুবই সতর্কতার সাথে বিচার করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য একদিন আল্লাহর দরবারে চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। এই দুনিয়ার সামাজিক জীবনে এ সকল হক্ক নষ্ট করা হয়ত আমরা খুবই হালকাভাবে দেখি, কারণ, কোনো অন্যায় সর্বত্র ঘটতে দেখলে তা গা-সওয়া হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর হিসাবে আমরা পার হতে পারব কি?

হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাউকে বলপূর্বক অংশগ্রহণ করানো একেবারেই না-জায়েয। কারো জান বা মালের ক্ষতি করা একেবারেই হারাম। বিভিন্ন দলীয় প্রচারণার ক্ষেত্রে খুবই নোংরাভাবে আমরা গীবতের আশ্রয় গ্রহণ করি। একদিকে যেমন রয়েছে নিজ দলের কথা জনগণের কাছে বলার প্রয়োজনীয়তা, অপরদিকে কারো সমালোচনার ক্ষেত্রে সংযমের জন্য ইসলামের নির্দেশ। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করবেন ইসলামী রাজনীতিতে জড়িত নেতৃবৃন্দ। ইসলামের দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য যেমন শরীয়তসঙ্গত হতে হবে, উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতিও শরীয়তসঙ্গত হতে হবে। ওয়াজিব উদ্দেশ্য পালনের জন্য আমরা হারাম মাধ্যম ব্যবহার করতে পারি না। সর্বোপরি এখানে বান্দার হক জড়িত।

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিভিন্ন দল থাকবেই। বিভিন্ন দল নিজ নিজ দলের উপযোগিতা ও অন্যান্য দলের দুর্বলতা বলবেন। কিন্তু এই পদ্ধতি অনেক সময় ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় আমরা রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা বা 'ইসলামী দলের' বিরোধিতাকে 'ইসলাম বিরোধিতা' বলে মনে করে রাজনৈতিক বিরোধীকে ইসলামের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করি। অথবা আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতাকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মধ্যে 'ভালো কাজের প্রতিযোগিতা' ( ) হিসাবে গ্রহণ না করে ব্যক্তিগত শত্রুতার পর্যায়ে গ্রহণ করি। ফলে মুসলমানদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি, গীবত, মারামারি এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত হয়। কিভাবে এই ঘৃণিত হারাম থেকে সমাজের মুসলমানদের রক্ষা করা যাবে তা নিয়ে ভাববেন আমাদের প্রাজ্ঞ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

(৭). প্রশস্ততাকে সঙ্কীর্ণ করা

রাজনীতি যেহেতু একটি নতুন উপকরণ। এর ব্যবহার করতে হবে শরীয়তের শিক্ষার আলোকে ও শরীয়তের বিধিবিধানের মধ্যে থেকে। এর ব্যবহারের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে। পৃথক দলগঠন করা, কোনো বৃহৎ দলকে সমর্থন করা, ক্ষমতার 'লবি' তৈরি করা, কোনো দলকে শর্তসাপেক্ষ সমর্থন দান করা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, মৌন সমর্থন ও ভোট প্রদান ইত্যাদি বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার করা যাবে। কিভাবে ব্যবহার করলে বা বর্জন করলে মুসলিম উম্মাহর বেশি উপকার হবে তা উলামায়ে কেরাম ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। বিভিন্ন দেশ ও সমাজের পরিস্থিতির কারণে তা বিভিন্ন হবে। তেমনি একই দেশের আলেমগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধের সুযোগ রয়েছে। নিঃসন্দেহে এ সকল ক্ষেত্রে এজমা বা ঐকমত্যই সর্বোত্তম অবস্থা। তবে সাধারণত তা সম্ভব নয়। এজন্য এই নব উদ্ভাবিত উপকরণের ব্যবাহরের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সাথে প্রত্যেকে নিজ পথে কর্ম করাই সুন্নাতের শিক্ষা। এক্ষেত্রে মতবিরোধকে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, ঝগড়াঝাটি ও কাদা ছোড়াছুড়ির মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষার বিপরীত।

বর্তমান যুগে ইসলামী কর্মে লিপ্ত মানুষদের মধ্যে যত কোন্দল, ভেদাভেদ ও কাদা ছোড়াছুড়ি তার একটি বড় কারণ হলো মূল ইবাদত ও উপকরণের মধ্যে পার্থক্য না বুঝে উপকরণকে ইবদাত মনে করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে থাকার তৌফিক দান করুন।

(চ). ইসলামী তাসাউফ : ইবাদত, উপকরণ বনাম বিদ'আত

উপকরণকে ইবাদত মনে করে বিভিন্ন প্রকারের খেলাফে সুন্নাত বিশ্বাস ও কর্ম তাসাউফের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখানে কিছু বিষয় আলোচনার চেষ্টা করব। আল্লাহর তৌফিক ছাড়া আমার মতো নগন্য মানুষের পক্ষে কিছুই সম্ভব না। আমি তাঁর কাছে তাওফীক ও ক্ষমা প্রাথনা করছি।

প্রথমত, তাসাউফ : পরিচিতি ও বিবর্তন

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আমাদের মন, হৃদয় বা ক্বলবগুলিকে পার্থিব লোভ, লালসা, হিংসা, ঘৃণা, অহংকার ইত্যাদি থেকে মুক্ত করা এবং আল্লাহর ভয়, মহব্বত, ভক্তি, ক্রন্দন, তাওবা, সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের ক্বলবের মতো করে নেওয়া ইসলামের একটি অন্যতম ইবাদত। এই আত্মশুদ্ধির পদ্ধতিকে সাধারণত 'তাসাউফ' বলা হয়। কুরআন, হাদীস ও সাহাবীদের বক্তব্যে 'তাসাউফ' শব্দটির কোনো উল্লেখ নেই। পরবর্তী যুগে এ শব্দটির প্রচলন হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন-পদ্ধতি ও সুন্নাত পর্যালোচনা করলে এই আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুব সহজেই আমরা অনুধাবন করতে পারি। বস্তুত এই পর্যায়ের আত্মশুদ্ধি ছিল তাঁদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরবর্তী যুগে যখন অনেক মুসলমান শুধুমাত্র ফরয পালন বা পার্থিব ভোগবিলাসের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতে শুরু করলেন তখন কিছু বুজুর্গ বিশেষভাবে আত্মশুদ্ধির জন্য গুরুত্ব আরোপ করে কথাবার্তা ও কাজ করতে থাকেন। এভাবে তাসাউফ পৃথক শাস্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসরণ করে, আত্মিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতায় সুন্নাত মানে উন্নীত হওয়াই তাসাউফের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

পরবর্তী যুগে তাসাউফের মধ্যে অনেক খেলাফে-সুন্নাত প্রবেশ করেছে। কখনো অজ্ঞতা, কখনো আবেগ, কখনো ভণ্ডামী এ সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজের কারণ ছিল। ৩য়- ৪র্থ হিজরী শতক থেকেই প্রসিদ্ধ সূফীগণ এ সকল খেলাফে-সুন্নাতের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তারা বারবার বলেছেন, এখন আর তাসাউফ নেই, শুধু ভণ্ডামীতেই দেশ ভরে গিয়েছে।

৫ম হিজরী শতকের অন্যতম সূফী আবুল কাসেম আব্দুল করীম ইবনু হাওয়াযিন আল কুশাইরী (৪৬৫ হি.) তার তাসাউফের গ্রন্থ "আর-রিসালাহ আল-কুশাইরিয়াহ"-তে এসকল কথা বারবার লিখেছেন। তাসাউফের নামে ভণ্ডামী, নষ্টামী ও ব্যবসার প্রসারের

জন্য তিনি রক্ত ঝরিয়ে কেঁদেছেন।[১]

এ সকল ভণ্ডামির পাশাপাশি সুন্নাতের জ্ঞানের অভাবে সাধারণ মানুষ ধোঁকা খেতে থাকেন এবং ক্রমান্বয়ে তাসাউফের নামে অগণিত খেলাফে-সুন্নাত কাজকর্ম মুসলিম সমাজে ছড়াতে থাকে। যুগে যুগে প্রখ্যাত সংস্কারকগণ এ সকল খেলাফে সুন্নাত রোধ করার চেষ্টা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (১০৩৪ হি./১৬২৪খ্রি.), শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১১৭৬ হি./১৭৬২ খ্রি.), সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী শহীদ (১২৪৬ হি./১৮৩১খ্রি.) প্রমুখ বুজুর্গ প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন সকল প্রকার শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও ভণ্ডামী থেকে তাসাউফ ও সূফী সমাজকে রক্ষা করার। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাঁদের পরের যুগগুলিতে তাঁদেরই নামে শতশত বিদ'আত প্রচলিত হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সুন্নাতের আলোকে তাসাউফের আমল

(১). ফরয পালনের পর বেশি বেশি নফল পালনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন:

...

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন ও ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয পালনই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য প্রিয়তম কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্যের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রীয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।"[২]

তাসাউফের মূল হচ্ছে যাবতীয় ফরয ইবাদত পালনের পরে বেশি বেশি নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। তাসাউফের প্রথম যুগের বুজুর্গগণের কর্মপদ্ধতির আলোকে পাঁচ ভাবে এই নফল ইবাদত পালন করা হয় :

প্রথমত, দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করা। মন বা নফস যে সকল মুবাহ দ্রব্য বেশি আগ্রহ করে তা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা। হৃদয়কে পার্থিব মোহ থেকে মুক্ত করা। যে পর্যায়ের পার্থিব লোভ মানুষকে রিয়া, হিংসা, ভণ্ডামী বা হারামের মধ্যে নিপতিত করে তা পরিত্যাগ করা ফরয। এর অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা নফল পর্যায়ের এবং আমরা দেখেছি যে এই নফল পর্যায়ের কৃচ্ছ্রতার পরিপূর্ণ পালনই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত।

দ্বিতীয়ত, বেশি বেশি নফল ইবাদত পালন করা। ফরয ইল্‌ম, আমল, দাওয়াত, জিহাদ, সৎকাজে নির্দেশ, অন্যায় থেকে নিষেধ ইত্যাদি পালনের পরে এসকল ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সকল ইবাদত নফলে পরিণত হয় এবং সকল প্রকার নফল ইবাদতই বেলায়াতের উৎস। তবে প্রাচীন সূফীগণ বিশেষ করে নফল নামায, তাহাজ্জুদ, নফল রোযা, নফল কুরআন তিলাওয়াত, নফল যিক্‌র, নফল দাওয়াত, নফল জনসেবা, নফল দান ইত্যাদি ইবাদত বেশি বেশি করতেন।

তৃতীয়ত, যথাসম্ভব মানুষের সঙ্গে মেলামেশা পরিত্যাগ করা। একাকী সদাসর্বদা আল্লাহর স্মরণ, চিন্তা, মৃত্যু চিন্তা, আখেরাতের চিন্তা ও নিজের গোনাহের চিন্তা করে ক্রন্দনের মধ্যে থাকা। শুধুমাত্র দ্বীনের প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশা বজায় রাখা।

চতুর্থত, সর্বদা নিজের মনের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা। কখনো মনের মধ্যে অহংকার, রিয়া, লোভ, কাউকে ঘৃণা করার প্রবণতা, হিংসা, নিজের কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি, ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক অবস্থাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কি-না, আল্লাহর ভয়, জাহান্নামের ভয়, শেষ পরিণতি ভালো না-হওয়ার ভয় কখনো কমে যাচ্ছে কি-না তা সদা সর্বদা সতর্কতার সাথে লক্ষ রাখা। কখনো কোনো অবনতি হলে তাওবা, ক্রন্দন ও আত্ম-শাসনের মাধ্যমে তার সংশোধন ও প্রতিকার করা।

পঞ্চমত, এসকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য একই মনের ও পথের কিছু মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করা। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো নিয়ম ছিল না। সাধারণভাবে আখেরাতমুখী বুজুর্গগণ যখন যেভাবে পেরেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত হৃদয়ে নিয়ে একত্রে বসে আখেরাতমুখী আলোচনা করে উপরিউক্ত ইবাদতসমূহ পালনের জন্য নিজেদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইল্‌ম শেখার জন্য এক উস্তাদ ও আমল শেখার জন্য আরেক উস্তাদ এ অবস্থা তাঁদের মধ্যে কখনোই ছিল না। এছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া অন্য কারো কাছে বাইয়াত গ্রহণ রীতিমত রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে বিবেচিত হতো তাঁদের যুগে এবং পরবর্তী অনেক শতাব্দী পর্যন্ত।

তাবেয়ীগণের যুগের পর থেকে, বিশেষত ৪র্থ হিজরী শতক থেকে কোনো কোনো বুজুর্গ এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো শাইখ বা আলেমের সাহচার্য গ্রহণ করতেন। তাঁর পরামর্শ, উৎসাহ ও সাহচার্যে থেকে ক্রমান্বয়ে উপরের ইবাদতগুলি পালনে অগ্রসর হতেন।

---

(২). তাসাউফ-তরীকত উপকরণ মাত্র : মুজাদ্দিদে আলফে সানী

সূফীগণের দৃষ্টিতে ইল্‌ম, আমল ও ইখলাস এই তিনের সমষ্টি ইসলাম। ইখলাসের ক্ষেত্রে নফল পর্যায়ের পূর্ণতার মাধ্যম বা উপকরণ হচ্ছে তাসাউফ ও তরীকতের কর্মকাণ্ড। এবিষয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রাহ) বলেছেন :

"ছুলুক ও জযবার মাকামসমূহ অতিক্রম করিয়া আমি জানিলম যে, এই ছয়ের ও ছুলুকের উদ্দেশ্য 'ইখলাছের মাকাম হাছেল করা মাত্র' – যাহা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপাস্য তুল্য উদ্দেশ্যসমূহ বিনাশ বা ফানার উপর নির্ভর করে। উক্ত ইখলাছ শরীয়তের এক (তৃতীয়) অংশ, যেহেতু শরীয়ত তিন ভাগে বিভক্ত। 'ইলম'–জানা, 'আমল'–কার্য করা, 'ইখলাছ'–উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা সাধন করা। অতএব, ইখলাছ পূর্ণ করণার্থে তরীকত ও হকীকতদ্বয় শরীয়তের খাদেম তুল্য। ইহাই প্রকৃত কার্য ; কিন্তু সকলের জ্ঞানে ইহা উপলব্ধি হয় না। জগৎ বাসীর অধিকাংশই অমূলক ধারণার স্বপ্নে মোহিত আছে। শিশুগণের ন্যায় ইহারাও বেদানা, আখরোট পাইয়াই যেন সন্তুষ্ট। তাহারা শরীয়তের পূর্ণতাসমূহের মূল্য কী বুঝিবে এবং হকীকত ও তরীকতের তত্ত্বই-বা কী উপলব্দি করিবে ! তাহারা শরীয়তকে 'খোলস' এবং হকীকতকে 'মজ্জ' ধারণা করিয়া থাকে। প্রকৃত বিষয় তাহারা কিছুই অবগত নহে। ছুফীগণের বাতুল বাক্যাদি লইয়াই তাহারা ধোঁকায় পতিত ও স্বীয় হাল বা অবস্থা ও মাকামাতের ছলনায় মগ্ন আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করুন।"[১]

অন্যত্র লিখেছেন : *"হে মান্যবর! প্রত্যেক ব্যক্তির তিনটি বিষয় লাভ করা ব্যতীত উপায় নাই । তবেই অনন্তকালের জন্য তাহার মুক্তি লাভ হইবে। প্রথমটি 'ইল্‌ম' , দ্বিতীয়টি 'আমল' এবং তৃতীয়টি 'ইখলাছ'। ইল্‌ম দুই প্রকার এক প্রকার ইল্‌মের উদ্দেশ্য – আমল করা, ফেকাহ যাহার জিম্মাদারী গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার ইলমের উদ্দেশ্য সুন্নাত জামাতের মতানুযায়ী বিশ্বাস শাস্ত্রে যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তদ্রূপ স্বীয় বিশ্বাস স্থাপন এবং একীন লাভ করা।... ফল কথা 'ইল্‌ম' ও 'আমল' শরীয়ত হইতে গৃহীত এবং ইখলাছ' যাহা উক্ত ইল্‌ম ও আমলের আত্মাস্বরূপ, তাহা সূফীগণের তরীকা চলার প্রতিই নির্ভরশীল। ... অবশ্য সাধারণ মো'মেনগণ জোর-জবরদস্তি করিয়া হইলেও এক প্রকার 'ইখলাছ' পাইয়া থাকে। কিন্তু আমি যে ইখলাস লইয়া আলোচনা করিতেছি, তাহা উক্ত 'ইখলাস' নহে ; বরং প্রত্যেক কথাবার্তা, গতিবিধি, কার্যকলাপ ইত্যাদিতে অনিচ্ছাকৃত ও স্বভাবত 'ইখলাছ' হওয়া। ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উপাস্য সদৃশ্য উদ্দেশ্যসমূহ নিবারিত হওয়া।"*[২]

অন্যত্র লিখেছেন : *"প্রথমত, আকীদা সংশোধন না করিয়া উপায় নাই... । দ্বিতীয়ত, ফেকাহ যাহার জিম্মাদারী ও দায়িত্ব লইয়াছে সেসকল বিষয় অবগত হওয়া ও তদানুরূপ আমল করা। তৃতীয়ত, সূফীগণের তরীকা অনুযায়ী সুলুক করা বা চলা। ইহা গায়েবী আকৃতিসমূহ ও নূর এবং রং ইত্যাদি দর্শনের উদ্দেশ্যে নহে, যেহেতু উহা খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত। বাহ্যিক নূর ও আকৃতিসমূহ কী ক্ষতি করিল যে, কেহ তাহা পরিত্যাগ করত কঠোর সাধনা বলে অদৃশ্য আকৃতি ও আলো পরিদর্শন করার চেষ্টা করিবে ? ইহারা উভয়েই আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু ও তাঁহার স্রষ্টা হওয়ার নিদর্শন। চন্দ্র, সুর্যের নূর বা আলো দৃশ্য জগতের বস্তু। তাহা আলমে মেসাল বা আধ্যত্মিক উপমার জগতে যে নূর পরিদর্শিত হয় তাহা হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহার দর্শন স্থায়ী ও সর্ব সাধারণ সকলেই ইহাতে সমকক্ষ বলিয়া ইহা মূল্যবান মনে হয় না, তাই সকলেই গায়েব বা অদৃশ্য জগতের নূর দেখার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। নিকটের পানি দেখায় কালো : দূরের পানি তাইতো ভালো।*

বরং সূফীগণের তরিকায় চলার উদ্দেশ্য শরীয়তের বিশ্বাস্য বস্তুসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা... শরীয়তের হুকুমসমূহ সহজসাধ্য ও সরল হওয়া, যেন উহা প্রতিপালন করিতে 'কষ্ট', যাহা নফসে আম্মারা হইতে উদ্ভূত, তাহা না হয়। এই ফকীরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সূফীগণের তরীকা প্রকৃতপক্ষে শরীয়তের ইল্‌মসমূহের খাদেম বা ভৃত্যস্বরূপ, ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।"[৩]

"শরীয়ত তিন ভাগে বিভক্ত – ইল্‌ম, আমল, ইখলাছ – এই তিনটি শরীয়তের অংশ। ইহারা যদি পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন না হয় তবে শরীয়ত হইবে না। উক্ত শরীয়ত যখন পূর্ণতা লাভ করিবে তখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও লাভ হইবে ; যাহা ইহ-পরকালের সর্ববিধ সৌভাগ্য হইতে শ্রেষ্ঠ।... অতএব, ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় সৌভাগ্যের দায়িত্ব শরীয়তের প্রতিই ন্যস্ত। এরূপ কোনো সৌভাগ্য নাই যে, তাহার জন্য শরীয়ত ব্যতীত অন্য কাহারও শরণাপন্ন হইতে হয়। তরীকত ও হাকীকত যাহা সূফীগণের একচেটিয়া, তাহা শরীয়তের তৃতীয় অংশ ইখলাছের পূর্ণতার সাহায্যকারী খাদেমস্বরূপ। উহাদের দ্বারা শরীয়ত পূর্ণ করাই উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নহে।

যেসব হালত, লম্ফঝম্প এবং ইল্‌ম-মারেফত পথিমধ্যে পরিলক্ষিত হয় উহার কোনোটিই উদ্দিষ্ট বস্তু নহে। বরং তরীকত-পন্থী শিশুদিগকে ভুলাইবার খেলনাস্বরূপ। উহা কাল্পনিক বা ধারণাকৃত বস্তু মাত্র। ঐ সমস্ত অতিক্রম করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির মাকাম, যাহা ছুলুক ও জযবার শেষ মাকাম, তাহা লাভ করা কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির মাকামের আনুষঙ্গিক ইখলাছের মাকাম অর্জন ব্যতীত তরীকত ও হকীকতের পথ অতিক্রম করার আর কোনোই উদ্দেশ্য নাই। প্রতিবিম্বত্রয় ও আত্মীক দর্শনের মাকামসমূহ অতিক্রম করিয়া সহস্রের মধ্যে হয়তো দুই-এক ব্যক্তি উক্ত ইখলাছ ও রেজার মাকামে উপনীত হইয়া থাকে । ইতর দৃষ্টিধারী ব্যক্তিগণ লম্ফঝম্পের হালত এবং তাজাল্লী ও আত্মীক দর্শন ইত্যাদিকেই মূল উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকে। অতএব, তাহারা ধারণার কারাবদ্ধ হইয়া শরীয়তের কামালত বা পূর্ণতাসমূহ হইতে বঞ্চিত হয়।"[৪]

অন্য চিঠিতে তিনি লিখেছেন : *"অন্তর্জগৎ কর্তৃক বহির্জগৎ পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম নাই। যথা - মুখে মিথ্যা না বলা শরীয়ত এবং অন্তঃকরণ হইতে মিথ্যা বলার কুমন্ত্রণা বিদূরীত করা তরীকত ও হকীকত। উক্ত নিবারণ যদি কৃচ্ছ্র*

সাধ্য হয়, তবে তাহা 'তরীকত' এবং যদি সহজসাধ্য ও স্বাভাবিকভাবে হয়, তাহা হকীকত। বস্তুত অন্তর্জগতে যাহা তরীকত ও হকীকত, তাহা বহির্জগত বা শরীয়তের পূর্ণতাকারী। অতএব, তরীকত ও হকীকতপন্থীগণের প্রতি পথিমধ্যে যদি কিছু বাহ্যিক শরীয়তের বিরুদ্ধ বিষয় প্রকাশ পায়, তবে তাহা সাময়িক মত্ততা ও অবস্থার বিপর্যয় মাত্র। যদি (আল্লাহ তা'আলা) উহাকে উক্ত মাকাম অতিক্রম করাইয়া সজ্ঞানতায় আনয়ন করেন, তবে উক্ত বিরুদ্ধভাব পূর্ণরূপে অপসারিত হইবে এবং তাহার শরীয়তবিরুদ্ধ ইল্ম-মারেফতসমূহ ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া যাইবে।"[১]

(৩). কাফিরও মুজাহাদা করলে কাশফ লাভ করতে পারে

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, তাসাউফের আশগাল ও তরীকতের আমল শুধুমাত্র পরিপূর্ণ শরীয়ত পালন ও ইখলাস অর্জনের মাধ্যম। এছাড়া যতকিছু ক্বলবী হালত, কাশফ, নূর, দর্শন, গায়েবী জগৎ অবলোকন সবই অর্থহীন ও কল্পনা মাত্র। এগুলি তাসাউফের উদ্দেশ্য নয়। উপরন্তু এগুলির অর্জন আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার কোনোরূপ আলামত নয়। যদি কেউ পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসরণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন ও ইখলাস অর্জন করতে পারেন, কিন্তু এসকল কোনো তাজাল্লী, হালাত, দর্শন ইত্যাদি লাভ না করেন তাহলেও তিনি সফলকাম ও সত্যিকার সূফী। আর যদি কেউ এসকল বিষয়াদি লাভ করে কিন্তু সুন্নাত ও ইখলাস অর্জন না করতে পারে, তাহলে সে মূলত খেলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত আছে। সে ব্যর্থ ও বিভ্রান্ত। মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী তাঁর "মাকতুবাত"-এ ও সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী তাঁর "সেরাতে মুসতাকীম' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থনে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে কোনো ফাসেক, এমনকি কাফির মুশরিকও তাসাউফের আশগাল পালন করে বিভিন্ন হালত, তাজাল্লী, কাশ্ফ ও দর্শন লাভ করতে পারে। এগুলি কখনো কামালাতের বা সঠিকত্বের প্রমাণ নয়।[২]

(৪). মুস্তাহাব পালন ও তানযিহী বর্জন যিক্র মুরাকাবার চেয়ে উত্তম

তিনি লিখেছেন : *"আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিক্র, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয ইবাদত তাহার সময় মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরূহ যদিও উহা 'তানজিহী' হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিক্র মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরূহে তাহরীমির কথা কী আর বলিব! অবশ্য উক্ত কার্যসমূহ (যিক্র মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল মাকরুহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।"*[৩]

(৫). কিয়ামতের দিনে তরীকতের কর্ম কোনো কাজে লাগবে না

ইমাম সারহিন্দীর কাছে লিখিত এক চিঠির সাথে মাওলানা মোহাম্মাদ কলিজ তাঁকে কিছু টাকা পাঠান এবং লিখেন: *"তালেবে ইল্ম এবং সূফীগণের ব্যয়ের জন্য সামান্য টাকা পাঠান হইল।"*

এতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী অত্যন্ত খুশি হয়ে লিখেন :

"সূফীগণের নামের পূর্বে যে তালেবে-ইল্মগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমার চক্ষে অতীব সুন্দর লাগিল। 'বহির্জগৎ অন্তর্জগতের নিদর্শনস্বরূপ।' অতএব, আশারাখি আপনার অন্তরেও যেন সূফীগণ হইতে তালেবে-ইল্মগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।... তালেবে-ইল্মগণকে অগ্রগণ্য করার অর্থ শরীয়ত প্রচার করা, যেহেতু উহারা শরীয়ত বহনকারী। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -এর ধর্ম উহাদের দ্বারাই কায়েম আছে। রোজ কেয়ামতে শরীয়তের প্রশ্ন উত্থিত হইবে ; তাসাওফের প্রশ্ন উত্থিত হইবে না। বেহেশতে প্রবেশ এবং দোজখ হইতে রক্ষা পাওয়া শরীয়তের প্রতিই নির্ভরশীল। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পয়গাম্বরগণ শরীয়তের দিকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং শরীয়তের প্রতিই উদ্ধারপ্রাপ্তি ন্যস্ত করিয়াছেন। শরীয়ত প্রচারের জন্যই ইহারা প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব, শরীয়ত প্রচারে যত্নবান হওয়া ও শরীয়তের হুকুমাদি পরিচালিত করা, বিশেষত যখন ইসলামের চিহ্ন মিটিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন আপ্রাণ চেষ্টা করা সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য কার্য। আল্লাহর রাহে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করাও শরীয়তের একটি মাস'আলা প্রচার তুল্য হইবে না। কেননা এই কার্যে সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর (আ.)-গণের অনুকরণ ও সহযোগিতা করা হয়। ইহা সঠিক যে, পূর্ণতম পুণ্যসমূহ তাহাদিগকেই প্রদান করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় অনেকেই করিতে পারে (অথচ তাহাদের নেকী শ্রেষ্টতম নয়)। দ্বিতীয়ত, শরীয়ত প্রতিপালনে নফছে আম্মারার পূর্ণ বিরোধিতা হয়, কেননা নফছের বিরুদ্ধাচরণের জন্যই শরীয়ত অবতীর্ণ হইয়াছে। অনেক সময় টাকা ব্যয়ের মধ্যেও নফছের সহযোগিতা ও কামনা থাকে। অবশ্য শরীয়ত প্রচারের জন্য যে ধন ব্যয় করা হয় তাহার মর্যাদা অতি উচ্চ। এই উদ্দেশ্যে এক কপর্দক ব্যয় করা অন্য উদ্দেশ্যে সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেও অধিক মূল্যবান।"[৪]

অন্যত্র লিখেছেন : *"হে বৎস, আগামীতে (কিয়ামতের দিনে) যাহা কার্যে আসিবে তাহা নবীয়ে কারীম ﷺ -এর অনুসরণ।... সাইয়্যেদুত্তায়েফা অলিকুল শ্রেষ্ঠ হযরত জুনাইদ বাগদাদীর মৃত্যুর পর তাঁহাকে কেহ স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন : 'আত্মিক বর্ণনাসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং ইশারা ইঙ্গিতাদি বিলুপ্ত হইয়াছে। মধ্য রাত্রিতে দুই এক*

রাক'আত নামায যাহা পাঠ করিতাম, তাহা ব্যতীত আর কিছুই উপকারে আসিল না।"[১]

তৃতীয়ত, তাসাউফের খেলাফে-সুন্নাত

সূফীগণের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু খেলাফে-সুন্নাত কাজের আলোচনা ইতঃপূর্বে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর বিদ'আত বিষয়ক মতামত আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি। অন্য কিছু খেলাফে-সুন্নাত বিষয় এখানে আলোচনা করছি। কারো সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হলো পাঠক যেন সুন্নাত পদ্ধতির তাসাউফের গুরুত্ব বুঝতে পারেন, তাসাউফের মাধ্যমে সত্যিকার বেলায়াত অর্জনের সুন্নাত আমলগুলি জানতে পারেন এবং সম্ভব হলে খেলাফে-সুন্নাত আমল পরিত্যাগ করতে পারেন। খেলাফে-সুন্নাত পরিত্যাগ সম্ভব না হলে যেন অন্তত সুন্নাতকে ভালবাসেন এবং খেলাফে-সুন্নাতের চেয়ে সুন্নাতকে উত্তম মনে করতে পারেন।

(১). নফল ইবাদত পালনে সুন্নাত পদ্ধতির ব্যতিক্রম কাজ করা

আমরা দেখেছি যে, কৃচ্ছ্রতা, নির্জনতা, ক্রন্দন, সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও বেশি নফল ইবাদতই তাসাউফের মূল। এক্ষেত্রে অনেকে অতি আগ্রহে সুন্নাত-পদ্ধতির বাইরে চলে যান। যেমন, কৃচ্ছ্রতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ভাবে মুবাহ বর্জন করা, সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে অবস্থান, অতিরিক্ত ক্ষুধার কষ্ট করা, রাত্রে না ঘুমানো ইত্যাদি। অবশ্য বর্তমান যুগে এগুলি ঘটে বলে মনে হয় না। সত্যিকারের কৃচ্ছ্রতা ও আত্মশুদ্ধির তাসাউফ বর্তমানে অচল বলেই মনে হয়।

(২). বর্জিত পদ্ধতি বা উপকরণ ব্যবহার করা

আমরা দেখেছি যে, পূর্ববর্তী যুগে তাসাউফের নফল ইবাদত ছিল অনেক প্রশস্ত। বর্তমানে শুধুমাত্র এক প্রকারের নফল ইবাদত যিক্‌রকেই তাসাউফ মনে করা হয়। যিক্‌রের ক্ষেত্রে সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। যিক্‌রের ক্ষেত্রে যেসকল শব্দ, উপকরণ বা পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো ব্যবহার করেননি তা আমরা করে থাকি। আমরা অনেকে যিক্‌রের আগে মুখেমুখে নিয়্যাত করে থাকি। আমরা ইতঃপূর্বে মুজাদ্দিদ-ই-আলফ-ই-সানী'র কথা থেকে জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমামগণ ও পূর্ববর্তী যুগের মানুষেরা কখনো কোনো নামায, রোযা, ওযু, গোসল, যিক্‌র, ওযীফা ইত্যাদির পূর্বে মুখে নিয়্যাত করেননি। এসকল ক্ষেত্রে মুখে নিয়্যাতের প্রচলন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনে মনে নিয়্যাতের সুন্নাত অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এজন্য একটি সুন্নাতকে মেরে ফেলার চেয়ে তার উপরে আমল করা উত্তম।

(৩). উপকরণকে ইবাদত মনে করা

উপরে আমরা দেখেছি যে, তাসাউফ ও তরীকত ইবাদত নয়, ওসীলা বা উপকরণ। স্বাভাবিক ফরয পর্যায়ের ইখলাস অর্জনের পরে নফল পর্যায়ের ইখলাস অর্জনের উপকরণ মাত্র। সুন্নাতের আলোকে কোনো প্রকার নফল ইবাদত কী-ভাবে ও কী পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে তা আবেদ ও শাইখের ইজতিহাদের বিষয়। এছাড়া তাসাউফের মধ্যে কিছু যিক্‌র, আশগাল পালনের ক্ষেত্রে কেউ কেউ সাময়িক চিকিৎসামূলক কিছু উপকরণ ব্যবহার করেছেন, যা তাঁদের ইজতিহাদ। অনেকে এসকল উপকরণকে ইবাদত মনে করে বিদ'আতে নিপতিত হন।

যেমন, যিক্‌র একটি ইবাদত। এই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত রয়েছে। আমরা অনেকে সুন্নাতের খেলাফ জোরে জোরে, ধাক্কা দিয়ে, সমস্বরে বা বিভিন্ন খেলাফে-সুন্নাত শব্দ উচ্চারণ করে যিক্‌র করে থাকি। মূল মাসনূন যিক্‌রেই সাওয়াব ও আত্মশুদ্ধি। এ সকল উপকরণে তো কোনো সাওয়াব নেই, উপরন্তু এতে সাওয়াব কমবে, কারণ তা সুন্নাতের খেলাফ। কেউ বাধ্য হয়ে বা সাময়িক চিকিৎসা হিসাবে করলে তিনি হয়ত মা'যুর হবেন। কিন্তু দুঃখজনক হলো আমরা খেলাফে-সুন্নাত এ কর্মগুলিকেই ইবাদত মনে করি। যিক্‌র বলতে আমরা মাসনূন 'যিক্‌র' বুঝি না। বরং ধাক্কা মারা, চিৎকার করা, লাফালাফি করা, ঐকতান করা ইত্যাদি খেলাফে-সুন্নাত কাজ বুঝি। আমরা মনে করি শুধু মাসনূন 'যিক্‌রে' আত্মশুদ্ধি হয় না, বরং এসকল খেলাফে-সুন্নাত কাজেই আত্মশুদ্ধি বা ক্বলব সাফ হয়।

(৪). পীরের মুরীদ হওয়া : সুন্নাত বনাম খেলাফে-সুন্নাত

কুরআন ও হাদীসে প্রকৃত মুখলিস ও নেককার মানুষদের সাহচর্যের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এগুলি সাধারণ নির্দেশ। এ সকল নির্দেশের আলোকে সৎ ও মুত্তাকী মানুষের সাহচার্য একটি নফল ইবাদত। যেকোনো নেককার, সৎ, মুখলিস মানুষের সাহচার্যে বসলেই এই ইবাদত পালিত হবে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ এই ইবাদত এভাবে উন্মুক্তভাবেই পালন করেছেন। কখনই তাঁরা এই ইবাদত পালন করতে নির্দিষ্ট কোনো শাইখের সাহচার্য নির্ধারিত করে নেননি। তাঁদের সুন্নাত অনুসরণ না করে মনগড়াভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের অর্থ করলে আমরা খেলাফে-সুন্নাতের মধ্যে নিপতিত হব।

পীর বা শাইখের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাসাউফের নফল ইবাদত পালনে সহযোগিতা গ্রহণ। পীরের সাহচার্য নফল ইবাদত পালনে পূর্ণতা অর্জনের সহযোগী উপকরণ বা ওসীলা মাত্র। উপকরণ হিসাবেই তাঁর সাহচর্য প্রয়োজন। একজন মুসলিম তাঁর উপর অর্পিত ফরয ইবাদত আদায় করার পরে যখন বেশি বেশি নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চান তখন তাঁর মূল কর্তব্য হলো এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত জানা ও সেইভাবে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়া। এক্ষেত্রে দুটি সমস্যা থাকে : প্রথমত, জানার সমস্যা এবং দ্বিতীয়ত, পালনের সমস্যা। অনেকেই আমরা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদি পাঠ করে এ বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করার মত সময় ও সুযোগ পাই না।

এছাড়া আমরা এসকল ক্ষেত্রে অনেক কথা জানলেও প্রবৃত্তির অবাধ্যতা, শয়তানের কুমন্ত্রণা ইত্যাদি কারণে তা পালন করতে পারি না। বিষয়টি খুবই পরিষ্কার ও বোধগম্য। প্রত্যেক মুসলিম জানেন যে, তিনি অনেক বিষয় হারাম জেনেও তা বর্জন করতে পারছেন না,

আবার অনেক ফরযও পালন করতে পারছেন না। সমাজে আমরা হাজারো আলেম বা মাদ্রাসা ছাত্রকে দেখতে পাব যারা ইসলাম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছেন, তবে ফরয দায়িত্বও পালন করছেন না এবং বিভিন্ন হারামে লিপ্ত রয়েছে, নফল পালন ও আত্মশুদ্ধি তো অনেক দূরের কথা। অপরদিকে একজন অশিক্ষিত বা সাধারণ শিক্ষিত মানুষ কোনো ইসলামী সংস্থা, দল বা বুজুর্গের সাহচর্যে থেকে ধার্মিকতা, আল্লাহ-ভীতি ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়েছেন।

এজন্য সাধারণত কোনো ভালো সত্যিকার মুত্তকি আলেম, যিনি জেনেছেন ও পালন করেছেন, তাঁর কাছে যেয়ে আমরা চারটি উপকার লাভ করি : **(১).** এ সকল ক্ষেত্রে সত্যিকারের মাসনূন কর্ম ও পথ জানা ; **(২).** এ সকল কর্ম পালনের ও পথে চলার প্রেরণা ; **(৩).** সৎ ও আল্লাহ-ভীরু মানুষের সাহচর্য, যা একটি বিশেষ ইবাদত ; এবং **(৪).** সৎ ও আল্লাহ-ভীরু মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা। এটিও একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে এই চারিটি বিষয় অত্যন্ত উপকারী। এই অর্থেই শাইখ বা পীরের সাহচার্যে উৎসাহ দিয়েছেন পরবর্তী যুগের সূফী ও বুজুর্গগণ।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, 'তাসাউফ' মূলত শরীয়ত পালনের নাম। শরীয়তের প্রয়োজনী সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইবাদত পালনের পরে আরো বেশি ইবাদত ও আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পরিপূর্ণ ইখলাস অর্জনের প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় সফলতা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে পরবর্তী যুগে শায়খদের সাহচার্যকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে :

প্রথমত, শাইখ বা পীর এই পূর্ণতা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম নয়। মূল মাধ্যম হলো 'সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ'। ইতঃপূর্বে ইমাম সারহিন্দীর কথা থেকে জেনেছি যে, *"যাহারা হযরত নবীয়ে কারীম ﷺ -এর পূর্ণ অনুসরণ করেন, তাঁহারাও এই দুষ্প্রাপ্য মাকামের পূর্ণ অংশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"*[১]

দ্বিতীয়ত, শাইখের কাছে যাওয়া ওসীলা বা উপকরণ ও মাধ্যম মাত্র। ইবাদত হলো : ইখলাস অর্জন, হিংসা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি থেকে আত্মশুদ্ধি, বেশি বেশি নফল ইবাদত পালন ইত্যাদি। যদি কেউ পীরের মুরীদ না হয়ে এগুলি অর্জন করতে পারেন তাহলে তিনি এসকল ইবাদতের পূর্ণ সাওয়াব, বরকত ও বেলায়াত অর্জন করবেন। সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (রাহ)-এর আলোচনায় আমরা দেখব যে, প্রকৃত মুত্তাকী ও সাদিক পীর না পেলে শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করেই পূর্ণ বেলায়াত অর্জন সম্ভব।

অপরদিকে যদি কেউ পীরের মুরীদ হয়ে এগুলি অর্জন করতে পারেন তাহলে তিনিও এগুলির পূর্ণতা অনুসারে পূর্বের ব্যক্তির ন্যায় সাওয়াব পাবেন, পীরের মুরীদ হওয়া অতিরিক্ত কোনো ইবাদত বলে গণ্য হবে না। আর যদি তিনি পীরের মুরীদ হওয়া সত্ত্বেও এসকল ইবাদত পালন করতে না পারেন তাহলে শুধুমাত্র মুরীদ হওয়ার জন্য তিনি কোনোপ্রকারে লাভবান হবেন না। তাঁর অবস্থা হলো ঐ ব্যক্তির মতো যিনি সাহরীর অত্যন্ত ফযীলতের কথা জেনে নিয়মিত সাহরী খান, কিন্তু রোযা পালন করেন না।

মুসলিমের প্রকৃত পীর মূলত কুরআন ও হাদীস। কুরআন হাদীস বুঝতে ও পালন করতেই পীরের কাছে যাওয়া। আর কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতেই পীরের ও পীরত্বের সঠিকত্বের মাপ হবে। ইমাম সারহিন্দী লিখেছেন : *"সুলুকের রাস্তায় চলার পথে আমার পথপ্রদর্শক হলো আল্লাহর কালাম। এই দৃষ্টিতে আমার পীর বা মোর্শেদ হলো কুরআন মজীদ।"* তিনি আরো বলেন : *"সকলের হাকীকি পীর তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ।"*[২]

তৃতীয়ত, শাইখ বা পীর কোনো নির্দিষ্ট পোস্ট বা পদমর্যাদা নয়। সুন্নাতে মুহাম্মাদী বা শরীয়তে মুহাম্মাদীর মধ্যে এই পদের জন্য পৃথক কোনো স্তর রাখা হয়নি। এই শব্দটিই এই অর্থে কুরআন-সুন্নাহতে ব্যবহার করা হয়নি। সেখানে মুত্তাকী, সাদিক বা সত্যবাদী, সালিহ বা নেককার ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে যাঁদের মধ্যে এ সকল গুণ দেখা যেত তাঁদেরকে আরবিতে "শাইখ" অর্থাৎ বয়স্ক, বৃদ্ধ বা মুরব্বী বলা হতো। শাইখ শব্দের ফারসী অনুবাদ হলো "পীর"।

যিনি সালিহ, সাদিক, মুখলিস, মুত্তাকী, যিনি ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত ; সকল প্রকার হারাম, মাকরূহ ও নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে চলেন ; পরিপূর্ণ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মুস্তাহাব পালনের চেষ্টা করেন ; হিংসা, ঘৃণা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি দোষগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন বা আত্মশুদ্ধি লাভ করেছেন তিনিই পীর। তিনি পীর নামেই পরিচিত হোন আর আলেম বা শায়েখ নামেই পরিচিত হোন। আর যিনি এসকল গুণ অর্জন করেননি, তিনি কখনোই পীর বা শাইখ নন। যদি তিনি তা দাবি করেন তাহলে মিথ্যাচার বা ভণ্ডামী হবে।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর যুগের পীরগণের বিষয়ে লিখেছেন : *"বর্তমানে পীর মুরীদী একটা প্রথা হইয়া গিয়াছে। এই সময় পীরগণ নিজেরই সংবাদ রাখেন না, কুফর ও ঈমানের সন্ধান রাখেন না। তিনি হক তায়ালার কি সংবাদ দিবেন, মুরীদগণকে কোন্ রাস্তা দেখাইবেন!!"*[৩] যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্নভাবে আমরা পীর মুরীদীর বিষয়টিকে খেলাফে-সুন্নাতভাবে বুঝেছি:

(ক). উপকরণকে ইবাদত মনে করা

আমরা দেখলাম যে, কোনো নেককার আলেমের সাহচর্য তাকওয়া ও ইখলাস অর্জনের একটি উপকরণ, মাধ্যম বা ওসীলা। কোনো কোনো আলেম "পীরের কাছে যাওয়া" জরুরি বলেছেন। এই জরুরত একান্তই উপকরণ হিসাবে। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, পীর ধরা ফরয। পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। কেউ মনে করছি পীর ধরাই কোনো ইবাদত। কেউ ভাবছি পীর ধরলেই সব হয়ে গেল, নাজাতের নিশ্চয়তা পাওয়া গেল, নিজের আমলের বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই। কেউ মনে করি যে, পীর না ধরলে বোধহয় ইবাদত

বন্দেগি, যিক্‌র ওযীফা কবুল হলো না বা সাওয়াব পূর্ণ হলো না ।

(খ). পীরত্বকে বিশেষ পোস্ট বা পদমর্যাদা মনে করা

'পীর' হওয়ার জন্য আমরা সত্যিকার ইল্‌ম, আমল, সুন্নাত, তাকওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয়ই জরুরি মনে করি না । যে কেউ পীরের সন্তান অথবা নিজে পীরত্বের দাবি করেছে সেই 'পীর' । আমাদের দেশে মূর্খতার কারণে সকল বিষয়েই ধোঁকাবাজীর বাজার চালু । ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ ইত্যাদি নামে যে ব্যক্তিই একটু ভালো প্রচার করতে পারেন, তিনিই সাধারণত ভাল বাজার পেয়ে যান । সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সততা কেউ বিচার করতে চান না । তবে এক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে সহজে বাজার পাওয়া যায় পীরত্বের দাবিতে । আর এই ক্ষেত্রটিই হলো সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর । অন্যান্য বিষয়ের ধোঁকা আমাদের জাগতিক ক্ষতি করে । অর্থ, শান্তি বা জীবনের ক্ষতি করে । আর পীরত্বের ধোঁকা আমাদের ঈমান, দ্বীন ও আখেরাত ধ্বংস করে ।

(গ). ফরয বাদে নফল ইবাদত করা

অনেকে পীরের মুরীদ হন, কিন্তু ফরয ইবাদত পালন করেন না । ফরয ইল্‌ম, আকীদা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত, যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, পালন না-করে নফল ইবাদত পালন করা, পীরের মুরীদ হওয়া, যিক্‌র ইত্যাদি নফল ইবাদতসমূহ পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না । অবস্থা বিশেষে হয়ত নফল ইবাদত কোনো কোনো ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে । কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তা আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াতের মাধ্যম নয় । ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গোনাহ হয় । হারামের গোনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ হলো – সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা ।

অনেকেই এই কাজ করছেন । শুধু তাই নয় এই ধরনের কাজকে ভালো, আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বলে মনে করছেন । সর্বোপরি যিনি গায়ে কোনো মলমূত্র মাখেননি, শরীয়ত মোতাবেক ওযু গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করেছেন, তবে আতর মাখার নফল ইবাদত করেননি, উপরিউক্ত মলমূত্রসহ আতর ব্যবহারকারী ও তাঁর ভক্তগণ তাকে অপূর্ণ ও খারাপ মনে করছেন ।

(ঘ). পীরের আমল বা কর্মের উপর নির্ভর করা

আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা হলো, অনেক পীর বা দরবারী মানুষ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বুঝান যে, মুরীদ ফরয-ওয়াজিব পালন করুক বা না-করুক বেশি কিছু আসে যায় না, পীর সাহেব তো আছেনই । তিনিই মুরীদের নাজাতের ব্যবস্থা করবেন । এই বিশ্বাস কুফরী বিশ্বাস । ইসলামের মূল বিশ্বাস হলো মানুষের নিজের কর্মই তার মুক্তি বা ধ্বংসের কারণ । অন্যের কর্ম তাকে মুক্তি দিবে না । পীরের কাছে যেতে হয় কর্ম শিখে কর্ম করার প্রেরণা নিতে । যেন মুরীদ নিজে কর্ম করে নাজাত পেতে পারে । পীরের কর্ম মুরীদকে নাজাত দিবে বা পীর নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে মুরীদ বসে থাকবে – এসকল চিন্তা কুফরী ।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্বাস বুঝার জন্য একটি হাদীস উল্লেখ করছি । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

"হে মুহাম্মাদের (ﷺ) মেয়ে ফাতেমা, তুমি (নিজের কর্মের দ্বারা) তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর । কারণ আমি তোমার কোনো ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না এবং উপকারের ক্ষমতাও রাখি না ।"[1]

এর অর্থ এ নয় যে, তিনি শাফাআত করবেন না, বা উম্মতের নেককার মানুষেরা শাফাআত করবেন না । এর অর্থ হলো বান্দা নিজের আমল নিজে করবে । তার পাপ ও অন্যায় থাকা সত্ত্বেও তার উপর সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তার জন্য শাফাআত করার অনুমতি প্রদান করবেন । আমরা ইতঃপূর্বে শাফাআত সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাস ও কুফরী বিশ্বাস আলোচনা করেছি ।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরের কুফরী বিশ্বাসটি 'বেশি মুরীদ অর্জনে'র একটি সফল মাধ্যম । কারণ সকল মানুষের মনেই আল্লাহর প্রেম অর্জন ও আখেরাতের নাজাতের আগ্রহ আছে । যদি পাপ, অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারের সাথে আখেরাতের নাজাত একত্রে পাওয়া যায় তাহলে তো কথাই নেই ।

এই বিশ্বাস পুঁজি করে ঈসা (আ.)-এর ধর্মকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেয় শৌল নামক এক ইহুদি । ঈসা (আ.)-এর উঠিয়ে নেওয়ার পরে সে ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের উপর অত্যাচার করে তাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে চেষ্টা করে । কিন্তু এভাবে সফল না হয়ে সে অন্য পথ ধরে । সে দাবি করে যে, ঈসা তাকে 'দেখা দিয়েছেন' এবং ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন ।

ঈসা (আ.) তাঁর পৃথিবীতে অবস্থানের সময় বার বার শিক্ষা দান করেন যে, শূকরের গোশ্‌ত, মদ ইত্যাদি স্পর্শ করা যাবে না । খাত্‌না করতে হবে । তাওরাত ও ইঞ্জিলের সকল বিধান মানতে হবে এবং আল্লাহর দ্বীনকে পুরোপুরি মানতে হবে । শুধু তাই নয়, যারা না-মানবে তাদেরকে বয়কট করতে হবে । শৌল নিজেকে পৌল নাম দিয়ে প্রচার করতে থাকে যে, ঈসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলে আর কিছুই লাগবে না । তিনিই নাজাতের ব্যবস্থা করবেন । খাত্‌না করতে হবে না, শূকর ও মদ খাওয়া যাবে, ইত্যাদি । তার এই "সহজ" ধর্ম আগুনের মত তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে । ইসা (আ.)-এর সত্যিকার অনুসারীগণ এর প্রতিরোধের চেষ্টা করেন । কিন্তু "সহজ ও ভক্তির" ধর্মের অনুসারীদের সামনে তাঁরা খড়কুটোর মতো ভেসে চলে যান । অবশেষে এই "সহজ" শৌলধর্মই এখন খ্রিষ্টান ধর্ম নামে পরিচিত ।[2]

(ঙ). পীরকে আল্লাহর কাছে "উকিল" মনে করা

অনেকে মনে করেন যে, পীর আল্লাহর দরবারে উকিলস্বরূপ। জাগতিক কোর্টে গেলে যেমন উকিল ধরতে হয়, তেমনি, আল্লাহর দরবারে যেতে হলে উকিল হিসেবে ধরতে হয় পীরকে। এই চিন্তা শিরক ও মহান আল্লাহর মর্যাদা ও মহিমার খেলাফ ধারণা। জাগতিক কোর্টের বিচারক জানেন না যে, এই বিবাদীয় সম্পতি সত্যিই কোন্ ব্যক্তির। এজন্য আইনের ধারাগুলির আলোকে উকিল বিচারককে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, সম্পতি তার মক্কেলেরই।

কিন্তু মহান আল্লাহ সকল বান্দার সকল বিষয় জানেন। তাঁর কাছে উকিলের প্রয়োজন কেন? তাঁর অজ্ঞতার কারণে সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে মাকসূদ হাসিল করানোর জন্য? নাকি তাঁর অজ্ঞতা দূর করে মক্কেলের সত্যঘটনা তাকে জানানোর জন্য?

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বারংবার বলেছেন যে, উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ঠ, মুমিনের জন্য অন্য কোনো উকিলের প্রয়োজন নেই।

পীর, ফকীর, পিতা, মাতা, এমনকি ব্যক্তির নিজের চেয়েও তাকে ভালো জানেন তার প্রভু। তাঁর কাছে যেতে, চাইতে বা ধরনা দিতে উকিলের প্রয়োজন – একথা চিন্তা করাও কঠিন পাপ। তাঁর পথে চলতে শিক্ষক ও সহচরের প্রয়োজন হতে পারে, উকিলের কোনো প্রয়োজন নেই।

(চ). জাগতিক প্রয়োজনে পীরের কাছে যাওয়া

এখানে লক্ষণীয় যে, উপরে আলোচিত "তৃতীয় পর্যায়ের নফল ইখলাস বা তাকওয়া" অর্জনের মানসে আমাদের সমাজের খুব কম মানুষই পীরের কাছে যায়। ইসলামের আকীদা গঠন ও ফরয ওয়াজিব পালন পূর্ণ করার পরে নফল ইবাদতের সহযোগিতার জন্য পীরের কাছে যাওয়া মানুষ সমাজে খুজে পাওয়া কষ্টকর। অধিকাংশ মানুষই রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ ইত্যাদি কাটাতেই শুধু পীরের কাছে যায়।

(ছ). পীরকে "বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী" বলে মনে করা

যুগে যুগে নেককার মানুষদেরকে মহান আল্লাহ "কারামত" বা "অলৌকিকত্ব" দিয়ে সম্মানিত করেছেন। "কারামত" শব্দের অর্থই "সম্মানী"। ইতঃপূর্বে কাশ্‌ফের আলোচনার সময় দেখেছি যে, কাশ্‌ফ বা কারামত নেককার মানুষের কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নয়। একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া "সম্মানী"। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নেককার বান্দাগণের দোয়া দয়া করে কবুল করেন। আবার অনেক দোয়া কবুল করেন না। মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ওলী সাহাবায়ে কেরামের জীবন দেখলে তা আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি। মহান আল্লাহ তাঁর হাবীব, খলীল ও তাঁর প্রিয়তম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অগণিত দোয়া কবুল করেছেন। এমনকি তাঁর মনের অব্যক্ত ইচ্ছাগুলিও আল্লাহ পূরণ করেছেন। আবার কখনো কখনো তাঁর দোয়া কবুল করেননি। উপরন্তু সেসব বিষয়ে দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর চাচা আবু তালিবের ইসলামের বিষয়ে, উহদের যুদ্ধের পরে ও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে আমরা এভাবে দেখতে পাই। অপরদিকে "অলৌকিকত্ব" অর্থই "কারামত" নয়। কাফির বা পাপী ব্যক্তিও সাধনা ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক "অলৌকিক" কর্ম দেখাতে পারে। এজন্য "পীরত্ব" বা ওলী হওয়ার ক্ষেত্রে "কারামত" কখনোই বিবেচ্য নয়।

কিন্তু আমাদের সমাজে এই "কারামত"-এর ধারণা বিকৃত হয়ে শিরকী বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। একদিকে মুসলমান শুধু "কারামত" খুঁজেন ও কারামতকেই পীর বা ফকীরের সঠিকত্বের প্রমাণ বলে মনে করেন। অপরদিকে এই বিশ্বাসকে পুঁজি করে সারাদেশে অসংখ্য ভণ্ড পীর-ফরীর সরলপ্রাণ অগণিত মানুষকে বিভিন্ন ভেল্কিবাজী দেখিয়ে টাকাপয়সা আত্মসাৎ করছে।

সর্বোপরি এ প্রবণতা ঈমান ধ্বংস করছে। বর্তমানে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, পীর বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সাথে মহান আল্লাহর একটি বিশেষ লাইন, সংযোগ ও সম্পর্ক আছে। তিনি চাইলেই মহান আল্লাহর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয় চেয়ে দিতে পারেন। আর এজন্যই রোগ, ব্যধি, বিপদ, মামলা ইত্যাদি সমস্যাতেই মানুষ পীরের কাছে যায়। শুধু তাই নয়, ঘুষ খেয়ে, ধোঁকা দিয়ে, মানুষ খুন করে বা অন্য কোনো কঠিন অপরাধের পরে যদি কেউ জাগতিক বিচারের মধ্যে পড়ে, তাহলে পীর সাহেবকে কিছু ঘুষ দিয়ে শাস্তি মাওকুফের চেষ্টা করে। তবুও আল্লাহর কাছে তাওবা করার চিন্তা করেন না। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ও শিরক। এই শিরকে লিপ্ত অগণিত মুসলিম নামধারী ব্যক্তি।

আর এই শিরকী প্রবণতার কারণেই ভণ্ডদের পীরত্বের বাজারে প্রবেশের এত আগ্রহ। কারণ পীর সাজতে পারলেই অগণিত বিপদগ্রস্ত ও অপরাধী টাকাপয়সা নিয়ে "পীরের" দরবারে ধরনা দেবে, তাকে কিছু ঘুষ দিয়ে "বিপদমুক্ত" হওয়ার জন্য। সহজে "টুপাইস" কামনোর জন্য রাজনৈতিক নেতা হওয়ার পরেই সম্ভবত দ্বিতীয় সহজতম পথ হলো পীর সাজা।

আর এজন্যই তারা তাদের প্রচার প্রপাগাণ্ডায় মূলত "অলৌকিকত্ব" প্রচারে আগ্রহী হন। পীর সাহেবের কাছে যেয়ে কত ব্যক্তি পাপ ত্যাগ করেছেন, তাহাজ্জুদ শুরু করেছেন, আল্লাহর পথে অগ্রসর হয়েছেন বা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠায় জীবন দানের প্রেরণা পেয়েছেন – এসকল কথা প্রচারে কোনো বিশেষ লাভ হয় না। এজন্য তারা প্রচার করেন, পীর সাহেবের কাছে যেয়ে কত লোকের বিপদ কেটেছে, কত মানুষের মনের কথা তিনি বলে দিয়েছেন, কত মানুষের জিন ছাড়িয়েছেন ইত্যাদি। ঠিক একইভাবে এ সকল অলৌকিকত্ব দাবি করে বাজার চালু করেছে হিন্দু ও অন্যান্য মুশরিক সমাজে শত শত "সাঁই বাবা", "ঠাকুর" বা "ভগবান"।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে নেওয়ার জন্য, পরিপূর্ণ আল্লাহভীতি, আল্লাহ-মুখিতা, তাওয়াক্কুল ও তাওহীদ হাতে-কলমে শেখানোর জন্য যে "পীরমুরীদি"-র ধারা শুরু হয়েছিল, সেই পীরমুরীদিই এখন মুসলমানকে মুশরিক বানানোর অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

(৫). সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভীর (রহ.) দৃষ্টিতে সূফীগণের বিদ'আত

সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভীর মতানুসারে বিদ'আত-মুক্তভাবে সুন্নাতের অনুসরণই মুক্তি ও বেলায়াতের একমাত্র পথ। এই পথের পূর্ণতার জন্য তাসাউফ একটি ওসীলা বা উপকরণ। যদি এই উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তাহলে সবই বেকার। তিনি সুফীদের বিদ'আত পরিত্যাগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিদ'আতকে তিনভাগ করে আলোচনা করেছেন: সূফীবেশী মুশরিকদের বিদ'আত, শিয়াদের বিদ'আত ও সমাজের অন্যান্য বিদ'আত। সূফীগণের বিদ'আতের মধ্যে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে রয়েছে:

(১). কাশফ, শুহুদ, মুশাহাদা ইত্যাদিকে তাসাউফ মনে করা। তাঁর মতে কাফির, মুশরিক, মু'মিন, সুন্নাতের অনুসারী বা বিদ'আতপন্থী যে-ই তাসাউফের আশগাল পালন করবে সে-ই এ সকল কিছু কিছু ফল লাভ করবে। কাফেরের কুফরী, বিদ'আতীর বিদ'আত ও সুন্নীর সুন্নাত অনুসরণ মূলত ভালো-মন্দ ও হক্ক-বাতিলের মাপকাঠি। কাশ্‌ফ-কারামতকে কামালাত মনে করা খেলা মাত্র। তবে সুন্নাতপন্থী মুমিনের জন্য তা একটি অতিরিক্ত লাভ।

(২). শরীয়তের ও সুন্নাতের বিরোধিতাকে তাসাউফ ও সুলূকের অংশ মনে করা।

(৩). আল্লাহ, শরীয়ত, সুন্নাত, ইল্‌ম ইত্যাদি বিষয়ে বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা বলা। উপরন্তু এসকল কুফরী ও ইলহাদী কথাবার্তাকে মারেফাতের অংশ মনে করা। মূলত তাসাউফের আশগাল পালনের ফলে যেসকল ক্বলবী অনুভূতি, কাশফ, দর্শন ইত্যাদি লাভ হয় সে বিষয়ে কথাবার্তা বলা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ কখনো এ ধরনের ক্বলবী অনুভূতি ও হালত নিয়ে কিছু বলতেন না। তবে ক্বলবের মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসা, হিংসা, অহংকার, রিয়া ইত্যাদি পাপের প্রবেশের বিষয়ে তাঁরা কথা বলতেন। এ বিষয়ে কথা বলা যায়।

(৪). তাকদীর ও গায়েবী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলা, আলোচনা বা তর্ক করা।

(৫). পীর মুর্শিদের তা'যীমে সীমালঙ্ঘন করা। পীরকে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের মাকামে বসিয়ে দেওয়া। তিনি বলেছেন, শুধু সূফীবেশী মুশরিকগণই নয়, ভারতের অনেক আল্লাহওয়ালা ভালো সূফীও এই বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। তাঁর মতে, পীর আল্লাহর পথে চলার মাধ্যম বা উপকরণ। যার মধ্যে কোনো শরীয়ত-বিরোধী ও সুন্নাত-বিরোধী কর্ম নেই তাঁকেই পীর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু মুরীদ কখনোই সর্বাবস্থায় পীরের অনুসরণের চিন্তা করবে না। বরং নিজের মূল আদর্শ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মনে করবে এবং তাঁরই অনুসরণ করবে। মুরীদ পীরকে প্রাণের চেয়েও বেশি মহব্বত করবে এবং শরীয়ত অনুসারে তিনি যা বলবেন তা প্রাণদিয়ে পালন করবে। তবে কখনই শরীয়ত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো বিষয়ে তাঁর কথা মানবে না। পীরের মহব্বত যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) বিরোধিতায় নিপতিত করে তাহলে তা ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) হক্ক ও মহব্বতের সামনে বাকি সকল কিছুই অস্তিত্বহীন ও মূল্যহীন। পীর থেকে কোনো সুন্নাত বা শরীয়ত বিরোধী কাজ দেখলে তার প্রতিবাদ করতে হবে ও তাঁকে সংশোধন করতে হবে। তিনি যদি সংশোধিত না হন তাহলে দেখতে হবে যে, তার অন্যায়টি আকীদাগত না কর্মগত। আকীদাগত হলে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। কর্মগত হলে তাকে পরিত্যাগ করা জরুরি নয়, তবে তাঁকে বিপদ বা বালাগ্রস্ত মনে করে তার জন্য দোয়া করতে হবে। ঐ বিষয়ে তার অনুসরণ হারাম জেনে তাকে বিপদমুক্ত করার জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে চেষ্টা করতে হবে।

(৬). ওলীদের কবর যিয়ারতের জন্য দূরদূরান্তে সফরে যাওয়া। তিনি বলেন যে, যদিও এই যিয়ারত বিদ'আত কিন্তু সাধারণ মানুষ একে ইবাদত মনে করে। উচ্চ মর্তবার পরিচ্ছন্ন ক্বলবের অধিকারী ব্যক্তি এ সকল যিয়ারত থেকে মহব্বত বিষয়ক কিছু ফায়দা পেতে পারেন। কিন্তু সাধারণভাবে এসকল যিয়ারত শুধু অর্থ, সম্পদ, সময় ও শ্রমের অপচয়ই নয়, বরং শিরক ও ধ্বংসের অন্যতম কারণ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এসকল কবরবাসীদের কাছে সাহায্য চাওয়া, দোয়া করা ইত্যাদি শিরক। এছাড়া হয়ত শয়তান কবরবাসীর নামে গায়েবী আওয়াজ দিয়ে বা বিভিন্ন ধোঁকার মধ্যে ফেলে তাকে বিভ্রান্ত করবে। তিনি বলেন : মুর্দাগণের বরযখী একপ্রকার হায়াত থাকলেও দুনিয়ার দিক থেকে তাঁরা বেশক মৃত এবং কখনোই তাঁদের জীবিতদের মতো ক্ষমতা বা শক্তি নেই। যদি কবরের পাশে গেলে বা থাকলে ইল্‌ম, তারবিয়ত, বেলায়াত ইত্যাদি মাকসূদ হাসেল হতো তাহলে তো সকল মুসলমানকে এখন মদীনায় রওযা মুবারকের পাশে যেয়ে পড়ে থাকলেই চলতো। শিক্ষা, তারবিয়ত, পীরমুরীদি ইত্যাদি সকল ধারা বাতিল করতে হতো।

তিনি বলেন, শিক্ষা, বরকত, তারবিয়ত, কামালাত, ইত্যাদির জন্য জীবিত কোনো সুন্নাত অনুসারীর সাহায্য নিতে হবে। যদি তা না পাওয়া যায় তাহলে কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের অনুসরণকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরতে হবে। এতেই সকল সমাধান রয়েছে। কুরআন ও হাদীস সর্বত্র রয়েছে এবং করআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুসরণই পরিপূর্ণ বেলায়াত।[1]

(৬). আত্মশুদ্ধি পরিত্যাগের বিদ'আত

অপরদিকে অনেক ধার্মিক ও ইসলামপ্রেমিক মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অনুরূপ আত্মিক অবস্থা অর্জনে একেবারেই আগ্রহী নন। অনেকেই মোটামুটি দ্বীনের মৌলিক বিধিবিধান পালন করলেও সর্বদা বেশি বেশি নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অবহেলা করেন। আমাদের হৃদয়ের কাঠিন্য দূরকরার চেষ্টাও আমরা করি না।

সাধারণত আমরা আমাদের কর্মে সন্তুষ্ট। আমরা আমাদেরকে ভালো মনে করি, অন্যান্য মানুষদের চেয়ে আল্লাহর পথে বেশি অগ্রসর মনে করি। আল্লাহ যদি কাউকে কিছু নেক আমল করার তাওফীক দান করেন তাহলে তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া ও স্থায়িত্বের দোয়া না করে উক্ত আমলকে নিজের কৃতিত্ব মনে করে নিজের উপর খুশি ও সন্তুষ্ট হই এবং নিজেকে অন্যান্য দ্বীনদার

মানুষের চেয়ে উত্তম মনে করে অহংকারে নিপতিত হই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যেখানে অবিরত অঝোরে কেঁদেছেন সেখানে আমরা দুই একবারও কাঁদার কথা চিন্তা করি না। করবই বা কেন? আমরা তো মনে করি যে, আমাদের জন্য জান্নাত নিশ্চিত। আমরা হয়ত ভাবি, আমাদের তো কোনো গোনাহ নেই, যত গোনাহ তো অন্য মানুষেরা করেন। এজন্য আমরা দু'জন ধার্মিক মানুষ একত্রিত হলে নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করি না, বরং অন্য মানুষদের গোনাহের সমালোচনা করি। আমরা হয়ত মনে করি, আমাদের এত নেক আমল কবুল না করে আল্লাহর কি উপায় আছে! আল্লাহ ক্ষমা করেন।

সাহাবীগণের হৃদয়ের অবস্থা দেখুন। তাবেয়ী সাঈদ ইবনু হাইয়ান বলেন:

ﷺ " :

.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) আনহুম দু'জনে একত্রিত হন। পরে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) কাঁদতে কাঁদতে আসেন। সমবেত মানুষেরা প্রশ্ন করেন: আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন: ইনি (আব্দুল্লাহ ইবনু আমর) আমাকে বললেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন: "যদি কোনো মানুষের মনে শরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" (এ কথা শুনে আমি জাহান্নামের ভয়ে কাঁদছি।)[1] এই ছিল সাহাবীগণের হৃদয়ের অবস্থা। যারা সকলেই জান্নাতের নিশ্চিত সুসংবাদ কুরআনের ওহীর মাধ্যমে পেয়েছেন, তাঁরাও গোনাহের ভয়ে, শাস্তির ভয়ে, ইবাদত কবুল না হওয়ার ভয়ে কেঁদেছেন।

আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর প্রেম ও ভয়ে ক্রন্দন ইত্যাদি আমাদের জীবনে অনুপস্থিত। এমনকি যাঁরা আত্মশুদ্ধির নামে কিছু যিক্‌র ওযীফা, পীরমুরিদী, আনুষ্ঠানিক ক্রন্দন ইত্যাদি পালন করছি তাঁরাও আত্মশুদ্ধির নামে দলাদলি, বিদ্বেষ ও অহংকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। অথচ আত্মশুদ্ধির মূল হলো এগুলি থেকে হৃদয়গুলিকে পবিত্র করা।

অহঙ্কার সকল ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক। তবে তা যদি আত্মশুদ্ধি, ধর্মপালন, দ্বীনের দাওয়াত, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর ইবাদত কেন্দ্রিক হয় তাহলে তা আরো বেশি ক্ষতিকারক। নিজেকে ভালো দ্বীনদার মনে করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। সাথে সাথে যদি নিজেকে অন্য কোনো মুসলমানের চেয়ে বেশি দ্বীনদার মনে করা হয় তাহলে ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন, ধর্ম পালনে তো কম-বেশি আছেই। আমি দাড়ি রেখেছি, আরেকজন রাখেনি। আমি যিক্‌র করি অথচ সে করে না। আমি বিদ'আতমুক্ত, অথচ অমুক বিদ'আতে জড়িত। আমি সুন্নাত পালন করি কিন্তু অমুক করে না। আমি ইসলামের দাওয়াত, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছি অথচ আমার আরেক ভাই শুধুমাত্র নামায রোযা পালন করেই আরামে সংসার করছেন। এখন কি আমি ভাবব যে, আমি ও সে সমান বা আমি তার চেয়ে খারাপ? তাহলে আমার এত কষ্টের প্রয়োজন কি?

প্রিয় পাঠক, বিষয়টি ভুল খাতে চলে গেছে। **প্রথমত,** আমি যা কিছু করেছি সবই আল্লাহর দয়া, রহমত ও তাওফীক হিসাবে তাঁর দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে এবং এই নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য সকাতরে দোয়া করতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** যে ভাই এ সকল নেয়ামত পাননি তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দোয়া করতে হবে, যেন আল্লাহ তাকেও এ সকল নেয়ামত প্রদান করেন এবং আমরা একত্রে আল্লাহর জান্নাতে ও রহমতের মধ্যে থাকতে পারি। **তৃতীয়ত,** আমাকে খুব বেশি করে বুঝতে হবে যে, আমি যা কিছু করছি তা আমার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের তুলনায় খুবই কম। আমি কখনোই আল্লহর দেয়া দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। কাজেই, আমার তৃপ্ত হওয়ার মতো কিছুই নেই। **চতুর্থত,** আমাকে বার বার সজাগ হতে হবে যে, আমি জানি না আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণ হচ্ছে কি-না? হয়ত আমার এ সকল ইবাদত বিভিন্ন ভুল ও অন্যায়ের কারণে কবুল হচ্ছে না, অথচ যাকে আমি আমার চেয়ে ছোট ভাবছি তার অল্প আমলই আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন, কাজেই কী-ভাবে আমি নিজেকে বড় ভাবব? **পঞ্চমত,** আমি জানি না, আমার কী পরিণতি ও তার কী পরিণতি? হয়ত মৃত্যুর আগে সে আমার চেয়ে ভালো কাজ করে আমার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা নিয়ে আল্লাহ দরবারে হাজিরা দেবে।

কেয়ামতের হিসাবনিকাশ শেষে জান্নাতে প্রবেশের আগে কখনো কোনো মুমিন নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম বা বেশি ধার্মিক ভাবা তো দূরের কথা! সাহাবী, তাবেয়ীগণ ও পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম বুজুর্গ ও নেককার মানুষেরা নিজেদেরকে জীবজানোয়ারের চেয়ে উত্তম ভাবতে পারতেন না। তাঁরা বলতেন, কেয়ামতের বিচার পার হওয়ার পরেই বুঝতে পারব, আমি জানোয়ারের অধম না তাদের চেয়ে উত্তম।

আরেকটি বিষয় আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দেয়। আমরা জানি যে, শিরক, কুফর, বিদ'আত, হারাম, পাপ ইত্যাদিকে ঘৃণা করা ও যারা এগুলিতে লিপ্ত বা এগুলির প্রচার প্রসারে লিপ্ত তাদেরকে ঘৃণা করা আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ঈমানী দায়িত্ব। আমরা পাপকে ঘৃণা করার ও হৃদয়কে হিংসামুক্ত রাখার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করব?

এই বিষয়টিকে শয়তান অন্যতম ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করে, যা দিয়ে সে অগণিত ধার্মিক মুসলিমকে হিংসা, হানাহানি, আত্মতৃপ্তি ও অহংকারের মতো জঘন্যতম কবীরা গোনাহের মধ্যে নিপতিত করছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত, –

প্রথমত, পাপ অন্যায়, জুলুম অত্যাচার, শিরক, কুফর, বিদ'আত বা নিফাককে অপছন্দ ও ঘৃণা করতে হবে; এবং তা করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে ও তাঁর প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে। তিনি যে পাপকে যতটুকু ঘৃণা করেছেন, নিন্দা করেছেন বা যতটুকু

গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাতের বাইরে মনগড়াভাবে ঘৃণা করলে তা হবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের নামে নিজের ব্যক্তি আক্রোশ বা অহংকারকে প্রতিষ্ঠা করা ও শয়তানের আনুগত্য করা।

এই ক্ষেত্রে বর্তমানে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ কঠিন ভুলের মধ্যে নিপতিত হন। কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত কঠিন পাপগুলিকে আমরা ঘৃণা করি না বা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি না, কিন্তু যেগুলি কোনো পাপ নয় বা কম ভয়ঙ্কর পাপ সেগুলি নিয়ে প্রচণ্ড হানাহানি ও হিংসা বিদ্বেষে নিপতিত হই। একুট চিন্তা করলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের সমাজের ধার্মিক মুসলিমদের দলাদলি, হানাহানি, গীবতনিন্দা ও অহঙ্কারের ভিত্তি হলো নফল ইবাদত। আমরা কুফর, শিরক, হারাম উপার্জন, মানুষের ক্ষতি, সৃষ্টির অধিকার নষ্ট, ফরয ইবাদত ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোনো আলোচনা, আপত্তি, বিরোধিতা বা ঘৃণা করি না। অথচ সুন্নাত নফল নিয়ে কীও ভয়ঙ্কর হিংসা ঘৃণার সয়লাব। ফরয সালাত যে মোটেও পড়ে না, তার বিষয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, কিন্তু যে সুন্নাত সালাত আদায় করল না, বা সালাতের মধ্যে টুপি বা পাগড়ি পরল না, অথবা সালাতের শেষে মুনাজাত করল বা করল না, অথবা সালাতের মধ্যে হাত উঠালো বা উঠালো না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা হানাহানি ও অহঙ্কারে লিপ্ত রয়েছি।

দ্বিতীয়ত, এই ঘৃণা একান্তই আদর্শিক ও ঈমানী। ব্যক্তিগত জেদাজেদি, আক্রোশ বা শত্রুতার পর্যায়ে যাবে না। আমি পাপটিকে ঘৃণা করি। পাপে লিপ্ত মানুষটিকে আমি খারাপে লিপ্ত বলে জানি। তিনি যখন তা পরিত্যাগ করবেন তখন তিনি আমার প্রিয়জন হবেন। আমি তার জন্য দোয়া করি যে, আল্লাহ তাকে পাপ পরিত্যাগের তাওফীক দিন।

তৃতীয়ত, ঘৃণা ও বিরোধিতার অর্থ হিংসা নয়। ভালবাসার সাথে এই ঘৃণা একত্রিত থাকে। মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক শিটকায় ও তাকে ঘৃণা করে। আপন ভাই তার অপরাধে লিপ্ত ভাইকে ঘৃণা করে। কিন্তু এই ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা। মূলত ব্যক্তি শিশু বা ব্যক্তি ভাইকে ঘিরে থাকে তার সীমাহীন ভালবাসা, আর তার গায়ে জড়ানো ময়লা বা অপরাধকে ঘিরে থাকে ঘৃণা। সাথে থাকে তাকে ঘৃণিত বিষয় থেকে মুক্ত করার আকুতি।

চতুর্থত, ঘৃণা ও অহংকার এক নয়। আমি পাপকে ঘৃণা করি। পাপীকে অন্যায়কারী মনে করি। পাপের প্রসারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। কিন্তু এগুলির অর্থ এই নয় যে, আমি আমার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে অমুক পাপীর চেয়ে উন্নত, মুত্তাকী বা ভালো মনে করি। নিজেকে কারো চেয়ে ভালো মনে করা তো দূরের কথা নিজের কাজে তৃপ্ত হওয়াও কঠিন কবীরা গোনাহ ও ধ্বংসের কারণ। আমি জানি না যে, আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কি-না, আমি জানি না আমার পরিণতি কী আর উক্ত পাপীর পরিণতি কী, কিভাবে আমি নিজেকে অন্যের চেয়ে ভালো মনে করব?

পঞ্চমত, সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুমিনকে নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকতে হবে। অন্যের কথা চিন্তা করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে। আমরা অধিকাংশ সময় অন্যের শিরক, কুফর, বিদ'আত, পাপ, অন্যায় ইত্যাদির চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। মনে হয় আমাদের বেলায়াত, কামালাত, জান্নাত, নাজাত সবকিছু নিশ্চিত। এখন শুধু দুনিয়ার মানুষের সমালোচনা করাই আমার একমাত্র কাজ। বাঁচতে হলে এগুলি পরিহার করতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া পাপ বা পাপীর চিন্তায় নিজের হৃদয়কে ব্যস্ত রাখা খুবই অন্যায়। এ চিন্তা আমাদের কঠিন ও আখেরাত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে ফেলে দেয়। তা হলো আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার। যখনই আমি পাপীর চিন্তা করি তখনই আমার মনে তৃপ্তি চলে আসে, আমি তো তার চেয়ে ভালো আছি। তখন নিজের পাপ ছোট মনে হয় ও নিজের কর্মে তৃপ্তি লাগে। আর এ হলো ধ্বংসের অন্যতম পথ।

হিংসামুক্ত পবিত্র হৃদয় অর্জন করাই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যতম সুন্নাত। এই সুন্নাতকে প্রতিপালন ও জীবনদানের নির্দেশ তিনি বিশেষভাবে দিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব আলোচনার সময় আমরা আনাস ইবনু মালিক (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : "বেটা, যদি সম্ভব হয় তাহলে এভাবে জীবনযাপন করবে যে, সকালে সন্ধ্যায় (কখনো) তোমার অন্তরে কারো জন্য কোনো ধোঁকা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল কামনা থাকবে না। অতঃপর তিনি বলেন : বেটা, এটা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে সে আমাকেই ভালবাসবে। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"

হিংসা ও অহংকারমুক্ত হৃদয় হলো জান্নাতের অন্যতম চাবিকাঠি। অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন : "একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর কাছে বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন : এখন তোমাদের এখানে একজন জান্নাতী মানুষ প্রবেশ করবেন। তখন একজন আনসারী মানুষ প্রবেশ করলেন, যাঁর দাড়ি থেকে ওযুর পানি পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে তাঁর জুতাজুড়া ছিল। পরের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই কথা বললেন এবং একই ব্যক্তি প্রবেশ করল। তৃতীয় দিনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম দিনের মতোই আবারো বললেন এবং আবারো একই ব্যক্তি প্রবেশ করল। তৃতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস ভেঙ্গে চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর উক্ত আনসারী ব্যক্তির পিছে পিছে যেয়ে বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মন কষাকষি করেছি এবং তিন রাত বাড়িতে যাব-না বলে কসম করেছি। সম্ভব হলে এই কয় রাত আপনার কাছে থাকতে দিবেন কি ? তিনি রাজি হন। (আব্দুল্লাহর ইচ্ছা হলো তিন রাত তাঁর কাছে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত জেনে সেই মতো আমল করা, যেন তিনিও জান্নাতী হতে পারেন)। তিনি তিন রাত তাঁর সাথে থাকেন, কিন্তু তাঁকে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে বা বিশেষ কোনো নফল ইবাদত পালন করতে দেখেন না। তবে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শুধুমাত্র ভালো কথা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে শোনেননি। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার কাছে তাঁর আমল খুবই নগণ্য মনে হতে লাগল। আমি বললাম : দেখুন, আমার সাথে আমার পিতার কোনো মনোমালিন্য হয়নি। তবে আমি পরপর তিনি দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনলাম এখন একজন জান্নাতী মানুষ আসবেন এবং তিন বারই আপনি আসলেন। এজন্য আমি আপনার আমল দেখে সেইমতো আমল করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে তিন রাত্র কাটিয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখলাম না! তাহলে কী কর্মের ফলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতী বললেন ? তিনি বললেন : তুমি যা দেখেছ এর বেশি কোনো আমল আমার নেই, তবে আমি আমার অন্তরের মধ্যে কোনো

মুসলমানের জন্য কোনো অমঙ্গল ইচ্ছা রাখি না এবং আমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন : এই কর্মের জন্যই আপনি এই মর্যাদায় পৌছাতে পেরেছেন।"[১]

ষষ্ঠ পদ্ধতি, তাবাররুকের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন

তাবার্‌রুক : সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত

সুন্নাত থেকে খেলাফে-সুন্নাতে চলে যাওয়ার আরেকটি কারণ হলো তাবাররুকের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত অনুসরণের একটি দিক হলো তাবাররুক বা তাঁর স্মৃতিজড়িত স্থান ও দ্রব্যের প্রতি ভালবাসা ও তা থেকে বরকত লাভের আশা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ওযুর পানি, গায়ের ঘাম, কফ, থুতু, মাথার চুল, ঝুটা খাবার বা পানি অথবা তাঁর দেওয়া যেকোনো উপহার গভীরতম ভালবাসা ও প্রগাঢ় ভক্তির সাথে গ্রহণ করেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের এসকল কাজে বাধা দেননি, অনুমোদন করেছেন। পরবর্তী যুগের তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও অন্যান্য যুগের সকল বুজুর্গ ও রাসূল-প্রেমিক মুসলিম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত যেকোনো দ্রব্যের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের আকুতির কথা কখনো গোপন করেননি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরে সাহাবীগণ অন্য কোনো বুজুর্গ সাহাবীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্যের প্রতি এধরনের আচরণ করেননি। তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ীগণও কখনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ীর স্মৃতি বিজড়িত কোনো দ্রব্য বরকতের জন্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেননি। আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আব্বাস, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, বেলাল, ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহুম বা অন্য কোনো সাহাবীর কোনো স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী তাবাররুক হিসাবে গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী বুজুর্গগণের ক্ষেত্রেও তাঁরা এ ধরনের কোনো আচরণ করেননি।[২]

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের এ কর্মকে অনেক আলেম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমোদনের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন : শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত বস্তুকেই তাবাররুক বা বরকতের জন্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও ভালবাসতে হবে। অন্য কোনো বুজুর্গের ক্ষেত্রে তাবাররুক জায়েয নয়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্মের উপর নির্ভর করা ছাড়াও তাঁরা অতিরিক্ত যুক্তি হিসাবে বলেন যে, অন্যান্য বুজুর্গের বুজুর্গীর বিষয়টি আমাদের ধারণা, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। কাজেই, তাঁদের স্মৃতিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতির মতো মনে করা ঠিক হবে না। অপরদিকে অন্য অনেক আলেম সকল বুজুর্গের স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যকে বরকতের জন্য সংরক্ষণ ও গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছেন।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্য যেমন মু'মিনের ভালবাসা ও ভক্তির বিষয়, তেমনি তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিও মুমিনের ভক্তি ও ভালবাসার স্থান। তিনি যে স্থানে নামায পড়েছেন সে স্থানে নামায পড়া, যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করেছেন সেখানে বিশ্রাম করা, যেখানে তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করেছিলেন সেখানে কিছুক্ষণ শয়ন করা, যেখানে তিনি প্রাকৃতিক হাজত পূরণ করেছেন সেখানে প্রাকৃতিক হাজত পূরণ করা, এভাবে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত সকল স্থানে তাঁরই কর্মের হুবহু অনুকরণের মাধ্যমে তাবাররুক বা বরকত লাভ সাহাবীগণের সুন্নাত। আমরা ইতঃপূর্বে এধরনের অনেক উদাহরণ সাহাবীগণের জীবনে দেখেছি। এক হাদীসে তাবিয়ী মুসা ইবনু উক্কবা বলেন,

ﷺ

আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা)-এর পুত্র সালেমকে দেখেছি (হজ্ব-উমরার সফরে) পথে কিছু জায়গা দেখে দেখে সেখানে নামায আদায় করতে। তিনি বলতেন : "আমার আব্বা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) এসকল স্থানে নামায আদায় করতেন, কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এসকল স্থানে নামায আদায় করতে দেখেছেন।"[৪]

নাফে' বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) আমাকে বলেছেন :

ﷺ

ﷺ ...

. ...

নবীজী ﷺ শরাফুর রাওহার মসজিদের পরের ছোট মসজিদের জায়গায় নামায আদায় করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর জায়গাটি চিনতেন... তিনি (হজ্বে যাওয়ার সময়) দুপুরে রাওহা থেকে যাত্রা করতেন এবং ঐ স্থানে আসার পরে সেখানে যোহরের নামায আদায় করতেন। অনুরূপভাবে মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসার সময়ে যদি প্রভাতের কিছু সময় পূর্বে বা শেষ রাত্রে ঐ স্থানে পৌছাতেন তাহলে সেখানে বাকি রাত অবস্থান করতেন এবং ফজরের নামায সেখানে আদায় করতেন।"[৫]

এরূপ আরো অনেক ঘটনা আমরা হাদীসে দেখতে পাই। তাঁদের এ সকল কর্মের মধ্যে আমরা তিনটি বিষয় লক্ষ্য করি :

প্রথমত, তাঁরা এ সকল স্মৃতি বিজড়িত স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণের মাধ্যমে বরকত সন্ধান করতেন। রাসূলুল্লাহ

ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিতে তিনি যা করেছেন ঠিক সেই কাজ সেভাবে করার জন্য কোনো কোনো সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে চলতি অবস্থায় কোনো গাছ বা ডালের কারণে একটু মাথা নিচু করেছিলেন, সেখানেও তাঁরা চলতি অবস্থায় মাথা নিচু করতেন। যেখানে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বসেছেন সেখানে প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা হাজত পূরণের জন্য বসতেন। তাঁদের অনুসরণ ছিল অতুলনীয় !

এ সকল স্থানের নিজস্ব কোনো বরকত তাঁরা খুঁজতেন না। অর্থাৎ, এ সকল স্থানের মাটি বা পাথর গ্রহণ, যেখানে তিনি ঘুমিয়েছেন বা হাজাত পূরণ করেছেন সেখানে বরকতের জন্য নামায আদায় অথবা যেখানে তিনি নামায আদায় করেছেন সেখানে বরকতের জন্য ঘুমান ইত্যাদি কাজ তাঁরা করতেন না। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামায আদায়ের জন্য যেসকল স্থানে থেমেছেন সেখানে তাঁরা থেমে ফরয নামায আদায় করতেন। সেসকল স্থানে বেশি বেশি নফল নামায আদায়ের ঘটনাও তাঁদের থেকে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা এ সকল স্মৃতি বিজড়িত স্থানে যেয়ে সেখানে নামায আদায়, বিশ্রাম করা বা হাজত পূরণ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ঘর থেকে রের হননি। । কারণ, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের খেলাফ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো এ সকল স্থানে নামায আদায়, বিশ্রাম করা বা হাজত পূরণ করার জন্য গমন করেননি। তিনি হজ্ব বা জিহাদের জন্য গমনাগমনের পথে এসকল স্থানে থেমেছেন। সাহাবীগণও ঠিক তাঁর সুন্নাতের অবিকল অনুসরণে গমনাগমনের পথে এসকল স্থানে থেমে হুবহু তাঁর অনুকরণের মাধ্যমে বরকত লাভ করতেন।

তৃতীয়ত, তাঁরা এসকল স্থানে তাঁর অনুসরণের মাধ্যমে বরকত লাভের বিষয়টি একান্তই ব্যক্তিগতভাবে করতেন। এ নিয়ে ডাকাডাকি, অন্যদেরকে আগ্রহ প্রদান ইত্যদি কোনোরূপ কাজ তাঁরা করতেন না।

কিন্তু তাঁদের যুগের অনেক তাবেয়ী ও নও মুসলিম এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করতে থাকেন। তাঁরা দলবেধে এ সকল স্থানে যেতে থাকেন। অনেকে তাঁর অনুসরণের দিকে লক্ষ্য না রেখে তিনি যেখানে বিশ্রাম করেছেন বা বাইআত গ্রহণ করেছেন সেখানেও নামায আদায় করতেন। অনেকে শুধুমাত্র এসকল স্থানে যেয়ে নামায আদায়ের জন্য রাওয়ানা দিতেন। এ সকল বিষয় দেখে প্রথম যুগের সাহাবীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তাঁরা এর বিরোধিতা করেন। এ বিষয়ক একটি হাদীস দেখুন:

.

. :

ﷺ

ﷺ

ﷺ.

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হুদাইবিয়ার প্রান্তরে একটি গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথের সাহাবীগণ থেকে "আমরণ যুদ্ধের" বাইয়াত গ্রহণ করেন। উক্ত বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবী মুসাইয়াব ইবনু হুজন (রা.) বলেন : আমরা পরের বৎসর যখন উমরার জন্য আসলাম তখন ঐ গাছটিকে আর চিনতে পারলাম না। তাবেয়ী তারেক ইবনু আব্দুর রহমান বলেন : আমি হজ্বের জন্য যাত্রা পথে একস্থানে দেখলাম কিছু মানুষ নামায আদায় করছেন। আমি প্রশ্ন করলাম : এ কোন্ মসজিদ? তাঁরা বললেন : এই সেই গাছ যে গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইআতে রেদওয়ান গ্রহণ করেন। তারেক বলেন আমি পরে প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনু মুসাইয়াবকে বিষয়টি বললাম। তিনি বলেন : আমার আব্বা স্বয়ং বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেন। তিনি বলেন যে, পরের বৎসর উমরায় যাওয়ার পথে আমরা আর গাছটি চিনতে পারিনি। আমরা গাছটিকে ভুলে গিয়েছিলাম, তাকে আর পাইনি। সাঈদ বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ জানলেন না, আর তোমরা জানলে! তোমরাই বেশি জান![1]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির বাইয়াতে রেদওয়ানের পরের বৎসর আমরা যখন উমরা পালনের জন্য আবার ফিরে আসলাম তখন আমাদের মধ্য থেকে দু'জন সাহাবীও ঐ গাছটির নিচে একত্রিত হয়নি। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ছিল।[2]

নাফে' (রাহ.) বলেন : কিছু মানুষ হুদাইবিয়ায় 'বাইয়াতে রেদওয়ানের গাছ' নামে কথিত গাছটির নিকট আসত এবং সেখানে নামায আদায় করত। খলীফা উমর ফারুক (রা.) এ কথা জানতে পারেন। তখন তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখান। পরে তিনি ঐ গাছটিকে কেটে ফেলতে নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ মতো গাছটি কেটে ফেলা হয়।[3]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ফারুক (রা.) তাঁর খিলাফতকালে এক সফরে কিছু মানুষকে দেখেন যে, তারা সবাই একটি স্থানের দিকে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন : এরা কোথায় যাচ্ছে? তাঁকে বলা হয় : ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, এখানে একটি মসজিদ বা নামাযের স্থান আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করেছিলেন, এজন্য এরা সেখানে যেয়ে নামায আদায় করছে। তখন তিনি বলেন :

.

.

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তো এই ধরনের কাজ করেই ধ্বংস হয়েছে। তারা তাদের নবীগণের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি খুঁজে বেড়াত এবং সেখানে গীর্জা ও ইবাদতখানা তৈরি করে নিত। যদি কেউ যাত্রা পথে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত) এসব মসজিদে নামাযের সময়ে উপস্থিত হয় তাহলে সে সেখানে নামায আদায় করবে। আর যদি কেউ যাত্রাপথে অন্য সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে সে না থেমে চলে যাবে। বিশেষ করে এসকল মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্য করবে না।"[১]

এজন্য ইমাম মালিক ও মদীনার অন্যান্য আলেমগণ মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলিতে যেতে নিষেধ করতেন। অনেক আলেম শুধুমাত্র কুবা'র মসজিদে যেয়ে নামায আদায় করতে অনুমতি দিতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন ও নামায আদায় করতেন বলে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইমাম মালিক কুবার মসজিদে নামায আদায়ের জন্য যাওয়াকে মাকরূহ মনে করতেন। তিনি ভয় পেতেন যে, ক্রমে ক্রমে মানুষ একে নিয়মিত রীতি বা সুন্নাতে পরিণত করে ফেলবে। আর মুস্তাহাবকে সুন্নাতে বা নিয়মিত রীতিতে পরিণত করলে বা সুন্নাতের গুরুত্ব দিয়ে পালন করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।[২]

এ ছিল আল্লাহর হাবীব ও খলীল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু বা স্থানের বরকতলাভের ক্ষেত্রে সাহাবী-তাবেয়ীগণের সুন্নাত। বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে "তাবাররুকের" নামে অগণিত শিরক প্রচলিত রয়েছে। যেমন, কবর, মাজার, পুকুর, পুকুরের মাছ, পানি, জীবজানোয়ার ইত্যাদিকে ভক্তি করা, সেখানকার মাটি, পানি, ময়লা ইত্যাদি সংগ্রহ করা ও পবিত্র মনে করা, এগুলিতে রোগব্যধি ভালো হবে মনে করা ইত্যাদি।

আমাদের দেশের সাধারণ মুসলিম এ বিষয়ে অনেকটা হিন্দু ও অন্যান্য পৌত্তলিকদের মতো হয়ে গিয়েছেন। অলৌকিক বা অস্বাভাবিক সবকিছুকে ভক্তি করা ও পূজা করা পৌত্তলিকদের ধর্ম। পানিতে ধোঁয়া, মাটি থেকে আগুন, পাথরে পানি ইত্যাদি যা কিছু তারা অস্বাভাবিক দেখেন তাকেই ঠাকুর বলে ভক্তি করেন। এমনকি কোনো গরু যদি অস্বাভাবিক দুধ বা বাছুর দেয় তাঁরা সেই গরুকেও ঠাকুর বলে ভক্তি ও পূজা করেন। অর্থাৎ, সৃষ্টির মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা বা অলৌকিকতা দেখলে তাকে স্রষ্টার শক্তি মনে না করে সংশ্লিষ্ট বস্তুর শক্তি মনে করে তাকে পূজা করেন। আমাদের দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীরও অনেকটা সেই অবস্থা।

যেখানে তাওহীদের মাধ্যমে মানুষকে সকল কুসংস্কার, অমঙ্গলধারণ ও সৃষ্টির উপাসনা থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর উপাসক অকুতোভয় দৃঢ়হৃদয় মানুষ তৈরি করেছে ইসলাম, সেই ইসলামের অনুসারীগণ অজ্ঞতা, অতিভক্তি ও কুসংস্কারের কারণে মূর্তির চোখের পানি, মাছের গায়ের ময়লা, পুকুরের কাদা, পীর নামধারীর পায়ের ধুলা ময়লা, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত দ্রব্যের ভক্তির মাধ্যমে মঙ্গললাভ ইত্যাদি কুসংস্কার ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত।

সম্বোধন ও উপাধি : সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত

তাবাররুক ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বিষয় হলো বুজুর্গগণের সম্বোধনের পদ্ধতি ও তাঁদের সম্মানে উপাধি ব্যবহার। এ বিষয়ে সারল্য ও স্বাভাবিকতাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় তাঁরা ছিলেন সবার ঊর্ধে। তাঁদের হৃদয় জুড়ে ছিলেন তিনি। তাঁর জন্য অকাতরে সকল সম্পদ, স্বজন ও নিজ জীবন বিলাতে সদা প্রস্তুত ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এই ভক্তি ও ভালবাসা ভাষার অলঙ্কারে প্রকাশের রীতি তাঁদের ছিল না। তাঁরা সর্বদা (ইয়া রাসূলাল্লাহ) ও (ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ) বলেই তাঁকে সম্বোধন করতেন। তাঁকে সম্বোধন করে তাঁদের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ও ভালবাসা জানাতে তাঁরা অনেক সময় বলতেন :

"আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবানি হউন"।

(ইয়া হাবীবাল্লাহ), (ইয়া খলীলাল্লাহ) ইত্যাদি বলার প্রচলন তাঁদের মধ্যে ছিল না, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর হাবীব ও খলীল। তাঁকে সম্বোধনের সময় 'সাইয়্যেদানা', 'মাওলানা' ইত্যাদি ভক্তি বা মর্যাদা-জ্ঞাপক উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। যদিও কাউকে 'সইয়্যেদুনা', 'মাওলানা' ইত্যাদি বলার রেওয়াজ তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এগুলির ব্যবহার না-জায়েয নয়।

উমর ফারুক আবু বকর সিদ্দীককে (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন :

ﷺ

"আপনি সাইয়েদুনা: আমাদের সাইয়্যেদ, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমাদের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সবচেয়ে প্রিয়।"[৩]

উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আরো বলতেন :

"আবু বকর আমাদের সাইয়েদ: নেতা, আমাদের সাইয়্যেদকে, বেলালকে মুক্ত করেছেন।"[৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনু হারেসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)- কে বলতেন :

"তুমি আমাদের ভাই এবং মাওলানা, অর্থাৎ আমাদের মাওলা (বন্ধু, অভিভাবক বা খাদেম)।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন যে, তিনিই মানবকুলের নেতা বা সাইয়্যেদ। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

"আমি আদম সন্তানদের সাইয়েদ বা নেতা, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমিই মাটি ফুড়ে উঠব, আমিই প্রথম শাফা'আত করব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফা'আতই কবুল করা হবে।"[২]

সম্ভবত দুটি কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে তাঁরা এসমস্ত উপাধি ব্যবহার করতেন না। **প্রথমত,** আল্লাহর বান্দা, নবী ও রাসূল হওয়ার মর্তবা সর্বোচ্চ মর্যাদা। এরপরে অন্য কোনো শব্দ আর তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে না। যেমন, কাউকে রাষ্ট্রপতি বলার পরে আর পৌরসভার চেয়ারম্যান, এলাকার মাতবর, সংসদ সদস্য ইত্যাদি উপাধিতে কোনো সম্মান বৃদ্ধি হয় না।

দ্বিতীয়ত, তিনি ভালবাসতেন যে, তাঁকে শুধু 'আব্দুল্লাহ'(আল্লাহর বান্দা) ও 'রাসূলুল্লাহ'(আল্লাহর রাসূল) বলা হোক। অতিরিক্ত উপাধি তিনি অপছন্দ করতেন।

তৎকালীন আরবীয় সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের প্রশংসা ও বিভিন্ন উপাধি ব্যবহারের নিয়ম ছিল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। বরং সারল্যই তাঁর প্রিয় ছিল। অনেক সময় মদীনার আদবের সাথে অপরিচিত দূরের বেদুঈনগণ ইসলাম গ্রহণের জন্য এসে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতিরিক্ত প্রশংসাবাচক উপাধি ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। আনাস ইবনু মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

ﷺ :

.

এক ব্যক্তি বলে : "ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া সাইয়্যেদানা, ইবনা সাইয়্যেদিনা, খাইরানা, ইবনা খাইরিনা : হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা, আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ মানুষের সন্তান।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "হে মানুষেরা, তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি) অবলম্বন করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী বা প্রবৃত্তির অনুসারী করে না ফেলে। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ), আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর কসম! আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে যে স্থানে রেখেছেন, যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে, তা আমি পছন্দ করি না।"[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

ﷺ [ ]

.

আমি বনু আমের গোত্রের একদল প্রতিনিধির সাথে মদীনায় নবীজী ﷺ -এর কাছে এলাম। আমরা বললাম : "আপনি আমাদের ওলী বা অভিভাবক এবং আপনি আমাদের সাইয়্যেদ বা নেতা।" তিনি বললেন : "সাইয়্যেদ তো আল্লাহ তাবারকা ও তা'লা।" আমরা বললাম : "আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মহান।" তখন তিনি বলেন : "তোমরা তোমাদের কথা বল বা কিছু কথা বল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে নিয়ে না যায়।"[৪]

সাহাবীগণ শাহাদতের জন্য বা তাঁর উপর সালাত সালাম প্রেরণ করতে তাঁর নাম নিতেন। যেমন- হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর সালাত পাঠান, আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন। আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন।

সালাত প্রেরণের ক্ষেত্রে তাঁর নামের আগে (সাইয়্যেদানা), (হাবীবানা), (মাওলানা), (শাফিয়ানা) ইত্যাদি উপাধি ব্যাবহরের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) একটি দরুদে 'সাইয়্যেদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তকীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, ইমামুল খাইর, রাসূলুর রাহমাহ' উপধি ব্যবহার করেছেন। আর তাঁর এসকল উপাধি তো বলেও শেষ করা যায় না। রেসালাত, নবুয়ত ও আবদিয়তের উপাধিই সকল উপধির অর্থ বোঝায়। এজন্য এগুলিই ছিল বহুল প্রচলিত। তাঁরা সাধারণত সর্বদা এগুলিই ব্যবহার করতেন।

অন্য কারো কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উল্লেখ করতে হলে সাহাবীগণ সাধারণত তাঁর উপাধি (রাসূলুল্লাহ) ও (নাবিয়্যুল্লাহ) বলে তাঁর উল্লেখ করতেন। যেমন বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন, নবীয়্যুল্লাহ ﷺ বলেছেন বা করেছেন ইত্যাদি।

কখনো কখনো তাঁরা অন্যের কাছে তাঁর উল্লেখ করতে তাঁর নাম উল্লেখ করতেন, যদিও সাধারণত তাঁর উপাধি বলাই তাঁদের রীতি ছিল। একব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমরকে (রা.) সফরে নামায কসর করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলে : আমরা তো কুরআন কারীমে নিজ গৃহে উপস্থিতকালে নামাযের বিষয়ে ও ভয়কালীন নামাযেব বিষয়ে উল্লেখ দেখতে পাই। কিন্তু সফরের নামায সম্পর্কে কিছু দেখতে পাই না।

তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন :

ﷺ ﷺ

"ভাতিজা, মহান আল্লাহ আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ﷺ -কে পাঠালেন, তখন আমার কিছুই জানতাম না। আমরা তো শুধু সে কাজই করি মুহাম্মাদ ﷺ -কে যা করতে দেখেছি।"[১]

এ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষেত্রে তাঁদের রীতি। আর অন্য সকল বুজুর্গ সাহাবীগণের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের রীতি ছিল সম্বোধনের সময় কুনিয়াত ধরে ডাকা। অর্থাৎ, (অমুকের পিতা) বলে ডাকতেন। আর তাঁদের উল্লেখ করার সময় নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বা অন্য কোন সাহাবী বা বুজুর্গকে ডাকার জন্য বা তাঁর নাম বলার জন্য নামের পূর্বে বা পরে হযরত, হুজুর, কেবলা, বাবা, বাবাজান, আব্বাজান, খাজা ইত্যাদি কোনো সম্মানসূচক শব্দ তাঁরা ব্যবহার করতেন না।

আর আমাদের দেশের প্রচলিত অগণিত আল্লাহর নৈকট্য জ্ঞাপক উপাধি তাঁরা কখনো ব্যবহার করেননি। তাবেয়ীগণ, তাবে-তাবেয়ীগণ, ইমামগণ ও প্রথম যুগের সকল আলেমই এইভাবে চলেছেন। উপাধির ব্যবহার তাঁদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। একটু পরের যুগে সামান্য উপাধি যা ব্যবহার করা হতো তা মুসলমানদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড অনুসারে। আল্লাহর সাথে তাঁর কতটুকু সম্পর্ক এ বিষয়ে কোনো কিছু বলা হতো না।

যেমন কখনো কখনো কারো সম্পর্কে বলা হতোঃ আলেম, কারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, যাহেদ বা সংসারত্যাগী, সালেহ বা নেককর্মশীল, ইমাম বা নেতা ইত্যাদি। এগুলিও তাবে-তাবেয়ীগণের পরের যুগে ব্যবহার করা হতো, উপাধি হিসবে নয়, বরং জীবনী বর্ণনার প্রয়োজনে বলা হতো এবং অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা হতো। বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কতটুকু তা নিয়ে উপাধি তৈরি করা হতো না।

গাওস, কুতুব ইত্যাদি শব্দের তো কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মুহিউস সুন্নাহ, কামেউল বিদ'আত, ইমামুল আইম্মাহ, গওস, গাওসে আ'জম, গাওসে সাকালাইন, ওলীয়ে কামেল, হাদীয়ে জামান, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, খাজা, আশেকে রাসূল, ওলীকুল শিরোমনি, সূফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, কেবলা, কাবা ইত্যাদি ইত্যাদি অগণিত উপাধির কোনোকিছুই তাঁরা কখনোই ব্যবহার করেননি।

কারো জীবদ্দশায় তো নয়ই, এমনকি কারো মৃত্যুর পরেও তাঁর নামের সাথে কোনো উপাধি তাঁরা ব্যবহার করতেন না। হানাফী মাযহাবের অন্যতম দুই ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসূফ তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার (রাহ) ইন্তেকালের পরে তাঁর মতামত সংকলন করে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক বই লিখেন। তাঁদের বইগুলি বাজারে পাওয়া যায়। আপনারা একটু কষ্ট করে তাঁদের লেখা বইগুলি পড়ে দেখুন। তাঁরা কখনোই "আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ" বলা ছাড়া কোনো উপাধি ব্যবহার করেননি। অগণিত স্থানে শুধু লিখেছেন : আবু হানীফা বলেছেন, আবু হানীফা রাহিমহুল্লাহ বলেছেন, আবু হানীফার মত, আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহর মত ইত্যাদি। ইমাম, ইমামুল মুহাদ্দিসীন, ইমাম আ'যম, ইমামুল আইম্মাহ, ফকীহকুল শিরোমনি, ওলীকুল শিরোমনি, গওসে সামদানী ইত্যাদি একটি উপাধিও তাঁরা ব্যবহার করেননি। তাঁদের সকল ভক্তি প্রকাশ করেছেন একটি বাক্যে : "রহিমাহুল্লাহ"।

আপনারা যে কোনো গবেষক ইসলামের প্রথম তিন বরকতময় যুগের লেখা যে কোনো গ্রন্থ থেকে এধরনের একটি উপাধিও খুঁজে বের করতে পারবেন না। এমনকি এর পরবর্তী কয়েক যুগেও এ সকল উপাধির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামের প্রথম ৩০০ বৎসরের মধ্যে লেখা কোনো হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আকীদা, জীবনী, ইতিহাস বা অন্য কোনো গ্রন্থে এ ধরনের কোনো উপাধি ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না (শিয়া, রাফেযী বা বিভ্রান্ত ফিরকাসমূহের গ্রন্থ ছাড়া)।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রতি শত বৎসরের মাথায় এই উম্মতের জন্য এমন মানুষ প্রেরণ করবেন যারা (অথবা যিনি) এই উম্মতের জন্য তার দ্বীনকে নবায়িত করবে।"[২]

এই হাদীসের আলোকে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে কোনো আলেম নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন যে, প্রথম শতকের মজাদ্দিদ কে হতে পারেন। যে সকল খলীফা বা আলেম ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের সার্বিক কর্মের আলোকে হয়ত কেউ কাউকে মুজাদ্দিদ বলে ধারণা করেছেন। কিন্তু কখনোই কোন জীবিত মানুষকে মুজাদ্দিদ বলে আখ্যায়িত করা বা কাউকে "মুজাদ্দিদে যামান" বলে উপাধি দেওয়া কখনোই তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না।[৩]

এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার:

(ক). সন্দেহাতীতভাবে এ সকল উপাধি ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ। এগুলি ব্যবহার করা রীতিতে পরিণত করার অর্থ হলো সুন্নাতকে বিতাড়িত ও মৃত্যুদান করা। আর এই খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বলার অর্থ সুন্নাতকে অপছন্দ করা ও ঘৃণা করা। আমরা সর্বদা বলি যে, ক্ষদ্রতম সুন্নাত, যেমন টুপি, মেসওয়াক ইত্যাদিকেও ঘৃণা করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে উপাধি ব্যবহারের সুন্নাত, সম্বোধনের সুন্নাত ইত্যাদিকে ঘৃণা করলে কি হবে তা আপনারাই বলবেন।

(খ). এ সকল উপাধির অনেকগুলি অত্যন্ত বেয়াদবীমূলক। যেমন, খাজায়ে খাজেগান, সূফীকুল সম্রাট, ওলীকুল শিরোমনি, সকল ওলীর শ্রেষ্ঠওলী, শাহেনশাহে তরীকত ইত্যাদি। সকল আলেম একমত যে, ওলী বলতে নবী ও সাধারণ ওলী সবাইকে বুঝায়। এজন্য এসকল উপাধি শুধুমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। যদি নবীগণকে বাদ দিয়ে অন্য মুমিনগণকেও বুঝানো হয়, তাহলেও এই উপাধিগুলি শুধুমাত্র সাহাবীগণের প্রাপ্য। কী চরম দুঃসাহসিক বেয়াদবীভাবে এই উপাধিগুলি অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়!

তাও করা হয় কাদের জন্য? সত্যিকার "ওলী" বা নেককার মানুষেরা কখনোই তাঁদের জীবদ্দশায় এ ধরনের কোনো উপাধিই ব্যবহার করতে দেন না। এগুলি মূলত ব্যবহার করা হয় সেই সব মানুষের ক্ষেত্রে যাদেরকে প্রচার করে চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

(গ). এসকল উপাধির মধ্যে অধিকাংশ উপাধি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। যেমন, ওলীয়ে কামেল, কুতুব, কুতুবে রাব্বানী, কুতুবে দাওরান, কুতুবে এরশাদ, ওলীকুল শিরোমনি, সূফী সম্রাট, মাহবুবে ইলাহী, মাহবুবে সোবহানী, আশেকে রাসূল ইত্যাদি। কে কতটুকু আল্লাহর প্রিয়, ওলী, কার তাকওয়া বেশি বা কার ইবাদত আল্লাহ কবুল করেছেন তা ওহীর মাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই নিশ্চিত জানা যায় না। এ সকল উপাধি ব্যবহার করে আমরা মূলত না জেনে আন্দাজে আল্লাহর নামে কথা বলছি। এভাবে ওহীর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর নামে কথা বলতে কুরআন কারীমে বার বার নিষেধ করা হয়েছে।[১]

(ঘ). কারো ঈমান, তাকওয়া, বেলায়াত, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পর্যায় বা গভীরতা জ্ঞাপক কোনো উপাধি ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে ভালো বলতে কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শা'নুহু কুরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন :

"তোমরা তোমাদের ভালত্ব বর্ণনা বা দাবি করবে না, আল্লাহই ভালো জানেন যে, তোমাদের মধ্যে মুত্তাকী কে।"[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভালো-মন্দ বলতে ও কাউকে নিশ্চিত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। বাহ্যিক যা দেখ যায় তাই বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। একবার একজন সাহাবী তাঁর সামনে অন্য সাহাবী সম্পর্কে বলেন যে : তাঁকে তিনি মু'মিন বা খাঁটি বিশ্বাসী বলে মনে করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন যে, মুমিন না বলে বল : মুসলিম।[৩]

অর্থাৎ, ইসলামের বিধান পালনকারী হিসাবে বাহ্যিক যা দেখা যায় তাই বলতে হবে। ঈমানের গভীরতা ও বিশুদ্ধতা আল্লাহই জানেন। অন্য হাদীসে আবু বাকরাহ (রা.) বলেন :

ﷺ

.

একব্যক্তি নবীজী ﷺ -এর নিকট অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করে। তিনি বলেন : "হতভাগা, পোড়াকপালে, তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে! তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কেটে দিলে!!" কয়েকবার একথা বললেন। এরপর বললেন : "যদি তোমাদের কারো কখনো একান্তই কোনো ভাইয়ের প্রশংসা করার দরকার হয় তাহলে সে লোকটির যে গুণগুলি সে জানে সেগুলি সম্পর্কে বলবে : আমি অমুককে এইরূপ মনে করি, আল্লাহই তাঁর সম্পর্কে সঠিক হিসাব রাখেন, আমি আল্লাহর উপরে কাউকে ভালো বলছি না। আমি মনে করি লোকটি এরূপ, এরূপ।"[৪]

এই হলো নবীদের পরেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম ওলী ও বুজর্গগণের বিষয়ে কথা বলার ও প্রশংসা করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা। তাহলে বাকি দুনিয়ার অন্যান্য সকল বুজুর্গ, দরবেশ, আলেম, ভালোমানুষ বা অন্য কারো বিষয়ে আমাদের কিভাবে কথা বলা প্রয়োজন! আর কী-ভাবেই বা আমরা বলি ?

এ সকল উপাধি ব্যবহারের ফলে আমাদের রুচি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর আমাদের সুন্নাত পদ্ধতিতে উপাধি ব্যবহার করলে মন ভরে না। মনে হয় বেয়াদবী হয়ে গেল বা কম রয়ে গেল। যেমন আজীবন নাচানাচি করে বা সুরকরে হেলেদুলে যিক্‌রে অভ্যস্থ যাকির শেষ জীবনে বসে সুন্নাত-মতো যিক্‌র করতে গেলে তাঁর মনে হবে আবেগ আসছে না, হাল হচ্ছে না, কিছু যেন কম রয়ে গেল।

আমরা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি পূর্ব যুগের পুস্তকাদি পাঠ করার সময় বার বার বলছি : আয়েশা বলেছেন, ফাতেমা বলেছেন, খাত্তাবের ছেলে উমর বলেছেন, হাসান বসরী বলেছেন, আবু হানীফা বলেছেন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে দোয়ার বাক্য ছাড়া কিছুই বলি না। কিন্তু নিজেরা কথা বলতে গেলে মনে হয় আগে হযরত, মা ইত্যাদি না লাগালে বোধহয় বেয়াদবী হয়ে গেল। আমার অবস্থা বলি। এই বইয়ে আমি 'হযরত' ইত্যাদি উপাধি পরিহার করে সুন্নাত অনুসারে দোয়া জ্ঞাপক বাক্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শুধু মনে হয়েছে, বোধহয় বেয়াদবী হয়ে গেল। তবুও চেষ্টা করেছি নিজের রুচি পরিবর্তন করে সাহাবী-তাবেয়ীগণের রুচির কাছে নেওয়ার। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমাদের প্রবৃত্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা ও কর্মের অনুসারী করে দেন এবং আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের মধ্যে থাকার তাওফীক দান করেন।

মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন: ইবাদত, উপকরণ, সুন্নাত বনাম খেলাফে-সুন্নাত

আজকের দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহর অন্যতম উৎসব হলো ঈদে মীলাদুন্নবী। প্রতি বৎসর ১২ই রবিউল আউআল আমরা এই ঈদ পালন করে থাকি। এছাড়া কোনো কোনো দেশে মুসলমানগণ সারাবৎসরই বিভিন্ন উপলক্ষ্যে 'মীলাদ মাহফিল' করে থাকেন। 'মীলাদ' বা ঈদে মীলাদুন্নবী নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে অন্তহীন বিতর্ক চলছে। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের সামান্য জ্ঞানে মীলাদের জায়েয বা না-জায়েয হওয়ার বিষয়ে নতুন কিছু বলার নেই, বলার চেষ্টাও করছি না। আমি মূলত সুন্নাতের আলোকে আমাদের মীলাদ মাহফিলের আলোচনা করব। এখানে মীলাদ বিষয়ক আলোচনার কারণ হলো, এ ক্ষেত্রে যে সকল খেলাফে-সুন্নাত কাজ সংঘঠিত হয় তার পিছনে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহের মধ্য থেকে একাধিক পদ্ধতি বিদ্যমান। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের কর্মের দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র ফযীলতের আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে ইবাদত তৈরি করা, জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না রাখা, উপকরণ ও ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারা ইত্যাদি।

আল্লাহ দয়া করে তাওফীক প্রদান করলে আমি মীলাদের মধ্যে সুন্নাত কী কী এবং কী-ভাবে আমরা যথাসম্ভব সুন্নাত পদ্ধতিতে মীলাদ পালন করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করব। মীলাদ আমাদের অতিপরিচিত অনুষ্ঠান হলেও আমরা অনেকেই শুধু একে বিদ'আত বা বিদ'আতে হাসানা বলেই জানি, এর বিস্তারিত ইতিহাস জানি না, এজন্য মীলাদের সুন্নাত ও খেলাফে-সুন্নাত আলোচনার পূর্বে আমি এর ইতিহাস আলোচনা করতে চাচ্ছি।

প্রথমত, মীলাদুন্নবী : পরিচিতি

মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ : জন্মসময়। এই অর্থে "মাওলিদ" শব্দটিও ব্যবহৃত হয়[১]। আল্লামা ইবনু মানযূর লিখছেন : "   :   " অর্থাৎ, "লোকটির মীলাদ : যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম।"[২]

স্বভাবতই মুসলমানেরা "মীলাদ" বা "মীলাদুন্নবী" বলতে শুধুমাত্র নবীজী ﷺ -এর জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বুঝান না। বরং তাঁরা "মীলাদুন্নবী" বলতে নবীজীর (ﷺ) জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করাকেই বোঝান। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোনো আনন্দ প্রকাশ, তা তাঁর জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে অন্য কোনো দিনেই হোক, যেকোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম পালন করাকে আমরা "মীলাদ" বলে বুঝি।

(ক) "মীলাদ" বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, তাই প্রথমেই আমরা তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর "মীলাদ" অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদ্‌যাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন কারীমে পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনোভাবে কোনো দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে, "মীলাদ" পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদ্‌যাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোনো নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় হাদীস শরীফ ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের মতামতের উপর নির্ভর করব :

(খ) হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন

(১). জন্মবার : সোমবার

আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন :

"এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়্যত পেয়েছি।"[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন :

ﷺ

"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়্যত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান করেন, সোমবারে মদীনা পৌঁছান এবং সোমবারেই তিনি হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।"[৪]

সোমবারের রোযা সম্পর্কে অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (ﷺ) বলেন, "রাসূলে আকরাম ﷺ অধিকাংশ সময় সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

." " "

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে মানুষের কর্ম আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ সকল মুসলিম বা সকল মুমিনকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র পরস্পরে রাগারাগি করে সম্পর্কছিন্নকারীদেরকে ক্ষমা করেন না, তাদের বিষয়ে তিনি বলেন :

এদের বিষয় স্থগিত রাখ।"[১] তিরমিযীর বর্ণনায় : "সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের কর্মসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় ; এজন্য আমি চাই যে, আমার কর্ম এমন অবস্থায় আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক যে আমি রোযা আছি।"[২]

এভাবে সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ শুক্রবারের কথা বলেছেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা সহীহ হাদীসের বর্ণনার পরিপন্থী। অনেক তাবে-তাবেয়ী এ বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন। তারা বলতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মবার সম্পর্কে কোনো কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত এ বিষয়ের হাদীস তাঁদের জানা ছিল না বলেই এই মত পোষণ করেছেন।[৩]

(২). জন্ম বৎসর : হাতির বৎসর

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের সাল সম্পর্কে কায়স ইবনু মাখরামা (রা.) বলেন :

ﷺ .

ﷺ ﷺ ﷺ.

"আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জনেই 'হাতির বছরে' জন্মগ্রহণ করেছি। উসমান ইবনু আফফান (রা.) কুবাস ইবনু আশইয়ামকে (রা) প্রশ্ন করেন : আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ ﷺ বড়? তিনি উত্তরে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাতীর বছরে' জন্মগ্রহণ করেন।"[৪]

হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতি নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ ছিল।[৫]

(৩). জন্মমাস ও জন্ম তারিখ : হাদীসে উল্লেখ নেই

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো হাদীসে তাঁর জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। একারণে পরবর্তী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মত রয়েছে। ইবনু হিশাম, ইবনু সা'দ, ইবনু কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী লিখক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন :

(গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন : আলেমগণের ১২টি মতামত

(১). কারো মতে তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি এবং জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্ম মাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোনো আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

(২). কারো কারো মতে তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৩). অন্য মতে তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(৪). কারো মতে তিনি রবিউল আউআল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ ইবনু আব্দুর রাহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

(৫). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ রবিউল আউআল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতালানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবনু আব্বাস ও জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা.) থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৫ হি.) তাঁর উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর ইবনু মুতয়িম (১০০ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন : "মুহাম্মাদ ইবনু জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবনু আহমদ ইবনু হাযম (৪৫৬ হি) ও মুহাম্মাদ ইবনু ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮ হি.) এই মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের উপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবনু দেহিয়া (৬৩৩ হি.) ঈদে মীলাদুন্নবীর উপর লিখিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ "আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর" -এ এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

(৬). অন্য মতে তাঁর জন্মতারিখ ১০-ই রবিউল আউয়াল। এই মতটি ইমাম হুসাইনের (রা) পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল বাকের (১১৪ হি.) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির ইবনু শারাহিল আশ শাবী (১০৪ হি.) থেকেও এই মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু উমর আল-ওয়াকেদী (২০৭ হি.) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবনু সা'দ তার বিখ্যাত "আত-তাবাকাতুল কুবরা"-য় শুধু দুটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[৬]

(৭). কারো মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (১৫১ হি.) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতির বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।"[১] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবনু ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন[২]। তা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে এই মতটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন যে ২ জন সাহাবী জাবির ও ইবনু আব্বাস (ﷺ) থেকে এই মতটি বর্ণিত।

(৮). অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ১৭-ই রবিউল আউয়াল।

(৯). অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২-শে রবিউল আউয়াল।

(১০). অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

(১১). অন্য মতে তিনি রজব মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ।

(১২). অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। ৩য় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবনু বাক্কার (২৫৬ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণিত। তাঁর মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বসম্মতভাবে রমযান মাসে নবুয়্যত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বৎসর পূর্তিতে নবুয়্যত পেয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্ম অবশ্যই রমযানে হবে। এছাড়া কোনো কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্বের পবিত্র দিনগুলিতে মাতৃগর্ভে আসেন। সেক্ষেত্রেও তাঁর জন্ম রমযানেই হওয়া উচিত। এ মতের সপক্ষে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) থেকে একটি বর্ণনা আছে বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[৩]

দ্বিতীয়ত, মীলাদুন্নবী ইতিহাসের আলোকে

(ক). ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে কেউ 'মীলাদ' পালন করেননি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলে আকরাম ﷺ -এর জন্মবার, জন্মমাস ও জন্মতারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি। তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলির আলেম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে ﷺ-এর জন্মদিন পালন বা উদ্‌যাপন করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে এধরনের মতবিরোধের কোনো সুযোগ থাকত না। মুহাদ্দিস, ফুকিহ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এই অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করছে।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে "ঈদে মীলাদুন্নবী" পালনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলিতে "মীলাদুন্নবী" বা রাসূলে আকরাম ﷺ -এর জন্মদিন পালন করা বা উদ্‌যাপন করার কোনো প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম আল্লামা ইবনু হাজর আল-আসকালানী (৮৫২ হি.) রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন জায়েয বলেছেন। তিনি লিখেছেন: "মাওলিদ পালন মূলত বিদ'আত। ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন শতাব্দীর সালফে সালেহীনের কোনো একজনও এই কাজ করেননি।"[৪]

এই শতকের অন্য একজন প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (৯০২ হি.)। তিনিও রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন জায়েয বলেছেন। কিন্তু প্রথম যুগে কেউ মীলাদ পালন করেননি তা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালফে সালেহীনের কোনো একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদ্‌যাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মমাস পালন করে আসছেন। এ উপলক্ষ্যে তাঁরা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এমাসের রাত্রে তাঁরা বিভিন্ন রকমের দান-সদকা করেন, আনন্দপ্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশি করে করেন। এ সময়ে তাঁরা তাঁর জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন।"[৫]

মীলাদের সমর্থক লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়্যেদ দিলদার আলী (১৯৩৫ খ্রি.) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: "মীলাদের কোনো আসল বা সূত্র প্রথম তিন যুগের কোনো সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়নি; বরং তাঁদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে।"[৬]

এরূপ ঐকমত্যের কারণ হলো, শতাধিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সেসকল গ্রন্থে একটি সহীহ বা যয়ীফ হাদীসও দেখা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ইন্তেকালের পরে কোনো সাহাবী সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদ্‌যাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে

বৎসরের কোনো সময়ে কোনো অনুষ্ঠান করেছেন। বর্তমান যুগে কিছু জাল হাদীস এ বিষয়ে প্রচার করা হয়, যেগুলি গত শতাব্দী পর্যন্ত মীলাদের পক্ষের আলিমরাও জানতেন না। এজন্যই তাঁরা এরূপ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই ছিলেন তাঁদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকাণ্ডের মূল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁরা নবী-প্রেমে চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোশাক, পরিচ্ছদ ইত্যাদির কথা আলোচনা করে প্রেমের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেননি। এমনকি তাঁর জন্মমুহূর্তের ঘটনাবলী আলোচনা করে জন্ম উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ বা দরুদ সালাম পাঠের জন্য তাঁরা কখনো বসেননি বা কোনো দান-সাদকা, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেননি। তাঁদের পরে তাবেয়ী ও তাবে- তাবেয়ীদের অবস্থাও তা-ই ছিল।

বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন আ'জামী বা অমুসলিম সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইযান্টাইন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তাঁরা নিজেদের দেশজ বা পূর্বধর্মের রীতিনীতি ত্যাগ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাঁদের জীবনাচারণে আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারসিক ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম।

(খ). মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন : শিয়াগণ কর্তৃক প্রাথমিক প্রবর্তন

দুই ঈদের বাইরে কোনো দিবসকে সামাজিকভাবে উদ্‌যাপন শুরু হয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্যোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩ খ্রি.) বাগদাদের আব্বাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০-ই মুহাররাম আশুরাকে শোক দিবস ও জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ "গাদীর খুম"[১] দিবস ঈদ ও উৎসব দিবস হিসাবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এই দুই দিবস পালনে অংশগ্রহণ করেন, তবুও তা সামাজিকরূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বৎসরে এই উদ্‌যাপনে বাধা দিতে পারেননি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এই দুই দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ঙ্কর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২]

ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়াগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাঈলী শিয়াগণ[৩] ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খ্রি.) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী ২ শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২ খ্রি.) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে।[৪]

এই দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাঈলী শিয়া শাসকগণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ২ ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৭টি জন্মদিন পালন করতেন : (১). রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর জন্মদিন, (২). আলী (রা.)-এর জন্মদিন, (৩). ফাতেমা (রা.)-এর জন্মদিন, (৪). হাসান (রা.)-এর জন্মদিন, (৫). হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর জন্মদিন, (৬). তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিন ও (৭). ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রিসমাস)।[৫]

(গ). শিয়া সম্প্রদায়ের ঈদে মীলাদুন্নবী : অনুষ্ঠান পরিচিতি

আহমদ ইবনু আলী আল-কালকাশান্দী (৮২১ হি.) লিখেছেন: "রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে ফাতেমী শাসক মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করতেন। তাদের নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উন্নত মানের মিষ্টান্ন তৈরি করা হতো। এই মিষ্টান্ন ৩০০ পিতলের খাঞ্চায় ভরা হতো। মীলাদের রাত্রিতে এই মিষ্টান্ন সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। যেমন- প্রধান বিচারক, প্রধান শিয়ামত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। এ উপলক্ষে খলীফা প্রাসাদের সামনের ব্যালকনিতে বসতেন। আসরের নামাযের পরে বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আজহার মসজিদে গমন করতেন এবং সেখানে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় বসতেন। মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ সময়ে ব্যালকনির জানালা খুলে হাত নেড়ে খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ করতেন। এরপর কারীগণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করতেন। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সহচরগণ হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম জানাতেন। খিড়কী বন্ধ করা হতো এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরতেন। এভাবেই তারা আলীর (রা.) জন্মদিনও পালন করত...।"[৬]

আহমদ ইবনু আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫ হি.) লিখেছেন : "এসকল জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই বড় ও মর্যাদাময়

উৎসব সময়। এ সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্মারক তৈরি করত, বিভিন্ন ধরনের খাবার, মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা হতো।"[১]

(ঘ). ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন : প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদ্‌যাপন

এভাবে হিজরী ৪র্থ শতাব্দী থেকেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের শুরু হয়। তবে লক্ষণীয় যে, কায়রোর এই উৎসব ইসলামী বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। সম্ভবত ইসমাঈলীয় শিয়াদের প্রতি সাধারণ মুসলিম সমাজের প্রকট ঘৃণার ফলেই তাদের এই উৎসবসমূহ অন্যান্য সুন্নী এলাকায় জনপ্রিয়তা পায়নি। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০) থেকেই মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের ২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বৎসর রবিউল আউআল মাসের প্রথমাংশে বা ৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মাজলিস ও দান-খয়রাতের মাধ্যমে "ঈদে মীলাদুন্নবী" পালন করতে শুরু করেন।[২]

যিনি ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং ঈদে মীলাদুন্নবীকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাকের ইরবিল প্রদেশের শাসক আবু সাঈদ কূকুবূরী (৬৩০ হি.)। সীরাতুন্নবী গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ তাকেই মীলাদুন্নবীর প্রকৃত উদ্ভাবক বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩]

(ঙ). আবু সাঈদ কূকুবূরীর পরিচিতি

৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। একদিকে অভ্যন্তরীণ বিভেদ, শত্রুতা, নিরাপত্তাহীনতা, অশান্তি, ব্যাপক সন্ত্রাস ও অজ্ঞানতার প্রসার। অন্যদিকে বাইরের শত্রুর আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের আক্রমণ। কঠিনতম সেই দিনে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড হামলা, সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ হিজরী (১২৩১ খ্রি.)-এর পরে আর মুসলমানেরা ইসলামের পঞ্চম রোকন হজ্ব পালন করতে পারে না। ঐতিহাসিক ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি.) লিখছেন : "৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা হজ্ব আদায় করেন। এর পরে যুদ্ধবিগ্রহ, তাতার ও ক্রুসেডিয়ারদের ভয়ে আর কেউ হজ্বে যেতে পারেননি।"[৪]

সেই কঠিন যুগের কয়েকজন সুপরিচিত মুসলিম শাসক ও সেনাপতির একজন ছিলেন সুলাতান সালাহুদ্দীন আইউবীর ভগ্নিপতি ও তাঁরই বীর যোদ্ধা সেনাপতি মালিকুল মুযাফফার আবু সাঈদ কূকুবূরী (রাহ)। পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী কুকুবূরীর পরিচিতি দিয়ে লিখছেন : "ধার্মিক সুলতান সম্মানিত বাদশাহ মুযাফ্ফরুদ্দীন আবু সাঈদ কূকুবুরী ইবনু আলী ইবনু বাকতাকীন ইবনু মুহাম্মাদ আল-তুরকমানী।"[৫] তাঁরা তুর্কী বংশোদ্ভুত। তাঁর নামটিও তুর্কী। তুর্কী ভাষায় কুকুবুরী শব্দের অর্থ "নীল নেকড়ে"।[৬]

কূকুবূরী অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। যাহাবী বলেন : "যদিও তিনি (কুকুবুরী) একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ধার্মিক, সবচেয়ে বেশি দানশীল, সমাজকল্যাণেব্রত ও মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম। প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের জন্য তিনি যে পরিমাণ অর্থব্যয় করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মতো উচ্চারিত হতো।"[৭] তিনি শাসন কার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন।[৮] তিনি তাঁর অতুলনীয় বীরত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি জনসেবা ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তবে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অন্যতম কর্ম যা তাঁকে সমসাময়িক সকল শাসক থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং ইতিহাসে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে তা হলো ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের প্রচলন।

তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বৎসরের শাসনামলের কোনো বছরে প্রথম এই অনুষ্ঠান শুরু করেন তা সঠিকভাবে জানতে পারিনি। প্রখ্যাত বাঙ্গালী আলেমে দীন, মাওলানা মোহাম্মদ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী ৬০৪ সাল থেকে কূকুবূরী মীলাদ উদ্‌যাপন শুরু করেন।[৯] তিনি তাঁর এই তথ্যের কোনো সূত্র প্রদান করেননি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর আগেই কূকুবূরী মীলাদ উদ্‌যাপন শুরু করেন। ইবনু খাল্লিকান লিখেছেন : "৬০৪ হিজরীতে ইবনু দেহিয়া খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবিলে আসেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন কূকুবূরী অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মীলাদ উদ্‌যাপন করেন এবং এ উপলক্ষ্যে বিশাল উৎসব করেন। তখন তিনি তাঁর জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন...।"[১০]

এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবনু দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে আগমনের কিছু পূর্বেই কূকুবূরী মীলাদ উদ্‌যাপন শুরু করেন, এজন্যই ইবনু দেহিয়া ইরবিলে এসে তাঁকে এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে দেখতে পান। তবে উদ্‌যাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশি আগে শুরু হয়নি বলেই মনে হয়, কারণ বিষয়টি ইবনু দেহিয়া আগে জানতেন না, এতে বোঝা যায় তখনো তা পার্শবর্তী দেশগুলিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। আমরা অনুমান করতে পারি যে, কূকুবূরী ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে বা ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হিজরী) মীলাদ পালন শুরু করেন।

(চ). কূকুবুরীর ঈদে মীলাদুন্নবী : অনুষ্ঠান পরিচিতি

সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনু খাল্লিকান (৬৮১ হি.) কূকুবূরীর মীলাদ অনুষ্ঠানের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও আন্তরিক ভক্ত। তিনি এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন: কূকুবূরীর মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের বর্ণনা দিতে গেলে ভাষা অপারগ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের মানুষেরা যখন এ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা জানতে পারেন তখন পার্শবর্তী সকল এলাকা থেকে লোকজন এসে এতে অংশ নিতে থাকে। বাগদাদ, মাউসিল, জাযিরা, সিনজার, নিসিস্‌বীন ও পারস্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক আলেম, কারী, সূফী, বক্তা, ওয়ায়েজ ও কবি এসে জমায়েত হতেন। মুহররম মাস থেকেই এদের আগমন শুরু হতো, রবিউল আউয়ালের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আগমন অব্যাহত থাকত। খোলা প্রান্তরে ২০টি বা তারো বেশি বিশাল বিশাল কাঠের কাঠামো (প্যান্ডেল) তৈরি করা হতো যার একটি তাঁর নিজের জন্য নির্ধারিত থাকত, বাকিগুলিতে তার আমীর ওমরাহ, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণের জন্য নির্ধারিত হতো। সফর মাসের ১ তারিখ থেকে এ সকল কাঠামোগুলিকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হতো। প্রত্যেক প্যান্ডেলের প্রতিটি অংশে থাকত গায়কদের দল, অভিনয়কারীদের দল এবং বিভিন্ন খেলাধুলা দেখানর দল। এ সময়ে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত। সকলের একমাত্র কাজ হয়ে যেত এ সকল প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়ান এবং আনন্দ উল্লাস করা। প্রতিদিন আসরের নামাযের পরে কূকুবূরী মাঠে আসতেন এবং প্রতিটি প্যান্ডেলে যেয়ে তাদের গান শুনতেন, খেলা-অভিনয় দেখতেন। পরে সূফীদের খানকায় রাত কাটাতেন এবং সামা সঙ্গীতের আয়োজন করতেন। ফযরের নামাযের পরে শিকারে বের হতেন। যোহরের পূর্বে ফিরে আসতেন।

এভাবেই চলত ঈদে মীলাদুন্নবীর রাত পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মতারিখ নিয়ে মতবিরোধ থাকার কারণে তিনি একবছর ৮-ই রবিউল আউয়াল, অন্য বছর ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতেন। এই দিনের ২ দিন আগেই অগণিত উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া মাঠে পাঠিয়ে দিতেন। তবলা বাজিয়ে, গান গেয়ে, আনন্দ উৎফুল্লাতর মাধ্যমে এ সকল জীব জানোয়ারকে মাঠে পৌঁছান হতো। সেখানে এগুলিকে জবাই করে রান্নর আয়োজন করা হতো।

মীলাদের রাত্রে মাগরিবের নামাযের পরে সামা গান বাজনার আয়োজন করা হতো। এরপর পুরো এলাকা আলোকসজ্জার অগণিত মোমবাতিতে ভরে যেত। মীলাদের দিন সকালে তিনি তাঁর দুর্গ থেকে বিপুল পরিমাণ হাদিয় তোহফা এনে সূফীদের খানকায় রাখতেন। সেখানে রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সমাজের সাধারণ অনেক মানুষ সমবেত হতেন। ওয়ায়েজগণের জন্য মঞ্চ তৈরি করা হতো। একদিকে সমবেত মানুষদের জন্য ওয়াজ নসীহত চলত। অপরদিকে বিশাল প্রান্তরে তার সৈন্যবাহিনী কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করতে থাকত।কূকুবূরী দুর্গে বসে একবার ওয়ায়েজদের দেখতেন, একবার সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখতেন। এ সময়ে তিনি সমবেত সকল আলেম, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মেহমানকে একে একে ডাকতেন এবং তাদেরকে মূল্যবান হাদীয়া তোহফা প্রদান করতেন। এরপর ময়দানে সাধারণ মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হতো, যেখানে বিভিন্ন রকমের খাদ্যের আয়োজন থাকত। খানকার মধ্যেও পৃথকভাবে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হতো।

এভাবে আসর পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া চলত। রাতে তিনি সেখানেই থাকতেন। সকাল পর্যন্ত সামা গানবাজনার অনুষ্ঠান চলত। প্রতি বৎসর তিনি এভাবে মীলাদ পালন করতেন। অনুষ্ঠান শেষে যখন সবাই বাড়ির পথে যাত্রা করতেন তিনি প্রত্যেককে পথখরচা প্রদান করতেন।[১]

আরেকজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইউসূফ ইবনু কাযউগলী সিবত ইবনুল জাওযী (মৃত্যু ৬৫৪ হি. ১২৫৬ খ্রি.) লিখছেন : "তিনি ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত সূফীদের জন্য "সামা" (ভক্তিমূলক গান)-এর আয়োজন করতেন এবং নিজে সূফীদের সাথে (সামা শুনে) নাচতেন।"[২] তিনি আরো লিখেছেন : "কূকুবূরীর ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত দাওয়াতে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের একজন বলেন : তার দস্তরখানে থাকত পাঁচশত আস্ত দুম্বার রোস্ট, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ খাবারের পাত্র, ত্রিশহাজার মিষ্টির খাঞ্চা। তাঁর দাওয়াতে উপস্থিত হতেন সমাজের গণ্যমান্য আলেমগণ এবং সূফীগণ, তিনি তাঁদেরকে মুক্তহস্তে হাদীয়া ও উপঢৌকন প্রদান করতেন। তিনি ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত সূফীদের জন্য "সামা" গানের আয়োজন করতেন এবং নিজে সূফীদের সাথে (সামা শুনে) নাচতেন।" অন্য এক বর্ণনাকারী বলেন : "তাঁর খানার মাজলিসে আমি একশত ভুনা ঘোড়া, পাঁচশত ভেড়া, দশ হাজার মুরগী, এক লক্ষ খাবারের পাত্র ও ত্রিশহাজার মিষ্টির খাঞ্চা গুণেছি।"[৩]

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, এই যুগ ছিল মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল যুগ। অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি ও বহির্শক্রর আক্রমণে বিপর্যস্ত মুসলিম জনপদগুলিতে কূকুবূরীর মীলাদ উৎসব অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেত। বিপর্যস্ত ও মানসিকভাবে উৎকণ্ঠিত বিভিন্ন মুসলিম দেশের মানুষেরা এই অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পান। ফলে দ্রুত তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

(ছ). ঈদে মীলাদুন্নবী : কূকুবূরীর পরে

যেসকল কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যুগে ধর্মীয় কর্ম, আচার বা উৎসব হিসাবে প্রচলিত, পরিচিত বা আচরিত ছিল না কিন্তু পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কর্ম হিসাবে প্রচলিত হয়েছে, সেগুলির বিষয়ে সর্বদায় মুসলিম উম্মাহর আলেম ও পণ্ডিতগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েন। যেহেতু মিশরের শিয়াগণ ও পরবর্তীকালে কূকুবুরী প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবী জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ ﷺ , সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে- তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না তাই স্বভাবতই এ বিষয়েও আলেমগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

কোনো কোনো আলেম ৭ম শতাব্দী থেকেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের বিরোধিতা করেছেন এই যুক্তিতে যে, সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ তাঁদের প্রচণ্ডতম নবীপ্রেম সত্ত্বেও কখনো তাঁদের আনন্দ এভাবে উৎসব বা উদ্‌যাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি, কাজেই পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জন্যও তা শরীয়ত-সঙ্গত হবে না। পরবর্তী যুগের মুসলমানদের উচিত প্রথম যুগের মুসলমানদের ন্যায় সার্বক্ষণিক সুন্নাত পালন, সীরাত আলোচনা, দরুদ সালাম ও ক্বলবী ভালবাসার মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ জানান, অমুসলিমদের অনুকরণে জন্মদিন পালনের মাধ্যমে নয়।

তাঁদের যুক্তি হলো এ সকল অনুষ্ঠানের প্রসার সাহাবীদের ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা সৃষ্টি করবে, কারণ যারা এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করবেন, তাঁদের মনে হতে থাকবে যে, সাহাবীদের মতো নীরব, অনানুষ্ঠানিক, সার্বক্ষণিক ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ পদ্ধতির চেয়ে তাদের পদ্ধতিটাই উত্তম। এ সকল নিষেধকারীদের মধ্যে রয়েছেন সপ্তম-অষ্টম হিজরী শতাব্দীর অন্যতম আলেম আল্লামা তাজুদ্দীন উমর ইবনু আলী আল-ফাকেহানী (৭৩৪ হি.), আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনু মুহম্মদ ইবনুল হাজ্ব (৭৩৭ হি.), ৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনু মূসা ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।

অপর দিকে অনেক আলেম প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী বা নবীজির (ﷺ) জন্মদিনের ঈদ পালনকে জায়েয বলেছেন, এই যুক্তিতে যে, এই উপলক্ষে যেসকল কর্ম করা হয় তা যদি শরীয়ত-সঙ্গত ও ভালো কাজ হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হতে পারে না। কাজেই কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ নসিহত, দান-খয়রাত, খানাপিনা, উপহার উপঢৌকন বিতরণ ও নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে বাৎসরিক ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করলে তা এদের মতে নাজায়েয বা শরীয়ত বিরোধী হবে না। বরং এসকল কাজ কেউ করলে তিনি তাঁর নিয়্যাত, ভক্তি ও ভালবাসা অনুসারে সাওয়াব পাবেন।

এ সকল আলেমদের মধ্যে রয়েছেন : সপ্তম হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আব্দুর রহমান ইবনু ইসমাঈল আল-মাকদিসী আল-দিমাশকী হাফিজ আবু শামা (৬৬৫ হি.), ৯ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.), আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ, শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.), নবম ও দশম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত আলেম জালালুদ্দীন ইবনু আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী (মৃত্যু ৯১১হি.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।[১]

তবে আলেমদের মতবিরোধের বাইরে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এই অনুষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে।

(জ). নবীজীর (ﷺ) মীলাদ উদ্‌যাপন বনাম ওরশ উদ্‌যাপন

আমরা আগেই বলেছি যে, জন্মদিন পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও অনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। রবিউল আউয়াল মাস যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্ম মাস, তেমনি তাঁর ইন্তেকালের মাস। বরং তাঁর জন্মের মাস সম্পর্কে হাদীস শরীফে কোনো বর্ণনা আসেনি এবং এবিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে বলে আমরা জেনেছি। কিন্তু রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার তাঁর ইন্তেকাল হওয়ার বিষয়ে কারো কোনো মতভেদ নেই।[২] এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, ৭ম হিজরী শতকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুদিন বা "ওরস" পালন করা হতো, জন্মদিন পালন করা হতো না। ভারতের প্রখ্যাত সূফী নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৭২৫ হি.) লিখেছেন যে, তাঁর মুরশিদ ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর (৬৬৮ হি.) ২রা রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল দিবস হিসাবে ওরস পালন করতেন, যদিও মুসলমানদের মধ্যে ১২-ই রবিউল আউয়ালই উরসের দিন হিসাবে প্রসিদ্ধ এবং মুসলমানগণ এই দিনেই উরস পালন করেন।[৩]

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ৭ম হিজরী শতাব্দীর শেষে এবং ৮ম হিজরী শতকের প্রথমাংশেও মীলাদুন্নবী পালন অনেক দেশের মুসলমানদের কাছে অজানা ছিল, তারা জন্মদিন পালন না করে মৃত্যুদিবস পালন করতেন। কিন্তু আবু সাঈদ কুকবূরীর জন্মদিন পালন বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন ক্রমান্বয়ে সকল মুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে রবিউল আউয়াল মাস রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম মাস হিসাবেই পালিত হতে থাকে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, মাওলিদ অনুষ্ঠান প্রথম উদ্ভাবনের যুগে, একটি বাৎসরিক আনন্দ প্রকাশের অনুষ্ঠান ছিল। শুধুমাত্র রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমদিকে, বিশেষত ৮ বা ১২-ই রবিউল আউয়াল এ অনুষ্ঠান করা হতো। আনন্দ প্রকাশের ধরনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কেউ আনন্দ প্রকাশ করেছেন ধর্মীয়ভাবে মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জানিয়ে, খানাপিনা ও তিলাওয়াত ও নবীজীর (ﷺ) জীবনী বা জন্ম কাহিনী আলোচনার মাধ্যমে। কেউ আনন্দ প্রকাশ করতেন জাগতিকভাবে খেলাধুলা, গান বাজনা ইত্যাদির মাধ্যমে। ১০ হিজরী শতক পর্যন্ত মীলাদ এইরূপ বাৎসরিক রূপেই ছিল বলে দেখা যায়।[৪]

(ঝ). কিয়াম বা দাঁড়ান

কূকুবূরী কর্তৃক রবিউল আউয়াল মাসে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উদ্ভাবনের দুই শতাব্দীরও পরে কিয়ামের প্রচলন হয়। ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসবের অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা বর্ণনার সময় কেউ কেউ তাঁর পৃথীবিতে আগমনের স্মৃতিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। হিজরী ১০ম শতকেও এই কিয়াম বা দাঁড়ানো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, যদিও তখন মীলাদ জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। দশম হিজরী শতকের সীরাতুন্নবী লেখক আল্লামা শামী হালাবী (মৃত্যু

৯৪২হি./১৫৩৬খ্রি.) প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদ অনুষ্ঠানকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন ও বিদ'আতে হাসানা বলেছেন, কিন্তু কিয়ামকে ভিত্তিহীন বিদ'আত বা বিদ'আতে সাইয়্যেআহ বলে নিন্দা করেছেন ।[১]

দশম হিজরী শতকের অন্য একজন প্রখ্যাত আলেম ইবনু হাজার হাইসামী মাক্কী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯৭৪ হি.) । তিনি মীলাদ উদ্যাপনের ঘোর সমর্থক ছিলেন । কিন্তু তিনি "কিয়াম" বা দাঁড়ানোর নিন্দা করেছেন এবং একে ভিত্তিহীন বিদ'আত বলেছেন । তিনি বলেন : "মীলাদ শরীফের মধ্যে কেয়াম করা বিদ'আত, তা করা উচিত নয় ; অনেক মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মীলাদ বা জন্মবৃত্তান্ত এবং মাতৃগর্ভ থেকে তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা স্মরণের সময় দাঁড়িয়ে পড়েন । এই কর্মও ভিত্তিহীন বিদ'আত । এর পক্ষে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি । সাধারণ মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তা'যীমের জন্য এভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে ; এজন্য অজ্ঞ জনসাধারণ মা'যূর বলে গণ্য হবেন । কিন্তু আলেম উলামা ইত্যাদি খাস মানুষের জন্য এরূপ কোনো ওজর নেই ।"[২]

এতে বুঝা যায় যে, দশম হিজরী শতাব্দীতে, মীলাদ অনুষ্ঠান উদ্ভাবনের ৪০০ বৎসব পরেও "কিয়াম" বা জন্ম মুহূর্তের আলোচনার সময় দাঁড়িয়ে পড়া "মীলাদ" অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়নি বা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি ।

এই দাঁড়িয়ে পড়ার প্রথম শুরু "মীলাদ" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়নি, হয়েছিল একটি শিক্ষাবর্ষ সমাপনী অনুষ্ঠানে নবীজীর (ﷺ) প্রশংসায় কবিতা (নাত) পাঠের সময় । আল্লামা হালাবী লিখেছেন : "প্রখ্যাত নবী-প্রেমিক সারসারী (৬৫৬ হি.) তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন :

:

:

"খুবই কম হবে নবী মুস্তফার মর্যাদার জন্য, যদিও তাঁর প্রশংসা সর্বোত্তম লেখককে দিয়ে স্বর্ণাক্ষরে রূপার উপর লেখা হয় । আদায় হবে না তাঁর হক, যদিও তাঁর নাম শ্রবণ করার সময় সম্ভ্রান্ত মানবকুল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন বা হাঁটুগেড়ে অবনত হয়ে বসে পড়েন ।"

ঘটনাচক্রে এরূপ ঘটে যে, (প্রখ্যাত আলেম, শাফেয়ী মাযহাবের অন্যতম পণ্ডিত) শাইখুল ইসলাম হাফেজ তাকীউদ্দীন আস-সুবকীর (৭৮৬ হি.) দরবারে এক দরস সমাপ্তির অনুষ্ঠানে অনেক বিচারক, সম্ভ্রান্ত মানুষের উপস্থিতিতে এই কবিতাটি পড়া হয় । যখন পাঠক কবির কথা: "যদিও তাঁর নাম শ্রবণ করার সময় সম্ভ্রান্ত মানবকুল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন" এই বাক্যটি উচ্চারণ করেন তখন বাক্যটি শোনার সাথে সাথে আল্লামা সুবকী কবির কথায় সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন ।"[৩] ক্রমান্বয়ে এই উঠে দাঁড়ানো মীলাদ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে ।

(ঞ). বর্তমান যুগে মীলাদ মাহফিল

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মীলাদ অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বিবর্তন ঘটতে থাকে । বর্তমানে বার্ষিক ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ উৎসব পালনে বিভিন্ন নতুন অনুষ্ঠানাদির সংযোজন হয়েছে । বিভিন্ন মুসলিম দেশে বা মুসলিম সংখ্যালঘু সমাজে এ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম আলোচনা, খানাপিনা বা দান সাদকার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সম্মিলিত গান বাজনা, সভা সমাবেশ, মিছিল র‌্যালি, জশনে জুলুস ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে । বস্তুত অনেক ভক্ত মুসলমান রাসূলে আকরাম ﷺ-এর জন্ম আলোচনা বা দোয়া দরুদের মাহফিলের চেয়েও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতাকে বেশি ভালবাসেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশের জন্য বেশি উপযোগী বলে মনে করেন ।

অপরদিকে ঈদে মীলাদুন্নবী বা মীলাদ মাহফিল এখন আর বাৎসরিক উৎসব হিসাবে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা এখন বিভিন্ন মুসলিম সমাজে একটি দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । বছরের যে কোনো সময়ে যে কোনো উপলক্ষে "মীলাদ" অনুষ্ঠান করা অধিকাংশ মুসলিম সমাজের একটি অতি পরিচত কর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে । এসকল নৈমিত্তিক "মীলাদ" অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের । তবে সকলেরই উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম উদ্যাপন, জন্ম উপলক্ষে আনন্দ ও সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর উপর দরুদ-সালাম পাঠ করা । আমাদের দেশে এ সকল অনুষ্ঠানে তাঁর জন্ম মুহূর্তের উল্লেখ করে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে (বা বসে) তাঁর উপর সালাম পাঠও "মীলাদ" মাহফিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে পরিগণিত হয়েছে, যা "কিয়াম" বলে পরিচিত । বর্তমানে যদি কেউ সারাদিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম আলোচনা করেন এবং দরুদ সালম পাঠ করেন তবুও তা "মীলাদ" হিসাবে গণ্য হবে না যতক্ষণ না তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে বা বসে "কিয়াম" করবেন ।

তৃতীয়ত, মীলাদুন্নবী : সুন্নাতের আলোকে

মীলাদকে কেন্দ্র করে অনেক শরীয়ত-বিরোধী কাজ ঘটে, যা আমরা সকলেই শরীয়ত বিরোধী বলে জানি । সেগুলি আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয় । যারা সেগুলি বর্জন করে একান্তই দ্বীনদারীর সাথে মীলাদ পালন করেন, সুন্নাতের আলোকে আমরা তাঁদের কর্ম আলোচনা করব ।

(ক) মীলাদের সুন্নাত-সম্মত ইবাদতসমূহ

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভালবাসা, সম্মান, মহব্বত ও ভক্তি হৃদয়ে সৃষ্টি করা ও বৃদ্ধি করা । এগুলি মু'মিনের ইমানের

অন্যতম অংশ ও ইসলামের অন্যতম ইবাদত। আমরা আমাদের হৃদয়ে যত বেশি তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারব ও বৃদ্ধি করতে পারব ততই আমাদের জন্য তা নাজাতের ওসীলা হবে। বস্তুত তাঁকে ভালবাসা, সম্মান করা ও অনুসরণ করার নামই ইসলাম। ইসলামের অর্থই হলো তাঁকে ভালবেসে, হৃদয় উজাড় করে তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁরই মতো ও তাঁরই পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে আত্মসমপণ করা।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম, জীবনী, কর্ম, আকৃতি, প্রকৃতি, তাঁর মর্যাদা, মহত্ব, সুন্নাত, আচার-আচরণ ইত্যাদি আলোচনা করা। এগুলি সবই সুন্নাত নির্দেশিত ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও অনেক সময় সাহাবীগণের কাছে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন, তাঁর মর্যাদা ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর প্রতি উম্মতের দায়িত্ব বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও মরণ তো ছিল তাঁকেই কেন্দ্র করে। আমরা ইতঃপূর্বে সুন্নাতের উৎস অধ্যায়ে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় ও তাঁর ইন্তেকালের পরে সাহাবীগণের জীবনের মূল কেন্দ্র ছিল তাঁর আলোচনা। তাঁর সুন্নাত, তাঁর নির্দেশ, তাঁর আকৃতি, তাঁর প্রকৃতি, তাঁর ফযীলত, মর্যাদা, মোজেজা, এককথায় তাঁর জীবন আলোচনা ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ। সকল জাগতিক কাজের ফাঁকে সুযোগমতো যে যখন এবং যত বেশি পেরেছেন এ সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এ সকল আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের (ﷺ) মহব্বত জাগরুক করেছেন, অনেক সময় চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা, তাঁর প্রশংসায় না'ত পাঠ করা। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা অন্যতম সুন্নাত-সম্মত ইবাদত ও অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। বস্তুত সৃষ্টির সেরা, সকল যুগের সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু : হাবীব ও খলীল রাসূলে আকরাম ﷺ আজীবন কষ্ট করে আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি, মুক্তি ও সফলতার একমাত্র পথ ইসলামকে মানব জাতির জন্য পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্য যে মানব সন্তান আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও রহমতের প্রার্থনা না করবে, তাঁর উপর যে মানুষ সালাম না পাঠাবে সে মানুষ মানব জাতির কলঙ্ক। একজন মানুষের ন্যূনতম প্রেরণা হওয়া উচিত যে, সে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকি মুক্তি ও শান্তির বার্তাবাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে দরুদ ও সালাম পাঠ করবে, তাঁর শান্তি, মর্যাদা ও রহমতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু মানব সন্তানের দায়িত্ব হলো তাঁর জন্য প্রার্থনা করা।

আমরা দেখেছি সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ বা ইসলামের প্রথম কল্যাণময় যুগের পুণ্যবান মানুষদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল বিভিন্ন মাসনূন সময়ে মাসনূন সংখ্যায় এবং অন্য সময়ে যত বেশি সম্ভব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর সালাত-সালাম পাঠ করা।

চতুর্থত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন পালন করা এবং তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করা। এ উপলক্ষে দান, সাদকা, মানুষকে খাওয়ানো, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি সুন্নাত-সম্মত ইবাদত পালন করা। আমরা আগেই দেখেছি যে, জন্মদিন বা জন্মতারিখ পালন বা উদ্‌যাপন করা খেলাফে-সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং তাঁর সাহাবীগণ কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ বা অন্য কারে জন্মদিন পালন করেননি। জন্মদিন উপলক্ষে কোনো প্রকারের অনুষ্ঠান বা উদ্‌যাপন তাঁদের সুন্নাতের খেলাফ। অনুরূপভাবে, তাঁর জন্মদিনে বা জন্মবারে কোনোরূপ আনন্দ উৎসব করা বা উদ্‌যাপন করাও খেলাফে-সুন্নাত। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মবার বা সোমবারে রোযা রাখা সুন্নাত-সম্মত ইবাদত, যা আমরা ইতঃপূর্বে জেনেছি।

(খ) মীলাদের মধ্যে খেলাফে-সুন্নাত : বিতর্ক ও কারণ

(১). সমস্যা কোথায়

এভাবে আমরা দেখি যে, মীলাদ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড অধিকাংশই সুন্নাত-সম্মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাহলে সমস্যা কোথায়? তাহলে কেন সকল উলামায়ে কেরাম একে বিদ'আত বলছেন, যদিও বিদ'আতে হাসানা না সাইয়্যেআহ তা নিয়ে মতবিরোধ করছেন?

সমস্যা এসকল ইবাদত পালনের পদ্ধতিতে। আমরা এ সকল ইবাদত পালন করছি এমন পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে কখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ , তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ পালন করেননি, অথচ এসকল পদ্ধতি অবলম্বন করা তাঁদের পক্ষে খুবই সম্ভব ও সহজ ছিল। এখন আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন, তাঁরা কেন এসকল পদ্ধতি বর্জন করলেন? এবং কেনই বা আমরা তাঁদের পদ্ধতি বর্জন করে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলাম? কী প্রয়োজনে? তাঁদের পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালন করলে আমাদের ক্ষতি কী? আর নতুন পদ্ধতিতে পালন করলে আমাদের লাভই-বা কী? আমাদের পদ্ধতি সর্বোত্তম না তাঁদের পদ্ধতি?

(২). মীলাদ উদ্‌যাপন : ইবাদত বনাম পদ্ধতি

এছাড়া আমাদেরকে জানতে হবে যে, পদ্ধতি ইবাদত কি-না ? যদি পদ্ধতি ইবাদত না হয় তাহলে **প্রথমত**, কোনো গোলমাল থাকে না। **দ্বিতীয়ত**, আমরা সাহাবীগণের পদ্ধতিতেই তা পালন করতে পারি। যেমন,- সালাম পাঠ ইবাদত, না নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ ইবাদত। যদি সালাম পাঠ ইবাদত হয় তাহলে দাঁড়ানো বা বসা নিয়ে কোনো গোলযোগ থাকে না। আর যদি দাঁড়ানোই ইবাদত হয় এবং না দাঁাড়িয়ে বসে সালাম পাঠে সাওয়াব কম হয় তাহলে জানতে হবে সাহাবীগণ কেন এই কম সাওয়াবের কাজ করলেন?

অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম, জীবনী, শিক্ষা আলোচনা, মহব্বত, তা'যীম ইত্যাদি ইবাদত, না 'মীলাদ' পালন ইবাদত। যদি উপরিউক্ত কাজগুলি ইবাদত হয় তাহলে আমরা সাহাবীগণের পদ্ধতিতেই তা করতে পারি। আর যদি আমরা মনে করি যে, মীলাদই ইবাদত এবং মীলাদ পালনেই সাওয়াব তাহলে বুঝতে হবে যে, উপরিউক্ত ইবাদতগুলি 'মীলাদ' নামে না করে সাহাবীগণের মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত, হাদীস, শামাইল, সীরাত ইত্যাদি আলোচনার নামে পালন করলে সাওয়াব হবে না বা

কম হবে। সেক্ষেত্রে একই প্রশ্ন : সাহাবায়ে কেরাম কেন এভাবে কম সাওয়াব বা সাওয়াবহীনভাবে ইবাদতগুলি পালন করলেন?

আমরা মূলত 'মীলাদ' উদ্‌যাপনকেই ইবাদত মনে করছি। একে আমরা বর্তমানে অনেকটা ওয়াজিব পর্যায়ের ইবাদত মনে করি। উপরন্তু এই 'মীলাদ' ইবাদত পালনে আমাদের বিভিন্ন দেশ, এলাকা ও গ্রুপের মানুষের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। একজনের 'মীলাদ' আরেকজনের কাছে 'মীলাদ' নয়। অর্থাৎ, তাঁর 'মীলাদ' নামক ইবাদত পালন হচ্ছে না।

যেমন,- মিশরের শিয়াদের যুগের মীলাদ, কূকুবূরীর যুগের মীলাদ, ইবনু হাজার আসকালানী, সুয়ূতী প্রমুখের যুগের মীলাদ আমাদের কাছে মীলাদ নয়, কারণ তাঁরা কখনো মীলাদের মধ্যে কিয়াম করেননি, তাওয়াল্লুদ পড়েননি। তাঁদের যুগের মীলাদ বর্তমান যুগের 'সীরাতুন্নবী' অনুষ্ঠানের মতো। অনুরূপভাবে বর্তমান যুগের বিভিন্ন দল অন্যদলের মীলাদ উদ্‌যাপন পদ্ধতিকে অসার ও বাতিল বলছেন।

(৩). মীলাদের দলিল প্রমাণাদি : পক্ষ ও বিপক্ষ

মীলাদ উদ্‌যাপনের পক্ষে সাধারণত নিম্নরূপ প্রমাণাদি পেশ করা হয়:

প্রথম প্রকারের দলিল : উপরোল্লিখিত মাসনূন ইবাদতের কথা বলি যা মীলাদের মাধ্যমে আমরা পালন করে থাকি। আমাদের যুক্তি, যেহেতু মীলাদের মাধ্যমে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালিত হচ্ছে সেহেতু তা অবশ্যই ইসলামের অন্যতম ভালো কাজ বলে গণ্য হবে।

যারা মীলাদ বিরোধী তারা এগুলিকে মীলাদ উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে পেশ করেন। তাদের দাবি, উপরিউক্ত মাসনূন ইবাদতগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বোত্তমভাবে পালন করেছেন। এসকল ইবাদত মীলাদ হিসাবে পালন তাদের জন্য সম্ভব ছিল, কিন্তু তাঁরা কখনোই 'মীলাদ' পালন করেননি। এতে জানা যায় যে, এ সকল ইবাদত মীলাদ হিসাবে পালন করা ঠিক নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতেই পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাঁর বংশবৃত্তান্ত ও জন্ম সংক্রান্ত বিষয় বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ এসকল বর্ণনা কখনো 'মীলাদ' নামে করেননি। সর্বদা তা 'হাদীস আলোচনা', 'শামাইল' বর্ণনা, 'সুন্নাত ও সীরাত' আলোচনা ইত্যাদি নামে করেছেন। তাহলে আমরা মীলাদ নামে করব কেন?

দ্বিতীয় প্রকারের দলিল : আল্লাহর নেয়ামতে আনন্দ প্রকাশের সাধারণ নির্দেশ ও ফযীলতের দলিল। মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনতে পারা এবং তাঁর উম্মত হতে পারা। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নেয়ামত এ ধরায় তাঁর আগমন। কাজেই, সেজন্য আনন্দ প্রকাশ না করলে ঈমান থাকলো কোথায়?

মীলাদ বিরোধীগণ এই দলিলও মীলাদের বিপক্ষে পেশ করেন। কারণ আল্লাহর নেয়ামতে আনন্দ প্রকাশের ফযীলত সবচেয়ে ভালো জেনেছেন ও মেনেছেন সাহাবীগণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত ও তাঁর জন্মে আনন্দও তাঁদের ছিল সর্বাধিক। তা সত্ত্বেও তাঁরা 'মীলাদ' অনুষ্ঠান করেননি। কাজেই জানা গেল যে, এই ইবাদত পালনের জন্য এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ। আমাদেরকে ঠিক তাঁদের পদ্ধতিতেই তাঁর সুন্নাত পালন, আলোচনা, জীবনী, শামাইল আলোচনার মাধ্যমেই তাঁর জন্মের শুকরিয়া জানাতে হবে।

তৃতীয় প্রকারের দলিল : আমরা কিছু যুক্তি পেশ করি। খ্রিষ্টানরা ঈসা (আ.)-এর জান্নাতী খাবার পাওয়ার নেয়ামতকে উপলক্ষ্য করে ঈদ বানিয়েছে, ইহুদিরা আশুরাকে ঈদ বানিয়েছে মূসা (আ.)-এর নাজাত উপলক্ষ্যে, আমরা কেন আমাদের নবীকে নিয়ে ঈদ করব না?

মীলাদ বিরোধীগণের নিকট এই দলিলের কোনো আবেদন নেই। তারা বলেন: **প্রথমত,** এভাবে কোনো ইবাদত তৈরি করা যায় না। **দ্বিতীয়ত,** রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাঁর উম্মতকে ইহুদি ও নাসারাদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাদের বিরোধিতা করতে বলেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদিগণ আশুরার দিনে মূসা (আ.)-এর অনুসরণে ও অনুকরণে শুকরিয়া হিসাবে রোযা রাখত। এছাড়া তারা এই দিনটিকে ঈদ হিসাবে উদ্‌যাপন করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নবীদের অনুসরণে এবং শুকরিয়া হিসাবে এই দিনে রোযা রাখতে সাহাবীগণকে উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহুদিদের অনুকরণে আনন্দ প্রকাশ বা উদ্‌যাপন করতে নিষেধ করেন। বরং তাদের বিরোধিতা করে শুধু রোযার মাধ্যমে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন: "তোমরা ঈদ পালন ও আনন্দ প্রকাশে তাদের বিরোধিতা কর এবং শুধু রোযা পালন কর।"[১]

এতে বুঝা যায় যে, শুকরিয়ার জন্য আনন্দ, উৎসব, উদ্‌যাপন ইত্যাদি ইহুদি নাসারাদের পদ্ধতি। আর ইসলামের পদ্ধতি হলো রোযা পালন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সোমবারে রোযা রাখতে শিখিয়েছেন। আমরা তাঁর বাইরে কেন যাব ?

তৃতীয়ত, ইহুদি ও খৃস্টানদের এসকল বিষয় সাহাবীগণ জানতেন। আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া ও রাসূলুল্লাহর প্রতি মহব্বত ও তা'যীমে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের মাথায় একটুও আসলো-না যে, ইহুদি ও নাসারাদের কর্মের আলোকে আমাদেরও উচিত এভাবে আমাদের নবীকে নিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করা বা তাঁর জন্ম উদ্‌যাপন করা। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোনো প্রকার আনন্দ প্রকাশের চিন্তা তাঁদের মাথায় আসলো না কেন ? তাঁরা উত্তম না আমরা?

চতুর্থত, তার চেয়েও বড় কথা খ্রিষ্টানদের নবী তাদের ঈদ নির্ধারণ করে দিলেন, ইহুদিদের নবী তাদের শুকরিয়ার দিন ও পদ্ধতি ঠিক করে দিয়ে গেলেন, কিন্তু আমাদের নবী ﷺ কেন আমাদেরকে এ সকল পদ্ধতিতে ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের কথা শিখিয়ে গেলেন না ?

চুতুর্থ প্রকারের দলিল : কুরআন ও হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য নবীগণের জন্ম ঘটনা বর্ণনার কথা আমরা বলি। তাহলে আমরা দেখছি যে, কুরআন হাদীসে মীলাদ রয়েছে। আমরা নামাযেও কিয়ামসহ মীলাদ আলোচনা করি, কারণ নামাযে দাঁড়িয়ে

জামাতবদ্ধভাবে এ সকল আয়াত পাঠ করা ও শোনা হয়।

মীলাদ বিরোধীগণ এই মীলাদই চান। এটাই তো সুন্নাত-মীলাদ। কুরআন কারীমে বিভিন্ন নবীর (আ.) জন্ম-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত মূসা, ঈসা ও যাকারিয়া (আ.)-এর জন্ম কাহিনী বেশ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ পাঠ করেছেন ও আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা থেকে কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের জন্ম পালনের বা জন্ম উপলক্ষে কোনো প্রকারের আনন্দ বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনী, জন্ম, মুজিজা, শামাইল ও সুন্নাত আলোচনা করেছেন, কিন্তু কখনো জন্ম পালন বা উদ্‌যাপন করেননি। কুরআন ও হাদীসের এই মীলাদই তো সুন্নাত-সম্মত মীলাদ। এই পদ্ধতির মীলাদ বাদ দিয়ে আমরা কেন জন্মদিনে বা অন্য সময়ে বানোয়াট পদ্ধতিতে মীলাদ উদ্‌যাপন করব ? সুন্নাত পদ্ধতি পছন্দ নয় বলে ?

প্রশ্ন হলো, যদি কেউ সদা সর্বদা কুরআনের উক্ত আয়াতগুলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল প্রকার হাদীস, সীরাত ও শামায়েল আলোচনার মাধ্যমে এভাবে "মীলাদ" পালন করেন তাহলে কি আমরা তাকে "মীলাদ পালনকারী" বলে স্বীকার করব কি-না? যদি তাকে মীলাদ পালনকারী বলে গণ্য করা হয়, তাহলে তো সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমরা সকলে মিলে এভাবে সুন্নাত পদ্ধতিতে মীলাদ-কিয়াম পালন করব।

আর যদি ভাবি যে, এতে মীলাদের সাওয়াব ও বরকত পূর্ণ হচ্ছে না, বরং, উঠে দাঁড়ানো, সমবেতভাবে সুর করে দরুদ পাঠ, নির্দিষ্ট কিছু কবিতা পাঠ ইত্যাদি আরো কিছু কাজ এর মধ্যে সংযুক্ত না করলে এতে পূর্ণতা আসবে না বা সাওয়াব পূর্ণ হবে না, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অপছন্দ করব। আমরা মনে করব যে, তাঁদের মীলাদ কম সাওয়াবের এবং আমাদের মীলাদ বেশি সাওয়াবের। আমাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তির মতো যে, মনে করে যে, নামাযের মধ্যে কিছু কর্ম বা কথা, আযানের মধ্যে কিছু কর্ম বা কথা না বাড়ালে নামায বা আযান পূর্ণ হচ্ছে না।

পঞ্চম প্রকারের দলিলঃ নবীগণের স্মৃতিতে কিছু করা। আমরা ইবরাহীম (আ.)-এর স্মৃতিতে হজ্ব পালন করি। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতিতে মীলাদ করব না কেন?

মীলাদ বিরোধীগণ জবাবে বলেন যে,- **প্রথমত,** এভাবে ইবাদত তৈরি করা যায় না। বরং এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দিয়ে গিয়েছেন তা পালন করতে হয়। **দ্বিতীয়ত,** এ থেকে বুঝা যায় যে, মীলাদ পালন ঠিক নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ অন্যান্য নবীদের স্মৃতিতে ইবাদত করেছেন, কিন্তু মীলাদ পালন করেননি। আমাদের কাজ হলো তাঁদের অনুসরণ করা।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, তাঁর জীবনের সর্বাধিক স্থান দখল করেছেন তাঁরই পিতা ইবরাহীম (আ.)। তাঁর তাঁর অনুসরণে ও অনুকরণে অনেক বিধান ইসলামের মধ্যে রয়েছে। তাঁর উল্লেখ রয়েছে দরুদে ইবরাহীমীতে। বিশেষত হজ্ব ও কুরবানি মূলত তাঁরই অনুসরণে নির্ধারিত করেছেন তিনি উম্মতের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনো কোনোভাবে ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম উদ্‌যাপন করেননি। এছাড়া সুযোগ পেলে অন্যান্য নবীদের অনুকরণ ও অনুসরণ তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু কারো মীলাদ বা জন্ম পালন তিনি কখনো করেননি।

আমরা দেখেছি যে, কোনো বুজুর্গের অনুকরণ করে অবিকল তাঁরই মতো কাজ করে বরকত অর্জন সাহাবীগণের পদ্ধতি। আর কোনো বুজুর্গের প্রতি ভক্তি করে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত কোনো দিন, স্থান বা দ্রব্যকে সম্মান করা, পালন করা বা উদ্‌যাপন করা খেলাফে-সুন্নাত রীতি।

ষষ্ঠ প্রকারের দলিল : আমরা হাদীসের কিছু ঘটনাকে দলিল হিসাবে পেশ করি। যেমন, আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের সংবাদ পেয়ে আনন্দে একটি দাসী মুক্ত করে দিয়েছিল। এজন্য সে মৃত্যুর পরে কাফির হওয়া সত্ত্বেও কিছু ফায়দা পেয়েছে বলে কোনো কোনো বর্ণনায় শোনা যায়। এতে বুঝা যায় যে, যদি কোনো মু'মিন এভাবে আনন্দ প্রকাশ করে তাহলে সে আরো অনেক নেয়ামত পাবে। এছাড়া বলা হয়, তাঁর জন্মের সময়ে ফিরিশতাগণ দলবেঁধে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়েছেন বা দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পড়েছিলেন। এ ঘটনা যদিও কোনো হাদীসে নেই, তবে ৯ম ও ১০ম হিজরী শতকের কোনো কোনো সীরাতুন্নবী গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তাঁর জন্মের সময় কিয়াম করা ফিরিশতাগণের সুন্নাত।

মীলাদবিরোধীগণ এই দলিল মানেন না। তাঁরা বলেন :

প্রথমত, কারো জন্মের সময় আনন্দ প্রকাশ করা আর প্রতি বৎসর তাঁর জন্ম পালন করা কখনোই এক নয়।

দ্বিতীয়ত, আবু লাহাবের ঘটনা থেকে সাহাবীগণ শিক্ষা গ্রহণ করলেন না কেন? আমরা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিনে বা জন্মে আনন্দ প্রকাশ ও অনুষ্ঠান করলে তা খুবই সাওয়াবের কাজ হবে। কিন্তু লক্ষাধিক সাহাবী ১০০ বছরের মধ্যে একবারও তাঁর জন্মদিন পালন করলেন না কেন ? এই সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের মত ক্ষমতা কি তাদের ছিল-না ? না-কি তাঁরা এভাবে ইবাদত তৈরি করাকে অপছন্দ করতেন ? না-কি ভক্তির অভাব?

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের সময় ফিরিশাগণ তাঁর আম্মাজানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করেছিলেন বলে আমরা দাবি করি। কিন্তু সাহাবীগণ ফিরিশতাদের অনুসরণ করে প্রতি বৎসর জন্মদিনে এভাবে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করলেন না কেন ? লক্ষ সাহাবীর একজনও তাঁর সারা জীবনে একটি বারও ফিরিশতাগণের এই সুন্নাত পালন করলেন না কেন ? তাঁদের ভক্তি কম ছিল বলে ? না-কি এ ঘটনা বানোয়াট বলে ? না-কি তাঁরা এভাবে ভক্তি প্রকাশকে খারাপ জেনেছেন বলে ? না কী কারণে ?

সর্বাবস্থায় তাঁরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যা বর্জন করেছেন তা করলে যে বেশি ভালো হবে, তা আমরা কী-ভাবে বুঝলাম ? তাঁরা এসব কিছুই বুঝলেন না, আমরা বুঝলাম, আমরা কি তাঁদের চেয়েও বেশি ভক্ত? বেশি প্রেমিক? বেশি হেদায়েত প্রাপ্ত?

তৃতীয়ত, সাহাবীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন পালন বা জন্মদিন উদ্‌যাপন বড় একটি সুযোগ এড়িয়ে গিয়েছেন। উমর (রা)-এর সময় যখন মুসলমানদের জন্য একটি পঞ্জিকা উদ্ভাবনের বিষয়ে আলোচনা হয়, তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন বাদ দিয়ে তাঁর হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পঞ্জিকা গণনার ব্যবস্থা করলেন। এ হিজরতকেও তাঁরা কখনো উদ্‌যাপন করেননি। প্রতি বৎসর বা কখনো হিজরত উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠান বা আনন্দ প্রকাশ করেননি।

সপ্তম প্রকারের দলিল : বর্তমান যুগের মীলাদ সমর্থকগণ আরেক প্রকারের দলিল পেশ করেন। তাঁরা সরাসরি দাবি করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম মীলাদ পালন করেছেন। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে মনে : গত প্রায় সাত শত বৎসর মীলাদ নিয়ে এত মতবিরোধ সত্ত্বেও কোনো একজন মুহাদ্দিসও কোন একটি হাদীসের গ্রন্থে একটি হাদীসও খুঁজে পেলেন না যে, সাহাবীগণ মীলাদ পালন করেছেন। ফলে সবাই একবাক্যে মেনে নিলেন যে, তা বিদ'আত। এখন বর্তমান যুগে আমরা কী-ভাবে এই দাবি করছি ?

আসল কথা হলো এখানে সাধারণত দু ধরনের দলিল পেশ করা হয়:

প্রথমত, কোনো বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হয়, যা কখনোই কোনো হাদীসের গ্রন্থে সনদসহ বর্ণিত হয়নি। আমরা বলেছি যে, ইবনু হাজার হাইতামী মাক্কী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯৭৪ হি.) দশম হিজরী শতকের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তিনি 'আন-নি'মাতুল কুবরা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপি মিসরের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। একটি তুর্কি সংস্থা এ বইটির নাম চুরি করে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে মীলাদের পক্ষে অনেকগুলি সনদ-বিহীন জাল হাদীস দিয়ে গ্রন্থটি পূর্ণ করে প্রকাশ করেছে। মূল গ্রন্থটির সাথে এ জাল গ্রন্থটি মিলালে যে কেউ তা জানতে পারবেন। হাদীসগুলির ভাষা থেকেই জালিয়াতি ধরা পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশের মীলাদের পক্ষের কোনো কোনো আলিম এ জাল পুস্তকটির উদ্ধৃতি প্রদান করেন। সম্ভবত তাঁরাও জানেন যে, এ হাদীসগুলি বিশ্বের কোনো হাদীসের গ্রন্থে নেই, এগুলির কোনো সনদ নেই, পূর্ববর্তী কোনো আলিম এগুলি কোনোভাবে উল্লেখ করেন নি এবং এ পুস্তকটিই জাল। ইবনু হাজার হাইতামী তাঁর 'ফাতওয়া হাদীসিয়্যাহ' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো হাদীসের সনদ বা কোন্ গ্রন্থে তা সনদসহ সংকলিত তা উল্লেখ না করে কোনো হাদীস উল্লেখ করা হারাম। কোনো বিষয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু নিজের মত প্রমাণ করতে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া খুবই কঠিন বিষয়, বিশেষত হাদীসের নামে মিথ্যা বলা। মহান আল্লাহ আমাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যাচার থেকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয়ত, এক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত দলিলকেই নতুন আঙ্গিকে পেশ করা হয়। বলা হয় রাসূলুল্লাহ নিজে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয় বর্ণনা করেছেন অথবা সাহাবীগণ তাঁর সীরাত, আকৃতি, প্রকৃতি, সুন্নাত আলোচনা করেছেন, কাজেই তাঁরা মীলাদ পালন করেছেন।

এই প্রকারের মীলাদ সম্পর্কে মীলাদ বিরোধীদের কোনো আপত্তি নেই। এতে ঘোর আপত্তি করেন মীলাদ ভক্ত মুসলিমগণ। তাঁর যদিও এগুলিকে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন, তবুও যদি বর্তমান সময়ে কেউ সাহাবীগণের অনুরূপভাবে 'মীলাদ' পালন করেন, তাহলে তারা সেটাকে মীলাদ বলে মানবেন না, যা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

(৪). সমস্যা শুধু সুন্নাতকে নিয়ে

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মীলাদ উদ্‌যাপন ও পালনের পক্ষে অনেক যুক্তি ও দলিল রয়েছে এবং মীলাদের মাধ্যমে আমরা অনেকগুলি সুন্নাত-সম্মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালন করি। কিন্তু সমস্য হলো সুন্নাত নিয়ে। যারা সকল ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে পরিপূর্ণ আদর্শ বলে মনে করেন তাঁদের কাছে একটিই প্রশ্ন: এসকল ইবাদত তাঁরা কিভাবে পালন করেছেন? তাঁরা কী-ভাবে নেয়ামতের শুকরিয়া করেছেন ? তাঁরা কী-ভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মে আনন্দ প্রকাশ করেছেন? তাঁরা কী-ভাবে তাঁর জীবনী, না'ত, সীরাত, শামাইল আলোচনা করেছেন? তাঁরা কী-ভাবে তাঁর প্রতি মহব্বত, তা'যীম প্রকাশ করেছেন? তাহলে আমরা কেন তাঁদের পদ্ধতিতে সেগুলি করব না?

(৫). পাপ, হারাম ও শিরক মিশ্রিত মীলাদ অনুষ্ঠান

উপরের সকল আলোচনা মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ বা জন্ম উদ্‌যাপনের নামে সকল প্রকার পাপ, অন্যায় ও শরীয়ত বিরোধিতা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত, সহীহ হাদীস পাঠ, দান-সাদকা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত ইত্যাদি সুন্নাত-সম্মত ইবাদত পালন করা নিয়ে। এইরূপ মীলাদ পালনকে অনেক আলেম জায়েয বলেছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এ সকল ইবাদত এই উপলক্ষে পালন করবে সে এসকল ইবাদতের জন্য সাওয়াব পাবে। সাওয়াব মূলত মাসনূন ইবাদতসমূহের। মীলাদকে উপলক্ষ্য করা তাঁরা জায়েয বলেছেন। অন্যান্য আলেম তা নিষেধ করেছেন। তাঁরা এসকল মাসনূন ইবাদত নিষেধ করেননি। শুধুমাত্র তা পালনের জন্য মীলাদকে উপলক্ষ্য করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কখনো কারো মীলাদ উপলক্ষে এ সকল ইবাদত করেননি।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সুন্নাত হলো মুমিনের জন্য লাগামস্বরূপ। একবার সুন্নাতের ব্যতিক্রম করলে অগণিত ব্যতিক্রমের পথ প্রশস্ত হয়। উপরের মাসনূন ইবাদতসমূহ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ পালন করেছেন, তবে মীলাদ উপলক্ষে নয়। আমরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে মীলাদ উপলক্ষে তা পালন করার অনুমতি দিলাম। ফলে আরো যুক্তি দিয়ে আরো অনেক ব্যতিক্রম কর্ম করার পথ প্রশস্ত হলো।

এজন্য উদ্ভাবনের শুরু থেকেই মীলাদের সাথে অনেক পাপ জড়িয়ে পড়েছে। যেমন,- গান, বাজনা, নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা, বেপর্দা চলাফেরা ইত্যাদি। এগুলিকে পাপ হিসাবে অধিকাংশ মুসলমান স্বীকার করেন। এছাড়া অনেক কর্ম ও বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে মীলাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে যা নেক কাজ বলে মনে করা হয়, কিন্তু সুন্নাত বিরোধিতার কারণে তা অনুচিত, মাকরুহ, হারাম বা শিরক। এখানে এজাতীয় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি:-

প্রথমত, মীলাদের মধ্যে সমস্বরে ও ঐক্যতানে দরুদ ও সালাম পাঠ। আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এক্ষেত্রে

সাধারণ সুন্নাত হলো মনে মনে বা মৃদু স্বরে এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তা আদায় করা। কোন সমাবেশে উপস্থিত মানুষদের মধ্যে তাঁর নাম বা উপাধি উচ্চারিত হলে অথবা আলোচক তাঁর উপর দরুদ পাঠ করতে বললে মাসনূন পদ্ধতি হলো উপস্থিত প্রত্যেকে নিজে নিজে তা পালন করবেন।

দ্বিতীয়ত, মাসনূন যিক্‌র ও সালাত-সালাম বাদ দিয়ে মানুষের রচিত শের, নাত বা কবিতা পড়ে সময় কাটানো। কবিতা, না'ত ইত্যাদি পাঠ মূলত কোনো যিক্‌র নয়। তা জায়েয হতে পারে কিন্তু তা মূলত সাওয়াবের কাজ নয়। তবে এর মধ্যে কুরআন ও হাদীসের কথা বা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ, আখেরাত, ইসলামের বিধিবিধান ইত্যাদি যতটুকু আলোচিত হবে ততটুকু যিক্‌রের সাওয়াব পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে কবিতা ও গদ্য সবই সমান।

অপরদিকে কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস পাঠ একদিকে বিশুদ্ধ ইবাদত, অপরদিকে যিক্‌রের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পথ। যখন কোনো মুসলিম একবার 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদ' বলেন তিনি এক বার দরুদ পাঠের অতুলনীয় সাওয়াব পাবেন, যা ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু যদি কেউ 'বালাগাল উলা বি কামালিহী' ১০০ বার পাঠ করেন তাহলেও আমরা বলতে পারব-না যে, তিনি কোনো নির্দিষ্ট সাওয়াব পাচ্ছেন। তবে মনের মধ্যে যতটুকু মহব্বত ও যিক্‌র অনুভূত হবে ততটুটু সাওয়াব তিনি পাবেন। আর এই ক্বলবী যিক্‌রের সাওয়াব তো দরুদ পাঠের সাথেও তিনি পেতেন। দরুদ পাঠ একটি সুনির্দিষ্ট যবানী ইবাদত। এর পাশাপাশি অন্তরে যে মহব্বত সৃষ্টি হবে তার সাওয়াবও তিনি পাবেন। কুরআন তিলাওয়াত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সহীহ হাদীস ভিত্তিক জীবনী আলোচনা ইত্যাদিও অনুরূপ।

তৃতীয়ত, এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস ও কল্পকথা আলোচনা করা। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে কোনো মিথ্যা কথা বলা, বর্ণনা করা, শোনা সবই কঠিন পাপ, হারাম ও কবীরা গোনাহ। এবিষয়ে আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া দরকার। দুনিয়ায় আমরা গলাবাজি করে চলতে পারব, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একদিন আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের সকল কাজের হিসাব প্রদান করতে হবে।

চতুর্থত, মীলাদকে ঈদ বলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দুটি ঈদ দিয়ে গেলেন। আমরা তাঁর শরীয়তকে অসম্পূর্ণ মনে করে আরেকটি ঈদ এর মধ্যে সংযুক্ত করলাম। শুধু তাই নয় একে সকল ঈদের সেরা ঈদ মনে করলাম। এভাবে আমরা দাবি করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এবং সাহাবীগণ সকল ঈদের সেরা ঈদ চিনতেও পারেননি, পালন করা-তো দূরের কথা!

পঞ্চমত, মীলাদকে ওয়াজিব মনে করা। মীলাদের উদ্ভাবনের শুরু থেকে আলেমদের মতভেদ ছিল তা জায়েয কি-না সে বিষয়ে। কেউই মীলাদকে কোনো প্রয়োজনীয় কর্ম বলে মনে করেননি। তাঁরা কেউ নিষেধ করেছেন, কেউ জায়েয বলেছেন। মীলাদ পালন না করলে যে কোনো সামান্যতম দোষ হবে, তা বোধহয় কারোর মনেও আসেনি। কারণ, এরূপ চিন্তা করলে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের দোষারোপ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে অনেকে কথায় বা কার্যত মীলাদ পালনকে জরুরি বিষয় বা ওয়াজিব বলে মনে করছেন। অগণিত সুন্নাত, নফল এমনকি ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করলেও তাঁরা বিশেষ নাখোশ হন না, কিন্তু "মীলাদ" পরিত্যাগ করলে তাঁরা নাখোশ হন। এছাড়া "মীলাদ" পালন করলেই হলো না, অবিকল তাঁদের মত ও তাঁদের পদ্ধতিতে পালন করতে হবে। না হলে খুবই আপত্তি।

ষষ্ঠত, মীলাদকে ঈমানের অংশ মনে করা বা একে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত প্রকাশের একমাত্র উপকরণ মনে করা। বর্তমানে অনেক মুসলিম এভাবে মীলাদ পাঠকেই সুন্নীয়তের একমাত্র আলামত বলে মনে করছেন। এভাবে তাঁরা প্রমাণ করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কেউই সুন্নী ছিলেন না। তাঁদের কারো মধ্যেই আমাদের মতো পরিপূর্ণ ঈমান ছিল না! লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!

সপ্তমত, কিয়াম বা দাঁড়ানো। আমরা দেখেছি যে, মীলাদের উদ্ভাবনের ২০০ বৎসর পরে কিয়ামের উদ্ভাবন হয়। আরো ২০০ বৎসর পর্যন্ত কিয়াম মীলাদের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করতে পারেনি, বরং অনেক মীলাদ পালনকারী কেয়ামকে ঘৃণা করতেন। এরপর ক্রমান্বয়ে তা মীলাদের অংশে পরিণত হয়। প্রথমদিকে কিয়ামের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা উল্লেখ করে তৎক্ষণাৎ তাঁর আগমনের স্মরণে দাঁড়িয়ে পড়া। আমাদের দেশে সালামের সময় উঠে দাঁড়নোই মূল কথা, তাঁর জন্ম ও ভূমিষ্ট হওয়ার কথা আলোচনা করা বা না করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একটি অবান্তর প্রশ্ন এখানে উঠানো হয়। দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ না-জায়েয কি-না? আসল প্রশ্ন হলো বসে সালাম জায়েয কি-না ? যদি বসে সালাম জায়েয হয় তাহলে আর দাঁড়ানোর দরকার কি? বিশেষত, আমরা যখন জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, পরবর্তী মুবারাক যুগের মানুষের ও তৎপরবর্তী প্রায় ১ হাজার বৎসর মুসলিমগণ সালামের জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কাজেই, যদি বসে সালাম জায়েয হয়, তাহলে আর তাঁদের সুন্নাতের বিরোধিতা করে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজন কী?

কখনো আমরা বলি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের মর্যাদা, বংশ-পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে হাদীস বলেছেন, আমরা বললে দোষ কি ? আসলে কেউ দাঁড়িয়ে ওয়াজ করতে নিষেধ করছে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলি বলছিলেন তখন সাহাবীগণ দাঁড়য়ে সালাম পড়ছিলেন কি-না? পরবর্তীতে যখন সাহাবীগণ এসকল হাদীস আলোচনা করতেন তখন দাঁড়িয়ে পড়তেন কি-না?

কখনো আমরা বলি যে, হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) বা অন্যান্য কবিরা দরবারে নববীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইসলামের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষে কবিতা পাঠ করতেন, আমরা করব-না কেন? আসলে কেউ দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ নিষেধ করছেন না। প্রশ্ন হলো তিনি যখন দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ করছিলেন তখন সাহাবীগণ কি দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করছিলেন কি-না?

এখানে আমরা আরেকটি অবান্তর বিতর্ক করি। তা হলো – কেউ মাজলিসে আগমন করলে তাঁর জন্য উঠে দাঁড়ানো যাবে কি-

না। এখানে প্রশ্নটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কারণ এখানে কেউ আসছেন না বা আমরা কারো আগমনে উঠে দাঁড়াচ্ছি না। আমরা মূলত সালাম পাঠের জন্য অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের কথা স্মরণ করে করে উঠে দাঁড়াচ্ছি।

এই কাজটি সন্দেহাতীতভাবে খেলাফে-সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ আজীবন সালাত ও সালাম পাঠ করেছেন। কখনোই তাঁরা সালাত ও সালামের জন্য উঠে দাঁড়াননি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্ম সংক্রান্ত হাদীসগুলি তাঁরা হাদীসের মাজলিসে, সীরাত ও শামাইল আলোচনার মাজলিসে অগণিতবার আলোচনা করেছেন। কখনোই তাঁরা এই উপলক্ষে উঠে দাঁড়াননি। আমরা জানি মীলাদ চালু হওয়ার পরেও কেউ এভাবে উঠে দাঁড়াতেন না। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাঁদের কর্ম উত্তম না আমাদের কর্ম এবং তাঁদের পরিপূর্ণ অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য, সাওয়াব ও রেজামন্দী পাওয়া সম্ভব কি-না?

বর্তমানে যারা সালামের জন্য উঠে দাঁড়ান তাঁদের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে:

(ক). কেউ মনে করেন, দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে সর্বাবস্থায় সালাত ও সালাম পাঠ সাওয়াবের কাজ। মূল ইবাদত সালাম প্রেরণ। শোয়া, বসা বা দাঁড়ানো মধ্যে সাওয়াবের কোনো রকমের হেরফের নেই। এজন্য সকলে যদি দাঁড়িয়ে সালাম পড়ে আমিও পড়ি। বসে পড়লে আমিও পড়ি। অথবা যেহেতু সমাজে দাঁড়িয়ে সালাম প্রচলিত আছে, এ-নিয়ে বিতর্কে না যেয়ে জায়েয হিসাবে দাঁড়িয়ে বা বসে সালাম পাঠ করি।

(খ). সমাজের প্রচলনকে হালাল করার জন্য কেউ ভাবেন, রাওযা মুবারাকায় যেয়ে যারা যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁরা তো দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করেন। আমিও নিজেকে রাওযা মুবারাকার সামনে কল্পনা করি এবং দাঁড়িয়ে সালাম প্রদান করি। এটি একটি অবান্তর কল্পনা। যিয়ারতের সময় দাঁড়িয়ে সালাম প্রদানই সুন্নাত। সাধারণ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন যেকোনোভাবে সালাম প্রদানের। কল্পনা করে তাঁর সুন্নাতকে নষ্ট করার প্রয়োজন কি? এতে সামান্যতম বরকত বা মহব্বত বৃদ্ধি হবে তা সাহাবীগণ বুঝলেন না?

(গ). কেউ মনে করেন, ফিরিশতাগণ আমাদের দরুদ-সালাম নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা যেয়ে বলবেন যে, আমরা তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়েছি। তাহলে তিনি বেশি খুশি হবেন। এই চিন্তা বাতুল ও অন্যায়। কারণ **প্রথমত,** কোনো হাদীসেই বলা হয়নি যে, ফিরিশতাগণ উম্মতের হালত তাঁর কাছে বর্ণনা করবেন। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে যে অবস্থায় আমরা সালাম পাঠ করি সবই ফিরিশতাগণ পৌঁছে দেবেন এবং আমরা তাঁর জাওয়াব ও দোয়া লাভ করব। **দ্বিতীয়ত,** তিনি কখনো বলেননি যে, দাঁড়িয়ে সালাম করলে তিনি বেশি খুশি হবেন। এসকল চিন্তা সবই মনের মাধুরী ও কল্পনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যা কথা বলা। **তৃতীয়ত,** এভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমাদের মধ্যে বিরাজমান অহংকারী নেতাদের মতো মনে করি। নাঊযু বিল্লাহ। সালাম পাঠের জন্য দাঁড়ানো তো দূরের কথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আসতে দেখে কেউ উঠে দাঁড়াক তা কখনো পছন্দ করতেন না। আর আমরা মনের মাধুরী দিয়ে কল্পনা করে তাঁকে কোথায় নামাচ্ছি? সুন্নাতের রশি গলা থেকে খুলে ফেলার অর্থই হলো বিভ্রান্তির দরজা নিজের জন্য খুলে নেওয়া।

আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

ﷺ

"সাহাবীগণের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউই ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াতেন না ; কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।"[১]

এখানে আমরা দেখছি যে, সম্মানিত আগন্তুক দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সাহাবীগণ এভাবে দাঁড়াতে চাইতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর নিজের জন্য কেউ দাঁড়াক তা পছন্দ করতেন না, তাঁই তাঁরা দাঁড়াতেন না।

তাঁরা তাঁর প্রস্থানের সময় তিনি যখন উঠতেন তখন তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াতেন। সম্ভবত এজন্য যে, প্রস্থানের সময় তাঁরই সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়, কাজেই তিনি তা অপছন্দ করবেন না। আবু হুরাইরা (রা) বলেন :

ﷺ

"নবীজী ﷺ আমাদের সাথে মাজলিসে বসে কথাবার্তা বলতেন। এরপর যখন তিনি উঠতেন তখন আমরাও উঠে দাঁড়াতাম এবং যতক্ষণ না তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম।"[২]

(ঘ). কেউ আরেকটু বাড়িয়ে নেন। তাঁরা মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সালাম পাঠ দেখেতে পাচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে দাঁড়াতে দেখলে খুশি হবেন। এখানে আমরা তাঁর নামে কয়েকটি মিথ্যা কথা বলি।

প্রথমত, আমরা কল্পনা করি যে, আমাদেরকে দাঁড়াতে দেখলে তিনি খুশি হবেন। একটু আগেই বলেছি যে, এটি জঘন্য মিথ্যা কথা। তিনি কখনো বলেননি যে, আমরা দাঁড়িয়ে সালাম প্রেরণ করলে তিনি খুশি হবেন।

দ্বিতীয়ত, এর চেয়ে বড় মিথ্য হলো তিনি আমাদের সালাম প্রদান দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে করা। সালাত ও সালামের ফযীলতে শত শত সহীহ, যয়ীফ ও বানোয়াট হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সকল হাদীসেই বলা হয়েছে যে, আমরা সালাত ও সালাম পাঠ করলে ফিরিশাতগণ তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন।

(ঙ). কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে যান। তাঁরা মনে করেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং আমাদের মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন। নাঊযু বিল্লাহ। বিশ্বের বুকে তাঁর নামে এতবড় অপবাদ আর কমই আছে। আউস (ﷺ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

....

"তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার।... কাজেই, এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।" সাহাবীগণ বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কী-ভাবে তখন আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বলেন: "মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।"[১]

দেখুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল ওলীর সেরা ওলী তাঁর প্রিয়তম সাহাবীগণকে জানালেন যে, তাঁদের দরুদ তাঁর কাছে পেশ করা হবে। তাঁরা অতিরিক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করলেন। কিন্তু তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনোভাবে তাঁদেরকে বললেন না যে, আমি সর্বদা বা মাঝেমধ্যে তোমাদের দরুদের মাজলিসে উপস্থিত হব। সালাত ও সালামের ফযীলতে শত শত হাদীস রয়েছে। একটি মিথ্যা হাদীসও নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের কারো সালামের মাহফিলে উপস্থিত হন। এতবড় মিথ্যা কথা বলতে কি আমাদের একটুও মন কাঁপে না?

কেন আমরা বিভিন্ন সম্ভাবনা, হতে পারে, কেন হবে না,... ইত্যাদি কথা বলে তাঁর নামে অতিরিক্ত কথা বলব? তাঁর সম্পর্কে কী বলতে হবে, কী করতে হবে, কী ভাবলে নাজাত পাব সব কি তিনি শিখিয়ে জাননি? তিনি কি আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে গিয়েছেন যে, এত সব সম্ভাবনা দিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে?

(চ). কেউ কেউ আরেকটু এগিয়ে বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সদা সর্বদা সবকিছু দেখেন ও জানেন। তাঁরা বলেন তিনি 'হাযির-নাযির'। 'হাযির-নাযির' আরবি শব্দ। হাযির অর্থ উপস্থিত। নাযির অর্থ দর্শক। 'হাযির-নাযির' বলতে বোঝান হয় 'সদাবিরাজমান ও সর্বজ্ঞ বা সবকিছুর দর্শক'। এই গুণটি শুধুমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে এই গুণ আরোপ করা মূলত শিরক। এছাড়া সুন্নাতের বিপরীত হওয়ার কারণে তা বিদ'আতী আকীদা।

আমি **'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা'** গ্রন্থে আকীদা বিষয়ক সুন্নাত ও খেলাফে সুন্নাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। এ গ্রন্থে আকীদাগত বিদ'আত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না। এ গ্রন্থের পরিসরে এটুকুই যথেষ্ট যে, এ বিশ্বাস 'খেলাফে সুন্নাত'। আগেই বলেছি যে, 'হাযির-নাযির' আরবি শব্দ। কখনোই কোনোভাবে কুরআনে বা হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে 'হাযির নাযির' বলা হয়নি। কখনোই কোনো সাহাবী, তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী কোনোভাবে কোনোদিন তাঁকে 'হাযির নাযির' বলেননি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যারা মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দরুদ সালামের মাজলিসে বা মীলাদের মাজলিস দেখতে বা শুনতে পান, বা তিনি সেখানে উপস্থিত হন এবং যারা মনে করেন যে, তিনি "হাযির-নাযির" বা সদা সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত রয়েছেন এবং সবকিছু দেখছেন ও জানছেন এসকল মানুষেরা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যা কথা বলছেন তাই নয়, উপরন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যাবাদি বলে দাবি করেন, নাউযু বিল্লাহ!

কারণ যদি তিনি দরুদ সালামের মাজলিসে উপস্থিত হন বা থাকেন বা দেখেন, তাহলে তিনি দরুদ সালাম বিষয়ক যত হাদীস বলেছেন তার অধিকাংশই মিথ্যা ও বাতুল কথায় পরিণত হবে। তিনি বললেন, তোমাদের দরুদ সালাম আমার কাছে পৌঁছানো হবে, সারা বিশ্বে ফিরিশতাগণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন দরুদ সালাম আমরা কাছে পৌঁছানোর জন্য, আমরা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কেউ সালাম দিলে আমি শুনতে পাই ও দূর থেকে সালাম দিলে ফিরিশতারা পৌঁছে দেন, আমার কবরে ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে দরুদ সালাম শুনে আমাকে জানানোর জন্য – ইত্যাদি সকল কথাই অর্থহীন ও মিথ্যা হয়ে যায়!! কেন একজন মুসলিম এভাবে অগণিত সহীহ হাদীসকে মিথ্যা প্রমাণিত করে অগণিত মিথ্যা কথা বানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে বলবেন?

আমি **'রাহে বেলায়াত'** গ্রন্থে এ সকল হাদীস সনদ ও বিশুদ্ধতার আলোচনা-সহ উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া **'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা'** গ্রন্থে হাযির নাযির প্রসঙ্গে সকল পক্ষের দলিলাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি। এখানে শুধু একটি হাদীস উল্লেখ করছি। আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

:

"আল্লাহ আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করছেন, যাকে সকল সৃষ্টির শ্রবণশক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাত পাঠ করবে তখনই ঐ ফিরিশতা আমাকে সালাত পাঠকারীর নাম ও তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করে আমাকে তাঁর সালাত পৌঁছে দিয়ে বলবে : অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর সালাত প্রেরণ করেছে।"[২]

রাসূলুল্লাহ এতদূর বিস্তারিত আমাদেরকে শিখিয়ে গেলেন, অথচ একটি হাদীসেও বলে গেলেন না যে, তোমরা সালাত সালাম পাঠ করলে আমি দেখতে পাব। বরং দরুদ ও সালামের ফযীলতে বর্ণিত শত শত হাদীস সবই মিথ্যা হয়ে যায় যদি আমরা এই দাবি করি। কারণ, তিনি যখন নিজেই সব দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে এ সকল ফিরিশতাদেরকে দরুদ সালাম নিয়ে গিয়ে নামধামসহ তাঁর দরবারে পেশ করা অর্থহীন একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য হবে।

একটি বানোয়াট হাদীসেও বলা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাদের দরুদ সালাম শুনতে পান বা দেখতে পান। এখন আমরা বিভিন্ন যুক্তি ও পরবর্তী যুগের কোনা কোনো আলেমের কথার উপর ভিত্তি করে যদি বলি যে তিনি আমাদের দরুদ ও সালাম নিজে শুনতে পান বা দেখতে পান, অথবা তিনি হাজির বা উপস্থিত ও নাযির বা দেখেন, তাহলে আমরা মূলত দাবি করব যে, তিনি নিজেই জানতেন না যে, তিনি রওযা মুবারাকায় বসে আমাদের সালাম দেখবেন বা শুনবেন বা সেখানে উপস্থিত হবেন। অথবা তিনি জেনেও আমাদেরকে না জানিয়ে, ভুল তথ্য দিয়ে চলে গিয়েছেন। এ ধরনের মিথ্যা অপবাদ তাঁর নামে বলার চিন্তাও কি কোনো মানুষ করতে পারে?

আমাদের কি উচিত নয় এ সকল বিষয়ে শুধুমাত্র তাঁর কথার উপর নির্ভর করা? গায়েবী জগৎ সম্পর্কে আমরা শুধুমাত্র ততটুকু কথা বলব, যতটুকু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। বাকি বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর বাইরে কিছু বলার অর্থই হলো – **প্রথমত,** আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নামে আন্দাজে মিথ্যা কথা বলা। **দ্বিতীয়ত,** আমরা দাবি করব যে, গায়েবী বিষয়ে আমাদের জানা জরুরি এমন কিছু বিষয় না শিখিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গিয়েছেন, ফলে এখন আমাদের যুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে তা জানতে হচ্ছে।

সম্ভবত একারণেই আমাদের দেশের অনেক আলেম সালাম পাঠের জন্য দাঁড়ানো জায়েয বললেও বিশেষভাবে বলতেন "হাযির-নাযির মনে করে দাঁড়নো চলবে না।" তবে সমস্যা হলো দাঁড়ানো বা কিয়ামকে যারা পছন্দ করেন ও যৌক্তিক প্রমাণিত করতে চান তাঁরা শেষ পর্যন্ত "হাযির" বলে দাবি করতে বাধ্য হন। তাঁরা কিয়ামের যুক্তিতে বলেন, কেউ উপস্থিত বা হাযির হলে তো আপনারা দাঁড়িয়ে পড়েন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য দাঁড়াবেন না কেন? এভাবে তাঁরা দাবি করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাযির হয়েছেন এবং এজন্যই আমরা দাঁড়াচ্ছি। তা না-হলে তো দাঁড়ানো বা "কিয়াম" অযৌক্তিক হয়ে যায়। এতক্ষণ দরুদ পড়লাম, তাঁর নাম উচ্চারণ করলাম, তখন দাঁড়ালাম-না, এখন হঠাৎ দাঁড়ানোর প্রয়োজন হল কেন?

(চ). মীলাদ পালনের কিছু নতুন ও উন্নত (!) পদ্ধতি

প্রিয় পাঠক, আমাদের সমস্যা হলো সাধারণ ফযীলতের দলীল দ্বারা একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রমাণের চেষ্টা করা এবং জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না রাখা। এভাবে আমরা খেলাফে-সুন্নাতের দিকে চলে যাই। আমরা যদি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) মহব্বত, তা'যীম, নেয়ামতের শুকরিয়া ইত্যাদি সাধারণ ফযীলতের উপর নির্ভর করে এবং জায়েয না-জায়েয বিতর্ক দিয়ে এভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি ও রীতি প্রচলনের পথ উন্মুক্ত করি তবে আরো অনেক নতুন সুন্নাত-বিরোধী উন্নত (!) বা 'বিদ'আতে হাসানা' (!!) পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব। যেগুলির পক্ষে অনেক অকাট্য (!) দলীল দেওয়া যাবে, তবে সবই মুমিনকে সুন্নাত থেকে বিচ্যুত করবে। আমি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি:

(ক). ঈদে মীলাদুন্নবীর নামায

আমরা ঈদে মীলাদুন্নবীর দিনে দুই রাক'আত শুকরিয়া নামাযের প্রচলন করতে পারি। এখন থেকে আমরা প্রতি বৎসর **১২**-ই রবিউল আউয়াল সকালে প্রথমে ঈদগাহে জামাতে দুই রাক'আত শুকরিয়া নামায আদায় করব। এরপর অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করব। এজন্য আমরা উপরের আলোচিত মীলাদের দলিলগুলি ছাড়াও অনেক অকাট্য (!) দলিল পেশ করতে পারব। কুরআন বা হাদীসে কোথাও কি তাঁর জন্মের জন্য শুকরিয়া নামায পড়তে নিষেধ আছে? আমরা অন্য ঈদে নামায পড়ি আর সকল ঈদের সেরা ঈদে নামায পড়ব না? বরং আমরা প্রতিটি মীলাদ মাহফিলের শুরুতে জামাতের সাথে দুই রাক'আত শুকরিয়া নামায আদায় করে এরপর মীলাদের বাকি কর্মকাণ্ড পালন করব!!

(খ). শুকরানা সাজদাসহ মীলাদ মাহফিল

আমরা মীলাদ মাহফিলের জন্য "শুকরানা সাজদার" প্রচলন করতে পারি। মীলাদ অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাই মিলে একটি শুকরানা সাজদা আদায় করব। আমরা জীবনের সকল আনন্দে শুকরিয়া সাজদা করি বা শুকরিয়া নামায আদায় করি, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমন, যা আমাদের সবচেয়ে বড় নেয়ামত, তাতে শুকরিয়া সাজদা বা নামায আদায় করি না। এটা কি ঠিক ? শুকরানা সাজদা হাদীসে আছে এবং ফকীহগণ একে সমর্থন করেছেন।

(গ). পুষ্পার্পণের মাধ্যমে মীলাদ

কারো কবরে খেজুরের ডাল, ফুল ইত্যাদি অর্পণ করা ভালো কাজ বলেই আমরা অনেকে মনে করি। আমরা বাংলাদেশের গরিব মুসলমান যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাওযা মুবারাকায় যেতে পারি না, এজন্য আমরা এখন থেকে প্রতিটি মসজিদের পাশে তাঁর রওযার স্মৃতিতে একটি স্থান নির্ধারিত করব এবং ঈদে মীলাদুন্নবীর দিনে তাঁর মহব্বতে প্রথমে সেখানে ফুলের তোড়া দিয়ে ইসালে সাওয়াব করে আমাদের দিন শুরু করব। কুরআন বা হাদীসে কোথাও কি নিষেধ আছে এধরনের মহব্বত প্রকাশে বা ইসালে সাওয়াবের আয়োজন করতে?

(ঘ). কদমবুসী ও জমিনবুসীর মাধ্যমে মীলাদ পালন

সকল প্রকারের সম্মানিত মানুষদের জন্যই আমরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। দুনিয়ার অনেক পাপী, সন্ত্রাসী, এমনকি অমুসলমানকেও আমরা শিক্ষক হিসাবে, নেতা হিসাবে বা শাসক-প্রশাসক হিসাবে দাঁড়িয়ে সম্মান করে থাকি। দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা অতি সাধারণ সম্মান। কিন্তু কদমবুসী, জমিনবুসি এগুলি আরো বিশেষ সম্মান। আমরা একান্ত ধর্মীয় মহান ব্যক্তিত্বদের জন্যই এধরনের সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। একারণে আমরা এখন থেকে আর সালামের সময় দাঁড়াব না, বরং জমিনের উপর শুয়ে পড়ে জমিন চুমু দিয়ে সালাম পড়তে থাকব। আমরা আমাদের পীর, মুর্শিদ, উস্তাদ বা মুরব্বীগণকে কদমবুসী ও জমিন বুসী করে সম্মান প্রদর্শন করি, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাব এটা কি ঠিক হবে ?

(ঙ) দফ বাজানোসহ মীলাদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলে মদীনাবাসীগণ "দফ" বাজিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। আনন্দ প্রকাশের ইসলামী বাদ্যযন্ত্র হলো দফ। বিবাহ ও ঈদে দফ বাজানোর কথা হাদীসে রয়েছে। মীলাদকে সকল ঈদের সেরা ঈদ বলে দাবি করা সত্ত্বেও মীলাদে আমরা দফ বাজাব না?

(চ) দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মাধ্যমে মীলাদ

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আগমনে কেউ উঠে দাঁড়ালে অপছন্দ করতেন। এজন্য সাহাবীগণ তাঁর আগমনে দাঁড়াতেন না। তবে তাঁরা তাঁর প্রস্থানের সময় দাঁড়াতেন। যাঁরা মনে করেন যে, তিনি মীলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন তাঁদের উচিত তাঁদের ধারণা অনুযায়ী তাঁর আগমনের সময় বসে বসে সালাম পাঠ করা এবং সালাম শেষে তাঁর প্রস্থানের সময় কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে সম্মান জানানো।

মুহতারাম পাঠক, এভাবে অনেক পদ্ধতি আমরা উদ্ভাবন করতে পারব। আপনি হয়ত এসকল পদ্ধতি প্রচলনের ক্ষেত্রে আমার সাথে একমত হবেন না, কারণ এগুলি আপনার সমাজে অপরিচিত। কিন্তু একবার চালু করে দেখুন, দেখবেন কত তাড়াতাড়ি তা প্রসার লাভ করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ গুলোর পক্ষে অসংখ্য দলিল দেওয়ার মতো আলেম পেয়ে যাবেন।

কেউ হয়ত বলবেন: আমাদের বড় বড় আলেম ও বুজুর্গগণ এ পদ্ধতিগুলি জানলেন না, পালন করলেন না, আমরা কী-ভাবে তা করব ? আমরা কি তাঁদের চেয়ে বেশি বুঝি ? সুন্নাত প্রেমিক সুন্নী মুসলমান ঠিক তেমনিভাবে চিন্তা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিগুলি জানলেন না, পালন করলেন না, আমরা কী-ভাবে করব ? আমরা কি তাঁদের চেয়ে বেশি বুঝি ?

চতুর্থত, মীলাদ অনুষ্ঠান : আমাদের অনুভূতি

সম্মানিত পাঠক, আমরা দেখেছি যে, মীলাদ অনুষ্ঠানে আমরা যেসকল কাজ করে থাকি তার অধিকাংশই সুন্নাত-সম্মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ সকল ইবাদতের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের বুজুর্গ আলেমগণের অনেকে মীলাদ অনুষ্ঠানকে জায়েয বলেছেন। কেউ-বা মুস্তাহাব বলেছেন। আমরা মনে করি যে, মীলাদ পদ্ধতি খেলাফে সুন্নাত হলেও, তা যদি শিরক ও অন্যান্য সকল প্রকার সুন্নাত বিরোধী কাজ থেকে মুক্তভাবে শুধুমাত্র দরুদ, সালাম, কুরআন তিলাওয়াত, সহীহ হাদীস আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে পালিত হয় তাহলে এসকল মাসনূন ইবাদত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মহব্বত অর্জন, সালাত ও সালাম পাঠ ইত্যাদি ইবাদত যা এ উপলক্ষে আমরা পালন করে থাকি তার সাওয়াব ইন্‌শা আল্লাহ আমরা পাব। কিন্তু পদ্ধতি যেহেতু খেলাফে-সুন্নাত, সেহেতু পদ্ধতির পিছনে ব্যয়িত সময় ও শ্রমের জন্য আমরা কোনো সাওয়াব পাব না। খেলাফে-সুন্নাত কোনো উপকরণ বা পদ্ধতির মধ্যে আমরা সাওয়াব আশা করতে পরি না। বরং এ সকল ইবাদত অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতিতে পালন করার জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার।

মীলাদের মধ্যে উপরোল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত ও সালাত সালামের ইবাদত পালনের ফলে স্বভাবতই স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষেরা অনেক ভালো আসর, বরকত ও হৃদয়ের হাল অনুভব করেন। এসকল নেয়ামত 'মীলাদ' পদ্ধতির কারণে নয়, মাসনূন ইবাদতগুলির কারণে। ইবাদতগুলি মাসনূন পদ্ধতিতে সাহাবীগণের অনুকরণে করলে নিঃসন্দেহে তার ফল আরো অনেক বেশি হবে।

মাসনূন পদ্ধতিতে মীলাদ পালনের জন্য আমাদের নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :

(ক). রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সোমবার দিন রোযা রাখতে শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মীলাদ পালন ও তাঁর জন্ম উপলক্ষে শুকরিয়া জানানোর এই হলো সর্বোত্তম পথ।

(খ.) সাহাবায়ে কেরাম আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও তা'যীমের সর্বোত্তম আদর্শ শিক্ষাদান করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষণে সাধ্যমতো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন, কর্ম, আকৃতি, প্রকৃতি চিন্তা করতেন, তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করতেন। তাঁরা সুযোগ পেলেই কয়েকজন একত্রিত হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনী, সুন্নাত, সীরাহ, শামাইল, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসতেন। আমাদেরও দায়িত্ব হলো সুযোগ ও আবেগ মতো যত বেশি সম্ভব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন কেন্দ্রিক মাহফিল ও মাজলিস কায়েম করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন্দ্রিক যে কোনো আলোচনা তাঁর প্রতি আমাদের মহব্বত বৃদ্ধি করবে, যা আমাদের ঈমানের অন্যতম অংশ। এছাড়া আমাদের জীবনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত তাঁর মহান নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য। এগুলি সর্বদা আলোচনা করা ও শুকরিয়া জানানো আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

(গ). সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ এই মাহফিলগুলি "মীলাদ" নামে করেননি। তাঁরা এ সকল মাজলিসকে 'যিক্‌রের মাহফিল', 'সুন্নাতের মাহফীল', 'হাদীসের মাজলিস', 'সীরাতের মাজলিস' ইত্যাদি নামে করতেন। নাম বা পরিভাষার চেয়ে বিষয় বেশি গুরুতপূর্ণ। তবুও নাম ও পরিভাষার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলিত নাম ও পরিভাষা ব্যবহার উত্তম। বাধ্য না হলে কেন আমরা তাঁদের রীতি, নীতি বা সুন্নাতের বাইরে যাব?

(ঘ). এ সকল মাজলিসে আনুষ্ঠানিকতা না করে মহব্বত ও আবেগের সাথে সাহাবীগণের অনুকরণে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত, রীতি, কর্ম, জীবনী, বাণী, শিক্ষা, আকৃতি, উঠা-বসা, শোওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, জন্ম, ওফাত, পরিবার পরিজন ইত্যাদি সকল বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জন্য তাঁর মহব্বত, কষ্ট ইত্যাদি স্মরণ করে মহব্বত বৃদ্ধি ও সাহাবীগণের মত ক্রন্দনের চেষ্টা করতে হবে।

(ঙ). আলোচনার মধ্যে উপস্থিত সকলে আদবসহ পরিপূর্ণ মহব্বত, ভয়, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে অনুচ্চস্বরে প্রত্যেকে নিজের

মতো করে সালাত ও সালাম পাঠ করতে হবে।

সপ্তম পদ্ধতি, বর্জনের বিদ'আত :

খেলাফে-সুন্নাতের একটি রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য বা দ্বীনের কল্যাণে বর্জন করা। আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন বা করতে নির্দেশ বা অনুমোদন প্রদান করেছেন তা বর্জন করা খেলাফে - সুন্নাত। এই বর্জন যদি ব্যক্তিগত আলস্য, অসুবিধা ইত্যাদি কারণে হয় তাহলে তা বিদ'আত হবে না, তবে সুন্নাতের গুরুত্ব অনুসারে তা ত্যাগ করা মুবাহ, মাকরূহ বা হারাম হতে পারে। আর যদি এই বর্জন সাওয়াবের উৎস হিসাবে বা দ্বীন পালনের অংশ হিসাবে করা হয় তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। আমি এখানে এই বিদ'আতের দুটি রূপ আলোচনা করছি।

(১). তাকওয়া ও তাসাউফের জন্য 'মুবাহ' বর্জন

বর্জনের বিদ'আত আমাদের সমাজে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান। এর প্রাচীন বা গতানুগতিক একটি রূপ আছে। কিছু মানুষ তাসাউফ, সাধনা, ফকীরী বা দরবেশীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল খাদ্য গ্রহণ করেছেন, যে সকল পোশাক পরিধান করেছেন, সাংসারিক, সামাজিক ও জাগতিক যে সকল কাজকর্ম করেছেন তা সার্বিক বা আংশিকভাবে বর্জন করতেন। এই বর্জন করাকে 'আল্লাহ পাওয়ার' বা তাকওয়া ও সাওয়াব অর্জনের জন্য উপকারী মনে করতেন। যেমন, গরুর গোশত, উটের গোশত, বিভিন্ন হালাল খাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের বা রঙের পোশাক, বিবাহ, সাংসারিক জীবন, সামাজিক ও জাগতিক বিভিন্ন দায়িত্ব তাঁরা পরিত্যাগ করতেন আল্লাহর পথে বেশি অগ্রসর হওয়ার মানসে। এগুলি সবই বিদ'আত। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এই ধরনের প্রবণতাগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছেন।

আমি **'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক পর্দা ও দেহ-সজ্জা'** নামক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহৃত সকল পোশাক, পোশাকের রং, আকৃতি, আয়তন, পরিধানের নিয়ম, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন প্রকারে পোশাক বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছেন। কখনো বড় কামিস বা পিরহান, কখনো খোলা লুঙ্গি ও চাদর, কখনো আবা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করেছেন। এ সকল পোশাকের বিভিন্ন রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন। যদি কেউ সেচ্ছায়, কোনো ব্যক্তিগত অসুবিধা বা প্রয়োজন ব্যতিরেকে সুন্নাত, মুস্তাহাব বা দ্বীনদারীর অংশ হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পোশাকের একটি পোশাক সর্বদা পরিধান করেন বা একটি বিশেষ রঙ সর্বদা ব্যবহার করেন, তাঁর ব্যবহার করা অন্য সকল পোশাক ও রঙ বর্জন করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এই বর্জনও উপরের উদাহরণের মতো বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ এই ব্যক্তি রাসূলুল্লহ ﷺ -এর মাঝে মাঝে পালন করা সুন্নাতকে সর্বদা পালন করে সুন্নাতের বাইরে চলে গিয়েছে এবং তিনি যা পরিধান করেছেন তা বর্জন করে আল্লাহর পথে এগোতে চেয়েছে। পানাহার, সাংসারিক বা জাগতিক কাজকর্ম ও ইবাদত বন্দেগি সকল ক্ষেত্রেই একই নিয়ম। আশা করি আমরা এই উদাহরণ থেকে অন্য সকল অবস্থা বুঝে নেব।

(২). দাওয়াত ও জিহাদের জন্য সুন্নাত বর্জন

বর্জনের বিদ'আতের একটি আধুনিক রূপ আছে। আধুনিক যুগে অমুসলিম কুফরী সংস্কৃতির প্রভাবে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক অভ্যাসগত, জাগতিক ও ইবাদত বন্দেগির সুন্নাত পরিত্যাগ করেন। তারা মনে করেন তাদের এই পরিত্যাগ বা বর্জন আল্লাহর পথে চলার উপকারী, সাহায্যকারী এবং ভালো। যেমন, অনেক আল্লাহর পথের পথিক নিয়মিত তাহাজ্জুদ, সার্বক্ষণিক ও সকাল-সন্ধ্যার সুন্নাত যিক্‌র, দাড়ি, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পোশাক বর্জন করেন। এ সকল সুন্নাতের কোনোটি মুস্তাহাব, কোনোটি ওয়াজিব, কোনোটি জাগতিক, কোনোটি ইবাদতের , কিন্তু সবগুলিই সুন্নাত।

যদি তারা এগুলি ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে বর্জন করতেন এবং বর্জনের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতেন তাহলে তা বিদ'আত হতো না। কিন্তু তারা এই বর্জনকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য উপকারী বলে মনে করেন। তারা কখনো পর্যায় নির্ধারণ করেন এবং বলেন : এ সকল সুন্নাত পালনের পর্যায়ে এখনো আসেনি। আগে দাওয়াত, আল্লাহর পথে আহ্বান, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা, ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি এরপর এসকল সুন্নাত পালন করতে হবে। তারা এ বিষয়ে কখনই রাসূলুল্লহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের জীবনপদ্ধতির দিকে তাকান না, যাঁরা দাওয়াত, জিহাদ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠর আগে, পরে ও মধ্যে সবসময়েই এগুলিকে নিয়মিত পালন করেছেন।

কখনো-বা এই শ্রেণির লোকেরা অন্যন্য মানুষের ভুলের উদাহরণ দেন। তাদেরকে তাহাজ্জুদ আদায় করতে বললে বা যিক্‌র করতে বললে বলবেন : সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদত বর্জন করে শুধু তাহাজ্জুদ, যিক্‌র ইত্যাদি ইবাদতে কী লাভ? কিন্তু তাহাজ্জুদ আদায় করলে বা মাসনূন যিক্‌র করলে কি এ সকল ইবাদত করা যায় না? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কি দুইদিকের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় করেননি?

অথবা বলবেন যে, অমুকে অমুকে তো খুব তাহাজ্জুদ আদায় করছেন, কিন্তু এসকল ইবাদত করছেন না, তাতে কি লাভ হলো? তাঁরা চিন্তা করছেন না যে, সে ব্যক্তির অন্যায়ের কারণে কি আমাদের জন্য একই ধরনের অন্যায় জায়েয হয়ে গেল? শুধু জায়েযই নয় উত্তম হয়ে গেল? যারা তাহাজ্জুদ আদায় করেন অথচ প্রয়োজনীয় দাওয়াত, সৎকর্মে আদেশের দায়িত্ব পালন করেন না তাদের কাজ নিঃসন্দেহে অন্যায়। কখনো বা তাঁরা নফলকে ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করার ফলে 'খেলাফে-সুন্নাত' ভাবে নফল পালন করছেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশিত কাজ বর্জন করে তাঁর খেলাফে সুন্নাত করছেন। তবে সাধারণত এরা এই খেলাফে সুন্নাতকে উত্তম বা দ্বীনের জন্য উপকারী মনে করেন না। বরং তাদের খেলাফে সুন্নাতকে জায়েয প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন অজুহাত ও ওজর পেশ করেন। কিন্তু অপর পক্ষ নিজেদের সুন্নাত বর্জনকে পালনের চেয়ে উত্তম ও দ্বীনের জন্য উপকারী বলে মনে করেন।

কখনো-বা তারা ইসলামের উপকারের কথা ভাবছেন। তারা মনে করছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দ্বীনের উপকারের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কিছু সুন্নাত পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। তারা এ কথা চিন্তা করেন-না যে, আমরা আমাদের কোনো মতাদর্শ প্রচার করছি না, আমাদের কোনো জাগতিক স্বার্থের জন্য, জাগতিক ক্ষমতালাভের জন্য তা করছি না। আমরা আল্লাহর দ্বীনকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য আল্লাহর হাবীব ও খলীল রাহমাতুল্লিল আ'লামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আচরিত ও প্রদর্শিত পথে প্রচার করছি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রদর্শিত পথে, তাঁর সুন্নাত মোতাবেক ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। ফলাফলের চিন্তা আমাদের নয়। আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথের একচুল পরিমাণ বাইরে যেতে পরি না। সুন্নাতেই নিরাপত্তা, সুন্নাতের বাইরে ধ্বংস।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি দ্বীনের প্রচার, প্রসার বা প্রতিষ্ঠার জন্য কোথাও এসকল সুন্নাত পরিত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন? আমরা কি তাঁর দ্বীনকে তাঁর চেয়েও বেশি বুঝি? কেন আমরা তাঁর সুন্নাত পরিত্যাগ করে বিপুল সাওয়াব থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করছি অথবা গোনাহের মধ্যে নিজেদেরকে নিপতিত করছি। কেন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশকে অমান্য করে গোনাহের মধ্যে নিপতিত হচ্ছি? তাঁকে খুশি করার জন্য?

আসল কথা কি বলব ? আসল কথা হলো, আমরা কুফরী সংস্কৃতির কাছে মানসিকভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছি। ইসলামের অনেক কিছু ভালো লাগে আবার অনেক কিছু আমাদের মন মানতে চায় না। আমরা একথা ভাবি-না যে, আমার পোশাক পরিচ্ছদ আচার আচরণ দেখে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ কতটুকু খুশি হবেন। আমরা ভাবি কুফরী সংস্কৃতির ধারকেরা অথবা আমাদের মতো পরাজিতরা আমাদেরকে ভালো বলবে, স্মার্ট বলবে, প্রসংসা করবে কি-না। আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের অনুগত করে দিন। আমীন!

রাসূলুল্লাহ ﷺ দাড়ি রেখেছেন, শুধু এজন্যই এটা তাঁর সুন্নাত। কিন্তু তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। তাঁর সাহাবীদেরকে দাড়ি বড় রাখতে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, তোমরা মুশরিক-মাজুসদের বিরোধিতা করে বড় দাড়ি রাখবে। মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিক-মাজুসগণও দাড়ি রাখতো, তবে তারা দাড়ি ছেটে ছোট করে রাখতো, এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে তাদের বিরেধিতা করে বড় দাড়ি রাখতে নির্দেশ দেন।[১]

বর্তমানে এই কাফির সম্প্রদায়ের রীতির প্রাবল্যে অনেক মুসলমান এই ওয়াজিব সুন্নাতকে পালন করতে পারছেন না। কেউ এই বর্জনের জন্য লজ্জা ও অনুতাপ অনুভব করেন, কেউ-বা অসহায়ত্ব অনুভব করেন। এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্য অনেকে তার এই সুন্নাত বর্জনকে ভালো ও উত্তম প্রমাণের চেষ্টা করছেন। কেউবা এই সুন্নাতকে সাধারণ অভ্যাসগত জাগতিক পানাহার ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাকে তাঁর থোড়াই কেয়ার করছেন।

কেউ বা কাফির সম্প্রদায়ের রীতির প্রতি নিজের ভালবাসা ও আনুগত্য চাপা দেওয়ার জন্য এর মধ্যে ধার্মিকতার রূপ প্রদান করছেন। তাঁরা দাবি করছেন, দাড়ি রেখে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করলে তা কেউ গ্রহণ করবে না, ভাববে আমাকেও তো দাড়ি রাখতে হবে, কাজেই দ্বীনের প্রয়োজনে দাড়ি কাটা যেতে পারে, বরং ভালো।

কী জঘন্য চিন্তা ! আল্লাহর দ্বীনকে আমরা তাঁর রাসূল ﷺ -এর চেয়েও বেশি বুঝলাম? এভাবে হয়ত আমরা কখন দ্বীনের প্রয়োজনে মদ খাওয়া, ব্যভিচার করা, নামায ত্যাগ করা, পর্দা ত্যাগ করা, ইত্যাদি সকল কবীরা গোনাহকে জায়েয এবং এরপর উত্তম বলে ফাতওয়া দিয়ে ফেলব। হয়তবা আরেকটু এগিয়ে দ্বীনের জন্য মূর্তিপূজা, মূর্তির সামনে দাঁড়ানো, মূর্তিকে দু'একবার ফুল দেওয়াও আমরা জায়েয করে ফেলব। মূলত অনৈসলামিক সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি তাঁদের মগজ ধোলাই করে ফেলেছে অথবা শয়তান বা প্রবৃত্তির তাড়না তাদেরকে আলস্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। উপরন্তু এই দুর্বলতা স্বীকার করার মতো সৎসাহসও তাঁদের মনে নেই। তাই অন্যায়কে ন্যায় মনে করে তাঁরা আরেকটি বড় অন্যায়ের মধ্যে নিপতিত হচ্ছেন।

আমরা ইতঃপূর্বে জেনেছি যে, ইসলামের নির্দেশিত দায়িত্বাবলীর দুটি শ্রেণি রয়েছে : একটি নিজে পালনের, দ্বিতীয়টি সমাজের অন্যান্যদেরকে পালন করানোর। প্রথম প্রকারটি সর্বজনীন। বিশ্বের যেখানে যে পরিস্থিতিতেই একজন মুসলিম বসবাস করুন না কেন এগুলি তাকে সুন্নাত অনুযায়ী পালন করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব সাধারণত ফরযে কেফায়া, কখনো তা ফরযে আইন। সকল ক্ষেত্রেই তা ক্ষমতা, সুযোগ ও পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। এ ক্ষেত্রে ওজর গ্রহণযোগ্য। এছাড়া এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব পৌঁছান, এরপর ফলাফল আল্লাহর হাতে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে 'হিকমত' ও প্রজ্ঞার অর্থ দাওয়াত গ্রহণকারীর মানসিক প্রস্তুতির আলোকে শরীয়ত অনুসারে দাওয়াত প্রদান। কোনো মদ্যপায়ী বা ব্যভিচারী অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হলে প্রথমেই মদ বা ব্যভিচার ত্যাগের দাওয়াত নয়, বরং প্রথমে ইসলামী বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা, প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তাঁকে ঈমানের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। কিন্তু হিকমতের অর্থ এই নয় যে, আমাকেও তাঁর সাথে মদপান বা ব্যভিচার করতে হবে। অনুরূপভাবে, একজন পর্দাহীন বেনামাযী মুসলিম মহিলাকে দাওয়াত দিতে হলে অবশ্যই তাঁকে আগে নামাজের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। প্রয়োজনে ন্যূনতম পর্দার কথা জানাতে হবে। কিন্তু তাঁকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমি নিজে বেপর্দা হব এই ধারণা শয়তানের প্রবঞ্চনা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের নামে প্রথম পর্যায়ের কোনো দায়িত্ব বা করণীয় বর্জন করা বা কোনো বর্জনীয়কে পালন করার কোনো বিধান সুন্নাতে নেই। আগে-পিছে করা, কাটছাট করা সবই আমাদের মনগড়া ও প্রবৃত্তির তাড়নার কাছে আত্মসমর্পণের ফল। আল্লাহর দয়া করে আমাদেরকে অন্তরের সবটুকু স্থান দিয়ে সুন্নাতকে ভালবাসার তৌফিক দান করেন।

অষ্টম পদ্ধতি, গুরুত্বগত খেলাফে-সুন্নাতে

ইতঃপূর্বে একাধিকবার আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সুন্নাত পালনে বা বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বের বিরোধিতা করা খেলাফে-সুন্নাত। আর এরূপ খেলাফ কর্মকে দ্বীন মনে করলে বা বেশি তাকওয়া মনে করলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। অনেক ধার্মিক মানুষ এই গুরুত্বগত বিদ'আতের মধ্যে নিপতিত হন। আমি এই বইয়ের মাঝে মাঝে এবিষয়ে কিছু বলার চেষ্টা করেছি। বইয়ের শেষ প্রান্তে বিষয়টি আবারো একটু আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে ক্ষমা, তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি।

(ক) সুন্নাত বা শরীয়তে মুহাম্মাদীর কর্মসমূহের গুরুত্বগত পর্যায়

কোনো কাজ করার বা বর্জন করার গুরুত্ব আমাদেরকে সুন্নাত থেকেই বুঝতে হবে। আমরা জানি যে, এই বইয়ে আমরা "সুন্নাত" বলতে ব্যাপকার্থে শরীয়তকে বুঝাচ্ছি।

যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, করতে বলেছেন এবং পরিত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন তার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আবার পরিত্যাগের শাস্তির বর্ণনা থেকে গুরুত্বের তারতম্য বুঝা যায়। যে কাজ তিনি করেছেন, করতে বলেছেন কিন্তু না-করলে আপত্তি করেননি তার গুরুত্ব দ্বিতীয় পর্যায়ে। তৃতীয় পর্যায়ে ঐ সকল কর্ম যা তিনি পালন করেছেন, কিন্তু পালন করার উৎসাহ প্রদান করে কিছু বলেননি। এই পর্যায়ের কর্মের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে : যা তিনি নিয়মিত করেছেন, ইবাদতের অংশ হিসাবে করেছেন, মাঝে মাঝে করেছেন, জাগতিক বা প্রাকৃতিক কাজ হিসাবে করেছেন।

বর্জনের ক্ষেত্রে যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ সদা সর্বদা বর্জন করেছেন, বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ করতে নিষেধ করেছেন এবং করলে কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন সেগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। শাস্তির বিবরণ থেকে গুরুত্বে পরিমাণ বুঝা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে যে কাজ তিনি বর্জন করেছেন এবং বর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছেন, তবে করলে বিশেষ কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করেননি। এরপর রয়েছে যা তিনি বর্জন করেছেন, অর্থাৎ করেননি, কিন্তু করতে নিষেধও করেননি। এই পর্যায়ের বর্জনের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত শ্রেণিভাগ ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশের চেয়ে নিষেধকে, অর্থাৎ করার চেয়ে বর্জনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। যে কাজ তিনি নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা যা তিনি আদেশ করেছেন তা পালনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছেন, যদিও দুটিই গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা গুরুত্বের দিক থেকে ইসলামের কর্মকাণ্ডকে নিম্নের পর্যায়গুলিতে ভাগ করতে পারি :

প্রথমত, ঈমান। অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান অর্জন ও শিরক, কুফর, বিদ'আত ইত্যাদি ঈমান বিধ্বংসী কর্ম বর্জন।

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন। ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি, ধোঁকা, জুলুম, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, কর্মে ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলি থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন এবং এগুলি করলে ভয়ঙ্করতম শাস্তি, আল্লাহর লা'নত ইত্যাদির ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া তিনি জানিয়েছেন যে, অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়ত, মানুষ ও অন্য সকল সৃষ্টির অধিকার নষ্ট বা ক্ষুণ্ন করা বর্জন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। এ সকল অপরাধের জন্য কঠিন ও ক্ষমার অযোগ্য শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

চতুর্থত, কুরআন ও হাদীসের অন্য সকল নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করা।

পঞ্চমত, কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত সকল ফরয দায়িত্ব পালন করা। যে সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরিত্যাগ করলে শাস্তির কথা বলেছেন সেগুলিই "ফরয" দায়িত্ব বলে গণ্য।

ষষ্ঠত, যে সকল কাজ তিনি করেছেন, করতে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন, কিন্তু পরিত্যাগ করলে কোনো আপত্তি করেননি সেগুলি পালন করা। এগুলির গুরুত্বগত পার্থক্য নির্ভর করে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সাওয়াবের বিবরণের উপর। এই প্রকারের কর্মের মধ্যে অন্যতম হলো, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন। এরপর ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

সপ্তমত, যে সকল কর্ম তিনি ইবাদতের মধ্যে বা ইবাদত হিসাবে করেছেন, কিন্তু করার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা প্রদান করেননি, বা বর্জন করতেও নিষেধ করেননি।

অষ্টমত, যে সকল কাজ তিনি জাগতিক ও প্রাকৃতিক কারণে করেছেন, তবে কাউকে করতে কোনো প্রকারে উৎসাহ প্রদান করেননি। এই প্রকারের কর্মের মধ্যে যেগুলি সর্বদা করেছেন সেগুলির গুরুত্ব বেশি। আর যেগুলি মাঝে মাঝে করেছেন সেগুলির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

এসকল পর্যায় ও কর্ম সুন্নাত অনুসারে জানা ও পালন করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুন্নাতের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ও সীমাহীন ভালবাসা ও আগ্রহ। এই ভালবাসা ও আগ্রহই আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে সহীহ হাদীসের আলোকে বিস্তারিতভাবে সুন্নাতকে জানতে ও গুরুত্ব ও পদ্ধতিতে হুবহু সুন্নাত অনুসারে পালন করতে।

(খ) গুরুত্বগত কিছু খেলাফে-সুন্নাত বা বিদ'আত ধারণা ও কর্ম

বইয়ের কলেবর বেড়ে যাওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে পৃথকভাবে কিছু লিখার আশা করি ও আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করি। এখানে শুধুমাত্র গুরুত্বগত কিছু খেলাফে-সুন্নাতের বিষয় উল্লেখ করছি। যেসকল

খেলাফে-সুন্নাত ধারণার ফলে আমাদের সুন্নাত পালও বিদ'আতে পারিণত হয়।

প্রথমত, উপরের তালিকা থেকে আমরা দেখছি যে, প্রথম পাঁচটি পর্যায়ের কর্ম বা বর্জন পরিত্যাগের জন্য শাস্তিভোগ করতে হবে। পরের তিন পর্যায়ের কর্মের জন্য পুরস্কার আছে কিন্তু পরিত্যাগে শাস্তি নেই। কিন্তু আমরা সাধারণত প্রথম পাঁচ পর্যায়ের কর্ম বা বর্জনের চেয়ে পরের তিন পর্যায়ের কর্ম বা বর্জনকে গুরুত্ব প্রদান করি। পালন, গুরুত্ব প্রদান, উৎসাহ প্রদান বা বর্জনে প্রতিবাদ সকল ক্ষেত্রেই এই খেলাফে-সুন্নাত ঘটে থাকে। যেমন, বিশুদ্ধ ঈমান, হালাল উপার্জন, আরকানে ইসলাম, পিতামাতা, সন্তান, স্ত্রী, প্রতিবেশী, কর্মচারী, কর্মকর্তা ও অন্যান্যের অধিকার আদায়, ইত্যাদির চেয়ে তাসবীহ, যিক্‌র, পাগড়ি, নফল নামায ইত্যাদির গুরুত্ব বেশি দেওয়া। ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু, থানায় কয়েদীর মৃত্যু, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বান্দার অধিকার বিষয়ক হারামের প্রতিবাদ না করে মাকরুহ পর্যায়ের পাপের প্রতিবাদে বেশি সোচ্চার হওয়া।

অনুরূপভাবে, হারাম বর্জন ও হালাল উপার্জন থেকে সুন্নাত-নফল পালনকে গুরুত্ব দেওয়া। অগণিত মানুষকে আমরা দেখি হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন সুন্নাত-নফল ইবাদত আগ্রহের সাথে পালন করছেন। বিশেষত, অনেকে বান্দার হক সংক্রান্ত হারামে লিপ্ত থেকে নফল ইবাদত পালন করছেন অতীব আগ্রহের সাথে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম পাঁচ পর্যায়ের মধ্যে সুন্নাতের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার ব্যতিক্রম করা।

তৃতীয়ত, শেষের তিন পর্যায়ের কর্মের মধ্যে সুন্নাতের যে গুরুত্বগত পার্থক্য রাখা হয়েছে তার বিপরীত গুরুত্ব দেওয়া। যেমন, নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। কুরআন ও হাদীসে মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর উপকার করা, সাহায্য করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, কারো সাহায্যের উদ্দেশ্যে সামান্য একটু পথচলা, এমনকি শুধুমাত্র নিজেকে অন্য কারো ক্ষতি করা বা কষ্ট প্রদান থেকে বিরত রাখাকে অন্য সকল প্রকার সুন্নাত-নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৃষ্টির সেবাকে সবচেয়ে বেশি ফলদায়ক বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো যে, আমরা কুরআনও হাদীসের এই স্পষ্টতম বিষয়টি একেবারেই অবহেলা করছি। একজন ধার্মিক মানুষ যিক্‌র ওযীফাকে যতটুকু গুরুত্ব দেন মানুষের সাহায্য, উপকার বা সেবাকে সেই গুরত্ব দেন না, বরং এগুলিকে ইবাদতই মনে করেন না।

চতুর্থত, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পর্যায়ের কাজগুলি আমরা গুরুত্বের দিক থেকে উল্টোভাবে গ্রহণ করি। খাদ্যের বিষয়টি চিন্তা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা কম খাদ্য খাওয়ায় অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি কম খেতে, খুধার্ত থাকতে ও মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন ও উৎসাহ দিতেন। এছাড়া তিনি খাওয়ার সময় দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। তবে সর্বদা তা ব্যবহার করতেন না বলেই বুঝা যায়। এছাড়া দস্তরখান ব্যবহার করতে তিনি উৎসাহ প্রদান করেননি। সাহাবীগণ হেঁটে হেঁটে, দাঁড়িয়ে বা পাত্রে রেখেও খেয়েছেন। এখন আমরা দ্বিতীয় কর্মীটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করি, অথচ প্রথম কাজটিকে গুরুত্ব প্রদান করি না।

পঞ্চমত, সুন্নাত পালন করতে যেয়েও সুন্নাতের বিরোধিতা করেন অনেকে। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করলে তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা হয়। কারণ, তিনি মাঝে মাঝে অন্য যে কাজটি করতেন তা বর্জিত হয়।

ষষ্ঠত, গুরুত্বগত বিদ'আতের একটি বড় রূপ হলো তাকওয়ার ধারণার বিকৃতি। আমরা অধিকাংশ সময়ে প্রথম ছয়টি পর্যায়ের কাজের চেয়ে শেষ দুটি পর্যায়ের কাজকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করি এবং এগুলিকেই তাকওয়ার প্রকাশ মনে করি। আমরা পাগড়ি, টুপি, যিক্‌র, দস্তরখান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন। কেউ হয়ত গীবত, অহঙ্কার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, তাহাজ্জুদ, যিক্‌র ইত্যাদি অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমরা এই ব্যক্তিকে মুত্তাকী বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি। এমনকি আল্লাহর ওলী বা পীর মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি। অপর দিকে যদি কেউ মানব সেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন তাকে আমরা আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হব না।

সপ্তমত, গুরুত্বগত বিদ'আতের সর্বোচ্চ পর্যায় হলো, আমরা শেষ পর্যায়ের নফল কাজগুলিকে দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল মুমিন মুসলমান একে অপরকে ভালবাসবেন। বিশেষত যাঁদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পর্যায় পাওয়া যায় তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর ওলী ও মুত্তাকী বান্দা হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে বিশেষভাবে ভালবাসব। নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না।

কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি রঙ, যিক্‌র, দোয়া, দরুদ সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি। ফলে প্রথম পাঁচটি পর্যায় যার মধ্যে সঠিকভাবে বিরাজমান নেই, অথচ পরের পর্যায়ে আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা আপন মনে করে দ্বীনি ভাই বা মহব্বতের ভাই বলে মনে করি। আর যার মধ্যে প্রথম পাঁচটি পর্যায় বিরাজমান, কিন্তু নফল পর্যায়ে আমার সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদণ্ড উল্টে ফেলেছি। আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি।

ফরয নামাযকে নফল মনে করে আদায় করা ও নফল নামাযকে ফরয বিশ্বাস করে আদায় করা যেমন সুন্নাত বিরোধিতা ও বিদ'আত, আমাদের উপরের বিষয়গুলিও অনুরূপ বিদ'আত। পালনের ক্ষেত্রে যেমন সুন্নাত অনুসারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, পালনে উৎসাহ প্রদান ও পরিত্যাগ করলে প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও এভাবে সুন্নাতের স্তর ঠিক রাখতে হবে। আল্লাহ আমদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাওফীক প্রদান করেন।

শেষ কথা

সম্মানিত পাঠক, আলোচনা আর দীর্ঘ করছি না। সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা ছাড়াও ভাষাগত দুর্বলতা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে মনে হয় যা বলতে চেয়েছি তা বোধহয় বলতে পারিনি। তাই শেষে কথাটি আবারো বলি।

আমরা জীবনে জাগতিক যত কাজ করি তা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যতে করি কিন্তু তা আল্লাহর কাছে কবুল না হয়, তাহলে আমরা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দুনিয়াতে আমাদের মাকসূদ পূর্ণ হয়। যেমন, কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি বা সুন্নাত পালনের নিয়্যাতে বিবাহ করেন তাহলে আল্লাহর কাছে কবুল না হলেও তাঁর জাগতিক প্রয়োজন ও মাকসূদ পূর্ণ হবে। অনুরূপভাবে খাদ্যগ্রহণ, বাসস্থান নির্মাণ, ব্যবসা, চাকুরি ইত্যাদি সকল কর্ম।

আর আমরা ইবাদত হিসাবে যে সকল কাজ করি তা যদি আল্লাহর নিকট কবুল না হয় তাহলে আমর দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই। কারণ আমরা মূলত জীবনের অধিকাংশ সময় জাগতিক প্রয়োজনে ব্যস্ত। সকল ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় আমরা চেষ্টা করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সামান্য কিছু ইবাদত বন্দেগি করা। উদ্দেশ্য কিছু সাওয়াব ও বরকত অর্জন। সাওয়াবের কাজ পালন করতে সাধারণত আমাদেরকে জাগতিক কিছু স্বার্থ বা সুখ-সুবিধা নষ্ট করতে হয়। এখন যদি এই ইবাদত আল্লাহর কাছে গৃহীত না হয়, তাহলে একদিকে যেমন আমরা জাগতিক স্বার্থ ও সুখ নষ্ট করলাম, অপরদিকে আখেরাতের জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গৃহীত না হওয়াই আমরা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলাম।

আমাদের ইবাদত-বন্দেগি কবুল হওয়ার জন্য ও সাওয়াব অর্জনের জন্য একমাত্র নিশ্চিত ও নিরাপদ পথই হলো 'সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা'। সুন্নাতের বাইরে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, দ্বিধা ও ভাবনা। কী প্রয়োজন আমাদের ঝুকি নেওয়ার?

সমাজে অনেক পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ মানুষ আছেন যারা নিজেদের ইল্‌ম, জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর আস্থা রাখেন। তারা মনে করেন যে, কুরআন হাদীস ঘেটে নতুন নতুন ইবাদত বন্দেগি বা ইবাদত বন্দেগির নতুন নতুন পদ্ধতি তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই প্রয়োজন পালনের দায়িত্বও তাদের। অগণিত অকাট্য (!) যুক্তি ও প্রমাণের আলোকে তারা অগণিত নতুন নতুন ইবাদত বন্দেগি তৈরি করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনে কোনোদিন যে কাজ যেভাবে করেননি তাও তাদের অকাট্য যুক্তির আলোকে ইবাদতে পরিণত হয়েছে এবং আল্লাহর সাওয়াব, নৈকট্য ও বরকত লাভের একমাত্র পথ বলে পরিণত হয়েছে। এগুলিতে তারা কোন ঝুকি আছে বলে মনে করেন না।

সম্মানিত পাঠক, আমি ঝুকি নিতে চাই না। আমার বুদ্ধি, বিবেক, আকল জ্ঞানের উপর আমার আস্থা নেই। অন্য কারো বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের উপরেও নির্ভর করতে ভয় লাগে। শুধু নির্ভয়ে নির্ভাবনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরে নির্ভর করতে ভালো লাগে। আমি একেবারে নাদান বোকা অনুসারীর মতো হুবহু অবিকল অনুসরণ করতে চাই নবীয়ে আরাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে। আমাদের কাছে একটিই প্রশ্ন: এই কাজটি সুন্নাত কি-না? রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কাজটিকে এভাবে করেছেন কি-না বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কি-না? যদি তাঁর সুন্নাত হিসাবে তা প্রমাণিত হয় আমি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তা করব। আর যদি তিনি এভাবে করেছেন বলে প্রমাণিত না হয়, তাহলে আমি কখনই সেই কাজে কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করব না। আপনার অগণিত যুক্তি ও অকাট্য দলিল আমার কাছে মূল্যহীন। এছাড়া আমাদের বিশ্বাস, সুদৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে জাননি। কাজেই, কুরআন হাদীস ঘেটে, যুক্তি প্রমাণ দিয়ে নতুন নতুন ইবাদত বন্দেগি তৈরির কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। তিনি নিজে আচরণ ও কার্যের মাধ্যমে যা আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন তা পালন করলেই পূর্ণতম সাওয়াব ও সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন সম্ভব। সেগুলিই করতে পারছি না আবার নতুন কিছুর অবকাশ কোথায়?

প্রিয় পাঠক, আপনার জন্যও আমি ভালবাসি যে, আপনিও তাঁরই অবিকল অনুসারী হয়ে যান। এজন্যই এই বই লেখা। এ বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ কথাটিই বলতে চেয়েছি। জানিনা পেরেছি কি-না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক অনেক সুন্নাত আমাদের মধ্যে মৃত ও অপরিচিত হয়ে গিয়েছে। অল্প কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে পারলাম। অনেক বিষয় আলোচনা করা সম্ভব হলো না। আল্লাহ তাওফীক প্রদান করলে হয়ত ভবিষ্যতে অন্য কোনো বইয়ে আলোচনা করব। তবে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো প্রত্যেক মু'মিনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সংযুক্ত হতে হবে। হৃদয়কে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর সাথে বেঁধে দিতে হবে। এজন্য কয়েকটি কাজ করতে হবে:

প্রথমত, সর্বাধিক পরিমাণ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে। প্রতিটি মু'মিনের দায়িত্ব প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব কুরআন অধ্যয়ন, বিশুদ্ধ হাদীস অধ্যয়ন। আরবি না জানলে আমরা তরজমা পাঠ করব। বেশি বেশি অধ্যয়ন আমাদেরকে সমাজের অগণিত খেলাফে-সুন্নাত কর্ম জানতে সাহায্য করবে। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের বুজুর্গী ও মহব্বতের বিশ্বাস সুদৃঢ় করবে এবং বাকি সকলের বুজুর্গীকে তাঁদের বুজুর্গীর নিচে স্থান করে দেবে।

দ্বিতীয়ত, কুরআন ও হাদীসকে প্রকৃত মুরশিদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। উদ্ভাবনী মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অনেক সময় জ্ঞানীকে সুন্নাত পরিত্যাগ করে উদ্ভাবনের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একমাত্র আদর্শ ও মুক্তির দিশারী হিসাবে বিশ্বাস করে তাঁর হুবহু অনুকরণের আন্তরিক প্রেরণা নিয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং পালন করতে হবে।

আমরা আল্লাহর পথে চলার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, দল, সংগঠন বা বুজুর্গের সাহচার্য গ্রহণ করি। আমাদের জন্য তা প্রয়োজনীয়। তবে আমাদের হৃদয়গুলিকে মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সাথে বেঁধে রাখতে হবে। সবার ঊর্ধে তাঁদের স্থান। সকলের কথা

ও মতের ঊর্ধে কুরআন ও হাদীসের কথা। আল্লাহর পথে চলার কর্মে, সকল নেক ও সাওয়াবের কর্ম পালনের সর্বোচ্চ আদর্শ ও সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী রাসুলুল্লাহ ﷺ। তাঁর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ। অনুসরণের ভুল হতে পারে, কিন্তু অনুসরণের বাইরে নাজাত আছে তা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। অন্তত এই বিশ্বাসটুকু হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক রাখা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে যখন যে সুন্নাতটি জানতে পারব তা যথাসাধ্য পালন করতে হবে। এককথায় আমাদের হৃদয় ও জ্ঞান-জগৎ ব্যস্ত থাকবে সদাসর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত ও তাঁর সুন্নাত জানার চেষ্টায়। আর আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যস্ত থাকবে তাঁর সুন্নাতের অনুসরণে। এভাবেই আমরা সাহাবীগণের অনুরূপ অনুসরণময় প্রেম-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তিময় অনুসরণ কিছুটা হলেও অর্জন করতে পারব। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দাতা।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন, সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নবীয়ে মুস্তাফা ﷺ -এর সুন্নাতকে বুঝার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আপাতত এখানেই শেষ করছি। অযোগ্য মানুষের এ নগন্য প্রচেষ্টার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণকর কিছু থেকে থাকে তবে তা শুধু মহান প্রভু আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীক। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে, মূলত অগণিত, সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং শয়তানের কারণে। আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ দয়া করে আমার এ সামান্য প্রচেষ্টাকে দয়া করে কবুল করে নিন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুগণ ও পাঠকবর্গের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন ; আমীন।

. .

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় যেসকল গ্রন্থের উপর মূলত নির্ভর করা হয়েছে এবং উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে বিষয়ভিত্তিক ও ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো। পাঠক দেখতে পাবেন যে, মূলত প্রাচীন ইমাম ও আলেমদের গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে এই গ্রন্থে। মহান আল্লাহ এসকল ইমাম, আলেম ও গ্রন্থাকারকে অফুরন্ত রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন, যাঁদের রেখে যাওয়া জ্ঞান-সমুদ্র থেকে সামান্য কিছু নুড়ি কুড়িয়ে এই গ্রন্থে সাজিয়েছি।

<u>প্রথমত, কুরআন করীম, তাফসীর ও প্রাসঙ্গিক</u>

১. কুরআন করীম
২. ইমাম তাবারী (৩১১হি.), জামেউল বাইয়ান/ তাফসীরে তাবারী, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮ খৃ.)
৩. আবু বকর জাস্সাস (৩৭০হি.), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী)
৪. আবু বকর ইবনুল আরাবী (৫৪৩হি.), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী)
৫. ইমাম ইবনু কাসীর (৭৭৪হি.), তাফসীরুল কুরআনিল কারীম/ তফসীরে ইবনু কাসীর (মিশর, কাইরো, দারুল হাদীস, ২য় প্রকাশ ১৯৯০)

<u>দ্বিতীয়ত, হাদীস শরীফ ও প্রাসঙ্গিক</u>

৬. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯হি.), আল-মুয়াত্তা (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১)
৭. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (২১১হি.), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
৮. ইবনু আবী শাইবা (২৩৫হি.), আল-কিতাবুল মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃ.)
৯. আহমদ ইবনু হাম্বল (২৪১হি.), মুসনাদে আহমদ (কাইরো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮খৃ.)
১০. দারেমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫হি.), আস-সুনান (সিরিয়া, দামেশক, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১খৃ.)
১১. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬হি.), আস সহীহ, ফতহুল বারী সহ, (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি.), আস- সহীহ, (মিশর, কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবুল আরাবিয়্যাহ)
১৩. আবু দাউদ সিজিসতানী, সুলাইমান ইবনুল আশআস (২৭৫হি.), আস-সুনান (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮খৃ.)
১৪. ইবনু মাজাহ কাযবীনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫হি.), আস-সুনান (তুরস্ক, ইসতাম্বুল, মাকতাবাহ ইসলামিয়্যাহ)
১৫. তিরমিযী, আবু ইসা মুহাম্মাদ (২৭৯হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৬. ইবনু আবীদ দুনিয়া (২৮১হি.), কিতাবুস সামত ও আদাবুল লিসান, মাওসূআতু ইবনু আবীদ দুনিয়া (বৈরুত, মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩খৃ.)
১৭. ইবনু ওয়াদ্দাহ (মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াদ্দাহ) আল-কুরতুবী (২৮৬হি.), আল-বিদা'উ ওয়ান নাহয়ু আনহা (বৈরুত, দারুর রায়েদ আল-আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮২ খৃ.)
১৮. ইবনু আবী আসেম (২৮৭), কিতাবুস সুন্নাত (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
১৯. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪হি.) মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল (বৈরুত, মুআসসাতুর রিসালা, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৪)
২০. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী , আস-সুন্নাহ (বৈরুত, মুআস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি)
২১. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শুআইব (৩০৩হি.), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২)
২২. নাসঈ, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১খৃ.)

২৩. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী (৩০৭হি.), মুসনাদে আবী ইয়ালা (সিরিয়া, দেমাশক, দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২ খৃ.)
২৪. ইবনু খুযাইমা (৩১১হি.), সহীহ ইবনু খুযাইমা (সৌদী আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২য় প্রকাশ, ১৯৮১খৃ.)
২৫. আবু জাফর তাহাবী (৩২১হি.), শরহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭)
২৬. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু উমর (৩২২হি.), আদ-দু'আফা আল-কাবীর, বৈরুত, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪ ।
২৭. ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি.), সহীহ ইবনু হিব্বান, তারতীব ইবনু বালবান (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৭)
২৮. তাবারানী, আবুল কাসেম (৩৬০হি.), আল-মু'জাম আল-কাবীর (ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ২য় সংস্করণ)
২৯. তাবারানী, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি.), আল-মু'জামুল আওসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৩০. ইবনু আদী আল জুরজানী (৩৬৫হি.), আল-কামিল ফী দুআফাইর রিজাল (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭)
৩১. ইবনুল মুকরি' (৩৮১হি.), আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম, আর রুখসাতু ফী তাকবীলিল ইয়াদ, রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.)
৩২. হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫হি.), আল-মুস্তাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ)
৩৩. বাইহাকী (৪৫৮হি.), শুআবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯০খৃ.)
৩৪. বাইহাকী (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪খৃ.)
৩৫. বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ ।
৩৬. ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ (৬০৬হি.), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭১খৃ.)
৩৭. ইবনুল আসীর আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৩৮. আল-মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি)
৩৯. হাফিজ মুনযিরী (৬৫৬হি.), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪)
৪০. ইমাম নববী (৬৭৬হি.), শারহু সহীহ মুসলিম, সহীহ মুসলিম সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১খৃ.)
৪১. নাবাবী, আল-আযকার, বৈরুত, রিসালাহ, তাহকীক শু'আইব আনাউত ।
৪২. খাতীব তাবরীযী (৭৩০হি.) মেশকাতুল মাসাবীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্র., ১৯৮৫)
৪৩. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি.), মীযানুল ইতিদাল, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, ১ম প্রকাশ)
৪৪. ইবনুল কাইয়েম (৭৫১হি.), আল-মানারুল মুনীফ (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৭০)
৪৫. নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭হি.), মাওয়ারিদুয যামআন বি যাওয়াইদি ইবনু হিব্বান (বৈরুত, দারুস সাকাফাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০ খৃ.)
৪৬. নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২ খৃ.)
৪৭. বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বকর (৮৪০হি.) মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খৃ.)
৪৮. বুসীরী আহমদ ইবনু আবী বাকর, যাওয়ায়িদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
৪৯. ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২হি.), ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৫০. ইবনু হাজার আসকালানী , তাকরীবুত তাহযীব (সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১৯৮৮খৃ.)
৫১. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৫২. শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২হি.), আল-মাকাসিদুল হাসানা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭ খৃ.)
৫৩. জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১হি.) তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাওসার, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৮হি.)
৫৪. জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১হি.), ফাদ্দুল ওয়া' ফী আহাদীসি রাফইল ইয়াদাইনি ফিদ দু'আ (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ খৃ.)
৫৫. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি.), তানযীহুশ শারীয়াহ, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮১)
৫৬. মুল্লা আলী কারী (১০১৪হি.), আল-আসরারুল মারফুয়া, (লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫)
৫৭. মুল্লা আলী কারী (১০১৪হি.) শরাহু শারহি নুখবাতিল ফিকর (বৈরুত, দারুল আরকাম)
৫৮. আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি.), কাশফুল খাফা, (বৈরুত, রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ ১৪০৫ হি)
৫৯. মুহাম্মাদ আল-কাত্তানী (১২৪৫হি.), আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফা (লেবানন, বৈরুত, দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৬ খৃ.)
৬০. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আসারুল মারফূয়া ফীল আখবারিল মাউযূয়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪ খৃ.)
৬১. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), আল-আজইবাতুল ফাযিলা লিল আসইলাহ আল-আশারাতিল কামিলা (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ৯৯৮৪ খৃ.)
৬২. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (দুবাই, দারুল কালাম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৬৩. শামসুল হক আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৬৪. মুফতী আমীমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (কলকাতা, হাজী মুহাম্মাদ সাঈদ)
৬৫. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সাহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮ খৃ.)
৬৬. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ.)
৬৭. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্র, ১৯৯২খৃ.)
৬৮. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (বিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ৩য় প্র. ১৯৮৮খৃ.)
৬৯. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (দেমাশক, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় প্র, ১৯৮৫)
৭০. মাহমূদ তাহহান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৭)
৭১. ড. আমীন আবু লাবী, ইলমু উসূলিল জারহি ওয়াত তা'দীল (সৌদী আরব, আল-খুবার, দারু ইবনি আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৭২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঢাকাা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০৫)

তৃতীয়ত: আকীদা, ফিকহ ও প্রাসঙ্গিক

৭৩. আবু হানীফা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০) আল ওসীয়্যাহ, শারহু মুল্লা হুসইন (হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০খৃ.)
৭৪. আবু হানীফা নুমান ইবনু সাবিত (১৫০হি.), আল-ফিকহুল আকবার, মুল্লা কারীর শারহ সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪.খৃ.)
৭৫. আবু ইউসূফ ইয়াকুব (১৭৬হি.), আর-রাদ্দু আলাল আউযায়ী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৭৬. মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯হি.), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩.খৃ.)
৭৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, কিতাবুল আসল বা আল-মাবসূত, (করাচি, ইদারাতুল কুরআন)
৭৮. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-হুজ্জাত, বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪০৩, ৩য় প্রকাশ ।
৭৯. শাফেয়ী, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (২০৪হি.), আল উম্ম (বৈরুত,দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)

৮০. হারেস মুহাসেবী (২৪৩হি.), রিসালাতুল মুসতারশিদীন (সিরিয়া, হালাব, মাকতাবুল মাতবুআত আল-ইসলামিয়্যাহ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ ১৯৮৫খৃ.)।
৮১. তাবারী, মহাম্মাদ ইবনু জরীব (৩১০হি.) সারীহুস সুন্নাহ (কুয়েত, দারুল খুলাফা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫খৃ.)
৮২. আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি.), আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ, ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফীর শারহ সহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮খৃ.)
৮৩. আবু মানসূর মাতুরীদী (৩৩৩হি.), শারহুল ফিকহিল আকবার (হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০খৃ.)
৮৪. ইবনু আবী যাইদ কাইরোআনী মালেকী (৩৮৬হি.), আল-মুকাদ্দিমাহ আল-কাইরোআনীয়্যাহ, শরহুল কাইরোআনীয়্যাহ, খামীস (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪হি.)
৮৫. ইবনু হাযম যাহরেী (৪৫৬হি.) আদ-দুররাতু ফীমা ইয়াজিবু এতেকাদুহু (মক্কা মুকাররামাহ, মাকতাবাতুত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮খৃ.)
৮৬. বাইহাকী শাফেয়ী (৪৫৮হি.), আল-ই'তিকাদ (বৈরুত, দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮১ খৃ.)
৮৭. কুশাইরী, আবুল কাসেম (৪৬৫হি.) আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ (বৈরুত, দারুল খাইর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)
৮৮. ইমামুল হারামাই, আবুল মাআলী আল-জুআইনী (৪৭৮হি.), আল-বুরহান ফী উসূলিল ফিকহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭খৃ.)
৮৯. আবু বকর সারাখসী (৪৯০), উসূলে সারাখসী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৩খৃ.)
৯০. আবু বকর সারাখসী (৪৯০হি.), আল-মুহাররার ফী উসূলিল ফিকহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬খৃ.)
৯১. আবু বকর সারাখসী (৪৯০হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯খৃ.)
৯২. আবু হামেদ গাযালী (৫০৫হি.) আল-মুসতাসফা (বৈরুত, দারুল আরকাম)
৯৩. আবু হামিদ আল-গাজালী (৫০৫হি.), ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.)
৯৪. গাযালী, আল-ইকতিসাদু ফিল ই'তিকাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩খৃ.)
৯৫. গাযালী (৫০৫হি.), মুকাশাফাতুল কুলুব (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র., ১৯৯৬খৃ.)
৯৬. উমর ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (৫৩৭হি.), 'আল-আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ' শারহ সহ, (ভারত, দেউবন্দ)
৯৭. আলাউদ্দীন সামারকান্দী (৫৩৯হি.), তুহফাতুল ফুকাহা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)
৯৮. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত্ত্ব ত্বালিবীন (বাংলা অনুবাদ- এ এন এম ইমদাদুল্লাহ, প্রকাশক বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী , ঢাকা)
৯৯. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রঈসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)
১০০. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), আল-ফাতহুর রাব্বানী (অনুবাদ আখতার ফারুক, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯খৃ.) পৃ.১২৩।
১০১. আল-কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭হি.), বাদাইউস সানায়ে' (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১০২. যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৬৪৩হি.), ইত্তিবাউস সুনান (সৌদী আরব, দাম্মাম, দারু ইবনিল কাইয়েম, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)
১০৩. ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৮১হি.), শারহু ফাতহুল কাদীর (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫ খৃ.)
১০৪. কাযী যাদাহ, আহমদ ইবনু কুদর, তাকমিলাতু শারহ ফাতহিল কাদীর লি ইবনিল হুমাম (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫ খৃ.)
১০৫. আহমদ ইবনু ফারাহ আল-লাখমী (৬৯৯হি.), মুখতাসারু খিলাফিয়্যাতিল বাইহাকী (সৌদী আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খৃ.)
১০৬. নিজামুদ্দীন আউলিয়া (৭২৫হি.), রাহাতিল কুলুব (অনুবাদ কফিল উদ্দীন আহমদ, বারগাহে চিশতিয়া, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫হি./১৯৯৪খৃ.)
১০৭. আলাউদ্দীন বুখারী (৭৩০হি.) কাশফুল আসরার আন উসূলিল বাযদাবী (বৈরুত, দারুল কিতাবলি আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৪খৃ.)
১০৮. ইবনুল কাইয়েম (৭৫১হি.), জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খৃ.)
১০৯. আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০হি.), আল-ই'তিসাম (সৌদী আরব, আল-খুবার, দারু ইবনু আফফান, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৫)
১১০. শাতেবী (৭৯০হি.), আলমুআফাকাত ফী উসূলিশ শারীয়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১১১. সা'দ উদ্দীন তাফতাযানী (৭৯১হি.), শারহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ (ভারত, দেউবন্দ)
১১২. ইবনু আবীল ইজ্জ হানাফী (৭৯২হি.), শারহুল আকীদাহ আত তাহাবীয়্যাহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৮৮খৃ.)
১১৩. ইবনু রাজাব (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ.)
১১৪. শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২হি.), আল-কাওলুল বাদী' (মদীনা মুনাওয়ার, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি)
১১৫. জালালুদ্দীন সূয়ূতী (৯১১হি.), সিবাহাতুল ফিকরি ফিল জাহরি বিয যিকরি (বৈরুত, দারুল বাশাইর আল-ইসলামিয়্যাহ, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮৮খৃ.)
১১৬. সুয়ূতী (৯১১হি.) আল-আমরু বিল ইত্তিবা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮ খৃ.)
১১৭. ইবনু নুজাইম (৯৭০হি.), আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযুদ দাকাইক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খৃ.)
১১৮. ইবনু হাজার হাইসামী মাক্কী আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯৭৪হি.) ফাতাওয়া হাদীসীয়্যাহ (বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাস, ১ম, ১৯৯৮)
১১৯. মুল্লা আলী কারী (১০১৪হি.), শারহুল ফিকহিল আকবার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ খৃ.)
১২০. মুজাদ্দেদে আলফে সানী (১০৩৪হি.), মাবদা ওয়া মা'আদ, অনুবাদ ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, ঢাকা, সেরহিন্দ প্রকাশন, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২১. মুজাদ্দিদ ই আলফ ই সানী (১০৪৩হি.), মাকতুবাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০হি./১৪০৬ বাং)
১২২. মুজাদ্দিদ ই আলফ ই সানী (১০৪৩হি.), মাকতুবাত শরীফ, জিলদে দুওম, বঙ্গানুবাদ এ.টি. খলীল আহমদ, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০খৃ.
১২৩. মুল্লা হুসইন ইবনু ইসকান্দার হানাফী (১০৮৪হি.), আল-জাউহারুল মুনীফা ফী শারহি ওয়াসিয়্যাতি আবী হানীফা (হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০খৃ.)
১২৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (১১৭৬হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু ইহয়ায়িল উলূম, ২য় প্রকাশ ১৯৯২)
১২৫. শাহ ইসমাঈল শহীদ (১২৪৬হি.), সেরাতে মুসতাকীম (দেউবন্দ, আরশদ বুক ডিপো)
১২৬. ইবনু আবেদীন শামী (১২৫২হি.), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯)
১২৭. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), মাজমূআতুল ফাতাওয়া, উর্দু তরজমা, (করাচী, সাঈদ কোম্পানি)
১২৮. মুহাম্মাদ আব্দুল আলী, ফাওয়াতিহির রাহামূত, আল মুসতাসফার সহিত (বৈরুত, দারুল আরকাম)
১২৯. আবুল মুনতাহী আল-মাগনীসাওয়ী, শারহুল ফিকহিল আকবার (হাইদারাবাদ, দায়েরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, ১৯৮০)
১৩০. মোহাম্মদ বেশারাতুল্লাহ, হাকিকতে মোহাম্মাদী ও মীলাদে আহমাদী (পার্বত্য চট্টগ্রাম, মোহাম্মদ মুশতাকুর রহমান, প্রথম প্রকাশ)
১৩১. সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর)
১৩২. নাসিরুদ্দীন আলবানী, আহকামুল জানাইয (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ প্রকাশ ১৯৮০ খৃ.)
১৩৩. মুহাম্মাদ সুলাইমান আশকার, আফআলুর রাসূল (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৬)
১৩৪. মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন জিযানী, মাআলিমু উসূলিল ফিকহি (রিয়াদ, দারু ইবনিল জাওযী, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬ খৃ.)
১৩৫. শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, সত্যের সন্ধানে, ১ম খণ্ড (ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬)
১৩৬. মুহাম্মাদ সারফরায খান সফদর, রাহে সুন্নাত (ভারত, দেওবন্দ, মাকতাবায়ে দানেশ)
১৩৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০৩)

১৩৮. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ ২০০৭)

চতুর্থত: ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক

১৩৯. ইবনু হিশাম (২১৩হি.), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৭৮)
১৪০. ইবনু সা'দ (মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ ইবনু মানী') (২৩০হি.), আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০খৃ.)
১৪১. খলিফা ইবনু খাইয়াত (২৪০হি.), তারিখ (বৈরুত, দারুল কলম, মুয়াস্সাতুর রিসালা, ২য় প্র. ১৯৭৭)
১৪২. ইবনু সা'দ (৩২০), আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
১৪৩. ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি.), আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (বৈরুত, মুয়াস্সাসাতল কুতুবিল সাকাফিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৭)
১৪৪. ইবনু আব্দুল বার, ইউসূফ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৬৩হি.) আল-ইনতিকা' ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৪৫. ইবনু খাল্লিকান (৬৮১হি.), ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কুম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় প্রকাশ)
১৪৬. যাহাবী (৭৪৮হি.), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুয়াস্সাতুর রিসালা, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৮৯ খৃ.)
১৪৭. ইবনুল কাইয়েম (৭৫১হি.), যাদুল মাআদ (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্র, ১৯৯৭ খৃ.)
১৪৮. ইবনু কাসীর (৭৭৪হি.), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্র. ১৯৯৬খৃ.)
১৪৯. ইবনু বাতুতা (৭৭৯হি.), রিহলাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১ম প্র, ১৯৮৭ খৃ.)
১৫০. আল-কালকাশান্দী, আহমদ ইবনু আলী (৮২১হি.), সুবহুল আ'শা (মিশর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়)
১৫১. আল-মাকরীযী, আহমদ ইবনু আলী (৮৪৫হি.), আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আসার (মিশর, কাইরো, মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনীয়্যাহ)
১৫২. আল-কাসতালানী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৯২৩হি.), আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
১৫৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ আশ শামী (৯৪২হি.), সুবুলুল হুদা/ সীরাহ শামীয়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খৃ.)
১৫৪. ইবনুল ইমাদ (১০৮৯হি.), শাযারাতুয যাহাব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯খৃ.)
১৫৫. আল-যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২হি.), শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
156. C. Jouco Bleeker And Geo Widengren, Historia Religionum: Handbook For The History Of Religions, Leiden 1969.
১৫৭. মুবারক আলী রহমানী, ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত (কলিকাতা, নাসারিয়া প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৪)
১৫৮. আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩)
১৫৯. মাহদী রেজকুল্লাহ, সীরাতুন নাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম প্র. ১৯৯২)
১৬০. মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বাইরূত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫)
১৬১. মুহাম্মাদ ইলিয়াস আব্দুল গনী, বুইউতুস সাহাবাহ হাওলাল মাসজিদ আন নাবাবী, (মদীনা মুনাওয়ারা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৯)।

পঞ্চমত: আরবী অভিধান ও প্রাসঙ্গিক

১৬২. ইবনু দুরাইদ (৩২১হি.) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫ হি.)
১৬৩. আল-জাওহারী, ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ (৩৯৩হি.), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯ খৃ.)
১৬৪. ইবনু ফারিস (৩৯৫হি.), মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাত (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি.)
১৬৫. ইবনু মানযূর আল-আফরীকী, মুহাম্মাদ ইবনু মুকাররম (৭১১হি.) লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৬৬. আল-ফাইউমী, আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৭৭০হি.), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৬৭. আল-ফাইরোজআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব (৮১৭হি.) আল-কামূসুল মুহীত (বৈরুত, মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭ খৃ.)
168. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, Third Printing, 1998)
১৬৯. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত, দারুল ফিকর)